ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতের সংবিধান, ধারা ৫১এ)

- সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
- মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
- আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
- ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
- দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
- অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
- বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
- জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
- পিতা-মাতা / অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষাবিজ্ঞান

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকারক

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস.সি.ই.আর.টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই বইয়ের সমস্ত স্বত্ব একমাত্র SCERT, Govt. of Tripura এর। একমাত্র লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইয়ের কোনো অংশই প্রতিলিপি, পুনরুৎপাদন, ব্যবহার করা যাবে না; অন্যথা প্রকাশক, লেখক, প্রকাশন সংস্থা আইনগত ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবে।

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০২০

প্রকাশক : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

মূল্য : ১৫০ টাকা

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২

প্রচ্ছদ
এস.সি.ই.আর.টি

অক্ষর বিন্যাস
শ্রী পীযূষ পাল
শ্রী সুদীপ দাস
শ্রী সাগর সূত্রধর
শ্রী রানা বনিক

মুখবন্ধ

মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক এবং জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (NCERT)-এর সহায়তায় জাতীয় পাঠ্যক্রমের যে রূপরেখা (NCF) 2005 তৈরি হয়েছিল এর প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে শিশুর জ্ঞানকে যুক্ত করা, অর্থহীন মুখস্থ পদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটানো। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য এবং বিদ্যালয়ের প্রতি আস্থা গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে NCERT-এর এই পাঠ্যক্রম ত্রিপুরা রাজ্যেও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (SCERT) নিরলস প্রয়াস করে যাচ্ছে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কলাবিভাগের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে একটি জনপ্রিয় বিষয়। NCERT থেকে পাওয়া Syllabus Structure অনুযায়ী বিগত শিক্ষাবর্ষে SCERT রাজ্যের শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা লিখিত একাদশ শ্রেণির শিক্ষাবিজ্ঞান বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। তদ্রূপ দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রেও শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা এই বইটি লেখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ড. দেবব্রত ভট্টাচার্য, ড. ভবানী মোদক, ড. নিবাস চন্দ্র শীল এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বইটি শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। SCERT-তে নিযুক্ত বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মীবৃন্দ যাঁরা টাইপ সেটিং, কভার ডিজাইন ও সামগ্রিক সৌষ্ঠব বর্ধনের কাজে (অক্ষর বিন্যাস) যুক্ত ছিলেন তাঁদের প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই বইটি শিক্ষানুরাগী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি আশাবাদী। শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে আবেদন থাকবে পরবর্তী সংস্করণে বইটি যাতে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তার জন্য গঠনমূলক মতামত জানালে SCERT যথাযথ উদ্যোগ নেবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
এস.সি.ই.আর.টি, ত্রিপুরা

CONTENT DEVELOPER

উপদেষ্টা

ড. নিবাস চন্দ্র শীল, Principal in-charge, CTE, Kumarghat

প্রথম অধ্যায়	:	শিক্ষা এবং দর্শন (ড: ভবানী মোদক, ড: দেবব্রত ভট্টাচার্য্য)
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	মহান পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্গণ (ড: দেবব্রত ভট্টাচার্য্য)
তৃতীয় অধ্যায়	:	শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক দিকসমূহ (শ্রীমতি চন্দনা বন্দোপ্যাধ্যায়)
চতুর্থ অধ্যায়	:	শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়সমূহ (শ্রীমতি মিত্রা আচার্য্য)
পঞ্চম অধ্যায়	:	নির্দেশনা ও পরামর্শদান (শ্রীমতি মিত্রা আচার্য্য)
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (ড: দেবব্রত ভট্টাচার্য্য)
সপ্তম অধ্যায়	:	শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান (শ্রীমতি চন্দনা বন্দোপ্যাধ্যায়, ড: ভবানী মোদক)
অষ্টম অধ্যায়	:	শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা (ড: ভবানী মোদক)

ড: দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, P.G.T., Khowai, Govt. Girls' Class-XII School.
ড: ভবানী মোদক, P.G.T., Madhuban (K) H.S. School.
শ্রীমতি চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, Lecturer, DIET, Agartala.
শ্রীমতি মিত্রা আচার্য্য, P.G.T., M.T.B. Girls' H.S. School.

প্রতিটি অধ্যায়ের অনুশীলনী প্রশ্ন তৈরি করেছেন ড: দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, এবং ড: ভবানী মোদক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা এবং দর্শন ১-৬১

● প্রথম একক : শিক্ষা এবং দর্শন— শিক্ষার এবং দর্শনের অর্থ, প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ● দ্বিতীয় একক : চার্বাক দর্শন, জৈন দর্শন ● তৃতীয় একক : ন্যায় দর্শন, যোগ দর্শন ● চতুর্থ একক : ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ

দ্বিতীয় অধ্যায় : মহান পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌গণ ৬২-১০২

● প্রথম একক : জ্যাঁ ব্যাকুইস রুঁশো ● দ্বিতীয় একক : জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী ● তৃতীয় একক : ফ্রেডারিক উইলহেম আগস্ট ফ্রয়েবেল ● চতুর্থ একক : মারিয়া মন্তেস্বরী

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক দিকসমূহ ১০৩-১৪৩

● প্রথম একক : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা— অর্থ, কারণ, শিক্ষার প্রভাব ● দ্বিতীয় একক : প্রেষণা– অর্থ, প্রকারভেদ, উপাদানসমূহ, শিক্ষায় প্রেষণার উপযোগিতা ● তৃতীয় একক: বুদ্ধি—অর্থ, তত্ত্ব (চার্লস স্পিয়ারম্যান এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, লুইস লিয়ন থার্স্টোন এর প্রাথমিক শক্তির তত্ত্ব), শিক্ষামূলক প্রয়োগ ● চতুর্থ একক : সৃজনশীলতা— অর্থ, উপাদান, সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়সমূহ ১৪৪-১৮৮

● প্রথম একক : সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি— অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, প্রকারভেদ, শিক্ষামূলক উপযোগিতা ● দ্বিতীয় একক : শৃঙ্খলা প্রাক্ স্বাধীনতা— অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় এর গুরুত্ব ● তৃতীয় একক : মূল্যবোধের শিক্ষা— অর্থ, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিকাশের উপায় সমূহ ● চতুর্থ একক : জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষা– অর্থ, জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরণে শিক্ষার ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায় : নির্দেশনা ও পরামর্শদান ১৮৯-২৩৪

● প্রথম একক : ব্যক্তিত্ব— অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ ● দ্বিতীয় একক : নির্দেশনা— অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় নির্দেশদানের গুরুত্ব ● তৃতীয় একক : পরামর্শদান— অর্থ প্রকারভেদ, শিক্ষায় পরামর্শদানের গুরুত্ব ● চতুর্থ একক : অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ— অর্থ, কারণসমূহ, প্রকারভেদ তাদের প্রতিরোধ-এর উপায়সমূহ (শ্রেণি থেকে পালানো, মিথ্যে ভাষণ, চুরি করা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা)

ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ২৩৫-২৬৯

● প্রথম একক : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা— অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, উপাদান, বাধাসমূহ ● দ্বিতীয় একক : ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু— অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণ পদ্ধতি ● তৃতীয় একক : ব্যাহত শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু— অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণ পদ্ধতি ● চতুর্থ একক : শিখনমূলক অক্ষমতা— অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষকের ভূমিকা।

সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান ২৭০-৩৩৩

● প্রথম একক : রাশিবিজ্ঞান— অর্থ, শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, পরিসংখ্যা বিভাজন ● দ্বিতীয় একক : লেখচিত্রে তথ্য পরিবেশন— স্তম্ভ চিত্র, পরিসংখ্যা বহুভুজ ● তৃতীয় একক : কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ— গড়, মধ্যমমান, ভূযিষ্টক ● চতুর্থ একক : বিষমতার পরিমাপ : সম্যক বিচ্যুতি

অষ্টম অধ্যায় : শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা ৩৩৪-৩৭৫

● প্রথম একক : প্রযুক্তিবিদ্যা— অর্থ, ধারণা, শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা ● দ্বিতীয় একক : শিক্ষণ প্রদীপন— প্রক্ষেপণমূলক এবং অপ্রক্ষেপণমূলক শিক্ষণ প্রদীপন ● তৃতীয় একক : শিক্ষায় প্রযুক্তি— এডুসেট, স্যাটেলাইট, টেলিভিশনমূলক, ইন্টারনেটমূলক ● চতুর্থ একক : যোগাযোগ— অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা ও দর্শন

- প্রথম একক : শিক্ষা এবং দর্শনের অর্থ, প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক
- দ্বিতীয় একক : চার্বাক দর্শন, জৈন দর্শন
- তৃতীয় একক : ন্যায় দর্শন, যোগ দর্শন
- চতুর্থ একক : ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা ও দর্শন

(Education and Philosophy)

উদ্দেশ্য (Objectives) :

- শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও দর্শনের অর্থ, প্রকৃতি এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা চার্বাক দর্শন এবং জৈন দর্শন সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা ন্যায় দর্শন এবং যোগ দর্শন সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ এবং প্রয়োগবাদ সম্পর্কে জানবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face) : এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের স্পন্দনের মুহূর্ত থেকেই শিক্ষার শুরু। প্রকৃতিগত দিক থেকে এই শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত রূপ ধারণ করেছে। সাংগঠনিক দিক থেকে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয় থেকে বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। আধুনিককালে শিক্ষাকে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য জ্ঞানের যে বিশেষধর্মী শাখা গড়ে উঠেছে, তাকে বলে শিক্ষাবিজ্ঞান। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধর্মী করার চেস্টা করলেও তার মানবীয় দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেননি।

আধুনিক সমাজে শিক্ষা এক ধরনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সমাজ যেমন সামগ্রিকভাবে কাজ করে, তেমনি ব্যক্তিও এককভাবে প্রচেস্টা করে। তাই বলা যায় আধুনিক শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করা। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের মান কেবলমাত্র বস্তুধর্মী সূচক দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। তার জন্য চাই উন্নততর জীবনাদর্শ। উন্নততর জীবনাদর্শই পারে শিক্ষার মধ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্যমুখী গতি সঞ্চার করতে। ব্যক্তি জীবনের জীবনাদর্শ গড়ে উঠে জীবনদর্শন থেকে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, জীবন পরিবেশের সঙ্গে এই সচেতনতার একাগ্রতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে জীবনদর্শন (Philosophy of Life.)। আর এই জীবনদর্শন পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তির মধ্যে কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করে। সুতরাং, শিক্ষার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন একটি জীবনদর্শনের। এই

জীবনদর্শনই শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং তাকে ব্যাপক তাৎপর্য দান করে। তাই জোহেন গটলিয়েব ফিচে (Johann Gotlieb Fiche) বলেছেন, শিক্ষার প্রকৃতরূপ একটি জীবনদর্শন ছাড়া স্বচ্ছতা লাভ করতে পারেনা।

এই কারণেই আধুনিককালে শিক্ষাদর্শনের উৎপত্তি। যে জীবনদর্শন শিক্ষাকে মানুষের জীবনে তাৎপর্যবহ করে তোলে তাকে বলা হয় শিক্ষাদর্শন। জীবনদর্শন যেমন বহুমুখী, তেমনি শিক্ষাদর্শনও বহুমুখী। তবে প্রত্যেকটি শিক্ষাদর্শন শিক্ষাকে তার নিজস্ব ভিত্তিতে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

আধুনিককালে শিক্ষাকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করার প্রধান উদ্দেশ্য হল, মানুষের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত করা। বাস্তবে কোনো বিজ্ঞান যতই বস্তুনির্ভর হউক না কেন, তাকে একটি আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সব বিজ্ঞানই একদিন দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই Philosophy বা দর্শনকে বলা হয় Mother of all disciplines.

সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার মূলে থাকে একটি দার্শনিক আদর্শ। এই দার্শনিক আদর্শই তাকে স্বাধীনতা দান করে পরিপূর্ণ করে তোলে। শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলির চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রেও শিক্ষাবিদগণ দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাই বলা হয় জীবন, দর্শন এবং শিক্ষা একই সূত্রে আবদ্ধ। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যাকে 'Philosophy' বলে অভিহিত করেছে ভারতীয় দর্শনে তাকেই দর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে, দর্শন বিশেষ করে বুদ্ধির আলোকে সত্যের অনুসন্ধান। আর ভারতীয় দর্শন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক। ভারতীয় দর্শন সকল সময়ই সত্যের ব্যবহারিক উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। দর্শন বলতে দুটি বিষয়কে বোঝায় — সত্যের উপলব্ধি এবং সত্য উপলব্ধির উপায়। ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন উভয়েই অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়; যথা বৈদিক বা আস্তিক দর্শন এবং অবৈদিক বা নাস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শন বলতে ষড়্‌দর্শনকে বোঝানো হয়; সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। আর চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক দর্শন। অপরদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদগুলো যেমন — ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ অধুনিক শিক্ষাকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এইসব দর্শনসমূহ দার্শনিক আলোচনায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজ নিজ যুক্তি পদ্ধতির সহায়তায় এইসব দর্শন নিজস্ব মতবাদগুলো আলোচনা করে এবং নিজ নিজ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। এই অধ্যায়ে শিক্ষা (Education) এবং দর্শনশাস্ত্রের (Philosophy) মধ্যেকার সম্পর্কের স্বরূপ এবং দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদসমূহ (Different Schools of Philosophy) আধুনিক শিক্ষাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম একক : শিক্ষা এবং দর্শনের অর্থ, প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক

(Meaning: Education and Philosophy, Nature of Education, Nature of Philosophy, Relation between Education and Philosophy)

ভূমিকা (Introduction) :

আধুনিককালে, শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য জ্ঞানের যে পৃথক শাখার উদ্ভব হয়েছে, তাকে বলে শিক্ষাবিজ্ঞান। এর থেকে উপলব্ধি করা যায়, শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে আধুনিককালে, বৈজ্ঞানিক রীতিতে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির জীবনের সমস্ত দিককেই প্রভাবিত করে। শুধুমাত্র বস্তুধর্মী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা উন্মেষ ঘটানোই শিক্ষার কাজ নয়, জীবনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলাই শিক্ষার কাজ। তাই দেখা যায়, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে, দর্শন থেকে শুরু করে সবরকম বস্তুধর্মী ও সামাজিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একদিকে শিক্ষা যেমন ব্যক্তির চিন্তা শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে দর্শন ও বিজ্ঞানগুলোর বিকাশে সহায়তা করছে, তেমনি অন্যদিকে নিজেও তাদের যুক্তিনির্ভর প্রামাণ্য ও অপ্রামান্য জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নিজের বিকাশ ঘটাচ্ছে। এই এককের আলোচ্য বিষয় শিক্ষা ও দর্শনের স্বরূপ ও তাদের সম্পর্ক বিষয়ে।

শিক্ষা ও দর্শন (Education and Philosophy) :

শিক্ষার উপর দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকৃতস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হলে জ্ঞানের এই দুটি বিশেষ ক্ষেত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং সেগুলি হল শিক্ষা এবং দর্শন।

শিক্ষা কি ? (What is Education) :

ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে জীবনের সমার্থক বলে মনে করা হয় আর সংকীর্ণ অর্থে একে সম্পূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। 'শিক্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলেও জানা যায় যে শিক্ষা হল মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা লাভের কৌশলকে নিয়ন্ত্রিত করা। 'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শিক্ষ্' ধাতু থেকে যার মূলগত অর্থ হল শৃঙ্খলিত করা বা নিয়ন্ত্রিত করা বা নির্দেশনা দেওয়া। আবার অন্যদিকে শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Education'। 'Education' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি চারটি ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'Educare' যার অর্থ হল প্রতিপালন করা বা পরিচর্যা করা, 'Educatio' যার অর্থ হল অন্তর্নিহিত কোনো কিছুকে প্রকাশ করা, 'Ecucere' এর অর্থ হল নিষ্কাশন করা বা নির্দেশনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 'Educatum' শব্দের

অর্থ হল শিক্ষাদান। আধুনিক অর্থে শিক্ষা হল শিশুর বা ব্যক্তির জীবন বিকাশের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার প্রক্রিয়া। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কতগুলি সম্ভাবনা বা ক্ষমতা থাকে যেগুলি বিকাশযোগ্য। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর এই জন্মগত সম্ভাবনার বিকাশে সহায়তা করা হয় তাকেই শিক্ষা বলা হয়। ব্যক্তির এই সম্ভাবনাগুলির সম্প্রসারণের ফলেই তার জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ হয়।

শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Education):

প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শিক্ষার প্রকৃতি বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বৈদিকযুগে শিক্ষার প্রকৃতি ছিল আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি। সূত্রযুগে শিক্ষার প্রকৃতি ছিল শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ চরিত্র গঠন এবং বিশেষীকরণের শিক্ষা। ব্রাহ্মণ্যযুগের শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল মননের সাহায্যে নিজের এবং পরমাত্মার শক্তিকে আবিষ্কার করা। বৌদ্ধযুগের শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল জীবন ও জগৎ থেকে মুক্তি। মধ্যযুগে শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল ধর্মভিত্তিক এবং মানুষকে ধর্মমনস্ক করে তোলা। নৈতিকতাই ছিল মূল কাঙ্খিত বিষয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রকৃতি দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছিল। একটি হল পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি জ্ঞানের বিস্তার আর অন্যটি হল প্রাচ্যবাদীদের হাত ধরে বিভিন্ন দেশীয় ভাষা যথা- সংস্কৃত, আরবিক, পার্শি ইত্যাদিকে পুনরুদ্ধার করে দেশীয় শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রকৃতি মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর এবং উৎপাদনমুখী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মূল প্রকৃতি ছিল মানুষ তৈরির শিক্ষা কিন্তু আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা পরিগণিত হল বস্তুমুখী শিক্ষায়। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Life long process) হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন— "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি" অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল ধারায় শিক্ষা চলে বলেই শিক্ষা জীবনব্যাপী।

জানা থেকে অজানা, সরল থেকে জটিল এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা অবিচল ধারায় ক্রমবর্ধমান শিক্ষার পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হয়। শিক্ষা ব্যক্তিকে সঠিক নির্দেশদান করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। শিক্ষাই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনমুখী বিশ্বে সার্থক অভিযোজনের পথ সুগম ও প্রশস্ত করে তোলে। সুতরাং, এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, শিক্ষার প্রকৃতি ক্রমপরিবর্তনশীল এবং পরিমার্জনশীল।

দর্শন কি? (What is Philosophy) :

'দর্শন' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Philosophy'। আর ইংরেজী 'Philosophy' শব্দটি দুটি গ্রীক্ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে -'Philos' এবং 'Sophia'। গ্রীক্ শব্দ 'Philos' মানে অনুরাগ বা ভালোবাসা (Loving) এবং 'Sophia' শব্দটির অর্থ হল জ্ঞান (Knowledge বা Wishdoon)। সুতরাং 'Philosophy' শব্দের অর্থ জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসা। প্লেটো (Plato) তাঁর "Republic" গ্রন্থে বলেছেন, যে ব্যক্তি সকল প্রকারের জ্ঞানের প্রতি আসক্তি আছে এবং যার জ্ঞানপিপাসা কোনো দিনই পরিতৃপ্ত হয় না, তিনিই প্রকৃত অর্থে দার্শনিক।

পাশ্চাত্য দেশে যাকে Philosophy বলা হয় ভারতে তাকেই দর্শন বলে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় দর্শন কথাটির সাধারণ অর্থ হল দেখা। 'দৃশ' ধাতু থেকেই দর্শন শব্দের উৎপত্তি। দর্শন বলতে সাধারণত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণকে বোঝায়, তবে এক্ষেত্রে দর্শন মানে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ নয়, দর্শন মানে তত্ত্ব দর্শন - জগতের এবং জীবের স্বরূপ উপলব্ধি। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই দর্শন। সেই কারণে ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তিনিই দার্শনিক যার সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়েছে, যার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটেছে, যিনি এই বিশ্বজগৎ ও জীবনের স্বরূপ জেনেছেন।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে বিচার করতে গেলে ভারতীয়রা যাকে দর্শন নামে অভিহিত করেছে তা ইংরেজী Philosophy- র প্রতিশব্দ নয়, কারণ তত্ত্বদর্শন বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার বিষয়টি Philosophy-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নয়। তবু আলোচনার বিষয়বস্তু, দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি এবং জীবনের সঙ্গে উভয়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে দর্শন এবং Philosophy-র মধ্যে মিল লক্ষ্য করে Philosophy-র প্রতিশব্দ হিসাবে দর্শন কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই জগতের দিকে যখন মানুষ তাকিয়ে দেখে তখন বিস্ময়ে তার মন ভরে যায়। জগতের অসীম ব্যাপকতা, অত্যন্ত বৈচিত্র্য তার মনে অদম্য কৌতুহল সৃষ্টি করে। এই বিস্ময় থেকেই আসে জিজ্ঞাসা। তাই তার মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে— এই জগৎ কি? কোথা থেকে এই জগতের উৎপত্তি হল? জগৎ কে ঘিরে এই যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল, নিয়মশৃঙ্খলা কে এইগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছে? এইভাবে একের পর এক অসংখ্য প্রশ্ন মনে এসে ভীড় করে। বিস্ময় থেকে জেগে উঠে মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষা। বিস্ময় নিয়ে আসে জিজ্ঞাসা আর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব সেই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেতে চায়। আর এইভাবেই দর্শনের উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক প্লেটো যথার্থই বলেছেন, বিস্ময়ই দর্শনের জনক। (Plato- Wonder is the parent of Philosophy.)

দর্শন এর ধারণা আরোও পরিস্ফুট হবার জন্য কিছু সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হল :

অগাস্ট কমতে - দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। (Auguste Comte - Philosophy is the science of sciences.)

অ্যারিস্টটল- দর্শন হল সেই বিজ্ঞান যা অনুসন্ধান করে সত্তার স্বরূপ এবং সেই স্বরূপের অন্তর্গত বিভিন্ন গুণাবলি যা তার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। (Aristotle - Philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in itself and the attributes which belong to it in virtue of its own nature.)

ইমানুয়েল কান্ট : দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং তাঁর আলোচনা। (Immanuel Kant : Philosophy is the science and criticism of cognition.")

জোহান্ গটলিয়েব ফিচ্ : দর্শন জ্ঞানের বিজ্ঞান। (Johann Gottlieb Fichte : Philosophy is the science of knowledge.)

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে :

- দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান।
- দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা।
- দর্শন হল জ্ঞানের বিজ্ঞান।

সুতরাং বলা যায় যে, দর্শন হল এমন এক বিষয় যা জীবন সম্পর্কীয় সমস্ত প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজে পেতে সহায়তা করে। তাই জীবনে চলার জন্য দর্শন এক অপরিহার্য বিষয় যাকে ব্যতীত মানবীয় অস্তিত্বের পূর্ণ অবয়ব সম্ভবপর হয় না যথার্থভাবে।

দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি (Nature of Philosophy):

বিশ্বের প্রত্যেকেরই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কতকগুলি ধারণা মনে জেগে উঠে। দার্শনিকদের কাজ হল এই ধারণাগুলিকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করা। বস্তুর স্বরূপ বা যথাযথরূপ সম্পর্কে জ্ঞান দান করাও দর্শনের কাজ। প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধারণত বস্তুর দুটি রূপ সম্পর্কে অবহিত হয়:- একটি তার বাহ্যরূপ এবং অপরটি তার স্বরূপ বা যথার্থরূপ। আকাশের যে নীল রং প্রত্যক্ষ করা হয় সেটি তার বাহ্যরূপ। কিন্তু স্বরূপত আকাশ বর্ণহীন। জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে অর্ধনিমজ্জিত কাষ্ঠখণ্ডটি বক্র মনে হয়, অথচ স্বরূপত তা নয়। এই বাহ্যরূপটিকে বলা হয় অবভাস বা প্রতিভাস (Phenomera বা Appearance)। দর্শনের অন্যতম কাজ হল বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে অবস্থিত তার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করা।

দর্শন বিজ্ঞান ও জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সুসংবদ্ধ ও শৃঙ্খলাগত জ্ঞান দিতে চেষ্টা করে। দার্শনিকের কাজ হল সাধারণ মানুষের ধারণার মতো বৈজ্ঞানিকদের এইসব ধারণাগুলি পরীক্ষা করা এবং তাদের যৌক্তিকতা বিচার করা। সাধারণ জ্ঞানের তুলনায় বিজ্ঞান অধিকতর সুসংহত ও সুসংবদ্ধ এবং বিজ্ঞানের তুলনায় দর্শনের জ্ঞান আরও সুসংবদ্ধ, সুসংহত ও পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য দার্শনিকগণ দেশ, কাল, কার্যকারণ সম্পর্ক, জড়, চেতনা, প্রাণ, মন, অভিব্যক্তি বা বিবর্তন, ঈশ্বর, ভালো-মন্দ, সুন্দর কুৎসিত, সত্য-মিথ্যা, প্রভৃতি সব বিষয় সম্পর্কেই প্রচলিত ধারণাগুলিকে বিচার করে দেখে, এইগুলির যৌক্তিকতা নির্ণয় করে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইগুলির ব্যাখ্যা দেয়। তাই বলা হয় দর্শনশাস্ত্র হল মানুষের জীবন ও তার অভিজ্ঞতাবলি সম্পর্কে তাৎপর্যবহ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্র।

দর্শন শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা যায়। লৌকিক অর্থে দর্শন হল দেখা বা আলোকন। কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় দর্শন হল বোধ, উপলব্ধি, জ্ঞান বা বুদ্ধি, সাক্ষাৎকার শক্তি, প্রকাশন বা আধ্যাত্মজ্ঞান সাধনশাস্ত্র। জড় ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে কোনো দ্রব্য বা বস্তু শুধু দেখা— তা দর্শনের পর্যায়ে পড়ে না। দেখার ভিত্তি করে জ্ঞানলোক গড়ে তোলাই দর্শন। (Perception), অনুমানের (Inference) দ্বারা বা প্রামাণ্য শাস্ত্র বা বিদ্বান মননশীল ব্যক্তির মাধ্যমে কিছু জানাও সেই জানাকে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে সত্য করে তোলাই দর্শন।

সমস্ত বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে যে নির্যাস জীবন ও জগৎকে এক ও অখণ্ড করে রেখেছে— তাই হল দর্শন। দর্শন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একক, অখণ্ড সত্তারূপে উপলব্ধি করে। দর্শনের সাহায্যেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বজগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় ভাবনা বা মননের স্তরে আমাদের উত্তরণ। সমগ্র জীবন জিজ্ঞাসাই দর্শন, তাই এর আদি নেই, অন্ত নেই। মানুষের ব্যক্তি জীবন জুড়ে আবার জীবনের বাইরেও দর্শনের পদচারণা, তাই দর্শন সমগ্র জীবনচর্চা এক অখণ্ড বিশ্বপ্রকৃতির গতিবীক্ষণ।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক (Relation between Education and Philosophy) :

যে-কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ মূলত দার্শনিক চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়। জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভুত পরস্পর বিরোধী চাহিদাগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়ানো সহস্র প্রশ্নের উত্তর দর্শনই দেয়। শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন সমস্যা যেমন– স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতা, নির্দেশদান কৌশল, ইত্যাদি বিষয়সমূহ এমনকি পাঠ্য বিষয়ের যথার্থতা ও দার্শনিক বিশ্বাস ও মৌলিক ধারণার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাপরিচলনা, উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার বৃহত্তর দিকগুলিও দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত। সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি তখনই সুসংহত হয়ে উঠে যখন তাদের ভিত্তি হয় গভীর দর্শন। বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শিক্ষাবিদ জন অ্যাডামস বলেছেন— শিক্ষা হল দর্শনের গতীয় অভিব্যক্তি। (John Adams- Education is the dynaic side of philosophy.) শিক্ষাবিজ্ঞানী জেমস ফ্রান্সিস রস বলেছেন—দর্শন ও শিক্ষা হচ্ছে একই মুদ্রার দুটি দিক। প্রথমটি হচ্ছে ধ্যানের দিক, শেষেরটি হচ্ছে কর্মের দিক। (James Francis Ross- Philosophy and Education are the two sides of a coin, the fomer is the contemplative side while the later is the active side.) জন ডিউই-এর মতে - দর্শন হচ্ছে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত শিক্ষার একটি তত্ত্ববিশেষ। (John Dewy- Philosophy is generalised theory of education.) তিনি মনে করেন যে, শিক্ষা হল এমন একটি গবেষণাগার যেখানে দর্শনের তত্ত্বগুলির মূল্য যাচাই করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক সত্যগুলি প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও স্থায়িত্ব লাভ করেছে— শিক্ষার মধ্য দিয়েই।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা ও দর্শন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দর্শন ছাড়া শিক্ষার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আবার শিক্ষা ছাড়া দর্শনের কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই।

শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও দর্শন (Philosophy and Various Dimensions of Education) :

দর্শন ও শিক্ষার নীতি (Philosophy and Pinciples of Education) জীবন শিক্ষা ও দর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দর্শন জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে; আর শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে, জীবনের সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য। এই কারণে মানুষের বিভিন্ন জীবনদর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে এসে শিক্ষাদর্শনে

রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষাদর্শন শিক্ষার আদর্শ বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়; আর শিক্ষা সেই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। সুতরাং একথা সত্য যে, প্রত্যেক শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে কোনো না কোনো একটি জীবনদর্শন কাজ করে।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন শিক্ষার সঙ্গে যে জীবনদর্শন সম্পর্কিত তার প্রকৃতি শুদ্ধ তাত্ত্বিক হতে পারে না। ব্যক্তিজীবনে শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যও বর্তমান। তাই তারা মনে করেন যে, জীবনদর্শন শিক্ষার গতি নির্ধারণ করবে, যা জীবনের গুণগতমান নির্ধারণ করবে তা অবশ্যই ব্যবহারিক হওয়া বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ জীবনদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রই হবে শিক্ষা। আর শিক্ষার সঙ্গে যে দর্শন সম্পর্কযুক্ত তাও হবে ব্যবহারিক। তাই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের তাৎপর্য নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যেসব জীবনদর্শনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় সেগুলি হল ভাববাদ (Idealism), বস্তুবাদ (Realism) এবং প্রয়োগবাদ (Pragmatism)। এদের মধ্যে প্রয়োগবাদ-ই হল মূলত ব্যবহারিক দর্শন। তাই এই দর্শনের প্রভাব আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। তবে আধুনিক শিক্ষার কোনো বিশেষ নীতি এককভাবে এই শিক্ষাদর্শনের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে একথা বললে ভুল করা হবে। বাস্তবে শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলিকে জীবনকেন্দ্রিক করে তোলার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন দর্শনের মূল তত্ত্বগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। যেমন- শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ সকলকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তেমনি পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, শৃঙ্খলা, শিক্ষক সমস্ত দিকেই দার্শনিকদের অবদান রয়েছে। এমনিভাবে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার প্রত্যেকটি নীতি দার্শনিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এক কথায় দর্শন ছাড়া শিক্ষার সামগ্রিক বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Philosophy and Aims of Education) :

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহীন শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। লক্ষ ছাড়া সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীই অর্থহীন। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ভর করে চিরাচরিত ও সমসাময়িক জীবনদর্শনের উপর। এই কারণেই জীবনের পরিবর্তিত দর্শন ভাবনার মতোই এরাও সতত পরিবর্তনশীল। শিক্ষার লক্ষ্য যদি গভীর দার্শনিক ও মৌলিক ভাবনাচিন্তার দ্বারা মূলীভূত হয়, তবে তা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাকে একটি মূর্ত পথ প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়। দার্শনিকরা তাদের পরিণত চিন্তার দ্বারা জীবনের সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ করে থাকেন। তাই সমাজে এক বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে তার আচরণকে সেই মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করতে শেখে। এই মূল্যবোধগুলি তাই একসময় জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় আর তখনই সেগুলি পরিণত হয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে। তাই মূল্যবোধের পরিবর্তনে শিক্ষার উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হতে থাকে কালের পটভূমিতে। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সে কারণে দার্শনিক চিন্তার ফলশ্রুতি বলে গণ্য করা হয়।

দর্শন ও শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Philosophy and Curriculum) :

পাঠক্রম হল শিক্ষার উদ্দেশ্য অভিমুখী যাত্রাপথ। কিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে, লক্ষ্য পূরণ হবে তার জন্য বিষয়বস্তু ও ক্রিয়াকলাপ নির্দেশ করে দেয় পাঠ্যক্রম। আর পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের অবদানও যথেষ্ট রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন আগ্রহজনিত চাহিদাগুলিকে তৃপ্ত করার জন্য যে সুষম ও কার্যকরী পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন তার একটি সাধারণমাত্রা নির্ণয় করতে পারে একমাত্র দর্শনই। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির কারণ কি? সেই বিষয়টি কোন্ চিন্তাধারাকে জাগিয়ে তোলে? শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি কতদূর সংগতিপূর্ণ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দর্শনই নির্দেশ করে। আবার দর্শনই ব্যক্তিদেরকে কিছু মূলনীতি শিক্ষা দেয়, যা থেকে বোঝা যায়, শিশুর মধ্যে কোন্ জ্ঞান, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি, পারদর্শিতা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ ঘটানো দরকার। দর্শনই বলে দেয়, জীবনের প্রয়োজনগুলির উপর নির্ভর করে পাঠ্যক্রমের ব্যপ্তি ও গভীরতা কতটা হওয়া উচিত। এইভাবে দর্শন পাঠ্যক্রমকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার বিভিন্নতা অনুসারে পাঠ্যক্রমের গতি প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যতা নির্ধারণ করে।

দর্শন ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Philosophy and Methods of Teaching) : শিক্ষণ পদ্ধতি হল শিশুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বহু নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি আবিষ্কারের পিছনে যদিও বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে কিন্তু এই পদ্ধতিগুলি কেন এবং কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তার প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করে দর্শন। বিভিন্ন দার্শনিকগণ শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির কথা বলেছেন। আবার আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বহু নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে যেগুলির মূল কথা হল শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা। এই সক্রিয়তা তার মধ্যে উপযোগিতামূলক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে আসা উচিত। শিক্ষাবিজ্ঞানের মধ্যে শিক্ষণ পদ্ধতি বিভিন্ন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

দর্শন এবং বিদ্যালয় শৃঙ্খলা (Philosophy and School Discipline) : শৃঙ্খলা জীবনদর্শনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার দিকে দর্শন নিজেকে যতটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করছে, ততটা অন্য কোনো ক্ষেত্রে করেনি। ভাববাদ (Idealism)-এর মূলনীতিই হল শৃঙ্খলা। তাদের মতে নিয়মানুবর্তিতার প্রক্রিয়ার মধ্যে শিশু যতক্ষণ না আত্মনিবেশ করছে, ততক্ষণ তার কাছে সম্পূর্ণ বিকাশের সফলতা অধরাই থেকে যাবে। স্বাধীনতার প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল হলেও ভাববাদীগণ কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাসী। কঠিন এবং কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবনযাপনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা জীবনের উচ্চ মূল্যবোধগুলিকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। আবার বাইরে থেকে জোড় করে আরোপিত শৃঙ্খলার প্রতি প্রকৃতিবাদীরা আস্থা রাখেন না। শারীরিক শাস্তিদান পদ্ধতিতে তাঁরা অস্বীকার করেন কারণ এটি শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ প্রবণতাকে প্রতিহত করে। শিশুর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই শৃঙ্খলাই আরোপিত করা দরকার, যার প্রকৃতিগত গুরুত্ব রয়েছে।

দার্শনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণকারীদের মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—দমননীতিবাদী, প্রভাববাদী এবং মুক্তিবাদী।

- দমননীতিবাদীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল—‘এটা করোনা, ওটা করোনা’— এমনকি তারজন্য বাইরে থেকে চাপ দিতে, ভয় দেখাতে, জোর করতে বা কঠোর দমননীতি অনুসরণ করতে তাঁরা দ্বিধা করেন না।

- আবার প্রভাববাদীরা বিধিবদ্ধতাকে পালন করতে চান বিশেষত, শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে। জন অ্যাডামস্-এর ভাষায় তারাই প্রভাববাদী, যারা প্রভুত্ব করতে চান। দমননীতিবাদীদের মতো বন্য পন্থা অবলম্বন করতে চান না। শিশুমনে নিয়ম-নিষ্ঠাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য শিক্ষকের পরোক্ষ প্রভাবই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত।

- মুক্তিবাদী দর্শন শিশুর সহজাত ভালোত্বে বিশ্বাস করে এবং তারা এও বিশ্বাস করেন যে, নিয়মনীতি মেনে চলার জন্য ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আগ্রহ ও দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা সম্ভব। মুক্তিবাদীরা শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চান এবং শিক্ষকের দিক থেকে কোনওরকম হস্তক্ষেপ আশা করেন না। তাদের উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের তাদের নিজস্ব পথে চলার, নিজস্ব ভুল করতে এবং নিজেদের মতোই সংশোধন করা উচিত। একেই বলা হয় মুক্ত শৃঙ্খলা, যা পূর্ণ সুযোগ ও সহায়তা পেলে শিশুরা নিজেদের মধ্যেই গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রতিষেধ বা মধ্যবর্তী হস্তক্ষেপের ক্ষমতা, যা শিক্ষকের শেষ অবলম্বন তা অবশ্যই তাঁর নিজের হাতে রাখা প্রয়োজনীয়।

দার্শনিক মতবাদের বিভিন্নতা শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে নানা মতাদর্শের সৃষ্টি করেছে ঠিকই কিন্তু একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে যিনি দায়িত্বশীল, সেই শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন অথবা সমসাময়িক প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শন থেকে এই তিনটি মতবাদই উদ্ভূত হয়।

দর্শন এবং শিক্ষকের ভূমিকা (Philosophy and the Role of a Teacher) :

শিক্ষাগত উন্নতির মেরুদণ্ডই হলেন শিক্ষক। তার ব্যক্তিসত্তা; সামাজিক সত্তা দুই-ই প্রভাবিত হয় সমাজে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদের দ্বারা। তাই তিনি নিজেও দর্শনের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। ভাববাদ (Idealism) অনুসারে উপদেশদান নির্দেশদান এবং এমনকি ছাত্রদের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার প্রকৃতিবাদীদের বিশ্বাস যে, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। শিশুকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠার এবং তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই শিক্ষকের কর্তব্য। প্রয়োগবাদী দর্শন অনুযায়ী শিক্ষক হলেন একজন পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টা, যিনি শিশুকে জীবনের পথে ভাবতে, আবিষ্কার করতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তাকে গ্রহণ করতে সাহায্য করবেন। আধুনিক শিক্ষায় বলা হয় শিক্ষক হবে শিক্ষার্থীর বন্ধু, নির্দেশক এবং জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক, শিক্ষার এই ধারণা স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যে নীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির উপর দার্শনিক প্রভাব বর্তমান।

দর্শন এবং মূল্যায়ন (Philosophy and Evaluation) :

শিক্ষাক্ষেত্রে 'মূল্যায়ন' আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার যে উদ্দেশ্য স্থির করা হয় এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে যেসব উপায় অবলম্বন করা হয়, তার প্রগতিতে, যথাযথ নির্ণয়ে, পরিণতি বিচারে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির সাহায্য নিতে হয় অর্থাৎ মূল্যায়ন সবসময় শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়ে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য যেহেতু দার্শনিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। সেহেতু সমগ্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটিও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষা এবং দর্শন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাকে আধুনিক প্রায় সকল শিক্ষাবিদরাই জীবনের সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন। জীবনধারণের জন্য ব্যক্তিকে তার জৈবিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল রকম চাহিদারই পরিতৃপ্তি ঘটাতে হয়। আর এই পরিতৃপ্তির জন্য চাই ব্যক্তির নিজস্ব সক্রিয়তা। জন ডিউই বলেছেন, Life is a by product activities and education is born out of those activities. সুতরাং এই ধারণা অনুযায়ী, সে সক্রিয়তার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। সেই প্রক্রিয়াই তার শিক্ষার কাজে সহায়তা করছে। সুতরাং শিক্ষা সবসময় জীবনকেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক। অপরদিকে দর্শনও জীবনকেন্দ্রিক। জীবনকে বাদ দিয়ে কোনো দর্শন হয় না। সুতরাং অভিজ্ঞতা থেকেই দর্শনের সৃষ্টি। তাই ব্যক্তি জীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষা এবং দর্শন উভয়ের উদ্ভব। শিক্ষাই জীবন। (Education is life.) আধুনিক এই বিশ্বাস, তাকে শুধু দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে বললে কম বলা হবে, এই অর্থে শিক্ষা নিজেই একটি জীবন সত্যে উন্নীত হয়ে পরিপূর্ণ দর্শনের রূপ নিয়েছে।

উপসংহার (Conclusion):

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ইহা বলা যায় যে, শিক্ষা ও দর্শন হল জীবন প্রবাহের দুটি দিক— একটি ব্যবহারিক এবং অপরটি তাত্ত্বিক, উভয়েরই লক্ষ্য একই— মানুষ ও মনুষ্যত্বের সমগ্র জীবন ও জগৎকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে বেঁচে থাকার ইচ্ছা (Will to Live), জীবনের লক্ষণ, প্রাণের স্পন্দন, সুস্থ দেহে, সংযত মনে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, নৈতিক মূল্যবোধে প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠবে এবং সৃষ্টি করবে নতুন নতুন অধ্যায়, ফলে সম্পদশালী হয়ে উঠবে বিশ্বজগত— সুদূর সোনালি ভবিষ্যতের সার্থক রূপায়ন সম্ভব হবে শিক্ষা ও দর্শনের সার্থক মেলবন্ধনে।

দ্বিতীয় একক: চার্বাক দর্শন, জৈন দর্শন
(Charvaka Darshan, Jain Darshan)

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Concept about Indian Philosophy):

প্রথম এককে 'দর্শন' এবং 'Philosophy'-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া গেছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে দর্শনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। একটি হচ্ছে ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি হল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই এককে ভারতীয় দর্শন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব সঠিক কবে ঘটেছে তা বলা মুশকিল। তবে ভারতীয়দের মধ্যেই প্রথম দর্শন চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রায় দু-হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কণ্ঠে বিশ্ববাসী নানা উপনিষদীয় বাণী শুনেছিলেন। ঋষিরা তাদের কঠোর সাধনার দ্বারা যেসকল তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন সেগুলিকেই সাধারণ মানুষের কাছে বাণীরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁরা বলেছেন জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে জানা যায় যে মূলতত্ত্বের সাহায্যে তাকেই সত্য বলা হয়। আর ভারতীয় দর্শনে সত্যের মর্ম উপলব্ধি, সত্যের সাক্ষাৎকারই হল দর্শন।

ভারতীয় দর্শন হল তত্ত্বদর্শন। এই দর্শন হল আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষণ। আত্মচেতনায় এর বিকাশ। সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এর সার্থকতা। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য। 'আত্মাকে জানো' (আত্মানাং বিদ্ধি) এবং পরমাত্মার রূপ উপলব্ধি করা। তাই ঈশ্বর সাধনা হতে হবে মানুষের পরমব্রত।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ বেদ ও উপনিষদ কেন্দ্রিক। বেদ শব্দের অর্থ পরমজ্ঞান। পার্থিব জ্ঞানের অতীত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের নামই পরমজ্ঞান, যা বেদ থেকে লাভ করা যায়। আর উপনিষদ শব্দের অর্থ আত্মা বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান। বেদ হল অপৌরষেয়। কোনো ব্যক্তির দ্বারা রচিত নয়। বেদ হল স্বয়ং ব্রহ্মের শাশ্বত বাণী। ভারতীয় যোগীগণ যোগ সাধনা বলে বৈদিক বাক্যসমূহের সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং পরবর্তীকালে তা লিপিবদ্ধ করেন।

বেদ ও উপলব্ধি অবলম্বনে উদ্ভব হয় সূত্র দর্শনের। 'সূত্র' শব্দের সাধারণ অর্থ সূতো। পুষ্প যেমন সূত্র গ্রথিত হয়ে মাল্য রচনা করে, তেমনি খণ্ড খণ্ড তত্ত্বসমূহ সূত্রের দ্বারা সংঘবদ্ধ হয়। বিভিন্ন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের স্মারক বাক্যগুলিই সূত্র। আর এই সূত্র গ্রন্থগুলিই বিভিন্ন দর্শনের উৎসগ্রন্থ।

যে গ্রন্থে সূত্রের প্রতিটি পদ অবলম্বন করে সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয় এবং যে গ্রন্থে রচয়িতা নিজের পদের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেন সেই গ্রন্থকেই ভাষ্যবিদগণ ভাষ্য বলে অভিহিত করেন। সূত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত বাক্যসমূহের দুর্বোধ্যতাকে প্রাঞ্জল করার জন্য ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয় অর্থাৎ ভাষ্য হল সূত্রের ব্যাখ্যা।

পরবর্তীকালে ভাষ্যের উপর বার্তিক বা টীকা নামে একপ্রকার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচিত হয়। যে গ্রন্থে সূত্র ও ভাষ্যে উল্লিখিত সকল বিষয়ের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয় এবং এর কাজ হল ভাষ্যোক্ত বিষয়কে সহজ সরলরূপে প্রকাশ করা।

ভারতীয় দর্শন কেবল একটি বিষয় নয়, এ হল একপ্রকার 'শাস্ত্র'। শাস্ত্র পৌরষেয় ও অপৌরষেয় উভয়ই। বেদ অপৌরষেয়, আর বিভিন্ন সূত্র, ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ পৌরষেয়। দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র, ভাষ্য ও টীকা থেকে ভারতীয় দর্শনের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় যেমন—

১) ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রধানত আধ্যাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার উপলব্ধিই হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য।

২) ভারতীয় দর্শন কেবল তত্ত্বালোচনা নয়— এ হল ব্যবহারিক জীবনে তত্ত্বের প্রয়োগ বা সংক্ষেপে জীবনদর্শন। ভারতীয় দর্শন জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত।

৩) ভারতীয় দর্শন বিচারবাদী দর্শন এখানে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মীয় চিন্তা মিশ্রিত হয়ে থাকলেও স্বাধীন যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়নি। প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায় তত্ত্বগুলিকে নিজ নিজ যুক্তিপদ্ধতি ও বিশ্লেষণরীতিতে বিচার করে উপস্থাপিত করেছে।

৪) ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মানুষের সকল প্রকার দুঃখের কারণ হল কামনা বাসনা। এরজন্য প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই আত্মসংযম ও সাধনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা বলেছেন আসক্তি বা প্রবৃত্তি নয়, নিরাসক্তি বা নিবৃত্তিই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত।

৫) প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকই মনে করে যে অবিদ্যা হল বন্ধনের মূল কারণ। আর অবিদ্যার অর্থ হল জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতা। তাঁদের মতে সংসার অস্থির, জগৎ ও জীবন দুঃখময়। মানুষ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সুতরাং জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলে তবেই ভবচক্র থেকে নিষ্কৃতি ঘটবে এবং পরিণামে দুঃখেরও বিনাশ ঘটবে।

৬) শাস্ত্রে চার প্রকার পুরুষার্থের উল্লেখ আছে। ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মোক্ষ বলতে বোঝায় মুক্তি। মানুষের বিভিন্ন প্রকার কর্মের মধ্যে বিশেষত সকাম কর্মকে বাদ দিয়ে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। তবে মোক্ষকে কোনো দর্শনশাস্ত্রে কৈবল্য, কোনো দর্শনশাস্ত্রে নিঃশ্রেয়স, কোনো দর্শশাস্ত্রে নির্বাণ ইত্যাদিরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়েরই দর্শনালোচনার মূল লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তির পথ অন্বেষণ।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা :

ভারতীয় দর্শন প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত— ১) বৈদিক দর্শন ২) অবৈদিক দর্শন।

বৈদিক দর্শন ঃ যে দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় এবং বেদকে অভ্রান্ত বলে গণ্য করা হয় তাকে বৈদিক দর্শন বলে।

অবৈদিক দর্শন ঃ যে দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়না এবং বেদকে অভ্রান্ত বলে গণ্য করা হয়না তাকে অবৈদিক দর্শন বলে।

আবার বৈদিক দর্শনকে আস্তিক এবং অবৈদিক দর্শনকে নাস্তিক দর্শনরূপেও অভিহিত করা হয়। সাধারণভাবে আস্তিক বলতে বোঝায় যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং নাস্তিক বলতে বোঝায় যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশিষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত— এই ষড়দর্শন হল বৈদিক বা আস্তিক দর্শন। আর চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ— এই ত্রয়ী দর্শন অবৈদিক বা নাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। এই এককে তিনটি অবৈদিক দর্শনের মধ্যে চার্বাক দর্শন ও জৈন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

চার্বাক দর্শন (Charvaka Darshan):

ভূমিকা (Introduction):

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের একমাত্র জড়বাদী সম্প্রদায়। জড়বাদ অনুসারে জড়ই একমাত্র তত্ত্ব এবং জড় থেকেই অচেতন, চেতন– যাবতীয় জাগতিক বিষয়ের উৎপত্তি, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিকতার আধিপত্য থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা করে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধ মতবাদরূপে চার্বাক জড়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চার্বাক নামের তাৎপর্য :

চার্বাক দর্শনের নামকরণ প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মতবৈষম্য লক্ষণীয়। কেউ কেউ মনে করেন চার্বাক শব্দটি 'চারু' ও 'বাক্'— এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'চারু' মানে মধুর এবং 'বাক' মানে কথা। এরা মনে করেন, যে দার্শনিক সম্প্রদায় লোকায়ত তত্ত্বের শ্রুতিমধুর কথা বলেন, তাঁরাই চার্বাক। ভিন্নমতে 'চর্ব' ধাতু থেকে চার্বাক শব্দের উৎপত্তি। 'চর্ব' মানে চর্বন করা বা ঔদরিক ভোগকে বোঝায় অর্থাৎ এই মতানুসারে যাঁরা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচারক তাঁরাই চার্বাক।

কেউ কেউ মনে করেন, লোকপুত্র বৃহস্পতিই জড়বাদের প্রবর্তক। 'চার্বাক' শব্দের মূল অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমান যুগে চার্বাক বলতে জড়বাদী নাস্তিককেই বোঝানো হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের চিন্তা ও ভাবধারা এই মতবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে বলে এই দর্শনকে 'লোকায়ত দর্শন' নামেও অভিহিত করা হয়।

বিভিন্ন চার্বাক সম্প্রদায় : চার্বাকগণ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—

১) বৈতণ্ডিক সম্প্রদায়, ২) ধূর্ত সম্প্রদায়, ৩) সুশিক্ষিত সম্প্রদায়।

১) বৈতণ্ডিক চার্বাক সম্প্রদায় : বৈতণ্ডিকরা ছিলেন সংশয়বাদী ও কূট তার্কিক। স্বমত প্রতিষ্ঠা নয়, পরমত খণ্ডনই ছিল এদের একমাত্র কাজ। ঈশ্বর, পরলোক, এমনকী প্রত্যক্ষ প্রামাণের প্রমাণ্যও এঁরা স্বীকার করেন না।

২) ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায় : এই সম্প্রদায় ধূর্ত বা উচ্ছেদবাদী বা দেহাত্মবাদী নামে পরিচিত। এঁরা কেবল প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করেন না। এরা জড়কেই পরম সত্য বলেন। এদের মতে কেবল ইন্দ্রিয় সুখই কাম্য, দৈহিক সুখই স্বর্গসুখ। দেহের অবসান বা বিনাশই মুক্তি বা মোক্ষ সাধারণত চার্বাক বলতে এই ধূর্ত সম্প্রদায়কেই বুঝায়।

৩) সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায় : সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায় অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, অথর্ববেদ, দণ্ডনীতি, গান্ধর্ববিদ্যা প্রভৃতি লৌকিক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। আর অনুমান হিসাবে সেগুলিকেই মানে যেসব অনুমানের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষগোচর হয়। যেমন মেঘ থেকে বৃষ্টির অনুমান, ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমান ইত্যাদি। এই সুশিক্ষিত চার্বাকরা আবার কেউ প্রণাত্মবাদী, কেউ মনাত্মবাদী কেউ বা ইন্দ্রিয়বাদী ছিলেন।

উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়ের মতামতগুলিই সর্বাধিক পরিচিত ও আলোচিত। বিভিন্ন আস্তিক দর্শনে এই চার্বাক সম্প্রদায়ের মতামতগুলিই বিশেষত প্রতিষ্ঠিত ও খণ্ডিত হতে দেখা যায়।

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব :

চার্বাকদের দার্শনিক চিন্তা, বিশেষভাবে তাদের জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানতত্ত্বে, জ্ঞানের স্বরূপ, শর্ত, প্রকার ইত্যাদি আলোচিত হয়। সাধারণভাবে জ্ঞান দুই প্রকার— স্মৃতি ও অনুভব। ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষভাবে কেবল সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। আর স্মৃতিভিন্ন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে অনুভব বলে। অনুভব যথার্থ ও অযথার্থ হতে পারে। যথার্থ অনুভবকে প্রমা এবং অযাথার্থ অনুভবকে অপ্রমা বলা হয়। কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেইরূপে জানাকে প্রমা বলে এবং কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা নয় তাকে সেইরূপে জানাকে অপ্রমা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানা প্রমা এবং সর্পরূপে জানা অপ্রমা।

চার্বাকমতে প্রমা বা যথার্থ অনুভব হল সত্য, সংশয়রহিত ও অনধিগত বিষয়ক জ্ঞান। আর যে প্রণালীতে প্রমা উৎপন্ন হয় তাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন মতে প্রমাণ দুই প্রকার– প্রত্যক্ষ ও অনুমান। জৈন, সাংখ্য ও যোগ দর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার– প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ। নৈয়ায়িকগণ চারটি প্রমাণের কথা বলেছেন– প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ বা জ্ঞান আহরণের উপায়। সাধারণভাবে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন– এই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে যে জ্ঞান লব্ধ হয় সেই জ্ঞান এবং জ্ঞান লাভের পদ্ধতি উভয়কেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। চার্বাক দার্শনিকগণও প্রত্যক্ষ বলতে অন্তরেন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংশয় ও বিপর্যয় রহিত। তাই চার্বাক মতে প্রত্যক্ষের সাহায্যেই যথার্থ

জ্ঞান লাভ করা যায়। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষ হল সমস্ত প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চার্বাক ব্যতীত যেসকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন তারাও প্রত্যক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র সঠিক ও অভ্রান্ত। যে বস্তু প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞাত, তাই হল সৎবস্তু। চার্বাকগণ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা যে একেবারে অস্বীকার করেছেন, তা নয়, তবে তাদের মতে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিনষ্ট করেনা। বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্ভুল জ্ঞান সম্ভব হয়।

চার্বাক দর্শনে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়নি। তাঁদের মতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমান প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য নয়। অনুমান থেকে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা সংশয়মুক্ত প্রকৃত জ্ঞান নয়। অনুমানের পাশাপাশি শব্দকেও চার্বাকগণ প্রমাণ হিসাবে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে শব্দ হল আপ্তবাক্য অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা, সত্যভাষী ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি আপ্ত পদবাচ্য। কিন্তু কোনো ব্যক্তি আপ্ত কিনা তা জানার জন্য অনুমানের সাহায্য নিতে হয়, যেহেতু অনুমান বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নয়, সেখানে অনুমানের উপর নির্ভরশীল শব্দ যথার্থ প্রমাণ হিসাবে গণ্য হতে পারেনা।

চার্বাকগণ বৈদিক বাক্যের প্রামাণ্যও অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে বেদের ভাষা বোঝা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার বেদে পরস্পর বিরোধী উক্তিও রয়েছে। বেদের বচনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা বেদ ধূর্ত ও ভণ্ড ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট।

চার্বাক জড়বাদ বা ভূতচতুষ্টয়বাদ:

জড়বাদ অনুসারে জড়ই একমাত্র মূলতত্ত্ব। জড় যাবতীয় জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি এবং জড়তেই তাদের চরম নিষ্পত্তি। জড়বাদ অধ্যাত্মবাদের বিপরীত মতবাদ। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় তার অস্তিত্ব স্বীকার অযৌক্তিক। ঈশ্বর, আত্মা, অদৃষ্ট, পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় হওয়ায় চার্বাকগণ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেননা। চার্বাকগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ এই চারটি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। পঞ্চভূতের মধ্যে 'ব্যোম' প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, তাই অগ্রাহ্য। এই চতুর্ভূতের সমন্বয়ে বস্তুজগতের সৃষ্টি। এমনকি প্রাণ এবং মনও এই চতুর্ভূতের সমন্বয়ে সৃষ্ঠ। চার্বাকগণ পার্থিব বস্তুসমূহের উৎপত্তিতে উপাদান কারণ মেনেছেন, কোনো নিমিত্তকারণ মানেননি। ভূতচতুষ্টয় হল এই উপাদান। উপাদানগুলি তাদের স্বভাব বা প্রকৃতিবশত পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। এমনকি বস্তুর বিনাশও ঘটে ভূতচতুষ্টয়ের স্বভাবধর্মের জন্যই। জগৎ ও জাগতিক বস্তুনিচয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ উদ্দেশ্যমূলক নয়। এই দুই ক্ষেত্রেই ঈশ্বর বা অদৃষ্টের কোনো কোনো ভুমিকা নাই। চতুর্ভূতের সংযোজন তাদের নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতির ভিত্তিতে হয় বলে একে স্বভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ বলা হয়।

চার্বাকগণ কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস করেন না। দুটি ঘটনা পাশাপাশি ঘটেছে বলে একটি অপরটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একথা বলা যায়না। জগতের কোনো ঘটনাই কার্যকারণ নিয়মানুসারে ঘটেনা, ঘটে আকস্মিকভাবে। তাই একে আকস্মিকতাবাদও বলা হয়।

ভূতচৈতন্যবাদ বা দেহাত্মবাদ :

চার্বাকদের মতে দেহাতিরিক্ত 'আত্মা' বলে কিছু নেই; চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। চৈতন্য মানব দেহেরই একটি গুণ। চতুর্ভূতের সমন্বয়ে যখন মানবদেহ সৃষ্টি হয়; তখনই এই গুণের আবির্ভাব হয়। চতুর্ভূতে চৈতন্য নেই; কিন্তু তাদের বিশেষ সমন্বয়ে চৈতন্য নামে নতুন গুণের উদ্ভব হয়। চার্বাকগণ আরো বলেছেন; সংসারে সবকিছুই ভঙ্গুর ও মরণশীল। মৃত্যুর সংগে সংগে চৈতন্য নামক গুণের বিনাশ হয় এবং দেহ চতুর্ভূতে পরিণত হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আর জীবন থাকেনা এবং পরলোক বলে কিছু নাই।

ঈশ্বরতত্ত্ব :

বেদানুসারী বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনতন্ত্রে পরমসত্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বেদবিরোধী চার্বাকগণ নিরীশ্বরবাদী। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তার কোনো অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ায় তার অস্তিত্ব স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

চার্বাকমতে ধূর্ত পুরোহিতবর্গ সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে ঈশ্বর নামক ধারণার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ঈশ্বর পুরোহিতবর্গের কল্পলোকের বাসিন্দা হতে পারেন, কিন্তু জন্মান্তরে সুখলাভের আশায় তার পূজা অর্চনা নিছকই সংস্কার। সত্যই যদি ঈশ্বর অস্তিত্বশীল হতেন তবে তিনি স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিটি মানুষের নিকট বিশ্বস্ত হতে সচেষ্ট হতেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। চার্বাক মতে রাজাই ঈশ্বর কেননা রাজা প্রত্যক্ষযোগ্য।

চার্বাক নীতিতত্ত্ব :

চার্বাকগণ জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ অস্বীকার করেন। তাদের মতে ইহজীবনই একমাত্র জীবনরূপে পরিগণিত হয়। মৃত্যুতেই মানুষের মুক্তি। মৃত্যুতেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের বিনাশ। কোনো কোনো দর্শনতত্ত্বে স্বর্গসুখলাভকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। আবার কোন কোন দর্শনতত্ত্বে মোক্ষ বা মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। কিন্তু চার্বাকদের মতে মোক্ষ বা মুক্তি অবান্তর বিষয়। চার্বাক মতে সুখই মানবজীবনের পুরুষার্থ অর্থাৎ সুখের দ্বারাই মনুষ্য আচরণের ভালোত্ব বা মন্দত্ব নির্ণীত হয়। যে কর্ম সুখজনক তাই যথোচিত। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ সংসারে দুঃখ, শোক, বিরহ, মৃত্যু সবই আছে কিন্তু মানুষ চায় সুখ ও আনন্দ কারণ সুখ ও আনন্দই তার জীবনের কাম্য। তাদের মতে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশে থাকে বটে, কিন্তু সেই কারণে সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত হওয়া মূর্খতারই সামিল। ধান ছাড়িয়ে চাল করতে হয় বলেই কি ভাত না খেয়ে পারা যায় ? কাঁটা আছে বলে কি লোকে মাছ খাবেনা। সুখের জন্যই মানুষ দুঃখকে স্বীকার করে। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর রূপ বোঝা যায় না তেমনি দুঃখ না থাকলে সুখকে বোঝা যায় না। দুঃখের পরেই সুখানুভূতি মধুর হয়ে উঠে।

চার্বাক মতে এই সুখ ব্যক্তি মানুষের আত্মগত সুখ। তাঁরা অসংযত আত্মসুখবাদের প্রচারক। তাদের মতে মানুষের সেই কর্মই সম্পাদন করা উচিত যে কর্ম তার নিজের পক্ষে সুখকর বা কল্যাণকর। এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা বলেন 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' অর্থাৎ

যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচো, ঋণ করে ঘি খাও।'

চার্বাকমতে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অর্থহীন, কেননা বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন করেও ফল পাওয়া যায়নি এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তাদের মতে স্বর্গ, নরক প্রভৃতির অস্তিত্ব অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। বেদবিহিত কর্মের সমালোচনা করে চার্বাকগণ বিভিন্ন কথা বলেন। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বলি প্রদত্ত পশু স্বর্গলাভ করলে, পুরোহিত তাঁর পিতাকে বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠান না কেন ? এইভাবে বৈদিক কর্মের কঠোর সমালোচনা করে চার্বাকগণ বলেন, 'ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবত্মো পারলৌকিক; স্বর্গ, অপবর্গ বা মুক্তি, আত্মা, পরলোক— এসব কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

আধুনিক শিক্ষায় চার্বাক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Charvaka Darshan in Modern Education) :

বিভিন্ন বৈদিক দর্শনে এই মতবাদের সমালোচনা করা হলেও চার্বাক দর্শন পরোক্ষে বিভিন্ন দিক থেকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে এবং তা হল নিম্নরূপ:

(১) আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিশুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বার স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা। এই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রক্রিয়া শিশুকে তার বর্তমান পরিবেশে সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex Action) সাহায্যে তার প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে থাকে অর্থাৎ দেখা গেল প্রথম থেকেই শিশুর কাম্য সুখভোগ। চার্বাক দর্শনে, মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে যে সুখানুভূতি হয়, সেই অভিমতই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষাসংক্রান্ত আধুনিক ধারণা অনেকাংশে চার্বাক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত একথা স্বীকার করতে হয়।

(২) আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতিসাধন করা। যে সমস্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে সক্ষম হবে এবং যে সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে, সেগুলিই শিক্ষার দিক থেকে কাম্য। চার্বাক দর্শনেও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। চার্বাক দর্শন যেহেতু বস্তুবাদে বিশ্বাসী সেইজন্য এই দর্শনে, অভিজ্ঞতার উপযোগিতা মূল্যের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত দৃষ্ঠিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে, আধুনিককালে তা অনেকাংশে চার্বাক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন বলা যায়।

(৩) চার্বাক দর্শনে বলা হয়েছে, যা প্রত্যক্ষ তাই একমাত্র সত্য অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা সত্য। আর যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তা অসত্য। আধুনিক শিক্ষানীতিতেও জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞানে 'ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা' এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ একমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জ্ঞান আহরণ করা হয়ে থাকে। কারো কারো মতে এই ইন্দ্রিয়গুলি ব্যক্তির জ্ঞানের এক একটি দ্বার। এইক্ষেত্রে চার্বাক দর্শনের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বক্তব্যের সমর্থন আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে মেলে।

(৪) চার্বাক দর্শনে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে জীবনের প্রয়োজনই সবার উপরে। তাই মানুষকে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব অভিজ্ঞতাই

সংগ্রহ করতে হবে। আধুনিককালে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে, শিশুর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল রকম অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনার নীতিগুলি চার্বাক দর্শনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খুবই প্রাসঙ্গিক ।

(৫) আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আত্মতৃপ্তি, আনন্দদায়ক অনুভূতি, আত্মশৃঙ্খলা ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে চার্বাক দর্শনের মূল কথাও হল সুখ ও আনন্দ। সুতরাং বলা যায় আধুনিক বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে, শিক্ষার বহুবিধ নীতি সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে চার্বাক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion):

চার্বাক দর্শন হল স্বাধীন চিন্তার দর্শন। চার্বাকরা জড়বাদী, দৃষ্টবাদী, স্বভাববাদী, আত্ম-সুখবাদী নাস্তিক দার্শনিক। তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কৃত্রিম ভেদাভেদ চার্বাকরা মানতেন না। এদিক দিয়ে তারা ছিল মানববাদী ও সাম্যবাদী। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে চার্বাক দর্শন সমালোচিতও হয়েছে। চার্বাক দর্শন কতগুলো নতুন দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি করে দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে; আবার বিভিন্ন দার্শনিকদের নির্বিচার চিন্তার মূলে আঘাত করে যুক্তিবাদী হতে সাহায্য করেছে; তথাপি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে চার্বাক দর্শন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

জৈন দর্শন (Jain Darshan)

ভূমিকা (Introduction):

জৈন দর্শন খুবই প্রাচীন দর্শন এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে জৈন ধর্মের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। জৈন দর্শনশাস্ত্র বেদবিরোধী ভারতীয় দর্শনতন্ত্রত্রয়ের অন্যতম। 'জৈন' শব্দটি এসেছে 'জিন' শব্দ থেকে। জিন শব্দের অর্থ জয়ী। যিনি সকল রকম কামনা, বাসনা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি জয় করে মুক্তিলাভ করেছেন, তাদেরকে বলা হয় জিন। এই 'জিন' এর জীবনাদর্শ যারা নিজেদের জীবনে অনুসরণ করেন, তাঁদের বলা হয় জৈন। জৈন দর্শন একই সঙ্গে ধর্ম এবং দর্শন দুইই।

জৈন ধর্মে চব্বিশজন জিনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের বলা হয় তীর্থঙ্কর। 'তীর্থঙ্কর' শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তীর্থ শব্দটির অর্থ হল 'নদীর ঘাট' বা 'সোপান'। তাই যে ব্যক্তিগণ সাধারণত মানুষকে সংসাররূপ জলাশয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সোপান রচনা করে দিয়েছেন, তাঁদেরকেই জৈন ধর্মে তীর্থঙ্কর বলা হয়। এই সকল তীর্থঙ্করদের মধ্যে সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর হলে ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন বর্ধমান, যার অপর নাম মহাবীর। মহাবীর ছিলেন গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ব্যক্তি তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। বস্তুত মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা বলে সাধারণত ধারণা করা হয়। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জৈনগণ বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেননা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করেননা, এই সকল তীর্থঙ্করদেরই তাঁরা সিদ্ধপুরুষ মনে করে উপাসনা করেন। এঁরা ছিলেন পূর্বে সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু নিজ সাধনাবলে কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন। তাই এরা হলেন মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ। জৈনদের বিশ্বাস, প্রতিটি জীবই নিজ প্রচেষ্টায় জিনদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারে।

কালক্রমে জৈন ধর্মাবলম্বীগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন যথা: শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ও দিগম্বর সম্প্রদায়। জৈন ধর্ম ও দর্শনের মূলনীতিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিলনা। উভয় সম্প্রদায়ই তীর্থঙ্করদের উপদেশ মেনে চলতেন। তবে ধর্মীয় আচার মেনে চলার ব্যাপারে দিগম্বরগণ ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। তারা ছিলেন সর্বস্ব ত্যাগী অর্থাৎ সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত। তাঁরা মনে করেন বস্ত্র পরিধানও আসক্তির পর্যায়ে পড়ে, তাই তাঁরা বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ছিলেন উদারপন্থী এবং তারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন।

জৈন দর্শনতত্ত্ব :

জৈন দর্শনের মূল কথা এ জগতে বস্তুরই অস্তিত্ব আছে। কেবলমাত্র বস্তুর অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয় বলে, একে বস্তুবাদ বলা হয়। জৈনরা আবার বহুত্ববাদীও বটে। তাদের মতে জগৎকে মানুষ যেভাবে জানে,

তাই সত্য এবং যথার্থ। সুতরাং ঈশ্বর বা কোনো পরমাত্মার কল্পনা করা নিরর্থক। তারা মনে করেন তত্ত্ব এক নয় বহু। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য জৈন দর্শনকে বহু স্বাতন্ত্র্যবাদ বা বহুত্ববাদ বলা হয়।

জৈনমতে যে কোনো বস্তুর অনন্ত ধর্ম আছে। এই ধর্ম দু-প্রকার ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক। ভাবাত্মক ধর্ম হল সেইগুলি, যার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতি নিরূপণ করা যায়। যেমন মানুষের ক্ষেত্রে এই ভাবাত্মক ধর্ম হল মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, জাতি, বর্ণ, গঠন, জন্মস্থান ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে যে ধর্মের অভাব থাকার জন্য তাকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করা যায় সেইগুলি হল অভাবাত্মক ধর্ম। যেমন-মানুষটি কৃষ্ণবর্ণ নয়, বেটে নয়; অশিক্ষিত নয়, আফ্রিকাবাসী নয় ইত্যাদি। জৈনমতে কোনো বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান বলতে বস্তুর এই অসংখ্য ভাবাত্মক ও অভাবত্মক ধর্মের জ্ঞান বোঝায়। এই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ, কোনো জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব।

দ্রব্য : জৈনদের মতে যা গুণ এবং পর্যায়বিশিষ্ট তাই দ্রব্য। দ্রব্য গুণ ও পর্যায়ের আশ্রয়। যাতে ধর্ম আছে বা থাকে, তাই ধর্মী এবং তাই দ্রব্য। যা দ্রব্যের স্বরূপগত ধর্ম এবং যার জন্য দ্রব্য স্থিতিশীল তাকে বলা হয় গুণ। যেমন আত্মার চৈতন্য ধর্ম। যা দ্রব্যের আগন্তুক ধর্ম এবং যার জন্য দ্রব্য পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় পর্যায়, যেমন ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার আগন্তুক ধর্ম, গুণের দিক থেকে দ্রব্য স্থিতিশীল এবং পর্যায়ের দিক থেকে দ্রব্য পরিবর্তনশীল।

জৈনদের মতে দ্রব্য দুশ্রেণিতে বিভক্ত - অস্তিকায় ও অনস্তিকায়। অস্তিকায় - যার বিস্তৃতি বা কায় আছে, অর্থাৎ যা দেশ জুড়ে থাকে তাকে অস্তিকায় বলে। অস্তিকায় দ্রব্য দুই প্রকার -জীব ও অজীব। অনস্তিকায় - যার বিস্তৃতি বা কায় নেই, যা দেশ জুড়ে থাকে না, তাকে অনস্তিকায় দ্রব্য বলে। কাল হলো অনস্তিকায়।

জীব : জৈনমতে যে দ্রব্যের চেতনা আছে তাই জীব। জীব ও আত্মা অভিন্ন। চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত ধর্ম। সকল ধর্মের বন্ধন থেকে যারা মুক্ত, সেই মুক্ত জীবদের চেতনা সবচেয়ে বেশি এবং ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ ও উদ্ভিদ দেহধারী জীবের চেতনা সবচেয়ে কম। আত্মাই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা নিত্য ও অপরিনামী, যদিও এর অবস্থাগুলি পরিবর্তনশীল। আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন অতিরিক্ত সত্তা এবং আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎভাবে জানা যায়। জৈনমতে আত্মা অসংখ্য। প্রতিটি দেহে এক একটি করে স্বতন্ত্র আত্মা বা জীব বিরাজিত।

অজীব : জৈনমতে অজীবের কোনো প্রাণ বা চেতনা নেই। অজীব পাঁচ প্রকার পুদগল, আকাশ, কাল, ধর্ম ও অধর্ম। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অজীবকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

পুদগল : জৈনদর্শনে জড়কে পুদগল নামে অভিহিত করা হয়। কোনো স্থূল জড় দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে বিভক্তকরতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসে যখন তাকে আর বিভক্ত করা চলেনা, এই সূক্ষ্ম অবিভাজ্য জড়কণাগুলিকে অণু বলা হয়। দুই বা ততোধিক অনু একত্রে মিলিত হলে সংঘাত বা দন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির দেহ ও জড়দ্রব্য হল সংঘাত। পদুগলের চারটি গুণ আছে - স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ।

আকাশ : জৈনমতে যা অস্তিকায় দ্রব্যের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান তাকে আকাশ বলে অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তুর বিস্তার আছে সেইগুলি আকাশে অবস্থান করে। পুদগল, আত্মা, ধর্ম ও অধর্ম সবকিছুই আকাশে অবস্থান করে। আকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহয্যেই জানা যায়। জৈনমতে আকাশ দু-প্রকার - লোকাকাশ

এবং অলোকাকাশ।

কাল : জৈনমতে আকাশ বা দেশ যেরূপ অনুমেয় কালও তদ্রূপ অনুমেয় অর্থাৎ কালও প্রত্যক্ষগোচর নয়। দ্রব্যের বর্তনা বা অবিচ্ছিন্নতা, গতি, পরিবর্তন, নতুনত্ব, প্রাচীনত্ব, প্রভৃতি কালের জন্যই সম্ভব হয়। কাল অনস্তিকায় এবং এর কোনো বিস্তৃতি নেই। কাল এক ও অবিভাজ্য। একই কাল জগতের সর্বত্র বিরাজ করছে। কাল দুই প্রকার- ব্যবহারিক কাল ও পারমার্থিক কাল। ব্যবহারিক কাল মুহূর্ত, মিনিট, ঘন্টা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পারমার্থিক কাল অনন্ত ও নিত্য, এর কোনো বিভাগ নেই। আর এই অনন্ত কাল সত্য।

ধর্ম ও অধর্ম : প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও অধর্ম শব্দের দ্বারা যথাক্রমে পুন্য ও পাপকে বোঝানো হয়। আসলে গতি ও স্থিরতা বোঝানোর জন্য জৈন দর্শনে ধর্ম ও অধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম গতীয় বস্তুর গতির সহায়ক কিন্তু কারণ নয়। গতি জীব ও অজীবের অন্তর্নিহিত শক্তি। ওই অন্তর্নিহিত গতিশক্তিকে সক্রিয় হয়ে উঠতে ধর্ম সহায়তা করে। অধর্ম ধর্মের বিপরীত; জীব ও অজীবের স্থিতির সহায়ক। ধর্ম আছে বলে গতিশীল পদার্থের গতি এবং অধর্ম আছে বলে স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি সম্ভব।

পদার্থ : জৈন পরাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অনুসারে পদার্থ নয় প্রকার - জীব, অজীব, পুন্য, পাপ, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জরা ও মোক্ষ। মতান্তরে সপ্তবিধ স্বীকৃত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে পুন্য ও পাপ ক্রমান্বয়ে সম্বর ও আস্রবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

জীব ও অজীব : জৈনমতে জীব চৈতন্যময় পরমজ্যোতিস্বরূপ এবং জীব ও আত্মা এক ও অভিন্ন। জীব মুক্ত ও সংসারীভেদে দ্বিবিধ হতে পারে। চেতনাহীন জড়দ্রব্যকে অজীব বলে। ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদগল হল অজীব।

পাপ ও পুন্য : সৎভাবকে পুন্য এবং অসৎভাবকে পাপ বলা হয়। পুন্য দুপ্রকার - ভাবপুন্য এবং দ্রব্যপুন্য। সৎ সংকল্পের দ্বারা আত্মার অনুকূল পরিনাম ঘটে এবং একে ভাবপুন্য বলে। আর এই ভাবপুন্যের দ্বারা কর্মপুদগলের যে শুভ পরিণাম ঘটে তাকে দ্রব্যপুন্য বলে। অনুরূপভাবে পাপও দুপ্রকার ভাবপাপ ও দ্রব্যপাপ। অসৎ সংকল্পের দ্বারা আত্মার প্রতিকূল পরিণাম ঘটে এবং একে ভাবপাপ বলে। আর এই ভাবপাপের দ্বারা কর্মপুদগলের যে অশুভ পরিনাম ঘটে তাকে দ্রব্যপাপ বলে। সুতরাং দ্রব্যপুন্য ভাবপুন্যের এবং দ্রব্যপাপ ভাবপাপের অনুসারী। ভাবপুন্য ও ভাবপাপ উভয়ই চিন্তন। আবার দ্রব্যপুন্য ও দ্রব্যপাপ উভয়ই কর্মপুদ্‌গলের পরিণাম।

আশ্রব ও বন্ধ : জৈন দর্শনে আশ্রব বলতে আত্মার অশুদ্ধতা বা মলিনতাকে বোঝায়, যা কর্মের প্রযোজক ও পরিণাম উভয়ই। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আশ্রব দুই প্রকার ভাবাশ্রব ও দ্রব্যাশ্রব। ভাবাশ্রব হল সেই সকল চিন্তন প্রক্রিয়া বা মানসিক অবস্থা যেগুলির দ্বারা জীব কর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। চুম্বকের মধ্যে যেরূপ লৌহ আকৃষ্ট করার সামর্থ্য থাকে, ভাবাশ্রব বিশিষ্ট জীবের মধ্যেও সেরূপ বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য থাকে। আর এই কর্মের পরিণাম বা কর্মপুদগল যখন আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাকেই দ্রব্যাশ্রব বলে। সুতরাং দ্রব্যাশ্রব হল ভাবাশ্রবের পরিনাম, ভাবাশ্রব না হলে দ্রব্যাশ্রব হয়না।

আত্মায় কর্মপুদগলের সংযুক্তিকে বন্ধ বলে। বন্ধ চার প্রকার প্রকৃতি, স্থিতি, অনুভব ও প্রদেশ।

সম্বর, নির্জরা ও মোক্ষ : আশ্রবের নিবৃত্তি বা নিরোধকে সম্বর বলে। আশ্রব ও সম্বর পরস্পর বিরুদ্ধ। প্রথমটি বন্ধের এবং দ্বিতীয়টি মোক্ষের হেতু। সম্বর দ্বিবিধ-ভাবসম্বর ও দ্রব্যসম্বর।

তপস্যার দ্বারা আত্মায় সঞ্চিত কর্মপুদগলের সমষ্টিকে নির্জরা বলে। নির্জরা দুপ্রকার যথাকাল ও ঔপক্রমিক। সম্বর ও নির্জরার পরিণামে জীব ও আত্মার দেহবন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে। একেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ হল কর্মপুদগলের পূর্ণক্ষয়।

জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ তার শিষ্যদের সংযম সাধনের জন্য চতুর্যাম বা চারটি উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে মহাবীর এই চতুর্যামের সঙ্গে আর একটি উপদেশ যোগ করে। এই পাঁচটি জীবনচর্চার দিক জৈনধর্মাবলম্বীদের মূলমন্ত্র বলা যায়। ঐইগুলি হল - "হিংসা করবে না," "মিথ্যা কথা বলবে না," চুরি করবে না, "কোনো কিছুতে আসক্ত হবে না" এবং ইন্দ্রিয়কে জয় করবে।" এই গুলির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'অহিংসা' জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। তাই জৈন দার্শনিক তত্ত্বে এবং যুক্তিবিদ্যায় এই অহিংসা নীতির প্রভাবই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

জৈন জ্ঞানতত্ত্ব : জৈন দর্শন অনুযায়ী পদার্থের যথার্থ ধারণাই হল জ্ঞান। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সংযোগের ফলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জৈনমতে জীব বা আত্মাই হল প্রকৃত জ্ঞাতা। আবার চৈতন্য হল জীব বা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। এই চৈতন্যময় আত্মা স্বরূপত, সর্বজ্ঞ। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি জীবাত্মাই সর্বজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু পূর্বকৃত কর্মের দরুন আত্মার এই সর্বজ্ঞতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃত জ্ঞান সেই বাধাকে দূর করতে পারে।

জৈন দর্শনের অন্তর্গত জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে - **(১) পরোক্ষ জ্ঞান এবং (২) অপরোক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।**

পরোক্ষ জ্ঞান:

মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান উপলব্ধি করা যায় সেই জ্ঞানই হল পরোক্ষ জ্ঞান। জৈনদের মতে পরোক্ষ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। এই জাতীয় জ্ঞান হল ব্যবহারিক জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান দুপ্রকার মতি ও শ্রুতি।

মতি : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক - এই পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন এই ষষ্ঠ অন্তরেন্দ্রিয়ের সহায়তায় বাহ্যজগৎ ও মানসজগতের যে জ্ঞান হয় তাকে মতি বলে।

শ্রুত : শ্রবণ ও গ্রন্থ পাঠ থেকে সৃষ্ট জ্ঞানকে শ্রুত বলা হয় অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন এবং শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে শ্রুতি বলে।

অপরোক্ষ জ্ঞান :

মন ও ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে যে জ্ঞান সরাসরি আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করা যায় তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। জৈনমতে অপরোক্ষ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান তিন প্রকারের অবধি, মনঃ পর্যায় এবং কেবল জ্ঞান।

অবধি : যোগীরা যোগসাধনাবলে অতীত, অনাগত, দুরবর্তী ও সুক্ষ্ম বিষয়ের যে সাক্ষাৎ বা ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করেন তাকে অবধি বলে। সাধারণ কথায় তাকে দূরদৃষ্টি বলা হয়।

মনঃপর্যায় : রাগ- দ্বেষাদি ষড়রিপু জয় করে কোনো ব্যক্তি অন্যের সুখ দুঃখাদি মানসিক অবস্থা সম্পর্কে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেন তাকে মনঃপর্যায় বলে।

কেবল জ্ঞান : বন্ধনমুক্ত সিদ্ধ পুরুষগণ স্বরূপত সর্বজ্ঞ আত্মার দ্বারা সকল বিষয়ের যে অবর্ণনীয়, দেশ-কালাতীত, বিশুদ্ধ, সাক্ষাৎ অনুভবযোগ্য জ্ঞানলাভ করেন তাকে কেবল জ্ঞান বলে। জৈনদর্শনে এই জ্ঞানকে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের বলে বিবেচনা করা হয়। জ্ঞানের পথে বাধাস্বরূপ সমস্ত কর্ম যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কোনো আত্মা যখন নিজেকে সকল কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে, তখনই তিনি কেবল জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। এই জ্ঞান স্থান কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।

অনেকান্তবাদ :

জৈন জ্ঞানতত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি বস্তু অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বা বস্তুটিকে দেখেছেন এবং প্রত্যেকেই আংশিক সত্যজ্ঞান লাভ করেন অর্থাৎ একই সত্যের নানা দিক বর্তমান এবং প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞান আংশিক হলেও সত্য। জৈন দর্শনে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকান্তবাদ বলা হয়। একমাত্র সর্বজ্ঞ কেবল জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো বস্তুর অনন্তধর্মের পরিচয় লাভ করতে পারেন। জৈন দর্শনের এই অনেকান্তবাদ সত্যের নিত্যতা অনিত্যতা, ঐক্য-অনৈক্য, পরিবর্তনশীলতা অপরিবর্তনীয়তা সবই সুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

স্যাদ্‌বাদ :

জৈনদর্শন সম্মত স্যাদবাদ উৎপত্তির বীজ লুকিয়ে ছিল তৎকালীন প্রচলিত কিছু দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং উপনিষদীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে। এই সিদ্ধান্ত সমূহের পারস্পরিক বিরোধিতার পরিনামেই জৈন দর্শনতন্ত্রের যৌক্তিক ভিত্তিস্বরূপ স্যাদ্‌বাদের উদ্ভব।

জৈনদের মতে, লৌকিক জীবের কোনো জ্ঞানই পূর্ণ সত্যও নয়, পূর্ণ মিথ্যাও নয়। সাধারণত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই সত্যের এক একটি দিক উপলব্ধি করে মাত্র। জৈন দর্শনে সত্যের এই এক একটি দিক বা বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 'নয়'। যেকোন লৌকিক জ্ঞান অথবা জ্ঞান প্রকাশক নয় আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু একথা সকলে বিস্মৃত হয় বলেই পারস্পরিক বাদানুবাদ ও কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে জৈনগণ চারজন অন্ধব্যক্তির হস্তীদর্শনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি হস্তীর পাদস্পর্শ করেন, তিনি বলেন, 'হস্তী স্তম্ভের মতো'; যিনি কর্ণ স্পর্শ করেন তিনি বলেন, 'হস্তী কুলোর মতো'; যিনি পুচ্ছ স্পর্শ করেন তিনি বলেন, 'হস্তী সর্পের মতো'; এবং যিনি উদরের তলদেশ স্পর্শ করেন তিনি বলেন 'হস্তী বৃহৎ জালার মতো'। এইভাবে তারা হস্তীর স্বরূপ সম্বন্ধে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। এই বাদানুবাদের কারণ হল তাদের প্রত্যেকের জ্ঞানই আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সত্য নয়। কেবল চক্ষুমান ব্যক্তিই হস্তীকে পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং অন্ধব্যক্তিদের কলহের মীমাংসা করতে পারে।

এই আপাত বিরোধিতার সমাধানে জৈনগণ বলেন যে প্রতিটি 'নয়' এর সাথে স্যাদ্ কথাটি যুক্ত করতে হবে। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'স্যাদ্' শব্দের অর্থ 'হয়ত' বা সম্ভবত বা হতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক 'নয়' ই আংশিক সত্য এবং অন্যান্য বিকল্প নয়ও আংশিক সত্য। এই মতবাদকে বলা হয় স্যাদ্‌বাদ।

সপ্তভঙ্গী নয় :

জৈন দর্শনে আংশিক সত্যকে প্রকাশ করার জন্য সাত প্রকারের 'নয়' এর উল্লেখ করা হয়েছে। একে বলা হয় 'সপ্তভঙ্গী নয়'। জৈনমতে যে কোন বস্তুর প্রতিটি পর্যায়ে সাতটি ধর্ম সম্ভব। এই সাতটি ধর্ম সম্বন্ধে

সপ্তবিধ সংশয় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় এবং সপ্তবিধ জিজ্ঞাসা থেকে সপ্তভঙ্গী নয়ের সৃষ্টি। সপ্তভঙ্গী নয়ের সাধারণ আকার হল -

(১) স্যাৎ অস্তি - হতে পারে সত্য, (২) স্যাৎ নাস্তি - হতে পারে সত্য নয়, (৩) স্যাৎ অস্তি 'চ নাস্তি চ' - হতে পারে কখনও সত্য কখনও সত্য নয়, (৪) স্যাৎ অব্যক্তব্যম-হতে পারে দুইটি সত্য কিন্তু একটি নাও হতে পারে, (৫) স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তব্যম চ - দেশ কাল সাপেক্ষে যখন একটি বস্তুতে একটি ধর্মের উপস্থিত বোঝান হয় দেশকাল নিরপেক্ষভাবে ঐ বস্তুটি অবর্ণনীয়, (৬) স্যাৎ নাস্তি চ অব্যক্তম চ - দেশকাল নিরপেক্ষভাবে কোন বস্তুর অবর্ণনীয়তা যদিও দেশকাল সাপেক্ষভাবে তার অস্বীকৃতি থাকে, (৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অব্যক্তব্যম চ - নির্দিষ্টকালে যখন কোন বস্তুর স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি থাকে, তখন দেশকাল নিরপেক্ষভাবে তা অবর্ণনীয়।

জৈন দর্শনের এই স্যাৎবাদ এর সঙ্গে আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের সাপেক্ষবাদের বা রাশিবিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা তত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জৈন দার্শনিকগণ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, 'স্যাৎবাদে' সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সংশয় প্রকাশ করা হয়না। প্রত্যেকটি 'নয়' ই সত্য নিশ্চিত।

জৈন নীতিতত্ত্ব :

জৈন নীতি শাস্ত্রে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তিনটি বিধি নির্দেশ করা হয়েছে। এইগুলি হল - সম্যকদর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র। এই তিনটি বিধিকে জৈন দর্শনে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়ে থাকে। সম্যক দর্শন বলতে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসকে বোঝায়। সম্যক জ্ঞান বলতে তত্ত্বজ্ঞানকে বোঝায় এবং সম্যক চরিত্র বলতে বোঝায় সদাচার। এই তিনটি বিধি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার জন্য পাঁচটি ব্রত পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি ব্রত হল - (১) অন্যকে হিংসা না করা বা অন্যের অনিষ্ট চিন্তা না করা। (২) সত্য কথা বলা (৪) অন্যের দ্রব্যের প্রতি লোভ না করা। (৩) ব্রহ্মচর্য পালন করা এবং (৫) বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। কর্মের জন্যই আত্মার বদ্ধ অবস্থা। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির মাধ্যমেই আত্মা মুক্ত হয়। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র এবং পঞ্চমহাব্রত পালনের মধ্য দিয়েই জীবের মোক্ষলাভ ঘটে।

আধুনিক শিক্ষায় জৈন দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Jain Darshan in Modern Education):

জৈনদর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রথমত : জৈন দর্শনের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে জীবন ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বলা হয় শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া তাই এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়াও বটে। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আদর্শ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জৈন দর্শনে অহিংসা ও পরমসহিষ্ণুতা তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত : 'জীব অনন্ত শক্তির আধার'- একথা জৈন দর্শনে বার বার উল্লিখিত হয়েছে, মহান শিক্ষাবিদদের

মতে এবং বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে একথা স্বীকৃত যে প্রতিটি শিশুই অনন্ত সম্ভাবনাময়। শিক্ষা হল শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়ামাত্র। জৈন দর্শনের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা এবং আধুনিক শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি বিকাশের চেষ্টা একই।

তৃতীয়ত: জৈন দর্শনে জীবনাচার হিসাবে যে বিধিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে যেমন সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন এবং সম্যক্ চরিত্র, সেগুলি যেমন একদিকে ব্যক্তিকে জীব হিসাবে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করে, তেমনি অন্যদিকে সামগ্রিক সমাজকল্যাণ এবং সামাজিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যেও অনুরূপভাবে ব্যক্তিকল্যান ও সমাজকল্যাণের সহনির্বাচণ লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থত: জৈন দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়নি, এই দর্শনমতে জীবনে যিনি জয়ী হয়েছেন, তিনি 'জিন'। এই জিনগণই আদর্শপুরুষ এবং অনুসরণযোগ্য। সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবন অনুসরণ করেই মুক্তিলাভ করতে পারে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের যে ভূমিকার উলেখ করা হয়েছে। তার সঙ্গে জৈন দর্শনের এই নীতির পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়, আধুনিককালে শিক্ষকের কাজ শুধু জ্ঞান বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিজের জীবন যাপনের রীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে প্রকৃত জীবনাদর্শ পরিস্ফুট করে তোলাই তার কাজ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক শিক্ষা অনেকাংশে জৈন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

উপসংহার (Conclusion):

আধুনিক শিক্ষার জৈনদর্শনের অনেক অবদান থাকা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে জৈনদর্শন বহু প্রশ্নেরই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, তথাপি জৈন দর্শন হল পুরুষাকারের দর্শন। জীব যে অনন্তজ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সুখের আধার এবং তার যে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি আছে একথা জৈনদের মতো এত গুরুত্ব সহকারে অন্য কোনো দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং এখানেই জৈন দর্শনের মহত্ব নিহিত রয়েছে।

তৃতীয় একক : ন্যায় দর্শন, যোগ দর্শন

(Naya Darshan, Yoga Darshan)

বৈদিক দর্শন (Vedic Philosophy):

মূলত বেদের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনকে বৈদিক বা আস্তিক দর্শন এবং অবৈদিক বা নাস্তিক দর্শন এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। আস্তিক বলতে সাধারণত যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যারা বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে তাদের বোঝায়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত— এই ষড়্দর্শন হল বৈদিক বা আস্তিক দর্শন। সুতরাং কোনো দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও যদি বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আস্তিক বলা চলে। এই বিভাগ অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তবুও এই উভয় দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হয়। যেহেতু উভয়েই বেদে বিশ্বাসী এবং বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। এই ষড়্দর্শনের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এদের আস্তিক বলা হয় যেহেতু এরা সকলেই বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে। এই এককে ৬টি বৈদিক বা আস্তিক দর্শনের মধ্যে ন্যায় দর্শন এবং যোগ দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ন্যায় দর্শন (Naya Darshan):

ভূমিকা (Introduction):

যুক্তি তর্কের দ্বারা কোনো বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াকে বা সংশয়াতীতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ন্যায়। এই শাস্ত্রের দর্শন মূলত বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। ন্যায় দর্শন ভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ষড়্দর্শনের অন্যতম দর্শনশাস্ত্র। ন্যায় দর্শনের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন মহর্ষি গৌতম। তিনি অক্ষপাদ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাই ন্যায় দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়। মহর্ষি বাৎসায়নের মতে ‘নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়’, অর্থাৎ যুক্তির সহায়তায় সংশয় রহিত হয়ে নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার নামই ন্যায়। যুক্তি তর্কের সহায়তায় কোনো বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণকে মনন বা ঈক্ষা বলা হয়। ন্যায় দর্শনে অনুমানের সাহায্যে এরূপ বিচার বিশ্লেষণ করা হয় বলে একে আন্বীক্ষিকী দর্শনও বলা হয়। যুক্তিনিষ্ঠ মননের স্বরূপ আলোচনা ন্যায়দর্শনের মুখ্য কাজ হওয়ায় ন্যায় দর্শন বাদবিদ্যা বা হেতুবিদ্যা বা অর্থশাস্ত্র নামেও পরিচিত। তবে ন্যায় দর্শন শুধুমাত্র প্রমাবিষয়ক আলোচনা হয়। মহর্ষি বাৎসায়ন ন্যায় দর্শনকে সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রদীপ যেরূপ সকল পদার্থকে আলোর দ্বারা উদ্ভাসিত করে, ন্যায় দর্শনও সেরূপ প্রমা এবং প্রমাণ বিষয়ক আলোচনার দ্বারা ব্যক্তির মননকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যা অন্যান্য শাস্ত্রের তত্ত্ব উপলব্ধিতেও সহায়ক হয়।

ন্যায় দর্শনের দুটি শাখা বর্তমান যথা: **১) প্রাচীন ন্যায়, ২) নব্য ন্যায়**

প্রাচীন ন্যায় : আনুমানিক ৪০০ খ্রিঃ পূর্ব থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত প্রাচীন ন্যায়ের বিস্তার। আর ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে নব্য ন্যায়ের সূচনা হয়। ন্যায় দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্র ন্যায় দর্শনের আকরগ্রস্থ। ৫২৮টি সূত্র সম্বলিত এই গ্রন্থ ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাঁর ন্যায়-সূত্রের উপর ভিত্তি করে মহর্ষি বাৎসায়ন, বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ ন্যায়ভাষ্য, ন্যায়বার্তিক, তাৎপর্য, টিকা, ন্যায়মঞ্জরী নামে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

নব্য ন্যায় : পরবর্তীকালে গঙ্গেশ উপাধ্যায় সূক্ষ্মবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে ন্যায় দর্শনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এই নতুন অধ্যায় নব্যন্যায় নামে পরিচিত। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সৃষ্টি 'তত্ত্বচিন্তামণি'-কে অবলম্বন করেই নব্যন্যায়ের যাত্রা শুরু। এই গ্রন্থটি প্রত্যক্ষ চিন্তামণি, অনুমান চিন্তামণি, উপমান চিন্তামণি ও শব্দ-চিন্তামণি এই চারটি অংশে বিভক্ত। নব্য ন্যায় চর্চার প্রথম পীঠস্থান ছিল মিথিলা। পরবর্তীকালে বঙ্গাদেশের নবদ্বীপ ন্যায়চর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠে।

প্রাচীন ন্যায় সম্মত পদার্থ : অন্যান্য দর্শনের মতো ন্যায় দর্শনেও মোক্ষকেই জীবের পরম পুরুষার্থরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। আর ন্যায়শাস্ত্র মতে, এই মোক্ষ লাভের জন্য যোড়শ পদার্থের যথাযথ জ্ঞান প্রয়োজন। এই যোড়শ পদার্থ হল— প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান। এই যোড়শ পদার্থকে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা হল।

১) প্রমাণ : প্রমাকরণম্ প্রমাণম্ অর্থাৎ প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। প্রমা হল যথার্থ অনুভব। আর প্রমাণ হল প্রমা লাভের পদ্ধতি বা উপায়। প্রমাণের দ্বারাই পদার্থের সিদ্ধি হয়। ন্যায় মতে প্রমাণ চারপ্রকার— প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান ও শব্দ।

২) প্রমেয় : প্রমার বিষয়কে প্রমেয় বলে। প্রমেয় হল জ্ঞানের অন্যতম শর্ত। সূত্রকার বারো প্রকার প্রমেয় উল্লেখ করেছেন। যথা আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।

৩) সংশয় : সংশয় হল একপ্রকার অনিশ্চয়াত্মক অযথার্থ জ্ঞান। একই ধর্মীকে পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি ধর্মবিশিষ্ট বলে মনে করলে সংশয় উৎপন্ন হয়। যেমন— এটি স্থানু অথবা পুরুষ।

৪) প্রয়োজন : বাৎসায়নের মতে যে পদার্থের প্রাপ্তি বা পরিত্যাগের জন্য জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয় সেই পদার্থকে প্রয়োজন বলে।

৫) দৃষ্টান্ত : যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী অভিন্ন মত পোষণ করেন তাকে দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত প্রমাণসিদ্ধ বিষয়।

৬) সিদ্ধান্ত : শাস্ত্রের কোনো বিষয় যখন যুক্তি ও প্রমাণের সহায়তায় নিশ্চিত সত্যরূপে প্রতিপ্রাদিত হয় তখন তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়।

৭) অবয়ব : পরার্থানুমান নামক ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাদি নামক খণ্ডবাক্যকে অবয়ব বলে। অবয়ব পাঁচ প্রকার— প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, ও নির্গমন।

৮) তর্ক : তর্ক হল এরূপ এক প্রকার পরোক্ষ পদ্ধতি যেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধ বিষয়ের

মিথ্যাত্ব প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করা হয়।

৯) নির্ণয় : তত্ত্বনিশ্চয় বা তত্ত্বাবধারণকে নির্ণয় বলে। বাদী ও প্রতিবাদী স্বমত প্রতিষ্ঠাপন ও পরমত খণ্ডন করলে মধ্যস্থের যে সংশয়ের উদ্রেক হয়, তা নিরসন করার জন্য যে অবধারণ তাকে নির্ণয় বলে।

১০) বাদ : জয়ের উদ্দেশ্যে নয়, কেবল সত্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে বিচার তাকেই বাদ বলে। গুরু-শিষ্যের আলোচনা বাদের প্রকৃস্ট উদাহরণ।

১১) জল্প : পরমত খণ্ডনপূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠাপনরূপ কথাকে জল্প বলে।

১২) বিতণ্ডা : বিতণ্ডা হল এমন এক প্রকার কথা যার দ্বারা কেবল পরপক্ষ খণ্ডিত বা নিরাকৃত হয়।

১৩) হেত্বাভাস : হেতুর দোষ বা দুস্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে। যা হেতুরূপে প্রতীয়মান হয় বা আভাসিত হয় অথচ প্রকৃত হেতু নয়, তাকেই হেত্বাভাস বলে।

১৪) ছল : ছল হল একপ্রকার অসদুত্তর। প্রতিপক্ষের বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ না করে তদ্‌ভিন্নার্থ কল্পনার দ্বারা যে অসদুত্তর তাকেই ছল বলে।

১৫) জাতি : ব্যাপ্তি অনপেক্ষরূপে কেবল সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা দোষোদ্ভারণকে জাতি বলে। জাতি ছল ভিন্ন একপ্রকার অসদুত্তর। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে চব্বিশ প্রকার জাতির উল্লেখ করেছেন।

১৬) নিগ্রহ স্থান : বিচারস্থলে পরাজয়ের হেতুকে নিগ্রহ স্থান বলে। মহর্ষি গৌতম বাইশ প্রকার নিগ্রহ স্থানের উল্লেখ করেছেন।

উপরি উল্লিখিত ষোড়শ পদার্থকে আবার চারটি দর্শনতত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই চারটি দর্শনতত্ত্ব হল—

ক) জ্ঞানতত্ত্ব, খ) জগৎতত্ত্ব , গ) আত্মতত্ত্ব, ঘ) ঈশ্বরতত্ত্ব।

(ক) জ্ঞানতত্ত্ব :

ন্যায় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বটি শিক্ষাগত দিক থেকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ন্যায় দর্শন মতে জ্ঞান দু-ধরনের- ১) প্রমাজ্ঞান ও ২) অপ্রমাজ্ঞান।

প্রমাজ্ঞান : যে জ্ঞানকে সরাসরি উপলব্ধি করা যায় তাহল প্রমাজ্ঞান। প্রমার চারটি উৎস যথা— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

অপ্রমাজ্ঞান : যে জ্ঞান সরাসরি উপলব্ধি করা যায় না তা হল অপ্রমাজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানে সংশয়, ভ্রম ও তর্ক জড়িয়ে থাকে তাকে অপ্রমাজ্ঞান বলে।

ন্যায় দর্শনে যথার্থ অনুভবের জ্ঞাতা হল প্রমাতা, জ্ঞান হল প্রমা, জ্ঞানের বিষয় হল প্রমেয় ও জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলা হয়। নৈয়ায়িকগণ চারপ্রকার জ্ঞানের উৎসের কথা বলেছেন। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

প্রত্যক্ষ : প্রত্যক্ষ হল জ্যেষ্ঠ প্রমাণ। এরূপ কোনো ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় নেই যারা প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য মানেন না। নৈয়ায়িকগণের মতে প্রত্যক্ষই সকল প্রকার জ্ঞান আহরণের মূল পদ্ধতি। জ্ঞানের বিষয়বস্তু বা

প্রমেয়-এর সঙ্গে যে-কোনো ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়। এই দর্শনমতে মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি নয় ছয়টি– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। এদের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বককে বলা হয় বহিরিন্দ্রিয় আর মনকে নৈয়ায়িকগণ বলেছেন অন্তরেন্দ্রিয়। এর উপর ভিত্তি করে নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন— লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

লৌকিক প্রত্যক্ষ : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক — এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষের ফলে যে প্রত্যক্ষ হয় তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। নৈয়ায়িকগণ লৌকিক প্রত্যক্ষের তিনটি স্তরের কথা স্বীকার করেন। এগুলি হল—

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ : নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হল বস্তুর গুণহীন সংবেদনমাত্র। যে প্রত্যক্ষে বস্তুর জ্ঞান হয়, কিন্তু বস্তুটি যে ঠিক কী, এরূপ জ্ঞান হয় না, তাকে বলা হয় নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। বিশিষ্ট নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের মতে, নিস্পকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্ অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রকারহীন তাই নির্বিকল্পক। 'প্রকার' শব্দের অর্থ বিশেষণ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হল বিশেষণ বর্জিত বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান। নির্বিকল্পক জ্ঞানে 'এইটির' জ্ঞান হয়, এর নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া– এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান হয় না।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ : সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলতে বস্তুর গুণযুক্ত প্রত্যক্ষকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বস্তুকে শুধু বস্তু বলেই জানা যায় না, বস্তুটি কিরূপ, কী জাতীয়, এই ধরনের জ্ঞানও হয়। সবিকল্পক জ্ঞান প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্' অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রকার বিশিষ্ট ও বিশেষ্য ও বিশেষণের ভেদযুক্ত তাকে সবিকল্পক বলে। সবিকল্পক জ্ঞানে 'এইটি ঘট' বা 'এইটি গরু' এরূপ জ্ঞান হয়।

প্রত্যভিজ্ঞা : প্রত্যভিজ্ঞা হল কোনো বস্তুকে পূর্ব পরিচিত বস্তু বলে চিনতে পারা। এটি হল স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের সমন্বিত রূপ। কোনো বিষয়ের বর্তমান প্রত্যক্ষস্থলে যদি ঐ বিষয়ক পূর্বানুভবলব্ধ বিষয়ের সাথে অভিন্ন রূপে চেনা যায় তবে তাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ : বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ জ্ঞান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যায়। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার। ১) সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ ২) জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষ ৩) যোগজ লক্ষণ প্রত্যক্ষ।

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ : কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করার সময় সেই বস্তু বা ব্যক্তি যে শ্রেণি বা জাতির অন্তর্গত, সেই শ্রেণির বা জাতির অন্তর্গত সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করার নাম সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ। যেমন, যখন বলা হয় "এটি একটি ঘোড়া"। এক্ষেত্রে বিশেষ একটি ঘোড়াকে প্রত্যক্ষ করার সময় ঘোড়া বা হাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিও মনে আসে।

জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষ : জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার স্থানান্তর হয় অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দিয়ে যে বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না, মানসিক পর্যায়ে, সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে সে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করাকে বলা হয় জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষ। যখন এক টুকরো বরফ চোখে দেখে বলা হয় "হিম শীতল বরফের টুকরো", তখন এই জাতীয় জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্মরণের ভিত্তিতে জ্ঞান আহরিত হয়। বস্তু সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে, বিরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর আরোপ করা হয়।

যোগজ লক্ষণ প্রত্যক্ষ : তৃতীয় প্রকারের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হল যোগজ প্রত্যক্ষ। ভূত-ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন বিষয়ের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাকে যোগজ প্রত্যক্ষ বলা হয়। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করলে, এই জাতীয় প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিত্য।

অনুমান : নৈয়ায়িক স্বীকৃত চতুর্বিধ প্রমাণমধ্যে অনুমান দ্বিতীয় প্রমাণ। অনুমান হল কোনো জ্ঞান নির্ভর অন্য জ্ঞান। সুতরাং, অনুমানের আক্ষরিক অর্থ হল 'পশ্চাদ্‌জ্ঞান' অর্থাৎ, যে জ্ঞান অন্য জ্ঞানের পরে লাভ করা হয়, তাকে বলে অনুমান। যেমন রান্নাঘরে ধূম দেখলে বলা হয় যে রান্নাঘরে বহ্নি রয়েছে। এক্ষেত্রে বহ্নি অনুমান করা হয়েছে। প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি তর্কবাক্য বা বচন থাকবেই। যে বচনগুলির দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে অনুমানের অবয়ব বলে। তিনটি পদ হল সাধ্য (Major Tern), পক্ষ (Minor Term) এবং হেতু (Middle Term)। হেতুর অপর নাম সাধন। হেতুর সাহায্যে যাকে লাভ করতে চাই তাই হল সাধ্য। যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হল তার নাম পক্ষ। হেতু সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে। নৈয়ায়িকগণ অনুমানকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন : **(১) স্বার্থানুমান (২) পরার্থানুমান।**

স্বার্থানুমান : নিজের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে যে অনুমান করা হয় তাকে স্বার্থানুমান বলে। আপন স্বার্থের জন্য এই অনুমান ব্যবহৃত হয় বলে একে স্বার্থানুমান বলে।

পরার্থানুমান: অন্যকে বোঝানোর জন্য বা অন্যের কাছে কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য যে অনুমান করা হয়, তাকে পরার্থানুমান বলে। পরের স্বার্থে এই অনুমান ব্যবহৃত হয় বলেই একে পরার্থানুমান বলা হয়। ন্যায় দর্শনে এই উভয় প্রকার অনুমানের দ্বারা কিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্তি (Logic) স্থাপন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উপমান : ন্যায় দর্শন মতে জ্ঞানার্জনের অপর একটি কৌশল উপমান। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'উপমান' শব্দের অর্থ সাদৃশ্যজ্ঞান। 'উপ' অর্থ হল সাদৃশ্য, মান হল জ্ঞান। পূর্ব পরিচিত কোনো বস্তুর সঙ্গে অপরিচিত বস্তুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, নতুন বস্তুটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে উপমান। যেমন– যে ব্যক্তি 'গবয়' পদবাচ্য পদার্থকে জানে না, তাকে যদি বলা হয় এটি একপ্রকার গোসদৃশ পশুর নাম। তারপর যদি ঐ ব্যক্তি গোসাদৃশ্য কোনো অপূর্ব দৃষ্ট পশু দেখতে পায়, তখন তার পূর্বের কথা স্মরণ হয় এবং বুঝতে পারে এই জাতীয় পশু হল 'গবয়' পদবাচ্য।

শব্দ : সর্বশেষে ন্যায় দর্শনে 'শব্দ' কে আর একটি জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। অন্যের উচ্চারিত শব্দ বা বাক্য থেকে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে বলা হয় শাব্দিক উপায়। মহর্ষি শব্দের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আপ্তোপদেশ : শব্দ : অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির উপদেশবাক্যই শব্দ প্রমাণ। এইরূপ উপদেশবাক্য থেকে পাওয়া জ্ঞান হল শব্দ জ্ঞান। তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য এরকম ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দ বা বাক্যই প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায়। ন্যায়দর্শনে সত্যবাদী, সত্যদর্শী এবং যিনি প্রবঞ্চনা করেন না, তাঁর বাক্যকে আপ্তবাক্য বলা হয়েছে এবং এই আপ্তবাক্যই প্রকৃত জ্ঞানের উৎস। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করুণাপাঠব— এই চতুর্বিধ দোষরাহিত্যই ব্যক্তি বা পুরুষ আপ্তত্বের নির্ধারক। এই চতুর্বিধ দোষের কোনো একটি উপস্থিত থাকলেই ব্যক্তিকে আপ্ত বলা যায় না।

শব্দ দুই প্রকার— বৈদিক ও লৌকিক। বেদোক্ত সকল বাক্যই বৈদিক। ন্যায় মতে বেদ অনিত্য ও পৌরুষেয়, ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। তাই বৈদিক বাক্য ঈশ্বর কর্তৃক কথিত এবং শব্দ প্রমাণ। অপরদিকে সাধারণ মানুষ কথিত বাক্য লৌকিক। তবে সকল লৌকিক বাক্যই শব্দ প্রমাণ নয়, কেবল আপ্ত কথিত লৌকিক বাক্যই শব্দ প্রমাণ।

(খ) জগৎতত্ত্ব :

নৈয়ায়িকরা জগতের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর ছাড়াও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জাগতিক বস্তুর সত্তা আছে, তা নিছক মনের ধারণা নয় অর্থাৎ সব জাগতিক বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা আছে বা এদের অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। নৈয়ায়িককরা সরল বস্তুবাদী দার্শনিক। তাঁদের মতে বস্তুর দু প্রকার গুণ আছে– 'মুখ্য' গুণ ও গৌন গুণ। বস্তু ক্ষণিক নয়, বস্তুর স্থায়িত্ব আছে। বস্তু কেবলমাত্র গুণের সমষ্টি নয়, এর গুণাতিরিক্ত সত্তা বা দ্রব্যত্ব আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এবং মরুৎ— এই চারটি উপাদানের দ্বারা পৃথিবী গঠিত। এই উপাদানগুলির অন্তিম অংশ হল চার প্রকারের পরমাণু যেগুলি অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং অবিভাজ্য। ঈশ্বর এইসব পরমাণু সৃষ্টি করেননি। তিনি এই পরমাণুর সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

যদিও এই জগৎ কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তবুও এই জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এই জগৎ কর্মবাদ নীতির অধীন এবং কার্যকারণ নীতি এই কর্মবাদের অধীনস্থ। কর্মবাদ এবং জড়জগতের মধ্যে ঈশ্বরই সামঞ্জস্য স্থাপন করেন।

(গ) আত্মতত্ত্ব :

নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা একটি অভৌতিক দ্রব্য এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হল শাশ্বত এবং বিভু বা সর্বব্যাপী। দেশ ও কালের দ্বারা আত্মা সীমিত হয় না। নৈয়ায়িকদের মতে বুদ্ধি, জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার এইগুলি সবার আত্মার গুণ। এতগুলি গুণ একত্রে কোনো জড়বস্তুর মধ্যে থাকতে পারে না। আবার দ্রব্য ছাড়া কোনো গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না; সেই হেতু গুণগুলিরও আধার বা আশ্রয়রূপে কোনো দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য হল আত্মা। ন্যায় দর্শনে দুই প্রকার আত্মার কথা বলা হয়েছে— জীবাত্মা ও পরমাত্মা। আত্মারূপে উভয়ই অভিন্ন হলেও প্রথমটি অনিত্য এবং দ্বিতীয়টি নিত্য জ্ঞানের অধিকারী।

ন্যায় দর্শন অনুযায়ী আত্মা নিত্য-উৎপত্তি বিনাশহীন। দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা নিত্য। দেহাবিচ্ছিন্ন হওয়ায় জীবাত্মাকে সীমিত বলে মনে হলেও জীবাত্মা আসলে সর্বব্যাপী বা বিভু। দেহ বহু, তাই প্রতিদেহাবিচ্ছিন্ন জীবাত্মাও সংখ্যায় বহু। জীবাত্মা বহু হলেও পরমাত্মা এক। এই পরমাত্মাই ঈশ্বর। যিনি জগতের নিমিত্ত কারণ।

(ঘ) ঈশ্বরতত্ত্ব :

মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ না করলেও দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে 'আত্মন' শব্দটি ব্যবহার করে এবং তাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দ্বিবিধ অর্থে গ্রহণ করে পরমাত্মা বলতে ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন। ন্যায় দর্শন অনুযায়ী এই পরমাত্মাই ঈশ্বর পদবাচ্য।

তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। জগতের স্রষ্টারূপে তিনি নিমিত্তকারণ। জগতের উপাদান কারণ হল নিত্য পরমাণুসমূহ। আর দেশ-কালাদি হল সহকারী কারণ। নিত্য পরমাণু সমূহের দ্বারা তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি শূন্য থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেননি; নিত্য ও শাশ্বত পদার্থগুলি সমন্বয়ে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সেই সৃষ্ট জগতে জীবাত্মাগুলি নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। ন্যায় দর্শন অনুযায়ী জীবাত্মা মন ও দেহ থেকে পৃথক। কিন্তু মন ও দেহের সংযোগে জীবাত্মার মধ্যে সুখ দুঃখ ইত্যাদি গুণের উদ্ভব হয়। এই কারণে শরীর ধারণ করলেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, অজ্ঞানতাই দুঃখের মূল কারণ। তাই দুঃখ দূর করতে হলে প্রকৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। পরমাত্মার জ্ঞানই প্রকৃত এবং নিত্য জ্ঞান। পরমাত্মার জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করাই হবে জীবনের মূল লক্ষ্য।

আধুনিক শিক্ষায় ন্যায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Naya Darshan in Modern Education):

ন্যায় দর্শনের নানা সীমাবদ্ধতার কথা অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি উল্লেখ করলেও, শিক্ষাগত দিক থেকে তার জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, পরমাত্মার জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এই মোক্ষ বা পরমাত্মার উপলব্ধি নির্ভর করে প্রকৃত জ্ঞানের উপর। প্রকৃত জ্ঞান বলতে লৌকিক এবং অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা। সুতরাং, আধুনিক শিক্ষার এই লক্ষ্যের সমর্থন পরোক্ষভাবে ন্যায় দর্শনে মেলে। আবার ন্যায় দর্শনে যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে স্থান পেয়েছে। জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি হিসাবে ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় 'ইন্দ্রিয় পরিমার্জনের নীতি ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষণ, জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়ার নীতি প্রভৃতি ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনের সামিল। উপমানের কৌশলও আধুনিক শিক্ষার পূর্বোক্ত নীতিকেই সমর্থন করে। আবার আধুনিক শিক্ষায়, যে ব্যক্তির বিষয়জ্ঞান গভীর এবং যিনি শিক্ষার্থীদের যে কোনো সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করতে সক্ষম, তিনিই শিক্ষকতার যোগ্য। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষক সম্পর্কিত এই ধারণা ন্যায় দর্শনের শাব্দিক জ্ঞানের উৎস সংক্রান্ত মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ন্যায় দর্শনের মূল ভিত্তি হল যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আধুনিক শিক্ষণের যুক্তি নির্ভর পদ্ধতির বহু উপাদান এই ন্যায় দর্শনে বর্ণিত যৌক্তিক কাঠামো থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion):

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে, আধুনিক শিক্ষা অনেকাংশে ন্যায় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেও ন্যায় দর্শনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন— ঈশ্বর এবং জীবাত্মা সম্পর্কে ন্যায় দর্শনের মতবাদে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। আবার ন্যায় দর্শনের মতে ঈশ্বর জগতের ভিতরে নেই। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে জগতের একেবারে বাইরে অবস্থান করে থাকে। এই ধরনের দ্বৈতবাদ নিখুঁত দার্শনিক মতবাদের পরিচায়ক নয়। তথাপি ন্যায় দর্শনের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনে ন্যায় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অপরিসীম।

যোগ দর্শন
(Yoga Darshan)

ভূমিকা (Introduction) :

যোগ দর্শন আস্তিক এবং সাংখ্য দর্শনের সমানতন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এই দর্শন বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী এবং অধিকাংশ সিদ্ধান্তেই সাংখ্যানুসারী। তবে ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাঁরা ভিন্নমত। ঐতিহ্যানুসারে সাংখ্যগণ নিরীশ্বরবাদী, আর যোগ দর্শন সেশ্বরবাদী। তাই সাংখ্যকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। তাছাড়া সাংখ্য দর্শন যেখানে তাত্ত্বিক আলোচনায় আগ্রহী, যোগ দর্শন সেখানে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ বা ব্যবহারে আগ্রহী। একটি তত্ত্বমূলক এবং অপরটি প্রয়োগমূলক।

আধুনিককালে সাংখ্য ও যোগ দুটি স্বতন্ত্র দর্শনতন্ত্ররূপে পরিচিত। যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক মহর্ষি পতঞ্জলি। তবে তিনি যোগের প্রবর্তক নন, কেননা তার পূর্বেও যোগীরা যোগ জানতেন। যোগ দর্শনকে পাতঞ্জল দর্শনও বলা হয়, মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত যোগসূত্র বা পাতঞ্জলসূত্র এই দর্শনের আদি আকর গ্রন্থ। তবে এই পতঞ্জলি এবং পানিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অভিন্ন কিনা সে বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। 195 টি সূত্র সম্বলিত যোগসূত্র চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

(১) সমাধিপাদ : সমাধিপাদে 51 টি সূত্র রয়েছে এবং এই সূত্রগুলির দ্বারা যোগের স্বরূপ ও প্রকার, উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, যোগাঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য সমাধিপাদকে যোগপাদও বলা হয়।

(২) সাধন পাদ : সাধনপাদে 55 টি সূত্রের মধ্য দিয়ে মূলত ক্রিয়া যোগের প্রয়োজনীয়তা ও ফল প্রদর্শিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে কর্মফল, দুঃখ, দুঃখের কারণ ও দুঃখের নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) বিভূতিপাদ : এই অধ্যায়ে যোগের মাধ্যমে যোগীর অলৌকিক শক্তি, ধ্যান, ধারণা ও বিবেক খ্যাতি ইত্যাদির বর্ণনা 55 টি সূত্রের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) কৈবল্যপাদ : কৈবল্যপাদে কৈবল্যের স্বরূপ ও প্রকার, পরলোক, পুরুষের সত্তা ইত্যাদি 34 টি সূত্র অবলম্বনে বর্ণিত হয়েছে। ,

যোগ শব্দের অর্থ : সংস্কৃত 'যুজ' ধাতুর উত্তর 'ঘঙ' প্রত্যয় নিবেশে 'যোগ' শব্দের উৎপত্তি হয়। 'যুজ' ধাতুর অর্থ সংযোগ বা সমাধি। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে যোগ বলতে সংযোগ বা সমাধিকে বোঝায়। তবে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যোগশ্চি ও বৃত্তি নিরোধ' অর্থাৎ যোগ বলতে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে বোঝায়। বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই ত্রিতত্ত্বকে একত্রে যোগদর্শনে অন্তঃকরন বা চিত্ত বলা হয়। আর চিত্তের পরিণাম বা বিকারকে চিত্তবৃত্তি বলে।

চিত্তবৃত্তি ঃ 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ পরিনাম বা বিকার। তাই চিত্তের পরিনাম বা বিকারকে চিত্তবৃত্তি বলে। যোগদর্শনে পাঁচপ্রকারের চিত্তবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

(১) প্রমাণ : প্রমাণ হল একপ্রকার জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি। এরূপ চিত্তবৃত্তির দ্বারা প্রমা উৎপন্ন হয়। প্রমান ত্রিবিধ - প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। চিত্ত ইন্দ্রিয় প্রণালীর সহায়তায় বাহ্য বিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে ঐ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চয়রূপ যে চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষে অপ্রাপ্ত হেতুগম্য বিষয়ের জ্ঞানের করণরূপ চিত্তবৃত্তিকে অনুমান প্রমাণ বলে। বেদ ও বেদানুসারী স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিকে আগম প্রমান বলা হয়।

(২) বিপর্যয় : বিপর্যয় নামক চিত্তবৃত্তি হল অতদ্রুপ, অপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান। বিপর্যয় বলতে ভ্রান্তজ্ঞান বা সংশয়জ্ঞান বা সংশয়কেই বোঝায়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম।

(৩) বিকল্প : শব্দবোধের অনুসারী বিষয় অলীক বা শূন্য হলে বিকল্প নামক চিত্তবৃত্তি হয়। শুধু শব্দকে আশ্রয় করে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, যদিও সেই শব্দের অর্থানুসারে কোনো বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তাকে বিকল্প বলা হয়। যেমন ঃ - আকাশকুসুম, অনন্ত।

(৪) নিদ্রা : জাগ্রত চৈতন্য ও স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার অভাবহেতু চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয় তাই হল নিদ্রা। যোগ দর্শনে নিদ্রা বলতে সুষুপ্তিকে বোঝায়। চিত্তে তমোগুণের প্রাধান্যের দরুন এই অবস্থা সৃষ্টি হয় যার ফলে মানুষের জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা এবং স্বপ্নের অভিজ্ঞতা সবই আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

(৫) স্মৃতি : স্মৃতিও এক প্রকারের চিত্তবৃত্তি। কোনা পরিবর্তন না ঘটিয়ে অভিজ্ঞতার পুনঃপ্রকাশের নাম স্মৃতি।

ক্লেশ : উপরোক্ত পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তিকে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে চিত্তবৃত্তি অবিদ্যাপ্রসূত এবং বন্ধনের কারণ তাকে ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি বলে (সংসার বন্ধনাদি ক্লেশ)। অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি ঠিক এর বিপরীত অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি বন্ধনের অপঘাতক ও মুক্তির সহায়ক। যোগ দর্শনে পাঁচপ্রকার ক্লেশের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল - অবদ্যি়া, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ক্লেশের উপস্থিতিতেই ধর্মাধর্মরূপ কর্মের উৎপত্তি হয় এবং পরিণতিতে জীবের বন্ধন দৃঢ় হয়। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

অবিদ্যা : অনিত্যকে নিত্যরূপে, অশুচিকে শুচি রূপে, দুঃখকে সুখ রূপে অনাত্মাকে আত্মারূপে জ্ঞানই অবিদ্যা। বস্তু স্বরূপত যা তাকে ভিন্নরূপে জানাই অবদ্যি়া।

অস্মিতা : আত্মাকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করার নাম অস্মিতা। এই অস্মিতা ক্লেশের ফলে পুরুষ নিঃসঙ্গ ও উদাসীন হয়েও নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে।

রাগ : যোগসূত্রকার রাগের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'সুখানুশয়ী রাগ' অর্থাৎ সুখসাধনের প্রতি আসক্তিকে রাগ নামক ক্লেশবৃত্তি বলে। একে তৃষ্ণা, লোভ বা গর্দ্ধও বলা হয়। যদিও অবিদ্যাই সকল ক্লেশের মূল তথাপি অস্মিতা থেকেই রাগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি।

দ্বেষ : দ্বেষ প্রসঙ্গে যোগসূত্রকার বলেছেন, 'দুঃখানুশয়ী দ্বেষ' অর্থাৎ দুঃখ সাধনের প্রতি বিরক্তিবোধ থেকে দ্বেষ নামক ক্লেশবৃত্তি বলে। একে প্রতিধ, জিঘাংসা ও ক্রোধ নামেও অভিহিত করা হয়।

অভিনিবেশ : অভিনিবেশ হল মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশ। পূর্ব জন্মসমূহে অনুভূত মরন দুঃখ থেকে বিবেকী/অবিবেকী জীবমাত্রেই যে মৃত্যুভয় উৎপন্ন হয় তাকে অভিনিবেশ বলে।

চিত্তভূমি : যোগের উদ্দেশ্য হল অবিবেকজ্ঞান দূর করে বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যতক্ষণ চিত্তের পরিণাম বা বিবেক থাকবে এবং আত্মা বা পুরুষের চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হবে, ততক্ষণ এই চিত্তবৃত্তিগুলি পুরুষ বা আত্মারই বৃত্তি বলে মনে হবে। সেইকারণেই যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিজাত চিত্ত প্রকৃতির ন্যায়ই ত্রিগুণাত্মক। কিন্তু মূল প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ:, তম: — এই গুণত্রয় যেরূপ সাম্যাবস্থায় থাকে চিত্ততে সেরূপ থাকেনা। প্রতিটি গুণই অপর দুইগুণকে অভিভূত করে স্বীয় কতৃত্ব প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হয়। এর থেকেই চিত্তের নানান অবস্থা বা চিত্তভুমির সৃষ্টি হয়। চিত্তভূমি হল চিত্তের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা। চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার - ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল—

ক্ষিপ্ত : অস্থির, সদা চঞ্চল এবং প্রতিমুহূর্তে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ধাববান চিত্তের অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা বলে। ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত রজ: ও তম: গুণ প্রধান। সংসারক্লিষ্ট অধিকাংশ সাধারণ মানুষের চিত্তই ক্ষিপ্তভূমিক। চিত্তের এরূপ অবস্থা যোগ সহায়ক নয়।

মূঢ় : অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্ত চিত্ত মূঢ়ভূমিক। এরূপ চিত্ত তমোগুণ প্রধান হওয়ায় মোহাচ্ছন্ন, অলস, নিষ্ক্রিয় এবং তত্ত্বচিন্তায় অসমর্থ। চিত্তের এরূপ অবস্থা যোগের অনুকূল নয়।

বিক্ষিপ্ত : বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত স্তরের। কেননা ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত সদাচঞ্চল, কিন্তু বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত কখনো চঞ্চল কখনো স্থির। এরূপ চিত্তে তমোজ্ঞানের প্রাধান্য না থাকায় চিত্ত সংবৃত্ত কিছু সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট হতে পারে। কিন্তু রজ: গুণের প্রভাবমুক্ত না হওয়ায় এই নিবেশ স্থায়িত্ব লাভ করেনা, চাঞ্চল্যবশত পরমূহুর্তেই বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয়। এ অবস্থাও যোগ পদবাচ্য নয়।

একাগ্র : একটিমাত্র অবলম্বন বিশিষ্ট চিত্তের ভূমিকে একাগ্রভূমি বলে। এরূপ ভূমিতে চিত্ত সম্পূর্নরূপে রজ: ও তম: গুনের প্রভাবমুক্ত হয়। ফলত সত্ত্বগুণ পূর্নরূপে উদ্ভাসিত হয় এবং চিত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি নির্দিষ্ট ধ্যেয় বিষয়ে নিবদ্ধ হয়। কোনো বস্তুতে দীর্ঘকাল মন:সংযোগ এই অবস্থাতেই সম্ভব। এই অবস্থাকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যোগ দর্শনে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কয়েকটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে - সবিতর্ক সমাধি, সবিচার সমাধি, সানন্দ সমাধি এবং সাস্মিত সমাধি।

কোনো দেবতার মূর্তির মতো কোনো স্থূল বিষয়ে চিত্ত যখন নিবিষ্ট হয় তখন তাকে বলে সবিতর্ক সমাধি। তন্মাত্রের মতো সূক্ষ্ম বাহ্য জিনিসে যখন চিত্ত নিবিষ্ট হয় তখন তাকে বলা হয় সবিচার সমাধি। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নিবিষ্ট হলে তাকে বলা হয় সানন্দ সমাধি। সাস্মিত সমাধিতে পৌঁছে ব্যক্তি অহম্ এর পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে।

নিরুদ্ধ : যে ভূমিতে চিত্তের সর্ববিধ বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় তাকে নিরুদ্ধভূমি বলে। এ অবস্থায় চিত্ত নিরালম্ব, শান্ত ও সমাহিত হয়। চিত্তবৃত্তির এরূপ নিরোধকে যোগ বলা হয়। যোগের ফলে আত্মা বৃত্তিসম্বন্ধ না হয়ে

স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। একে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

অষ্টাঙ্গযোগ : যোগ দর্শনের চরম লক্ষ্য আত্মার কৈবল্যসিদ্ধি। কিন্তু সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি সম্ভব হয়না। যোগ দর্শনে এই সাধনার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই যোগকে মূলত প্রয়োগবিদ্যা বা সাধনশাস্ত্র বলা হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করলে অবিদ্যাদি পঞ্চপর্বরূপ ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষয় হয় এবং সম্যক জ্ঞানের উদ্ভাসন হয়। কৈবল্যের সাধনরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে, 'যমনিয়মাসন - প্রানায়াম প্রত্যাহার - ধারণাধ্যান সমাধায়োহস্টাবঙ্গানি' অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান ও সমাধি - এই আটটি যোগাঙ্গ। নিম্নে এই আটটি যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

যম: কতকগুলি কর্ম থেকে প্রতিনিবৃতি হওয়াই যম- সাধন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চসাধনকে একত্রে যম বলা হয়।

অহিংসা : অহিংসা হল হিংসার অনুষ্ঠান। হিংসা ত্রিবিধ - কায়িক, বাচিক ও মানসিক। প্রাণী হত্যা কায়িক, প্রাণী হত্যার নির্দেশ দান বাচিক এবং প্রাণী হত্যার সকল্প মানসিক হিংসার দৃষ্টান্ত। তবে শুধুই হত্যাই নয়, প্রাণীকে যে কোনো প্রকার আঘাত বা দুঃখ দানই হিংসা। তাই অহিংসা হল যে কোনো প্রকার হিংসা থেকে পূর্ণ বিরতি।

সত্য : সত্য শব্দের দ্বারা সত্য দর্শন, সত্য শ্রবন ও সত্য ভাষণ বোঝায়। অসত্য সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

অস্তেয় - অস্তেয় বলতে বোঝায় কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্বপ্রকার চৌর্যবৃত্তি হতে বিরতি। যোগ দর্শনে অস্তেয় বলতে কেবল পরদ্রব্য অগ্রহণ নয়, পরদ্রব্যের প্রতি স্পৃহাও পরিতাজ্য।

ব্রহ্মচর্য : ব্রহ্মচর্য বলতে পূর্ণ যৌন সংযমকে বোঝায়। যৌনাচার কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ হয়। ব্রহ্মচর্যে উভয়বিধ যৌনাচার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

অপরিগ্রহ : জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয় অগ্রহণই অপরিগ্রহ। জীবন রক্ষার জন্য ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন কেবল সেটুকু ভোগ্য বস্তুই গ্রহণীয়। অপরিগ্রহের দ্বারা যোগিগণের কৈবল্যের প্রতিবন্ধক ভোগবিলাসিতাকে পরিহার করা হয়েছে।

নিয়ম : যোগসূত্রকার বলেছেন, 'শৌচ - সন্তোষ- তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রনিধানানি নিয়মা: অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চসাধনকে একত্রে নিয়ম বলে। 'শৌচ' শব্দের দ্বারা দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ শুচিতাকে বোঝানো হয়েছে। সন্তোষ হল একপ্রকার মানসিক সংযম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ, কাষ্ঠ মৌন, আকারমৌন ইত্যাদি বিপরীত অবস্থা সহ্য করাকে তপশ্চর্যা বলে। মোক্ষের উপকারক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং ইস্টমন্ত্র জপকে স্বাধ্যায় বলে। প্রনব জপের ফলে ইষ্ট বিষয়ের দর্শনলাভ হয়। পরমগুরু ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পনকেই ঈশ্বরপ্রণিধান বলে। এরূপ অবস্থায় যোগী স্বস্থ হন, অর্থাৎ তাঁর আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে।

আসন : মনঃসংযোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গি বা অভ্যাসকে বলা হয় আসন। আসন প্রসঙ্গে যোগসূত্রকার বলেছেন, 'স্থিরসুখমাসনম্' অর্থাৎ স্থির ও সুখদায়ক উপবেসন-ই আসন। আসন-এর অনুশীলনে দেহের নিয়ন্ত্রণ ও মনের একাগ্রতা সাধন সম্ভব হয়। যোগ শাস্ত্রে পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন,

স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, ময়ূরাসন ইত্যাদি শারীরিক আসনের উল্লেখ রয়েছে।

৪) প্রাণায়াম : বিশেষ নিয়মে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করার প্রক্রিয়া হল প্রাণায়াম। ব্যক্তির প্রাণবায়ুর শ্বাসরূপ অন্তর্মুখী গতি এবং প্রশ্বাসরূপ বহির্মুখী গতি একটি নির্দিষ্ট ছন্দে বিরামহীনভাবে চলে। এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে চিন্তা অন্তর্মুখী হয় এবং দীর্ঘসময়ব্যাপী আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকা যায়।

৫) প্রত্যাহার : ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে অন্তর্মুখী করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রত্যাহার। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলি যে পর্যন্ত তাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে পর্যন্ত মন চঞ্চল থাকে। তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ানুরাগ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যাহার সাধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৬) ধারণা : যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোনো একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারেনা, সে সাধনার উচ্চতর স্তরে উঠতে পারেনা। তাই এই দর্শনে ধারণাকে একটি সাধন মার্গ হিসাবে গুরুত্ব দওেয়া হয়েছে। কোনো বিষয়ে দীর্ঘ সময় মনোনিবেশ করাকে বলা হয়েছে ধারণা। নাভি, হৃদয়, বক্ষ, কণ্ঠ, তালু নাসিকাগ্র, নেত্র, ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ বা দেবদেবীর মূর্তির মতো কোনো বাহ্যবস্তু ধারণার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭) ধ্যান : কোনো বিষয়ে বিরামহীন নিবিষ্ট চিন্তা করাকে যোগদর্শনে ধ্যান বলা হয়। ধ্যানস্থ অবস্থায় ধ্যানের বিষয়বস্তুর, অংশগুলি সম্পর্কে এবং সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়।

৮) সমাধি : যোগ সাধনার সর্বশেষ পর্যায় হল সমাধি, এটি এমন একটি অবস্থা, যখন মন বিষয়বস্তুতে এতই নিবিষ্ট চিত্ত হয় যে চিন্তার বিষয় ব্যক্তির চৈতন্যকে সম্পূর্নভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অবস্থায় ব্যক্তিসত্তা আত্মময় হয়ে উঠে। এই অবস্থায় আত্মাই ধ্যানের কর্তা এবং বিষয় হয়ে উঠে। চিত্তবৃত্তি পরিপূর্ণভাবে নিরোধের জন্য এই সমাধি একান্তভাবে প্রয়োজন।

যোগদর্শনে উল্লিখিত এই অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে দ্বিবিধ সাধন রয়েছে, বহিঃরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার - এই পাঁচটি বহিঃরঙ্গ। যোগসূত্রকার এগুলিকে সাধনপাদে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ, যা একত্রে সংযম নামে খ্যাত, সেগুলিকে বিভূতিপাদে উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক শিক্ষায় যোগ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Yoga Darshan in Modern Education):

যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, অজ্ঞানতাই মানুষের দুঃখের মূল কারণ। মানুষের এই দুঃখ দূর করার উপায় হিসাবে যোগ দর্শনে কিছু ব্যবহারিক কৌশল অবলম্বন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থে যোগ দর্শনকে এক প্রকারের ব্যবহারিক দর্শনও বলা যায়। জীবনের দুঃখ মোচন করে মুক্তিলাভের জন্য মানুষের কি কি করণীয় এবং কি উপায়ে সেগুলি করতে হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কার্যকরী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যোগ

দর্শনে অর্থাৎ ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ সাধন, যোগ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাই বলা যায় উদ্দেশ্যগত দিক থেকে যোগ দর্শন এবং শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান। কারণ ব্যক্তিকল্যাণ সাধন করাও আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য।

যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তির পাঁচটি স্বাভাবিক স্তরের কথা উল্লেখ করা হয় যেগুলি আত্মার বিকাশ ঘটায় এবং এই স্তরগুলির মধ্যদিয়েই মানুষকে অগ্রসর হতে হয়। এই স্তরগুলি মনুষ্যজীবনে পর্যায়ক্রমে আসে। আধুনিক শিক্ষা, যে মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানেও ব্যক্তি জীবনের বিকাশের কতগুলি ধারাবাহিক স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্তর বিভাগগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হয়।

যোগসাধনায় যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও আধুনিক শিক্ষায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি যে মনঃসংযোগের সহায়ক একথা আধুনিক শিক্ষাবদিগণও স্বীকার করেন। অপরদিকে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের মতো যোগগুলিও যে শিক্ষার্থীর মধ্যে মনঃসংযোগের প্রস্তুতি আনে, সেকথাও আধুনিক শিক্ষায় পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করা। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যও যোগদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির অনুশীলনকে আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, আধুনিক শিক্ষার অনেকগুলি নীতিই যোগ দর্শনের নীতির দ্বারা প্রভাবিত এবং আধুনিক শিক্ষার বহু কৌশল, যোগসাধনার কৌশলগুলিরই বিকল্পরূপ।

উপসংহার (Conclution) :

সাংখ্য দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসাবে মূলত যোগ দর্শনের উদ্ভব। তত্ত্বগতভাবে যোগদর্শনের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি উঠলেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ বা উপলব্ধি করার জন্য যোগদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম বলে গণ্য করা হয়।

চতুর্থ একক: ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ

(Idealism, Naturalism, Pragmatism)

পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Concept about Western Philosophy):

যে শাস্ত্র সমগ্রভাবে জগৎ ও জীবনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা ও তার মূল্যায়ন করেন তাকে দর্শন নামে চিহ্নিত করা হয়। দর্শন নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন যেপরমতত্ত্বই দর্শনের জ্ঞানের প্রধান বিষয় আবার কারও মতে বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলির যুক্তিসিদ্ধ আলোচনাই দর্শনের কাজ। পূর্ববর্তী এককে দর্শন সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হওয়া গেছে। এই এককে পাশ্চাত্য দর্শন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদ ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবদান আলোচনা করা হবে।

পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রা শুরু গ্রীক দর্শন থেকে। এই সময়টি কৃষ্টির ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের পেছনে আছে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ইতিহাস। গ্রীক বণিকগণ বাণিজ্যের মাধ্যমেই এই প্রাচীন ও বিখ্যাত কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। তারপর এই সুপ্রাচীন সভ্যতা থেকে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মেধাবী গ্রীক জনগণ শিক্ষা লাভ করেছিল এবং তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিতও হয়েছিল। এই ভাববিনিময়ের ফলে গ্রীক দর্শনের সবচেয়ে পুরোনো শাখা আয়োনীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এই আয়োনীয় দার্শনিকগণই পাশ্চাত্য দর্শনকে বিকশিত হবার পথ প্রস্তুত করলেন।

এরপর যিনি বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করলেন তিনি হলেন বিখ্যাত দার্শনিক ও সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস। তিনি বললেন জড় জগৎ মূলতত্ত্ব নয়, তার কোনো সূক্ষ্ম রূপও নেই। মূলতত্ত্ব আকৃতি নির্ভর এবং সংখ্যা দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায়। এইভাবেই জ্যামিতি ও গণিতের প্রচলন হল। তাঁর সম্প্রদায় প্রথম বলেছিলেন পৃথিবী একটি গ্রহ। কপারনিকাস (Copernicus) এই পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই প্রথম তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা গঠন করেন।

এর পরের পর্যায়ে যারা দর্শনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন তারা হলেন ‘Eleatics’। এদের বাস ছিল দক্ষিন ইতালির Elea নামক একটি শহরে, তাই এরা Eleatics নামে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে জেনোফেনস, জেনো প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তাদের দর্শনে যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয় সংবেদনের থেকে উচ্চস্থান পেয়েছে।

এরপর এলেন দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে হেরাক্লিটাস এবং ডেমোক্রিটাসের নাম উল্লেখযোগ্য। হেরাক্লিটাস আগুনকে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উপাদান রূপে গ্রহণ করলেন এবং তিনি বললেন আগুনের মতোই সবকিছু পরিবর্তনশীল। আগুন যেমন জ্বলে তেমন নেভে, তেমনি জীবন জগৎ কোনো কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। ডেমোক্রিটাস গ্রীক দর্শনকে উপহার দিলেন তার পরমানুবাদ। অ্যানাস্কাগোরাস ও বস্তুবাদী ছিলেন। তিনিও মনে করতেন সৃষ্টি ও ধ্বংস বলে কিছু নেই - সব উপাদানগুলিই থাকে, শুধু তাদের মিশ্রণ ও বিমিশ্রণ

হল সৃষ্টি ও ধ্বংসের মূল কারণ।

এরপরে সোফিস্ঠ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান। এই সম্প্রদায়ের জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল প্রবল। এরা জ্ঞান আহরণ করতেন ও বিতরণ করতেন। তাঁরা বলতেন মানুষ সমস্ত কিছুর তৌলদণ্ড। (Man is the measure of all things.)

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে সেই সময়ে সকলে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলতেন জ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ গুণ (Knowledge is the greatest virtue.)। এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বিচার বিশ্লেষণ, তীক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রযত্ন। তিনি মানুষকে অনন্ত গুণের অধিকারি বলে মনে করেন। সুপ্তগুণের বিকাশ প্রক্রিয়াই তাঁর কাছে ছিল শিক্ষাপ্রক্রিয়া।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো (Plato) আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে আদর্শ মানুষ তৈরি করতে চাইলেন। তার পরিকল্পনায় সমাজ রাষ্ট্রের পুরোধা হবে একজন দার্শনিক যিনি সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার্থক্য বুঝবেন। তিনি জ্ঞানলাভের জন্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের চেয়ে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির উপর বেশী জোর দিয়েছেন।

প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল তার গুরুর দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনকে অধিবিদ্যার অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর অভিমত হল - দর্শন হল এমন এক বিজ্ঞান যা সত্তা কে সত্তা হিসাবে পর্যালোচনা করে - সত্তাকে বিশুদ্ধ সত্তা হিসাবে দেখে, সত্তার বিভিন্ন আংশিক দিক নিয়ে আলোচনা করে না। দর্শন হল সত্তার স্বরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনার শাস্ত্র। পরবর্তী পর্যায়ে ইমানুয়েল কান্ট, হার্বার্ট স্পেন্সার, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আলফ্রেড জুলেস এয়ার, কারনাপ প্রভৃতি দার্শনিকদের আলোচনায় পাশ্চাত্য দর্শন আরও বিকশিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্ভবের পটভূমি সম্পূর্ণ পৃথক। তাই তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় দর্শন একই সঙ্গে একটি আলোচনা শাস্ত্র এবং জীবনমন্ত্রও বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন প্রথম থেকে একটি আলোচনা শাস্ত্র মাত্র। সত্যের বিচার বিশ্লেষণ এবং যুক্তি নির্ভর তত্ত্ব নির্ধারণকেই পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দর্শন সবক্ষেত্রেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত। পাশ্চাত্য দর্শন ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চরম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তা যুক্ত হয়েছিল, জীবনের বাহ্যিক দিকগুলির সঙ্গে। তাই পাশ্চাত্য দর্শনগুলির সঙ্গে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যায়। সংগঠিত প্রথাগত শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিকাশ সমকালীন হওয়ায়, স্বাভাবিকভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব শিক্ষার উপর অনেক বেশি পড়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনের কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করলে, আধুনিক শিক্ষাকে কিভাবে সেগুলি প্রভাবিত করেছে, তা সহজে উপলব্ধি করা যাবে। এই এককে মূলত পাশ্চাত্য দর্শনের অন্তর্গত ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ এবং প্রয়োগবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভাববাদ (Idealism)

ভূমিকা (Introduction):

ভাববাদ হল দর্শনশাস্ত্রের প্রাচীনতম শাখা। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে গ্রীক দার্শনিক অ্যানাস্কাগোরাস (Anaxagoras) -এর মতবাদে প্রথম ভাববাদের সূত্রপাত হয়। অ্যানাস্কাগোরাস জগৎ প্রক্রিয়ার মূলে একটি সক্রিয় শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই সক্রিয় শক্তিই তাঁর মতে চেতনা বুদ্ধি বা মন - যার নাম তিনি দিয়েছেন 'Nousi'। জগতের শৃঙ্খলা, ঐক্য, সৌন্দর্য এবং সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করেই তিনি ধারণা করেছিলেন যে, নির্বুদ্ধি জাগতিক শক্তিকে দিয়ে এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাবেনা। এই জগৎ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর পরে প্রাচীন দার্শনিক প্লেটোর বিশ্বজনীন সত্য বা ধ্যানধারণার অধিবিদ্যামূলক তত্ত্বের (Metaphysical Theory) মধ্যে ভাববাদকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে ভাবের জগতে বিভিন্ন শ্রেনির ধারণা আছে। সর্বোচ্চ ধারণা হল শিব অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গালের ধারণা (Idea of Good)। প্লেটোর মতে এই ধারণা গুলিকে জানা এবং এই ধারণা গুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে জানাই হল দর্শনের কাজ।

এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বা মানুষের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী। ভাববাদ বিশ্বাস করে মানুষ হল সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। তাদের কাছে মানুষ ও তার আত্মা বা সত্ত্বা; বস্তু ও দেহের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা মানুষ এবং এই সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একই ভাবমূলক বা আধ্যাত্মিক সত্ত্বার অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই মতানুযায়ী ভাবজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎই প্রকৃত সত্য। বস্তুজগৎ মায়া মাত্র। আধ্যাত্মিক জগতের অধিকারী হলেন সর্বজনীন মনের অধিকারী ঈশ্বর। মানুষের মন, এই সর্বজনীন মনের অংশ মাত্র। তাই মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হবে, ঐ সর্বজনীন মনের অধিকারী ঈশ্বর বা পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করা।

ভাববাদী দার্শনিকরা আরও বলেছেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেমন পরম সত্য, তেমনি জীবনের মূল্যবোধগুলিও চিরন্তন সত্য, তাদের মতে মূল্যবোধগুলি পূর্বনির্ধারিত, চূড়ান্ত, চিরকালীন ও অপরিবর্তনীয়। জীবনের মূল্যবোধগুলি নতুন করে সৃষ্টি করা যায়না বা সময়ের ব্যবধানে সেগুলিকে কোনো সময়েই অপ্রয়োজনীয় বলে ভাবা যায় না। ঈশ্বর উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই, এই মূল্যবোধগুলিকে উপলব্ধি করা যায়, আর এই ঈশ্বর উপলব্ধি কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই সম্ভব। কারণ মানুষই জগতে শ্রেষ্ঠ জীব। তার মনে তাই স্রষ্টাকে জানা বা উপলব্ধি করার প্রেরণা স্বভাবজ। মনোবিদ রস্ এর মতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব হল সর্বোত্তম মূল্যবান এবং তা ঈশ্বরের মহত্তম কর্মের নিদর্শন। (Ross- Human personality is the supreme and constitutes the noblest work of God.) সত্য, সৌন্দর্য ও সাধুতা ইত্যাদি উচ্চতর মূল্যবোধগুলির উপলব্ধি হল জীবনের লক্ষ্য। সক্রেটিস, প্লেটো, ইমানুয়েল কান্ট, ফ্রেডরিক হেগেল, ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল, স্বামীবিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি চিন্তাবিদগণ এই দার্শনিক মতবাদকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে গেছেন।

শিক্ষায় ভাববাদ (Idealism in Education):

ভাববাদের প্রবক্তা হিসাবে প্রাচীন দার্শনিক সক্রেটিস বা প্লেটোর নাম উল্লেখ করা হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এই দার্শনিক মতবাদের প্রয়োগ করেন প্রথম কমিনিয়াস (Cominius)। কমিনিয়াসের এই প্রয়োগিক ধারণাকে পরবর্তীকালে পেস্তালৎসী, ফ্রয়েবেল, রাস্ক ইত্যাদি শিক্ষাবিদরা আরো বিস্তৃত করেন। ভাববাদ এই ধারণায় বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর সমস্ত ভালো জিনিসের পেছনেই একটি স্বর্গীয় শক্তি কাজ করে। শারীরিক বা প্রাক্ষোভিক সত্তার তুলনায় মানুষের যৌক্তিক সত্তাই শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যুক্তিবাদি সত্তাই সত্যের উদ্‌ঘাটনে সক্ষম। মূলত, মানুষ একটি আধ্যাত্মিক জীব এবং শুধু এই অধ্যাত্মবাদের দ্বারাই মানুষ পশুর থেকে পৃথক হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার এই আধ্যাত্মিক চেতনার পরম স্তরে উন্নীত হতে পারে। তাই তাদের কাছে শিক্ষা হল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করার প্রক্রিয়া। (Education is the process of attaining spirituality.) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাস্ক (Rusk) বলেছেন শিক্ষা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের গণ্ডিকে বিস্তৃত করে। শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেলও শিক্ষাকে, পরমাত্মাকে উপলব্ধির প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন ভাববাদী শিক্ষা দার্শনিকদের ধারণা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা জীবনের আদর্শগত দিকের কথা বিবেচনা করেছেন। ফলে শিক্ষায় ভাববাদ মূলত তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে পরবর্তীকালে ভাববাদী দার্শনিকরা তাদের এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকটা বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন এবং এর ফলে ভাববাদ তাই শিক্ষার বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করতে সম্ভবপর হয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education):

ভাববাদী দার্শনিকদের মতে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। তারা মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে দিব্যতার উন্মোচন ঘটা উচিত। এই বিশ্বজগৎ হচ্ছে ত্রুটিহীন শৃঙ্খলামন্ডিত চিন্তাপ্রণালীর প্রকাশ। কিছু সুনির্দিষ্ট অপরিহার্য নিয়ম এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করছে আর নিয়মগুলিকে উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য, মানুষের জীবনের বস্তু সামগ্রির তুলনায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুসামগ্রী মানুষকে তাৎক্ষণিক আনন্দ দিলেও তাকে চিরন্তন আনন্দের অধিকারী করে তুলতে পারেনা। বস্তুর বিনাশ আছে, তাই বস্তুসামগ্রী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের আনন্দও বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে ঈশ্বর হলেন চির-আনন্দময়। তাই ঈশ্বর উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিজীবনে চরম আনন্দ আসতে পারে। অন্যদিকে ব্যক্তি আত্মা, বিশ্ব আত্মারই অংশ। সুতরাং আত্মোপলব্ধির (Self-realisation) মাধ্যমেই বিশ্ব আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। ভাববাদের মতে এই আত্মোপলব্ধি হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

এছাড়াও ভাববাদী দার্শনিকরা তাদের এই মূল লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করে আরো কতকগুলি বিশেষধর্মী লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন যেমন তাঁরা বলেছেন, মানুষ যেহেতু আধ্যাত্মিক জীব, যেহেতু তার এই ভাবময় জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁদের মতে, মানুষের মধ্যে সমস্ত, সৎগুণই সুপ্ত অবস্থায় জন্মগতভাবে থাকে। তাদের সম্ভাবনাগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলা শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– শিক্ষা হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। (Swami Vivekananda-

Education is the manifestation of perfection already in man.) এমনিভাবে বিভিন্ন ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকদের দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষার লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার লক্ষ্য বস্তুকেন্দ্রিক নয়। শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং আত্মকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীর মধ্যে জীবনের উন্নত মূল্যবোধগুলি জাগ্রত করাই লক্ষ্য।

পাঠ্যক্রম (Curriculum):

ভাববাদ আধ্যাত্মিক ধারণা ও আদর্শের মধ্যে থেকে পাঠ্যক্রম গঠনের প্রতি দিক্ নির্দেশ করেছেন। তাঁরা পাঠ্যক্রমের ব্যবহারিক দিকের তুলনায় তাত্ত্বিক দিকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, মানুষের জীবনের উচ্চতম আর্দশ হল ঈশ্বরে সফলতা প্রাপ্তি। এর জন্য তিনি সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলির ক্রমাগত জাগরণ ঘটানোকেই পাঠ্যক্রমের আদর্শ বলেছেন, আবার শিক্ষার লক্ষ্য যেহেতু আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে সহায়তা করা তখন সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে পাঠ্যক্রমে এমন বিষয় রাখতে হবে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক, নান্দনিক ও মূল্যবোধগুলি জাগিয়ে তোলা যায়। বিভিন্ন ভাববাদী দার্শনিক শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য পাঠ্যক্রমে নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কাব্য, শিল্পকলা ইত্যাদির মাধ্যমে নান্দনিক কার্যাবলিকে রূপদানের কথা বলা হয়েছে এই দর্শনে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্ম সচেতনতা জাগ্রত করার জন্য ভাববাদ পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্যশিক্ষা, শারীর শিক্ষা এবং বিভিন্ন হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ উপযুক্ত স্বাস্থ্য ছাড়া আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না। তাই শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তুলতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, একজন আদর্শ মানুষ এবং একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি গঠনের দিকেই ভাববাদের প্রকৃত মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানব জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক অধিকারকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এই পাঠ শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ের গভীরে পৌঁছতে সহায়তা করে। বিভিন্ন বিষয়গুলিকে উপভোগ করতে, জীবনের বিশুদ্ধতার মূল্যায়ন করতে এবং জীবন ও বিশ্বের প্রতি একটি সুসম্বন্ধমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি (Methods of Teaching):

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাববাদ যে উচ্চ আদর্শ-এর নির্দেশ দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাববাদী দার্শনিক বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলেছেন। যেমন সক্রেটিস প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি-এর কথা বলেছেন। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক দ্বারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কৌশল হল প্রশ্ন করা ও আলোচনা করা। শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি যত বেশি করা হয় তত বেশি পঠিত বিষয়টির অর্থ ও গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের কাছে পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল হয়ে যায়। দার্শনিক প্লেটো আলোচনা ও বিতর্ক (Discussion and Debate Method) পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেছেন। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহ প্রদান করে। হাবার্ট স্পেনসার নির্দেশদান ও বক্তৃতা পদ্ধতি-এর (Instruction and Lecture Method) উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীদের একজন বন্ধু ও দার্শনিক। তাই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে

নির্দেশদানের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করবেন এবং বর্ণনামূলক উপস্থাপন দ্বারা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকৃত ঘটনা ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্যাবলি পরিবেশন করবেন। দার্শনিক ফ্রয়েবেল শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা (Spontaneous Self-activity) এবং খেলার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাববাদীগণ মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মোপলব্ধি-এর মধ্য দিয়েই সর্বজনীন আধ্যাত্মিক চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারে। আর এই আত্মোপলব্ধি কখনও আরোপিত হয় না। এর জন্য আত্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভর করতে হয়।

শিক্ষক (Teacher):

ভাববাদ-এ শিক্ষককে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নতি হয়েছে, তিনিই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। প্রত্যেক শিক্ষক জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধগুলির অধিকারী হবেন। তিনি তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবেন অর্থাৎ শিক্ষকের কাজ জ্ঞান বিতরণ করা নয়; শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অভিজ্ঞতায় শিক্ষকের ব্যক্তিত্বই হল একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। তাঁর মুখ নিঃসৃত হয়েই বিষয়বস্তু, শিক্ষর্থীর কাছে উপস্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষক বাস্তবতাকে মূর্ত করে তোলেন। শিক্ষকই হলেন গুরু। প্রভাবশালী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে অবশ্যই অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, শিক্ষাদানের প্রত্যেকটি কৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। নিজস্ব ব্যবহার ও আচরণের উচ্চ মানদণ্ডের দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব জীবধর্ম অনুযায়ী সত্যের অনুসন্ধানে স্বত:স্ফূর্তভাবে নিয়োজিত থাকবে। শিক্ষকের কাজ হবে, তাদের সেই অনুসন্ধানে সহায়তা করা। ঋষি অরবিন্দ (Rishi Aurubindo) শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা ভাববাদী চিন্তাধারাকে পরিস্ফুট করেছে। তিনি বলেছেন– The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or task master, he is a helper and guide.

শিক্ষালয় (School):

ভাববাদ অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মান্ডের মূলে যে সার্বজনীন আধ্যাত্মিক সত্তা বিরাজমান, তাঁকে উপলব্ধি করাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। সুতরাং সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে, শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে বিশেষত্ব আনা একান্তভাবে প্রয়োজন। ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, সর্বজনীন আধ্যাত্মিক সত্ত্বার মাধ্যমেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ঐক্য বিরাজ করছে। সেই ঐক্যকে যদি হৃদয়ে উপলব্ধি করতে হয় তবে শিক্ষা পরিবেশে বা শিক্ষালয়ের জীবনে সেই ঐক্যের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে অর্থাৎ আদর্শ শিক্ষালয় হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ যেখানে ব্যক্তি, সমাজ, বিশ্বপ্রকৃতি সবকিছুই বর্তমান। এই ধরনের শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা জীবনযাপনের মধ্যে দিয়েই নিজের আধ্যাত্মিক সত্তাকে উপলব্ধি করবে, অন্যান্য সহপাঠীদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকে উপলব্ধি করবে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে বিশ্ব-আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবে।

শৃঙ্খলা (Discipline):

ভাববাদ এই ধারণায় বিশ্বাস করে যে, শৃঙ্খলা ও আত্মসংযমের বশীভূত না হলে, শিক্ষার্থীরা কিছুতে তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্ভাবনাগুলিকে উপলব্ধি করতে পারবে না। আত্মোপলব্ধির প্রয়াসে আত্মশৃঙ্খলা

একান্তভাবে প্রয়োজন। আচরণবিধির যে আদর্শ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হবে। তা শিক্ষার্থীদের সমস্ত কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ভাববাদীরা বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলার কথা ভাবা হচ্ছে তা হবে অন্তঃজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তায় চিন্তায় বা স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় কোনো বাধাদানের প্রচেষ্টা থাকবে না, সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা বজায় থাকবে। তবে স্বাধীনতাকে কিছু অনুমোদন করলেও কঠোর শৃঙ্খলাতেই ভাববাদ বিশ্বাস করে। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই নিয়ম নীতির বশ্যতা স্বীকার করবে। কঠিন ও কঠোর নিয়মাবর্তী জীবনযাপনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা জীবনের উচ্চমূল্যবোধগুলি যথা সহানুভূতি, সহযোগিতা, দায়িত্ব, সচেতনতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে।

সীমাবদ্ধতা (Limitation):

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদ- এর মূল্যায়ন করতে গেলে মূলত বলতে হয়, এই চিন্তাধারার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সম্পর্ক অনেক কম, বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও বর্তমান শিক্ষাধারার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। শিক্ষার পাঠ্যক্রম-এ বিজ্ঞান ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয় সমূহের অনুশীলনকে অবহেলা করা হয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ভাববাদ-এর আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্বাসকে সমর্থন করে না। প্রাণ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ বা মহাকাশ বিজ্ঞানের বস্তুগত জগৎকে কখনোই অতীন্দ্রিয়বাদ বিষয়গত অনুভূতি সম্বলিত ভাববাদ-এর তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা যায় না। ভাববাদে ব্যবহৃত বহু শব্দ বা ধারণা আছে, যাকে সহজ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, যেমন- আত্মা, মন, সত্তা ইত্যাদি। এখানে শিক্ষকের উপর পরোক্ষভাবে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ আত্মজ্ঞান লাভ ও সেই জ্ঞানকে সর্বজনীন জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের কাজ কেবল অপরিণত শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নির্ভর হয়ে পড়তে হয়। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভাববাদী দার্শনিকরা যে মতবাদ প্রচার করেছেন, তা আদর্শগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হলেও বাস্তবে তা চরিতার্থ করা খুবই মুশকিল। আদর্শ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যক্তিকে উন্নতমূল্যবোধের অধিকারী করে তোলা শিক্ষার দায়িত্ব হওয়া উচিৎ কিন্তু এই আদর্শ এতই সুদূর প্রসারী যে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমিত কার্যাবলির দ্বারা সেই আদর্শকে চরিতার্থ করা যায় না। ফলে শিক্ষার এই লক্ষ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে কর্ম প্রেরণা সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়। তাই আদর্শগত দিক থেকে ভাববাদ-এর মধ্যে ত্রুটি না থাকলেও বাস্তবতার বিচারে তার মূল্য তুলনামূলকভাবে কম। সমালোচকদের মতে ভাববাদ মূলত বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল, এটি শাশ্বত ও স্থির নীতি মেনে চলে। জীবনের বাস্তবতাকে এই দর্শন-এ অবহেলা করা হয় না। জ্ঞানের উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ, শিক্ষাকে পুস্তক কেন্দ্রিক ও বাস্তব জীবন বিমুখ, শৃঙ্খলার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান — কখনোই কোনো শিক্ষাদর্শন-এর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হতে পারে না।

উপসংহার (Conclusion):

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গাসুন্দর করে তোলার প্রয়াসে ভাববাদ যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠা করেছে তা ব্যক্তিকে আদর্শ জীবনবোধ ও সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভাববাদী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত শিক্ষা বিশ্ব-মানবাত্মার প্রকৃতি উপলব্ধিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে।

প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

ভূমিকা (Introduction):

ভাববাদ এর মত প্রকৃতিবাদও এক ধরনের দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতিই পরম সত্য। প্রকৃতির মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে; প্রকৃতিই সকল দার্শনিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ প্রাণিজগতের নিয়মকেও প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তারা মনে করেন মানুষও বস্তু জগতেরই অংশ অর্থাৎ প্রকৃতিবাদীগণ বিশ্বজগতের স্বরূপ, পরিবর্তন এবং ঘটমান অবস্থা ইত্যাদি সবকিছুকেই নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন।

এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ প্রকৃতিকে তিন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে তিন ধরনের প্রকৃতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। একদল চিন্তাবিদ প্রকৃতি বলতে জড় প্রকৃতিকে বোঝান। তাঁরা মনে করেন মানুষের জীবন জড় জগতের নিয়ম দ্বারাই পরিচালিত হয় কারণ মানুষ জড় প্রকৃতিরই অংশবিশেষ অর্থাৎ মানুষের জীবনের সবকিছু বৈশিষ্ট্যকে ভৌত বিজ্ঞানের (Physical Science) নিয়মাবলির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। এই মতবাদকে জড় প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদ (Physical Naturalism or Materialism) বলা হয়ে থাকে।

অপর একদল দার্শনিক মানুষকে যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করেন, মানুষের আত্মা বা আধ্যাত্মিক সত্তা বলে কিছু নেই। বস্তুজগতে বা জড় জগতে বিভিন্ন সামগ্রী যেমন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে। সুতারাং সবকিছুকেই যন্ত্র জগতের নিয়মাবলির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ (Mechanical Naturalism)।

আর এক মতবাদে বলা হয়েছে মানুষ এক সাধারন জৈবিক সত্তা (Biological Enity)। একই জৈবিক সত্তা অভিব্যাক্তির উন্নত স্তরে এসে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের প্রকৃতির সুষ্ঠ ব্যাখ্যা করতে হলে অভিব্যক্তির নিম্নস্তরের প্রাণির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য যে নিয়ামবলি আছে সেগুলিকেই প্রয়োগ করতে হবে। এই মতবাদকে বলা হয় জৈবিক প্রকৃতিবাদ (Biological Naturalism)।

কয়েকজন বিখ্যাত প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হলেন - এরিস্টটল (Aristotle), ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon), জ্যাঁ জ্যাকুইস রুঁশো (Jean Jaques Roussean), এলদোস লিওনার্ড হাক্সলি (Aldous Leonard Huxley), হার্বার্ট স্পেনার (Herbert Spencer) প্রমুখ।

প্রকৃতবাদী শিক্ষাদর্শন (Naturalism in Education):

অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের মতো প্রকৃতিবাদও শিক্ষাকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা যখন কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তখনই প্রকৃতিবাদ মুক্তির নিশান দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে শৃঙ্খলামুক্ত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল। প্রকৃতিবাদ শিক্ষা প্রক্রিয়াকে শিশুকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত

করতে চেয়েছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নয়। শিক্ষা হল শিশুর স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়া। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে, আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষাবিদগণের চিন্তাকে প্রকৃতিবাদ বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করেছে।

শিক্ষার নীতি (Principles of Education):

প্রকৃতিবাদী দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে কতগুলি নীতি নির্ধারণ করেছেন সেগুলি হল -

(১) প্রকৃতি অনুসরণ (Follow Nature) : প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুঁশোর মতানুযায়ী শিক্ষার কাজ শুধুমাত্র শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে তোলা নয়, তার প্রকৃতিগত দক্ষতা ও সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটানোই হল শিক্ষার আসল লক্ষ্য। প্রকৃতিই হল শিশুর আদর্শ শিক্ষক। তাই বিদ্যালয়গুলিতে কৃত্রিম পরিবেশের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর জোড় দিতে হবে।

(২) আত্মশিখন (Self Learning) : প্রত্যেক শিশুকে প্রকৃতি থেকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনের সুযোগ করে দিতে হবে। বইয়ের তত্ত্বগত জ্ঞান এখানে গৌণ ভূমিকা পালন করবে।

(৩) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centred Education): জন এডাম্‌স্ (John Adams) প্রথম শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন। যে কোনো শিখন প্রক্রিয়ার শিশুই মূল কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষক এখানে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

(৪) শিক্ষার প্রগতিশীল ধারণা (Progressive Manner of Education) : শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে পাঠ্যক্রমকেও গতিশীল হতে হবে। শিশুর জীবন বিকাশের স্তর (শৈশব, বাল্য, কৈশোর) অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকেও শিশুর সাধারণ বয়স এবং মানসিক বয়সের স্তর অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।

(৫) শিশুর সম্পূর্ন স্বাধীনতা (Complete Freedom of the Child) : প্রকৃতিবাদীদের মতে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে তাকে সম্পূর্ন স্বাধীনতা দিতে হবে। বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে তাকে বেঁধে না রেখে পর্যবেক্ষন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার সম্পূর্ন সুযোগ করে দিতে হবে।

(৬) ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ (Training of Senses) : ইন্দ্রিয়ই হল আমাদের জ্ঞান অর্জনের প্রধান উপায়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সঠিক ও বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায়। তাই এমনভাবে ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে শিশু প্রকৃতিগতভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

(৭) বস্তুধর্মী শিক্ষা (Materialistic Education): সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের জন্য বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান খুবই জরুরী। তাই প্রকৃতিবাদীরা আধ্যাত্মিক শিক্ষার পরিবর্তে বস্তুধর্মী শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোড় দিয়েছেন। শিশুরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সৃষ্টির মাধ্যমে বস্তুধর্মী জ্ঞান লাভ করবে।

(৮) নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education): প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুঁশো নেতিবাচক শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যে শিক্ষা সরাসরি জ্ঞানদানের পূর্বে জ্ঞান আহরণের উপকরণগুলিকে বা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে পরিমার্জন করে জ্ঞান গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করে, তাই হল নেতিবাচক শিক্ষা, এর বৈশিষ্ট্য হল ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জন এবং যুক্তিশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ করে শিক্ষাদান।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education):

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মতে শিক্ষার কোনো সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ। এর কারণ হল প্রকৃতি যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যের কথা বলেছেন। জৈবিক প্রকৃতিবাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা, জড় প্রকৃতিবাদীদের মতে শিশুকে পরিপূর্ণ ও আনন্দদায়ক জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। অনেকে বলেছেন শিশুকে তার জীবন পরিবেশের সঙ্গো সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যার থমাস পার্শিনান বলেছেন– প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জীবনের পরিপূর্ণতা আনা। (Sir Thomas Percy Nunn- The proper goal of human life is perfection of the invidual.) তাই শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করা। কোনো চিন্তাবিদ বলেন - শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুকে তার আত্মশিখন (Self-learning) এবং আত্মপ্রকাশে (Self-expression) সহায়তা করা। প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের প্রস্তাবিত শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় একটি কথাই বলতে চেয়েছেন, তাঁদের মতে শিশুকে তার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশে সহায়তা করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। আর তাঁরা মনে করেন এই বিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবে শিশু আনন্দময় জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। মানুষের জীবনের বস্তুগত চাহিদা পরিতৃপ্তির মাধ্যমেই আনন্দ আসে। তাই প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন শিক্ষা মানুষের বস্তুগত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যক্রম (Curriculum) :

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকরা শিশুর উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা মনে করতেন, প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব দাবী ও ক্ষমতা আছে তাঁর পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার। তাই শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে বিষয় নির্বাচন করার জন্য। চরম প্রকৃতিবাদী হার্বার্ট স্পেনসারের মতে মানুষের প্রকৃতি মূলতঃ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক এবং জীবনের সর্বপ্রধান ধর্ম হল আত্মসংরক্ষণ (Self -preservation)। তাই তিনি পাঠ্যক্রমে এমন সব বিষয় সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন যা আত্মসংরক্ষণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। প্রত্যেক শিশু তার চাহিদা অনুযায়ী প্রকৃতির কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে বা শিখবে। তাকে কোনো পাঠ্যক্রম অনুশীলন করতে বাধ্য করা হবেনা। প্রকৃতিবাদী দার্শনিকরা পরবর্তীকালে পাঠ্যক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিকাশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁরা মনে করেন মানুষকে বস্তুগত আনন্দ দিতে হলে জীবনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে। তাঁদের মতে শিক্ষার পাঠ্যক্রম হবে বিস্তৃত এবং তার মধ্যে বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রাধান্য পাবে। শিশুর চাহিদার কথা চিন্তা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন -

(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান : এর মধ্যে থাকবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি। এই বিজ্ঞানগুলি শিশুকে প্রকৃতিকে জানতে সাহায্য করবে।

(২) গণিত ও ভাষা : প্রকৃতিবাদীরা গণিত, ভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। টি. এইচ. হাক্সলির মতে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে।

(৩) ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা : যে কোনো আধুনিক জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হলে তার বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করা উচিত। ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা শিশুকে মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনা বিকাশের ধারাটি অনুশীলন করতে সহায়তা করবে এবং বর্তমান জীবনে তাদের তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করবে।

(৪) কৃষিকাজ ও কারুশিল্প : এই বিষয়গুলি শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেবে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

(৫) শরীর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা : প্রকৃতিবাদীরা আত্মসংরক্ষণের জন্য শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, তাঁরা বলেছেন শিশুকে স্বাভাবিক পরিবেশে অঙ্গ সঞ্চালনের সুযোগ দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রকৃতির কাছ থেকেই আত্মরক্ষার কৌশল শিখবে এবং নিজেদেরকে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ করবে।

(৬) অংকন : প্রকৃতিবাদীরা অংকনকে শিশুর আত্মপ্রকাশনার প্রধান কৌশল হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাই অংকনকে পাঠ্যক্রমে আবশ্যক কাজ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

(৭) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা : প্রকৃতিবাদীরা বলেছেন, শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেদের ধর্ম নির্ধারণ করবে। আর নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে তারা বলেছেন, শিশুর উপর জোড় করে নীতিবোধ চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। তারা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করে, নিজেদের নৈতিক মান গড়ে তুলবে।

প্রকৃতিবাদী ধারণায় পাঠ্যক্রম সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, তারা পাঠ্যক্রমকে কয়েকটি নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বা পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, অনেক বেশী বিস্তৃত ও বাস্তবসম্মত করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Methods of Teaching):

প্রকৃতিবাদ-এর দার্শনিকদের মতে শিশু আত্মসক্রিয়তায় শিক্ষা লাভ করবে। প্রকৃতিবাদের মুখ্য প্রবক্তা রুঁশো বলেছেন– Give your Pupil no Verbal lesson. ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning through Senses), হাতে কলমে কাজ করে শিক্ষা (Learning by Doing), খেলাচ্ছলে শিক্ষা (Play Way Education) এগুলি হল প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মূলমন্ত্র অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী যে পদ্ধতি শিশুকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, তা কখনই আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি হতে পারেনা। শিশু তার চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখবে। এই কারণে প্রকৃতিবাদীরা পদ্ধতি বলতে মূলত পরিবেশ রচনা করার কথা বলেছেন। বিদ্যালয় পরিবেশকে তারা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করার কথা বলেছেন এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন– গ্রন্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে মূর্ত জিনিসের সাহায্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ-এর উপর তারা জোড় দিয়েছেন।

শিক্ষক (Teacher):

প্রকৃতিবাদ-এ শিক্ষকের উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। প্রকৃতিবাদীরা বলেছেন, শিক্ষকের কাজ জ্ঞান বিতরণ করা নয়, তাঁর কাজ হবে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা যার মধ্যে শিশু স্বাধীনভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে। শিক্ষকের ভূমিকা হবে পর্যবেক্ষকের। তিনি শিশুদের কর্মপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করবেন তিনি - শিশুদের শাসন করবেন না। শিশুরা প্রকৃতির দ্বারাই শাসিত হবে।

শৃঙ্খলা (Discipline) :

শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যাপারে, প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদার্শনিকগণ মুক্তশৃঙ্খলা (Free Discipline) বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাকে (Spontaneous Discipline) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, অবদমন বা শাস্তির মাধ্যমে যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তা শিক্ষার্থীদের মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; এই ধরনের শৃঙ্খলা প্রকৃত শৃঙ্খলা নয়। এই প্রসঙ্গে প্রকৃতিবাদীগণ এক নীতির প্রস্তাব করেছেন, যাকে বলা হয়, কৃত কর্মের স্বাভাবিক ফলের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা। এভাবে কর্মফলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রন করার সুযোগ করে দেওয়াই হবে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রধান উপায়।

সীমাবদ্ধতা (Limitation) :

শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ন দর্শন হিসাবে প্রকৃতিবাদ অবশ্যই অপর্যাপ্ত। এটি সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগে বা প্রক্ষোভের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবং জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গুলিকে অস্বীকার করে। প্রকৃতিবাদ, জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। এটি একটি বিপজ্জনক প্রয়াস কারণ স্বাধীনতা প্রায়শই যা খুশি করার অনুমোদনপত্রে পরিণত হয়। বস্তুতান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ, বাস্তবের একটি নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয় যার দ্বারা মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা উপেক্ষিত হয়। সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সামাজিক সমস্যা ও প্রয়োজনের দিক, বিশেষত সংরক্ষিত সামাজিক ঐতিহ্যের প্রবাহের দ্বারা এর উন্নতি ও ক্রমবিকাশের দিকটি এই দর্শনে উপেক্ষিত হয়, যদিও শিক্ষক উচ্চতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী তবুও শিক্ষককে এই দর্শন-এ যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। শিশুর শিক্ষায় তাকে একটি দ্বিতীয় সারির স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতিবাদ শিশুকে সম্পূর্নরূপে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার মধ্যে বেড়ে উঠতে দেয়, যা যথেষ্ট বিপজ্জনক। এটি শিশুর বর্তমান চাহিদাকেই দেখে এবং তার ভবিষ্যৎ চাহিদা ও মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে।

উপসংহার (Conclusion) :

উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী দর্শনের অবদান অসামান্য। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার (Child-centric Education) ধারণা মূলত প্রকৃতিবাদের অবদান। শিক্ষার মধ্যে যে প্রাণশক্তি রয়েছে, শিক্ষার সাথে জীবনের যে যোগসূত্র রয়েছে তাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে প্রকৃতিবাদ। ব্যক্তি জীবনের সমস্ত দিকের বিকাশের উপর প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। তাই বলা যায় প্রকৃতিবাদ প্রভাবে আধুনিক শিক্ষা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

প্রয়োগবাদ
(Pragmatism)

ভূমিকা (Introduction) :

দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে প্রয়োগবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি রচিত হয় চার্লস পিয়ার্স (Charles Sanders Peirce) কর্তৃক যাকে প্রয়োগবাদের জনক (Father of Pragmatism) বলে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীকালে আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্: ও জনডিউই এই দার্শনিক তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তারূপে পরিচিতি লাভ করে। প্রয়োগবাদ একটি আমেরিকান দর্শন। এটি আমেরিকার জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারাকেই প্রকাশ করে এবং আমেরিকার নিজস্ব জীবনাদর্শ এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমেরিকার জাতীয় চরিত্রই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে তার উপযোগিতার ভিত্তিতে বিচার করা। এই জাতীয় চরিত্রের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখেই প্রয়োগবাদের উদ্ভব।

'Pragmatism' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি গ্রীক্ শব্দ 'Pragma' যার অর্থ হল কর্ম (Action) এবং 'Pragmatikos' যার অর্থ হল উপযোগিতা (Utility) ক্ষেত্রে উদ্ভুত হয়েছে। প্রয়োগবাদী দর্শন পরীক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধান করতে গিয়ে মানুষ তার প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং তার ধারণাগুলিকে যাচাই করে সত্যকে উপলব্ধি করে। প্রয়োগবাদ এমন একটি দর্শন যা কর্মকে প্রাধান্য দেয়। প্রয়োগবাদ এমন একটি দর্শন যার মূলে রয়েছে বাস্তবমুখী কর্মপ্রক্রিয়া যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে উপযোগী অর্থাৎ প্রয়োগবাদের মূল কথা হল উপযোগিতা।

প্রয়োগবাদীদের মতে, এই পৃথিবীতে চিরস্থির বা চিরসত্য বলে কিছু নেই। সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল। প্রয়োগবাদ যে কোনো চিরস্থায়ী, চূড়ান্ত মূল্যবোধের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, অন্যান্য প্রচলিত মতবাদের থেকে এটি অনেকবেশী মানবিক কারণ, মানবজীবন ও মানবিক চাহিদার সঙ্গেই এটি সংযুক্ত। প্রয়োগবাদে 'ব্যক্তি' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই দর্শনের মূলনীতি হল যে, ব্যক্তি নিজেই নিজের মূল্যবোধগুলিকে সৃষ্টি করে। তাদের মতে মূল্যবোধ একই জায়গায় স্থির থাকেনা। মূল্যবোধ সদা পরিবর্তনশীল। প্রয়োগবাদীরা আরও বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির জীবনের বিকাশ পরিবেশের সঙ্গো সক্রিয় অভিযোজনের মাধ্যমে সাধিত হয়। তাই তারা মানুষের পরিবেশ ও তাকে রূপায়ণ করার শক্তির উপর জোড় দেন। ব্যক্তির সমস্যার সার্থক সমাধানের মাধ্যমেই নিজের জন্য প্রকৃত পরিবেশ তৈরি করে থাকে।

প্রয়োগবাদের তিনটি শাখা আছে। সেগুলি হল - মানবতাবাদী, পরীক্ষামূলক ও জীববৈজ্ঞানিক। মানবিক প্রয়োগবাদ সত্যকে ধারণ করে, যে সত্য মানব প্রকৃতি ও তার কল্যাণের পক্ষে সামাগ্রিকভাবে সন্তোষজনক। পরীক্ষামূলক প্রয়োগবাদ অনুযায়ী, সত্য হল যাকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়। পরিবেশের সঙ্গো মানুষের অভিযোজন এবং তাকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর উপরেই জীববৈজ্ঞানিক প্রয়োগবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তা হলেন উইলিয়াম জেমস্, জন ডিউই ও ফার্দিনান্দ শীলার। তাদের মতে, প্রয়োগবাদ হল দর্শনের একটি গতিশীল শাখা; বর্তমানে প্রয়োগবাদ শিক্ষাব্যবস্থাকে

প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। এটি একটি বাস্তব ও উপযোগী দর্শন। এটি শিক্ষকতা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যাবলিকেই প্রধান বলে ধরেছে। এটি বিদ্যালয়গুলিকে এক একটি ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপে পরিণত করেছে। প্রয়োগবাদ মানুষকে আশাবাদী, উৎসাহী ও কর্মক্ষম করে তোলে। এটি শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে।

শিক্ষায় প্রয়োগবাদ (Pragmatism in Education):

প্রয়োগবাদ আধুনিক শিক্ষানীতিকে নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্লেষণ করলে, প্রয়োগবাদী দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কটি বোঝা যাবে।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education):

প্রয়োগবাদী দর্শনে মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে। তাই প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার কোনোও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলেননি। প্রয়োগবাদী দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই এর মতে প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার শিক্ষার উদ্দেশ্য পৃথক হবে। তাই শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য বলে কিছুকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জীবনের নতুন নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শিশুকে সেইসব দৈহিক, মানসিক সামাজিক ও নৈতিক কর্মে নিয়োগ করা, যার মাধ্যমে তার জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। এই দর্শন অনুসারে মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল এবং প্রতিমুহূর্তেই মানুষকে নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এই নতুন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য। আবার আধুনিক প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাকে সামাজিক দিক থেকে উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই শিক্ষার্থীদের সামাজিক দিক থেকে উপযোগী করে গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। অতএব প্রয়োগবাদী দর্শনে শিক্ষার উদ্দেশ্যের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতা হতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করতে পারলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সার্থক হবে বলে প্রয়োগবাদীগণ বিশ্বাস করতেন।

পাঠ্যক্রম((Curriculam):

শিক্ষার লক্ষ্যের মতো প্রয়োগবাদীরা মনে করেন শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকা উচিত নয়। তারা বলেছেন এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়। সবই সাময়িক এবং পরিবর্তনশীল। শিশুর বিকাশের নানা স্তরে শিশুর বিভিন্ন চাহিদা, প্রবণতা, রুচি সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যক্রম বিন্যস্ত হবে, অর্থাৎ পাঠ্যক্রম হবে পরিবর্তনশীল ও নমনীয়। প্রয়োগবাদীরা পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে আরেকটি নীতির উপর বিশেষ জোড় দিয়েছেন সেটি হল উপযোগিতার নীতি। বিদ্যালয় অবশ্যই শিশুকে সেই অভিজ্ঞতা দেবে যেগুলি তার পক্ষে উপযোগী এবং পাঠ্যক্রমে সেই বিষয়গুলিই অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলি জ্ঞানোন্মেষ ঘটায় এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মপটুত্বের জন্ম দেয়, যেগুলি শিশুর পক্ষে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। যেমন ভাষা, স্বাস্থ্য, শারীরিক প্রশিক্ষণ, ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্তই বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন অভিজ্ঞতা বা পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুগুলিকে একটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হিসাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। দার্শনিক

জন ডিউই-র মতে শিক্ষার বিষয়বস্তু এমন হবে যাতে সেগুলি ছাত্রদের মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। আবার প্রয়োগবাদী দর্শনে বিদ্যালয়ের বিষয়গুলির পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে সামাজিক, স্বাধীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যাবলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কার্যাবলিগুলি শিশুর মধ্যে নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটায়, স্বাধীন ও উদ্যোগী প্রবণতার জন্ম দেয়, নাগরিকত্বের প্রশিক্ষণ দেয় এবং সুশৃঙ্খলা জাগিয়ে তোলে। তাই শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিশুর প্রয়োজন হল কার্যকারিতা সুতরাং পাঠ্যক্রম অবশ্যই কার্যাবলিকেন্দ্রিক হবে। এছাড়াও প্রয়োগবাদীরা পাঠ্যক্রমে আরও কতকগুলি নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন - সক্রিয়তা, বৃত্তিমুখীনতা, ব্যবহারযোগ্যতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, বৈচিত্র্যতা ইত্যাদি।

শিক্ষণপদ্ধতি (Methods of Teaching) :

শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ সক্রিয়তা, স্বাধীনতা, সমস্যা সমাধান ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন মানুষ তার কর্মের মধ্য দিয়েই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে, তাই তারা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর সেই চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয়তার নীতি নির্ধারণ করেছেন। সক্রিয়তাভিত্তিক (Activity Based) বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি যা বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সেগুলির মূলে আছে প্রয়োগবাদী নীতি। শিক্ষণের এই নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগবাদের প্রধান প্রবক্তা জন ডিউই তার সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method) প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে জন ডিউই-র শিষ্য ও অনুগামী উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক (William Hard Kilpatrick) সেই সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সংস্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক প্রজেক্ট পদ্ধতির সৃষ্টি করেছেন। এই প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসারে পাঠ্যবিষয় বা অর্জিত জ্ঞানকে বিভিন্ন সমস্যায় বিভক্ত করে ছাত্ররা যাতে আপন চেষ্টার দ্বারা সমস্যাগুলির সমাধান করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষক এখানে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project Method) :

শিক্ষার্থীদের সমস্যাভিত্তিক কর্মনির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়ে, সামাজিক উপযোগিতামূলক কর্মসম্পাদনে উৎসাহিত করে, স্বাভাবিক কর্মপরিস্থিতিতে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়, তাই হল প্রজেক্ট পদ্ধতি। প্রত্যেক প্রজেক্ট মানেই একটি সমস্যা। এখানে সমস্যা নির্বাচন করা হয় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। শিক্ষার্থীরা এখানে স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বাভাবিক পরিবেশে কাজ করে অর্থাৎ প্রজেক্ট পদ্ধতির মূল কথা হল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা এবং তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করা।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয় :

(১) **উদ্দেশ্যস্থাপন :** প্রথমত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতায় তাদের কাজটি ঠিক করবে এবং সঙ্গে সেই কাজ করলে কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে সে সম্পর্কেও তারা আলোচনা করবে।

(২) **পরিকল্পনা :** দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষক কর্মসম্পাদনের বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকরী পরিকল্পনা রচনা করবে।

(৩) **সম্পাদন :** এই স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিকল্পনা কাজে অগ্রসর হয় এবং কর্মসম্পাদন করে।

(৪) বিচারকরণ : সর্বশেষ স্তরে সমস্যার বা কাজটির ফলাফল বিচার করা হয়, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়েছিল তার পরিণতিতে কী ফললাভ হয়েছে বা তা কতটুকু সার্থক হয়েছে তা বিচার করে দেখা হয়।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রজেক্টকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় -

(১) সংগঠনমূলক প্রজেক্ট : যেকোনো ধরনের সৃজনধর্মী কাজ এই প্রজেক্টের অন্তর্গত। যেমন নাটক, অভিনয়ের ব্যবস্থা করা বা কোনো একটি জিনিস তৈরি করা, ইত্যাদি।

(২) উপভোগাত্মক বা গ্রহণাত্মক প্রজেক্ট : কোনো কিছুকে উপভোগ করার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই কাজ বা প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় যেমন গল্পশোনা, গান শোনা ইত্যাদি।

(৩) বিশেষ শিক্ষামূলক প্রজেক্ট : এই জাতীয় প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল বিশেষ কোনো বিষয়কেন্দ্রিক কাজ করা বা জ্ঞান আয়ত্ত করা। যেমন কবিতা মুখস্থ করা, অঙ্কের সুদকষা শেখা, ভূগোলের জরিপ শেখা ইত্যাদি।

(৪) সমস্যামূলক প্রজেক্ট : কোনো বিশেষ মানসিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে সব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় তাদের বলে সমস্যামূলক প্রজেক্ট, যেমন- গ্রহণ কেন হয়, কুয়াশা কেন হয় ইত্যাদি।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিশ্বাস করেন প্রজেক্ট পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষাদানের কাজ অনেকাংশে বিজ্ঞান সম্মত হবে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে যে মূলনীতিগুলি অবলম্বন করা হয় সেগুলি হল উদ্দেশ্যের নীতি, স্বতঃস্ফুর্ততার নীতি, বাস্তবতার নীতি, উপযোগিতার নীতি, সামাজিক অভিজ্ঞতার নীতি ও গনতান্ত্রিক প্রণালীর নীতি। প্রজেক্ট পদ্ধতি যেহেতু সক্রিয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই এটি শিক্ষর্থীর মধ্যে কর্মপ্রেরণা যোগায়। এগুলি সাধারণত শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর নিজস্ব চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়, এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক অনেক সহজ হয় ফলে শিক্ষা অনেক বেশী ফলপ্রসু হয়।

শিক্ষক (Teacher) :

শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রয়োগবাদীরা বলেছেন, তাঁর কাজ হবে শিক্ষার্থীর জন্য আদর্শ জীবন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যার মধ্যে শিশু প্রত্যক্ষ অভিযোজনের মাধ্যমে জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি আয়ত্ত করবে। যেহেতু শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রয়োগবাদ সক্রিয়তাকে অগ্রে স্থান দেয় তাই শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষক বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন, পরিকল্পনা রচনা করেন, কিন্তু শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করবে না। তবে তিনি পরোক্ষভাবে পাঠের সব পর্যায়েই অংশগ্রহণ করবেন। তাঁর দায়িত্ব গতানুগতিক পাঠদানের দায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশী। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করবেন। কোনো শিক্ষর্থী যে বিশেষ সমস্যা নির্বাচন করেছে, তা যেন শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, শিক্ষক সেদিকে

লক্ষ্য রাখবেন অর্থাৎ এককথায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু, সহায়ক এবং যোগ্য নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

শৃঙ্খলা (Discipline):

প্রয়োগবাদ দর্শন অনুযায়ী শিশুর শৃঙ্খলা হবে অন্তর্জাত স্বতঃস্ফূর্ত। শিশুরা নিজের আগ্রহেই কাজ করবে, সুতরাং তার মধ্যে বিশৃঙ্খলতার কোনো সুযোগ থাকবেনা। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করবে।

শিক্ষালয় (School):

প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই বলেছেন প্রত্যেকটি বিদ্যালয় হবে শুদ্ধ, সরল এবং সুসমন্বিত সমাজ। (School is a simplified, purified and beter balanced society.) অর্থাৎ সমাজের যা কিছু অনুকরণীয়, শিক্ষণীয়, বিষয় সেগুলিকে সরল করে, আদর্শায়িত করে শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বও বিকশিত হবে এবং সামাজিক অগ্রগতিও সম্ভব হবে। সুতরাং প্রয়োগবাদী ধারণায় শিক্ষালয় নিছক পাঠ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান নয়; শুদ্ধ জীবনযাপনের উপযোগী বিশেষভাবে রচিত এক পরিবেশ।

সীমাবদ্ধতা (Limitation):

প্রয়োগবাদী দর্শন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমালোচিত হয়েছে, প্রয়োগবাদ কোনো নিরঙ্কুশ মানদণ্ডকে মেনে নেয়না। শিক্ষা মানুষকে জীবনের নতুন মানদণ্ড সৃষ্টিতে সাহায্য করে। শাশ্বত মূল্যবোধ সমাজের সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসংগতির সৃষ্টি করে। মূল্যবোধ ছাড়া মানবিক আচরণের যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। প্রয়োগবাদ মানবতাবাদের সযত্নলালিত মূল্যবোধগুলিকে অবহেলা করে। প্রয়োগবাদ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলির বিরোধিতা করে। এটি চূড়ান্ত উপযোগিতাবাদেরই সমার্থক। নিঃস্বার্থ মানবতাবাদের জন্য এই দর্শনে কোনো স্থান নেই। প্রয়োগবাদী দর্শন-এ শিক্ষার লক্ষ্যটি অনেকাংশেই অস্পষ্ট। প্রয়োগবাদী শিক্ষাপদ্ধতি সমালোচনামুক্ত নয়। প্রয়োগবাদীগণ মুক্ত পঠনপাঠন এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে অস্বীকার করেছে যা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

উপসংহার (Conclusion):

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগবাদ শিক্ষাকে নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। কোথাও এই প্রভাব প্রত্যক্ষ, আবার কোথাও পরোক্ষ। প্রয়োগবাদ বাস্তববাদী দর্শন হওয়ায় তার প্রভাবে আধুনিক শিক্ষা তুলনামূলকভাবে বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ-এর অবদানের উল্লেখযোগ্য দিক হলো সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ। আধুনিক শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিক ভাবধারা মূলত প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত। এইসব দিক থেকে শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োগবাদী দর্শনের সম্পর্ক প্রমাণিত।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক : শিক্ষা এবং দর্শনের অর্থ, প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করা। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের মান কেবলমাত্র বস্তুধর্মী সূচক দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। তার জন্য চাই উন্নততর জীবনাদর্শ। উন্নততর জীবনাদর্শই পারে শিক্ষার মধ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্যমুখী গতি সঞ্চার করতে। ব্যক্তি জীবনের জীবনাদর্শ গড়ে উঠে জীবনদর্শন থেকে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, জীবন পরিবেশের সঙ্গে এই সচেতনতার একাগ্রতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে জীবনদর্শন (Philosophy of Life.)। আর এই জীবনদর্শন পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তির মধ্যে কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করে। সুতরাং, শিক্ষার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন একটি জীবনদর্শনের। এই জীবনদর্শনই শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং তাকে ব্যাপক তাৎপর্য দান করে। তাই জোহেন গটলিয়েব ফিচে (Johann Gotlieb Fiche) বলেছেন, শিক্ষার প্রকৃতরূপ একটি জীবনদর্শন ছাড়া স্বচ্ছতা লাভ করতে পারেনা। এই কারণেই আধুনিককালে শিক্ষাদর্শনের উৎপত্তি। যে জীবনদর্শন শিক্ষাকে মানুষের জীবনে তাৎপর্যবহ করে তোলে তাকে বলা হয় শিক্ষাদর্শন। জীবনদর্শন যেমন বহুমুখী, তেমনি শিক্ষাদর্শনও বহুমুখী। তবে প্রত্যেকটি শিক্ষাদর্শন শিক্ষাকে তার নিজস্ব ভিত্তিতে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। শিক্ষা ও দর্শন হল জীবন প্রবাহের দুটি দিক— একটি ব্যবহারিক এবং অপরটি তাত্ত্বিক, উভয়েরই লক্ষ্য একই— মানুষ ও মনুষ্যত্বের সমগ্র জীবন ও জগৎকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে বেঁচে থাকার ইচ্ছা (Will to Live), জীবনের লক্ষণ, প্রাণের স্পন্দন, সুস্থ দেহে, সংযত মনে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, নৈতিক মূল্যবোধে প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠবে এবং সৃষ্টি করবে নতুন নতুন অধ্যায়, ফলে সম্পদশালী হয়ে উঠবে বিশ্বজগৎ — সুদূর সোনালি ভবিষ্যতের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে শিক্ষা ও দর্শনের সার্থক মেলবন্ধনে।

দ্বিতীয় একক: চার্বাক দর্শন, জৈন দর্শন

চার্বাক দর্শন: ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের একমাত্র জড়বাদী সম্প্রদায়। জড়বাদ অনুসারে জড়ই একমাত্র তত্ত্ব এবং জড় থেকেই অচেতন, চেতন– যাবতীয় জাগতিক বিষয়ের উৎপত্তি, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিকতার আধিপত্য থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা করে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধ মতবাদরূপে চার্বাক জড়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চার্বাক দর্শনের নামকরণ প্রসঙ্গে পন্ডিতগণের মতবৈষম্য লক্ষণীয়। কেউ কেউ মনে করেন চার্বাক শব্দটি 'চারু' ও 'বাক্'— এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'চারু' মানে মধুর এবং 'বাক' মানে কথা। এরা মনে করেন, যে দর্শন সম্প্রদায় লোকায়িত তত্ত্বের শ্রুতিমধুর থেকে উৎপত্তি। 'চর্ষ' মানে চর্বন করা বা ঔদরিক ভোগকে বোঝায় অর্থাৎ এই মতানুসারে যাঁরা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচারক তাঁরাই চার্বাক। কেউ কেউ মনে করেন, লোকপুত্র বৃহস্পতিই জড়বাদের প্রবর্তক। 'চার্বাক' শব্দের মূল অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমান যুগে চার্বাক বলতে আমরা জড়বাদী নাস্তিককেই বুঝে থাকি। সাধারণ মানুষের চিন্তা ও ভাবধারা এই মতবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে বলে এই দর্শনকে 'লোকায়ত দর্শন' নামেও অভিহিত করা হয়। চার্বাকগণ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত— ১) বৈতন্ডিক সম্প্রদায়, ২) ধূর্ত সম্প্রদায়, ৩) সুশিক্ষিত সম্প্রদায়।

জৈন দর্শন : জৈন দর্শন খুবই প্রাচীন দর্শন এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে জৈন ধর্মের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। জৈন দর্শনশাস্ত্র বেদবিরোধী ভারতীয় দর্শনতন্ত্রত্রয়ের অন্যতম। 'জৈন' শব্দটি এসেছে 'জিন' শব্দ থেকে। জিন শব্দের অর্থ জয়ী। যিনি সকল রকম কামনা, বাসনা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি জয় করে মুক্তিলাভ করেছেন, তাদেরকে বলা হয় জিন। এই 'জিন' এর জীবনাদর্শ যারা নিজেদের জীবনে অনুসরণ করেন, তাঁদের বলা হয় জৈন। জৈন দর্শন একই সঙ্গে ধর্ম এবং দর্শন দুইই। জৈন ধর্মে চব্বিশজন জিনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের বলা হয় তীর্থঙ্কর। 'তীর্থঙ্কর' শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তীর্থ শব্দটির অর্থ হল 'নদীর ঘাট' বা 'সোপান'। তাই যে ব্যক্তিগণ সাধারণত মানুষকে সংসাররূপ জলাশয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সোপান রচনা করে দিয়েছেন, তাঁদেরকেই জৈন ধর্মে তীর্থঙ্কর বলা হয়। এই সকল তীর্থঙ্করদের মধ্যে সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর হলে ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন বর্ধমান, যার অপর নাম মহাবীর। মহাবীর ছিলেন গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ব্যক্তি তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। বস্তুত মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা বলে সাধারণত ধারণা করা হয়। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় একক : ন্যায় দর্শন, যোগ দর্শন

ন্যায় দর্শন : যুক্তি তর্কের দ্বারা কোনো বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াকে বা সংশয়াতীতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ন্যায়। এই শাস্ত্রের দর্শন মূলত বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। ন্যায় দর্শন ভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ষড়্‌দর্শনের অন্যতম দর্শনশাস্ত্র ন্যায় দর্শনের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন মহর্ষি গৌতম। তিনি অক্ষপাদ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাই ন্যায় দর্শনকে অক্ষনাদ দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়। মহর্ষি বাৎস্যায়নের মতে 'নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়', অর্থাৎ যুক্তির সহায়তায় সংশয় রহিত হয়ে নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার নামই ন্যায়। যুক্তি তর্কের সহায়তায় কোনো বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণকে মনন বা ঈক্ষা বলা হয়। ন্যায় দর্শনের অনুমানের সাহায্যে এরূপ বিচার বিশ্লেষণ করা হয় বলে একে আন্বীক্ষিকী দর্শনও বলা হয়। যুক্তিনিষ্ঠ মননের স্বরূপ আলোচনা ন্যায়দর্শনের মুখ্য কাজ হওয়ায় ন্যায় দর্শন বাদবিদ্যা বা হেতুবিদ্যা বা অর্থশাস্ত্র নামেও পরিচিত। তবে ন্যায় দর্শন শুধুমাত্র প্রমাবিষয়ক আলোচনা হয়। মহর্ষি বাৎস্যায়ন ন্যায় দর্শনকে সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রদীপ যেরূপ সকল পদার্থকে আলোর দ্বারা উদ্ভাসিত করে, ন্যায় দর্শনও সেরূপ প্রমা এবং প্রমাণ বিষয়ক আলোচনার দ্বারা ব্যক্তির মননকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যা অন্যান্য শাস্ত্রের তত্ত্ব উপলব্ধিতেও সহায়ক হয়। ভারতীয় দর্শনের দুটি শাখা বর্তমান যথা: ১) প্রাচীন ন্যায়, ২) নব্য ন্যায়।

যোগ দর্শন : যোগ দর্শন আস্তিক দর্শন এবং এই দর্শন বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে। সাংখ্য ও যোগ একই দর্শনের দুটি ভিন্ন দিক। বস্তুত যোগ দর্শনে সাংখ্য দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগই সূচিত হয়েছে। কেবল একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের কোনো স্বীকৃতি নেই কিন্তু যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। যোগ দর্শন আস্তিক এবং সাংখ্য দর্শনের সমানতন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এই দর্শন বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী এবং অধিকাংশ সিদ্ধান্তেই সাংখ্যানুসারী। তবে ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাঁরা ভিন্নমত। ঐতিহ্যানুসারে সাংখ্যগণ নিরীশ্বরবাদী, আর যোগ দর্শন সেশ্বরবাদী। তাই সাংখ্যাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং

যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। তাছাড়া সাংখ্য দর্শন যেখানে তাত্ত্বিক আলোচনায় আগ্রহী, যোগ দর্শন যেখানে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ বা ব্যবহারে আগ্রহী। একটি তত্ত্বমূলক এবং অপরটি প্রয়োগমূলক। আধুনিককালে সাংখ্য ও যোগ দুটি স্বতন্ত্র দর্শনতন্ত্ররূপে পরিচিত। যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক মহর্ষি পতঞ্জলি। তবে তিনি যোগের প্রবর্তক নন, কেননা তার পূর্বেও যোগীরা যোগ জানতেন। যোগ দর্শনকে পাতঞ্জল দর্শনও বলা হয়, মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত যোগসূত্র বা পাতঞ্জলসূত্র এই দর্শনের আদি আকর গ্রন্থ। তবে এই পতঞ্জলি এবং পানিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অভিন্ন কিনা সে বিষয়ে মতান্তর রয়েছে।

চতুর্থ একক: ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ

ভাববাদ : ভাববাদ হল দর্শনশাস্ত্রের প্রাচীনতম শাখা। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বা মানুষের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী। ভাববাদ বিশ্বাস করে মানুষ হল সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। তাদের কাছে মানুষ ও তার আত্মা বা সত্ত্বা; বস্তু ও দেহের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তারা মানুষ এবং এই সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একই ভাবমূলক বা আধ্যাত্মিক সত্ত্বার অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই মতানুযায়ী ভাবজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎই প্রকৃত সত্য। বস্তুজগৎ মায়া মাত্র। আধ্যাত্মিক জগতের অধিকারী হলেন সর্বজনীন মনের অধিকারী ঈশ্বর। মানুষের মন, এই সর্বজনীন মনের অংশ মাত্র। তাই মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হবে, ঐ সর্বজনীন মনের অধিকারী ঈশ্বর বা পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করা।

প্রকৃতিবাদ: প্রকৃতিবাদ এক ধরনের দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতিই পরম সত্য। প্রকৃতির মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে; প্রকৃতিই সকল দার্শনিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ প্রাণীজগতের নিয়মকেও প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তারা মনে করনে মানুষও বস্তু জগতেরই অংশ অর্থাৎ প্রকৃতিবাদীগণ বিশ্বজগতের স্বরূপ, পরিবর্তন এবং ঘটমান অবস্থা ইত্যাদি সবকিছুকেই নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিবাদ শিক্ষাকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা যখন কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তখনই প্রকৃতিবাদ মুক্তির নিশান দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে শৃঙ্খলামুক্ত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল। প্রকৃতিবাদ শিক্ষা প্রক্রিয়াকে শিশুকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নয়। শিক্ষা হল শিশুর স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়া।

প্রয়োগবাদ : প্রয়োগবাদ এমন একটি দর্শন যার মূলে রয়েছে বাস্তবমুখী কর্মপ্রক্রিয়া যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে উপযোগী অর্থাৎ প্রয়োগবাদের মূল কথা হল উপযোগিতা। প্রয়োগবাদীদের মতে, এই পৃথিবীতে চিরস্থির বা চিরসত্য বলে কিছু নেই। সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল। প্রয়োগবাদ যে কোনো চিরস্থায়ী, চূড়ান্ত মূল্যবোধের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, অন্যান্য প্রচলিত মতবাদের থেকে এটি অনেকবেশী মানবিক কারণ মানবজীবন ও মানবিক চাহিদার সঙ্গেই এটি সংযুক্ত। প্রয়োগবাদে 'ব্যক্তি' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই দর্শনের মূলনীতি হল যে, ব্যক্তি নিজেই নিজের মূল্যবোধগুলিকে সৃষ্টি করে। তাদের মতে মূল্যবোধ একই জায়গায় স্থির থাকেনা। মূল্যবোধ সদা পরিবর্তনশীল। প্রয়োগবাদীরা আরও বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির জীবনের বিকাশ পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় অভিযোজনের মাধ্যমে সাধিত হয়। তাই তারা মানুষের পরিবেশ ও তাকে রূপায়ণ করার শক্তির উপর জোড় দেন। ব্যক্তির সমস্যার সার্থক সমাধানের মাধ্যমেই নিজের জন্য প্রকৃত পরিবেশ তৈরি করে থাকে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ ১ মানের প্রশ্ন

১) ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন—
(ক) মহর্ষি বাৎসায়ন (খ) মহর্ষি গৌতম (গ) বাচস্পতি মিশ্র (ঘ) জয়ন্ত ভট্ট

২) ন্যায় মতে প্রমাণ _______ প্রকার।
(ক) পাঁচ প্রকার (খ) নয় প্রকার (গ) তিন প্রকার (ঘ) চার প্রকার

৩) যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন_______ ।
(ক) মহর্ষি পতঞ্জলি (খ) পার্শ্বনাথ (গ) ঋষভদেব (ঘ) গৌতম বুদ্ধ

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) প্রকৃতিবাদের মুখ্য প্রবক্তা কে ছিলেন?
২) বৃত্তি শব্দের অর্থ কি?
৩) ন্যায় মতে অনুমান কত প্রকার ও কি কি?

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) 'Philosophy'- শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ।
২) ন্যায় দর্শনের কয়টি শাখা ও কি কি?
৩) চিত্তভূমি কত প্রকার ও কি কি?

৬ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১৫০টি শব্দ

১) শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভাববাদীদের ধারণা ব্যক্ত কর।
২) ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর।
৩) আধুনিক শিক্ষায় যোগ দর্শনের প্রভাব আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মহান পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ

- প্রথম একক : জ্যাঁ জ্যাকুইস রুঁশো
- দ্বিতীয় একক : জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী
- তৃতীয় একক : ফ্রেডারিক উইলহেম অগাস্ট ফ্রয়েবেল
- চতুর্থ একক : মারিয়া মন্তেস্বরী

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহান পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ
(Great Western Educators)

উদ্দেশ্য (Objectives):

- শিক্ষার্থীরা জ্যাঁ জ্যাকুইস রুঁশোর শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, শৃঙ্খলা, শিক্ষায় তাঁর অসামান্য অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা জোহান হেনরিক পেস্তালৎসীর শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, শৃঙ্খলা, শিক্ষায় তাঁর অসামান্য অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা ফ্রেডারিক উইলহেম অগাস্ট ফ্রয়েবেলর শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, শৃঙ্খলা, শিক্ষায় তাঁর অসামান্য অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষিকা , শৃঙ্খলা, শিক্ষায় তাঁর অসামান্য অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face):

গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ্ধতি ছিল মুখস্থ করা, যার ফলে বারবার পড়া, লেখা ও ঘন ঘন পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিক্‌গুলি উপেক্ষিত ছিল, শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার নিজস্ব চাহিদা, মতামত, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির কোনোরূপ মূল্যই দেওয়া হত না। ফলে শিক্ষকদের বহির্জাত শৃঙ্খলার আশ্রয় নিতে হত অর্থাৎ শাস্তি নিন্দা ইত্যাদির দ্বারা শৃঙ্খলা বজায় রাখা হত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল শাসক ও শাসিতের মত; বাধ্যতা, আনুগত্য ইত্যাদি ছিল শিক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যক কর্ম। শিক্ষা ছিল বিদ্যালয়ের একচেটিয়া ও শিক্ষকদের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত, শিক্ষাকে গণ্য করা হত মূলত বয়স্ক জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে। সুতরাং শিশুর কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে উঠত অবাস্তব, অস্পষ্ট। বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু স্বাধীনভাবে শিখতে পারে, বাইরে থেকে কোনো শক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই, শৃঙ্খলা অন্তর্জাত, বহির্জাত নয়। শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুদের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শিক্ষক শ্রেণির একমাত্র সর্বময় কর্তা নন, শিক্ষার্থী অনেক বেশি সক্রিয়। শিক্ষাকে জীবনধারার সাথে অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়। বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা কিছু মহান শিক্ষাবিদ এর অসামান্য অবদান এর ফলে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে যাদের মধ্যে রুঁশো, পেস্তালৎসী, ফ্রয়েবেল ও মন্তেস্বরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল জনক হলেন রুঁশো। তাঁর মতে শিশুর উপর কোনো কৃত্রিম শিক্ষাসূচি চাপানো চলবে না, শৃঙ্খলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং তা জোর করে চাপানো চলবে না। রুঁশোর মতে শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি ভিত্তিক, শিশুর শিক্ষার উপর বাইরের কোনো শক্তির হস্তক্ষেপ চলবে না। রুঁশো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এমিল' এ একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা দেন। রুঁশোর হাত ধরেই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা (Child-centric Education) এর ধারণাটি জন্ম নেয়।

রুঁশোর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণাটি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং একে বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলতে সহায়তা করেছেন, যাদের মধ্যে পেস্তালৎসী ও ফ্রয়েবেল অন্যতম।

পেস্তালৎসীর মতে শিশুর সামর্থ্য ও শক্তিগুলির স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশই হল প্রকৃত শৃঙ্খলা। পেস্তালৎসীই হলেন প্রথম শিক্ষক যিনি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে প্রকৃত শৃঙ্খলা কঠোর নিয়ন্ত্রণ বা শাসনের মধ্যে দিয়ে আসবে না, আসবে সহানুভূতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শিশুদের স্বাধীন কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে। শিশুর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদানে পেস্তালৎসী বিশ্বাসী ছিলেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই তিনি বস্তুভিত্তিক পাঠ (Object Lesson) নামে প্রগতিশীল পদ্ধতিটির উদ্ভাবন করেছিলেন।

ফ্রয়েবেল তাঁর বিখ্যাত 'কিন্ডারগার্টেন' নামে প্রসিদ্ধ শিশু শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা হল আত্মবিকাশের প্রক্রিয়া এবং তাতে থাকবে সক্রিয়তা ও সামাজিক সহযোগিতা। তাই কিন্ডারগার্টেন প্রথায় খেলা, গান, সৃজনমূলক প্রচেষ্টা, যৌথকর্ম ইত্যাদি হল শিক্ষার মূল মাধ্যম।

শিশুর আগ্রহ, ক্রমবিকাশ, ব্যক্তিগত বৈষম্য, চাহিদার উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তার মধ্যে মারিয়া মন্তেস্বরীর নাম উল্লেখযোগ্য। মারিয়া মন্তেস্বরী বিশ্বাস করতেন যে, শিশুর শিক্ষা হল শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার উন্মেষণ বা বিকাশ। সুতরাং শিশুর শিক্ষায় বাইরের কোনো শক্তির হস্তক্ষেপের স্থান নেই। শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফুর্ত। তাই তার প্রয়োজন পূর্ণ-স্বাধীনতা। এর থেকেই জন্ম নিয়েছে মন্তেস্বরীর বিখ্যাত স্বয়ং শিক্ষার (Auto Education) ধারণাটি।

বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার পেছনে রুঁশো পেস্তালৎসী, ফ্রয়েবেল, মন্তেস্বরী এদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এদের শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রথম একক

জ্যাঁ জ্যাকুইস রুঁশো
(Jean Jacques Rousseau)

ভূমিকা (Introduction):

জ্যাঁ জ্যাকুইস রুঁশো 1712 সালের 28 জুন জেনেভায় জন্মগ্রহণ করেন। রুঁশোর পিতার নাম ছিল আইজ্যাক (Issac Rousseau) এবং মাতার নাম ছিল সুজান বানার্ড (Suzane Banard)। রুঁশোর পিতার মূল ব্যবসা ছিল ঘড়ি তৈরি করা। তাঁর মাতা ছিলেন উচ্চ বংশীয় মহিলা এবং রুঁশোর বয়স যখন মাত্র নয় দিন, তখন তাঁর মাতা জ্বরে (Puerperal Fever) এ মারা যান এবং মাতার অকস্মাৎ মৃত্যু সম্পর্কে রুঁশো পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "The first of my misfortunes."

রুঁশো ছিলেন শিক্ষাবিদ দার্শনিক, লেখক, সুরকার অর্থাৎ অত্যন্ত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি তাঁর পরিবার ও জন্মস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন এবং এর নিদর্শন হল তাঁর লিখিত বেশীর ভাগ গ্রন্থে তিনি "Jean- Jacques Rousseau, Citizen of Geneva" লিখতেন। দশ বছর বয়সে রুঁশোকে একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ের পড়াশুনো রুঁশোর ভাল লাগেনি, তাই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে শিক্ষা মূলত বেশিরভাগ সময়েই গ্রহণ করেছিলেন প্রকৃতির সংস্পর্শে ও জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

যখন রুঁশোর বয়স মাত্র দশ বছর ছিল, তখন তাঁর পিতা একটি আইনগত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল এক বিত্তশালী ব্যক্তির সাথে এবং আইনগত ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি রুঁশোকে নিয়ে নিয়ন (Nyan) নামক স্থানে চলে যান এবং রুঁশো সেখানে পরবর্তীকালে তাঁর মামার সাথে বড় হন। রুঁশোর জীবনের অন্যতম অনুরাগ ছিল সংগীত (Music) এবং সঙ্গীত এর প্রতি রুঁশো অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

20 বছর বয়সে রুঁশো যদিও একজন মনোযোগী শিক্ষার্থী ছিলেন না, কিন্তু দর্শন (Philosophy), গণিত (Mathematics), সংগীত (Music) বিষয়গুলি নিয়ে পড়ার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। 27 বছর বয়সে তিনি লিয়ন (Lyon) এ শিক্ষক হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেন। রুঁশোর লেখা গ্রন্থ "Discourse on the Arts and Sciences" তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তিনি তাঁর লিখিত Opera "Le devin du Village" (The Village Soothsayer) -এর জন্য শব্দ ও সঙ্গীত লিখেন এবং এই Opera রাজা পঞ্চদশ লুই-এর সম্মুখে 1752 সালে প্রদর্শিত হয়, তাতে রাজা এতই আনন্দিত হন যে, রুঁশোকে সমস্ত জীবনব্যাপী পেনশন এর ব্যবস্থা করে দেন।

কিন্তু 1762 সাল ছিল রুঁশোর জীবনে অত্যন্ত বিপর্যয়কারী, কারণ এই বছরেই তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ "Emile" এবং "The Social Contract" প্রকাশিত হয়েছিল যা সমস্ত ফ্রান্সে ব্যাপক আলোড়ন-এর সৃষ্টি

করে, ফলে তৎকালীন ফরাসী সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে। তাই রুঁশো গ্রেপ্তার এড়াতে সুইজারল্যান্ড (Switzerland) চলে যান কিন্তু পরবর্তীকালে সুইজারল্যান্ড এর কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি অমানবিক হয়ে পড়ে এবং তাকে "Emile" ও "The Social Contract" লেখার জন্য নিন্দা করে। 1767 সালের 22 মে রুশো ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন কিন্তু জনগণ তাঁকে চিনতে পারে এবং তাঁকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয় ও অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education):

রুঁশোর মতে শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় নয়। শিশুর অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের বিকাশ সাধনই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শৈশবে শিশুর শরীর-স্বাস্থ্য গঠন করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য এবং এ সময়ে তার নৈতিক অথবা সামাজিক শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই।

বাল্যকালে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর ইন্দ্রিয় ও মানসিকবৃত্তির অনুশীলন।

কৈশোরে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সত্যিকারের জ্ঞান আহরণ এবং এই সময়ে শিশু প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে থাকবে।

রুঁশোর মতে, স্ত্রী শিক্ষার লক্ষ্য হল যে, স্ত্রীকে পুরুষের যোগ্য জীবন সঙ্গিনী হিসাবে গড়ে তোলা। পুরুষের জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করে তোলাই হল নারীজীবনে শিক্ষার লক্ষ্য। মেয়েদের অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। তারা নৃত্য, গীত, সেলাই ও অন্যান্য গৃহস্থলীর কাজকর্ম শিখবে এবং মেয়েরা হবে ধর্ম পরায়ণা।

সুতরাং রুঁশোর মতে– শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল নিম্নরূপ :

- শিশুকে সক্রিয় করে তোলা।
- শিশুকে কর্মেন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।
- শিশুর মানসিক ক্ষমতাগুলি যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে সহায়তা করা অর্থাৎ বলা যায় রুঁশোর ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুর দেহ মনের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে সুনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy):

অষ্টাদশ শতক এর চিন্তাজাগত আলোড়িত হয় নতুন বৈপ্লবিক ভাবনায়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, ধর্মীয় পরিমন্ডলে, শিক্ষায়, সমাজের নানাস্তরে রাজনীতিতে প্রশ্নহীন আনুগত্য, ধ্রুপদী চিন্তা, অনড় মূল্যবোধ, কুসংস্কার, সাধারণ নিপীড়ন ইত্যাদির বাতাবরনে বিচারবুদ্ধি, জিজ্ঞাসাস্বরূপ প্রতিক্রিয়া স্পন্দিত হল।

রুঁশোর প্রকৃতিতে ব্যক্তিমানুষের স্থান ছিল সবার উপরে। সেই ভাবনা গ্রাস করল সমস্ত চিন্তাভাবনার জগৎ। তাঁর মননশীলতা ছুঁয়ে গেল রাষ্ট্রচিন্তা, ধর্মীয় চেতনা, সমাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি। রুঁশোর মতে শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী, কারণ প্রকৃতির হাত থেকে যা কিছু আসে তা সবই ভালো কিন্তু সব কিছুই

মানুষের কাছে এসে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন যে, প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাই হল আদর্শ শিক্ষা। Emile নামক গ্রন্থে তিনি 'প্রকৃতি' শব্দটিকে তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছিলেন যথা :

(১) মানসিক প্রকৃতি (Psychological Nature)

(২) জাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature)

(৩) জৈবিক প্রকৃতি (Biological Nature)

(১) মানসিক প্রকৃতি (Psychological Nature) :

রুঁশো বলেছিলেন, The child is a book which the teacher is to read from page to page. অর্থাৎ শিক্ষার্থী হল একটি গ্রন্থ যার প্রতিটি পৃষ্ঠা শিক্ষককে পড়তে হবে। রুঁশোর মতে মানসিক প্রকৃতি বলতে বুঝায় শিশুর প্রকৃতিদত্ত শক্তি, সম্ভাবনা, চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ইত্যাদির সমন্বয়কে। রুঁশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিকল্পিত হবে। সাধারণত শিশু বড় হবার সাথে সাথে পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির চাপে তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়ে যায় এবং তাকে কতগুলি কৃত্রিম আচরণ ও অভ্যাস শিখতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু এই শিক্ষা হল প্রকৃতিবিরোধী শিক্ষা।

(২) জাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature) :

শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে রুঁশোর ব্যাখ্যা হল—প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও। (Back to Nature.) অর্থাৎ সেখানে শিশু গাছপালা, নদী, পশু-পাখী, ফল-ফুল ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার সুযোগ পাবে। রুঁশো শিশুকে নগরের কৃত্রিম পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিতে বলেছিলেন কারণ তাঁর মতে নগর হল 'মানবজাতির কবরখানা।' (Cities are the graves of human civilisation.)

শিশুর শিক্ষা হতে হবে প্রকৃতির কোলে যেখানে শিশুর স্বাভাবিক গুণাবলি বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে। জাগতিক প্রকৃতি বলতে রুঁশো মূলত বুঝিয়েছেন সেই প্রাকৃতিক অবস্থাকে যা রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি সৃষ্টি হবার আগে বিদ্যমান ছিল। এই প্রাকৃতিক অবস্থাকে রুঁশো নাম দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক অবস্থা এবং এই পরিবেশে যে মানুষ বাস করতো তার নাম রুঁশো দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক মানুষ। এই প্রাকৃতিক মানুষ অবিকৃত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির ছিল কিন্তু সমাজ ও অন্যান্য সংস্থা সৃষ্টি হবার ফলে তার এই বিশুদ্ধ প্রকৃতি কলুষিত হয়ে যায়। তাই সমাজের কৃত্রিম আবহাওয়া থেকে রুঁশো শিশুকে দূরে রাখতে বলেছিলেন।

(৩) জৈবিক প্রকৃতি (Biological Nature) :

শিশু কতকগুলি জৈবিক সত্তা নিয়ে জন্মায়, তার মধ্যে কিছু সহজাত প্রবৃত্তি ও চাহিদা বর্তমান থাকে। সামাজিক কৃত্রিম পরিবেশে সেই জৈবিক প্রকৃতির যথাযথ বিকাশ ঘটা সম্ভবপর হয় না। শিশুর শিক্ষা হতে হবে গাছপালা, নদী, পাহাড়, আকাশ, বাতাস, রোদ, জল, পশু-পাখি ইত্যাদি নিয়ে অর্থাৎ শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে যাতে শিশু প্রকতির সাথে ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে শিখতে পারে। শিশুর জীবনের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকৃতিই হবে তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষাদাতা। এই প্রকৃতিগত শিক্ষা হবে সমাজের রীতিনীতি, নিয়মপ্রথা অনুযায়ী নয়। মানুষের নিজস্ব স্বরূপের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষ জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করে। সেই প্রকৃতিদত্ত নিয়ম অনুসারে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে।

শিক্ষন পদ্ধতি (Method of Teaching):

রুঁশো তাঁর 'এমিল' নামক গ্রন্থে দুটি কাল্পনিক চরিত্র (এমিল : ছেলে, সোফি : মেয়ে) এর মাধ্যমে তাঁর শিক্ষন পদ্ধতির একটি পূর্ণ ধারণা বিবৃত করেছেন বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে। রুঁশো তাঁর লিখিত "এমিল" নামক গ্রন্থে মোট পাঁচটি খণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর হিসাবে ভাগ করেছেন। প্রথম চারটি খণ্ডে কাল্পনিক পুত্র (এমিল) এর শিক্ষা এবং পঞ্চ খণ্ডে কাল্পনিক কন্যা সোফি-এর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

রুঁশো এমিলের শিক্ষাকে তার বয়স অনুযায়ী কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা-

(ক) এক থেকে পাঁচ বৎসরের শিক্ষা

(খ) পাঁচ থেকে বারো বৎসরের শিক্ষা

(গ) বারো থেকে পনের বৎসরের শিক্ষা

(ঘ) পনের থেকে কুড়ি বৎসরের শিক্ষা

(ক) এক থেকে পাঁচ বৎসরের শিক্ষা :

শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। অতি শৈশবে তার কোনো কৃত্রিম শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাধীন সঞ্চালনের ভিতর দিয়ে এই বয়সে তার শরীর স্বাস্থ্য গঠিত হয়। ফলে সরল সহজ পাচ্য খাদ্য ও হাল্কা পোশাক শিশুকে দিতে হবে ও তার যথাযথ শারীরিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঁচ বৎসর অবধি শিশুর শিক্ষা হবে নিছক শারীরমূলক এবং এ সময়ে শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের প্রতি কোনো মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই। রুঁশোর মতে শরীর যত শক্তিশালী হবে ততই শরীর মনের অনুগত হবে। দুর্বলতা থেকেই আসে যত দুর্নীতি। তাই শিশুকে শারীরিক দিক দিয়ে সবল করে তোলার প্রচেস্টা করতে হবে। ফলে শিশুটি ক্রমশ সৎ হয়ে উঠবে।

(খ) পাঁচ থেকে বারো বৎসরের শিক্ষা :

এ সময়ে রুঁশো এমিলের শিক্ষা নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education) এবং প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব (Theory of Natural Consequence)— এই দুই নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। এই সময়ে তার শিক্ষা কেবলমাত্র মানসিক বৃত্তির অনুশীলন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সবল ও পুস্ট করে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই স্তরে 'প্রচেস্টা ও ভুলের (Trial and Error) মধ্য দিয়ে শিখবে এবং বারো বৎসর পর্যন্ত শিশুকে কোনো বই পড়তে বলা হবে না বা কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। শিশুর মনকে তার স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে হবে এবং গতানুগতিক প্রথায় নানারূপ ভাবধারা, আচরণ ও বিশ্বাস শিশুর উপর জোর করে চাপানোর কথা রুঁশো তীব্র ভাষায় বিরোধিতা করেছেন। রুঁশোর মতে প্রকৃতি চায় যে, শিশু বয়স্ক ব্যক্তি হবার আগে অবধি যাতে শিশুই থাকতে পারে।

(গ) বারো থেকে পনের বৎসরের শিক্ষা :

এ সময় শিশুর ইতিবাচক শিক্ষা (Positive Education) শুরু হবে কারণ শিশু এই সময় অবধি তার জ্ঞান আহরণের মাধ্যমগুলি তৈরি করে নিতে পেরেছে এবং এই পর্যায় থেকেই শুরু হবে সত্যকারের জ্ঞান অর্জনের কার্য প্রক্রিয়া। রুঁশো এ পর্যায়েও বিশেষ কোনো বই পড়ার নির্দেশ দেন নি কিন্তু 'রবিনসন ক্রুশো'

হল একমাত্র বই যা শিশু পড়তে পারে এবং এই বই থেকে শিশু আত্মনির্ভরতা, প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন, প্রচলিত জ্ঞানের অসারতা ইত্যাদি বিষয়গুলি এই বই পড়ে শিখতে পারবে। এই সময়ে শিশুর কৌতূহলই হবে একমাত্র পথনির্দেশক এবং শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলই হবে সব দিক থেকে কাম্য।

এই সময়ে শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়ে উঠে। এই সময়ে শিশু পর্যটনের ভিতর দিয়ে ভূগোল শিখবে, নৈসর্গিক ঘটনা দেখে জ্যোতির্বিদ্যা শিখবে। শিশুর জন্য গতানুগতিক শিক্ষার কোনো পাঠ্যক্রম থাকবে না কিন্তু এই সময়ে তাকে বৃত্তিমুখী শিক্ষা মূলত কৃষিকাজ এর শিক্ষা দেওয়ার কথা রুঁশো বলেছেন।

(ঘ) পনের থেকে কুড়ি বৎসরের শিক্ষা :

এই বয়সে এমিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখবে কিছু নৈতিক শিক্ষা। মৌখিক উপদেশের মধ্য দিয়ে শিখবে না। কারণ এই সময় তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ শুরু হয়ে যায় এবং এই সময়টি হল শিশুর নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি শিক্ষার কাল। তবে সেই শিক্ষা দিতে হবে অতি সাবধানে এবং ঠিক সময়ে। এমনকি 18 বছর বয়সেও হয়তো উপযুক্ত সময় নয়। এ বিষয়ে পরিণমনের (Maturation) জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এ বয়সে শিক্ষার্থী শিখবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী।

সোফির শিক্ষা :

সোফি নামক কাল্পনিক একটি কন্যার শিক্ষার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মেয়েদের জন্মই হ'ল পুরুষদের জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য। সুতরাং সোফির শিক্ষাও পরিচালিত হবে সেই লক্ষ্যে। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে রুঁশো ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কথা বলেন নি। রুঁশোর মতে মুক্ত স্বাধীনতা মেয়েদের জন্য নয়, তাদের আচরণ সংযমী হতে হবে। তাদের জন্য ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রুঁশো বলেছেন, মেয়েদের শিক্ষা এই লক্ষ্যে ধাবিত হবে যাতে মেয়েরা ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহিনী ও আদর্শ মাতা হতে পারে। তাই রুঁশো নারীকে বৌদ্ধিক শিক্ষায় উন্নত হবার কোনো পরিকল্পনা দেননি, কারন তিনি মনে করতেন–শিক্ষিত রমনী তার স্বামী, সন্তান ও সকলের কাছে কঠিন ব্যাধিস্বরূপ, তাকে পরিহার করা উচিত।

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব (Theory of Natural Consequence) :

যে শিক্ষা জ্ঞানদানের পূর্বে, জ্ঞান আহরণের উপকরণগুলি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে পরিমার্জন করে জ্ঞান আহরণের উপযোগী করে তোলে, তাই হল নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)। নেতিবাচক শিক্ষা নীতি অনুযায়ী শিশুকে মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এই স্বাভাবিক পরিবেশে শিশু নিজস্ব সক্রিয়তার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। সে জন্মগতভাবে সৎ। সুতরাং, তার মধ্যে কোনো অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করা উচিত নয়। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় যা শিখবে তাই হল প্রকৃত শিক্ষা। আগুনে হাত দিতে হাত পুড়বে, কুখাদ্য খেলে শরীর খারাপ হবে, এইসব অভিজ্ঞতা শিশু বই পড়ে জানবে না। নিজের বাস্তব কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। রুঁশো এই শিক্ষণ নীতিকে বলেছেন–প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতির পরিবেশে অবাধ সঞ্চালন। প্রকৃতিই হবে শিশুর একমাত্র শিক্ষক। রুঁশোর মতে শৈশব হল বিচারবুদ্ধির নিদ্রিত অবস্থা এবং শিশুর নৈতিক শিক্ষাতেও মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। প্রকৃতিই সেখানে হবে একমাত্র শিক্ষক এবং শিশু তার কাজের ভালো মন্দের বিচার, পুরস্কার বা শাস্তি প্রকৃতি থেকেই পাবে, মানুষ তাকে দেবে না।

উদাহরণস্বরূপ, বলা যায়, শিশু আগুনে প্রথমবার হাত দিলে গরম বোধ করবে ও নিজে থেকেই হাত সরিয়ে নেবে। ঠিক তেমনি বেশি বৃষ্টি ভিজলে তার ঠাণ্ডা লাগবে এবং বেশি বৃষ্টি ভিজবে না অর্থাৎ সমস্ত কাজের স্বাভাবিক ফলাফল শিশু নিজেই ভোগ করবে ও প্রকৃত শিক্ষা লাভ করবে।

রুঁশোর মতে, প্রকৃতি হল সব থেকে বড়ো শিক্ষক। সে প্রকৃতির কাছ থেকে শিখবে ও ভুল করবে নিজে এবং সংশোধন করে নেবে। প্রকৃতি থেকে যে শিক্ষা লাভ করবে তা হবে চিরস্থায়ী।

পাঠ্যক্রম (Curriculum):

শৈশবে শিশুর শিক্ষা হবে মূলত শারীর ভিত্তিক এবং শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সঞ্চালনগুলি যাতে পুষ্ট ও সবল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাল্যকাল : এই সময়ে শিশুকে গতানুগতিক প্রথায় কিছু শিক্ষা দেওয়া হবে না। তাকে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শেখবার কোনো প্রয়োজন নেই, তাকে এই বয়সে ধর্ম শিক্ষা দেবারও কোনো প্রয়োজন নেই। শিশু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাকৃতিক জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। এই সময়ের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা বা Negative Education.

কৈশোর : বারো বৎসরের এর পর শিশুর ইতিবাচক শিক্ষা (Positive Education) শুরু হবে। এই স্তরে কোনো বিশেষ বই পড়ার নির্দেশও দেননি। তবে এই স্তরে ডেনিয়েল ডিফোর (Daniel Defoe) লেখা গ্রন্থ (Robinson Crusoe) 'রবিনসন ক্রুশো' পড়ার কথা বলেছেন।

যৌবনে : এই স্তরে শিশুকে সামাজিক কর্তব্য, সহযোগিতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত করানো হবে। এই স্তরে সাহিত্য, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সঙ্গীত, অঙ্কন, শিল্প প্রভৃতি বিষয়গুলি পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে।

শিক্ষক (Teacher):

রুঁশো তাঁর শিক্ষানীতিতে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও তার উপর গতানুগতিক দায়িত্ব আরোপ করেন নি। তিনি বলেছেন, শিক্ষক হবেন পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত এবং প্রাকৃতিক শিক্ষানীতিতে আস্থাবান, তার মধ্যে সেবামূলক মনোভাব থাকবে। তিনি শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করবেন। রুঁশোর মতে, শিক্ষকের ভূমিকা হবে পরিচালকের, বন্ধুর ও পথ প্রদর্শকের। তিনি শিক্ষার্থীর নিত্য সহচর হয়ে তার জীবন উপযোগী বিভিন্ন পরিবেশ রচনা করবেন। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, উদ্ভাবন, সমন্বয় সাধনের সময় উপযুক্ত পথ প্রদর্শক। তাঁর মতে শিক্ষকের কাজ হবে শিশুকে আগ্রহ সঞ্চার করানো এবং শিশু নিজে থেকেই তা শিখবে। শিশু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শিখবে ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষক জোর করে কিছু শিখাবেনা।

শৃঙ্খলা (Discipline):

রুঁশোর শৃঙ্খলার ধারণাটি ব্যক্তির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই রচিত। বিকাশমান ব্যক্তি নিজের ফলাফলের ভিত্তিতেই (Discipline by Natural Consequences) নিজেকে সংশোধিত করবে। এই শৃঙ্খলা আত্মশৃঙ্খলা

বা মুক্ত শৃঙ্খলা। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে এই মুক্ত শৃঙ্খলা তত্ত্বের জনক হলেন রুঁশো। রুঁশোর মতে শৃঙ্খলা হবে মুক্ত শৃঙ্খলা (Free Discipline) এবং শৃঙ্খলা আরোপিত হবে না। মুক্ত পরিবেশেই শিক্ষার্থী তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না তার আচরণের উপর ভিত্তি করে। রুঁশো বলেছেন, "শিশুকে স্বাধীনতা দাও" এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করা চলবে না। শাস্তি শিশু প্রকৃতির কাছ থেকেই লাভ করবে এবং এই শিক্ষা হবে চিরস্থায়ী।

গ্রন্থ (Writings):

- Discourse on Inequality
- The Social Contract/Principles of Political Right
- Emile/On Education
- The Cunning Man
- Julie or the New Eloise
- Four Plays
- The Reveries of Solitary Walker
- Confessions
- The Creed of a Savoyard Priest
- Discourse on the Arts and Science
- Eassay on the Origin of Languages
- Letters on the Elements of Botany
- Letter on the French Music
- A Complete Dictionary of Music
- Letter to Monsieus d' Alembert on the Theatre
- The Profession of a Faith of a Savoyard Vicar

অবদান (Contribution):

- শিশুর শিক্ষার জন্য তার আগ্রহ, প্রবৃত্তি, চাহিদা, সক্রিয়তা ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি আলোকপাত করেছেন।
- শিক্ষায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুরা তাদের আগ্রহ ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ মুক্ত প্রকৃতির কাছ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।
- পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, হাতের কাজ, নীতি শিক্ষাকে স্থান দিয়েছেন।

- স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক শৃঙ্খলার উপর রুঁশোই অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।
- রুঁশোর শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই প্রগতিশীল শিক্ষা বাস্তবগ্রাহী হতে পেরেছিল।
- রুঁশোর শিক্ষাদর্শনকে নির্ভর করেই বর্তমান শিক্ষায় প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ এর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে।
- শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, ব্যক্তিমূলক বৈষম্য, স্বাধীনতা, আনন্দময় শিক্ষা প্রক্রিয়া, আত্ম-শৃঙ্খলা, সক্রিয়তা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির মত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণাগুলি রুঁশোর দ্বারাই প্রবেশ করতে পেরেছে।

সীমাবদ্ধতা (Limitation):

- রুঁশো প্রচলিত প্রথা ও তত্ত্বগুলিকে বিনা বিচারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মন্দ ছাড়া কিছুই লক্ষ্য করেননি।
- রুঁশোর দ্বারা বর্ণিত প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব মোটেও যুক্তিগ্রাহ্য নয় কারণ অনেক সময় শিশুর কৃতকার্যতার জন্য জীবন সংশয়েরও কারণ হতে পারে। যেমন- আগুন স্পর্শ করতে গিয়ে সারা শরীরে আগুন লেগে যেতে পারে। ইহা ছাড়াও অপরাধ ও প্রাকৃতিক শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক কোনো সম্পর্ক নেই।
- মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে রুঁশোর মতবাদ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল কারণ "এমিল" নামক গ্রন্থে সোফি নামক একটি মেয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, মেয়েদের জন্মই মূলত হয় পুরুষদের জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য। তাই রুঁশোর নারী শিক্ষার পরিকল্পনা অমানবিক।
- রুঁশোর শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ।
- শিশুর পক্ষে সঠিকভাবে নিজস্বভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।
- রুঁশোর মতে শৃঙ্খলা হবে মুক্ত শৃঙ্খলা কিন্তু এ ধরনের শৃঙ্খলায় শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থা সুস্থভাবে বজায় রাখা সম্ভবপর মনে হয় না।
- সমাজের ভালো কোনো কিছুই রুঁশো গ্রাহ্য করেন নি।

উপসংহার (Conclusion):

ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের পরে রুঁশোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ পরিলক্ষিত হয়। যার মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিত (Paranoia), উদ্বেগ (Anxiety) অন্যতম। এর মধ্যে 1776 সালের 24 অক্টোবর এক দুর্ঘটনায় পতিত হন। The Great Dane নামক স্থানে এবং সেখানে প্রচণ্ড ধাক্কার ফলে তাঁর প্রচণ্ড দুর্ঘটনায় স্নায়বিক (Neurological) ক্ষতি হয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়া শুরু হয় এবং তাঁর মৃগীরোগ (Epilepsy) শুরু হয়। 1778 সালের 22 জুলাই ফ্রান্সে রুঁশো "Othello" নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'Willow Song' এর উপর নিজের সুরে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন এবং সেদিন মার্কুইস গিরারডিন (Marqauis

Girardin) এবং পরিবারের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন এবং সেদিন তাঁর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায় এবং তাঁর Apoplectic Stroke-এ মৃত্যু হয়।

রুঁশো তাঁর গ্রন্থ "The Social Contract" এর প্রারম্ভিক লাইন এ লিখেছিলেন, "Man is born free, and everywhere he is in chains." এবং এর বিরুদ্ধেই তাঁর প্রায় সামগ্রিক জীবন উৎসর্গ করেছেন। রুঁশোই শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবে— একথা তিনিই মূলত গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। শিশুর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার কথা বলেছিলেন। রুঁশোর শিক্ষা চিন্তার ফলশ্রুতি হিসাবেই আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্ম এবং তাই রুঁশোকে আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলা হয়।

দ্বিতীয় একক

জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী

(Johann Heinrich Pestalozzi)

ভূমিকা (Introduction):

শিশুকে কিছু শেখাতে হলে তাকে ভালো করে জানতে হবে– রুঁশোর এই মতবাদকে সর্বাপেক্ষা সার্থক করে তোলার পিছনে যে মহান শিক্ষার্থীদের অবদান ছিল তার মধ্যে জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী অন্যতম। জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী সুইজারল্যান্ড (Switzerland) এর জুরিক (Zurich) শহরে 1746 সালের 12 জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতি শৈশবেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, ফলে পেস্তালৎসীর সমস্ত শিক্ষার দায়িত্ব পড়ে তাঁর মাতার এক পরিচারিকার উপর। তিনি গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং ল্যাটিন ও গ্রীক শিখেন, Schola Abbatissana এবং Schola Corolina থেকে। পেস্তালৎসী 1761 সালে Gymnasium এ অংশগ্রহণ করেন এবং Johann Jakol Bodmen ও Johann Jakol Breitingen থেকে গ্রীক (Greek) ও হিব্রু (Hebrew) শিখেন। পেস্তালৎসী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন Collegium Humanitatis এবং Collegium Humanitacis থেকে এবং সেখানে তিনি ভাষা ও দর্শনের উপর শিক্ষা লাভ করেন।

শিশুদের প্রতি সমবেদনা ও সেবামূলক মনোভাব থেকে তাঁর শিক্ষা চিন্তার উদ্ভব। তাই তাঁকে অনেকে "ফাদার পেস্তালৎসী" বলেও আখ্যা দেন। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কতটুকু করতে পেরেছিলেন বা সমাজের কল্যাণ করতে পেরেছেন কিনা সেটা বড় কথা নয়; তিনি সমাজ কল্যাণে সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেছিলেন সেটাই বড় কথা। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী চিন্তানায়ক রুঁশো প্রচলিত মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু তাঁর এই আঘাত ছিল সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বসর্বস্ব আকস্মিক এবং নেতিবাচক। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বারা পরবর্তীকালে অনেক চিন্তাবিদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই সব চিন্তাবিদদের মধ্যে জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী অন্যতম। রুঁশোর গ্রন্থ 'এমিল' যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল বছর। তিনি রুঁশোর শিক্ষাদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু পেস্তালৎসীর শিক্ষাদর্শন ছিল রুঁশোর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ পেস্তালৎসীর শিক্ষাদর্শনে কর্মমুখীনতা অনেক বেশী ছিল। পেস্তালৎসী জীবনে বহু বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং এর পিছনে দায়ী ছিল তাঁর মানসিক অস্থিরতা কিন্তু এই অস্থিরতার মূলে ছিল তাঁর জীবন দর্শন। তিনি মানবের কল্যাণ সাধন চাইতেন এবং বিশ্বাস করতেন মানুষের কোনো কল্যাণকামী শক্তিই বিশেষ কোনো পরিবর্তন বা কৌশলের ফল নয়, কল্যাণময় শক্তি হল তার অন্তঃজ সত্ত্বা। তিনি মনে করতেন মানুষকে সৎ চরিত্রের অধিকারী করে সামাজিক উন্নতি করতে পারলে সামগ্রিক মানবকল্যাণ হবে। তাঁর এই জীবনদর্শনকে এক কথায় মানবতাবাদ (Humanism) বলা হয় এবং তাঁর শিক্ষাদর্শনও তাঁর

জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

পেস্তালৎসী বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার সম্ভব। তিনি শিক্ষাকে সমাজ সংস্কারের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষাকে জনজাগরণের পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে সর্বজনীন করার প্রচেষ্টাই সারা জীবন করে গেছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে নিউহফ্ (Nuhof) নামক স্থানে 1774 সালে এ অনাথ শিশুদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে এই জগতে যা কিছু ভাল, যা কিছু সৎ, যা কিছু মহৎ তাতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। শিক্ষার কাজ হল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার বলে যা কিছু প্রাপ্য তা তাকে পাইয়ে দেওয়া। সুতরাং পেস্তালৎসী শিক্ষাকে সামাজিক উন্নতির হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেছেন আর এটাই হল তাঁর শিক্ষাদর্শনের সামাজিক যৌক্তিকতা।

তিনি বলেছিলেন শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। (Natural progressive and harmonious development of all power of the human being.) তিনি জীবন বিকাশকে উদ্ভিদ বৃদ্ধির সাথে তুলনা করেছিলেন কারণ বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে ঠিক তেমনি শিশুর মধ্যেও বিকাশের সব রকম সম্ভাবনা থাকে। উদ্ভিদ যেমন পরিবেশ থেকে তার স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ করে বড় হয়, শিশুও পরিবেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগাড় করে নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে বড় হতে থাকে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর মধ্যে বৃদ্ধির উপাদান প্রবেশ করানো নয় বরং শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর এই স্বাভাবিক বিকাশের পথে যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় তা দেখা। তিনি ব্যক্তি কল্যাণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নতি সাধন করতে গিয়ে শিক্ষার আর একটি লক্ষ্যের কথা বলেছেন এবং তা হল প্রত্যেক মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ যাতে উপার্জনশীল হয়ে উঠতে পারে সে দিকে সহায়তা করাও শিক্ষার কাজ।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education):

পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সুষম বিকাশ সাধন করা। তাঁর মতে শিশু প্রাকৃতিক ক্ষমতা, আগ্রহ ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে সেগুলির যথাযথ বিকাশ সাধন করা, দৈহিক উন্নতির সঙ্গে শিশুর নৈতিক বিকাশ হবে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষা শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটাবে ও মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটাবে। পেস্তালৎসী শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী করতে চাইতেন তাই তিনি বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে শিশুকে বৃত্তি শিক্ষাও দিতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার শেষে যাতে শিক্ষার্থী উপার্জনক্ষম হয়ে উঠে সেইজন্য শিক্ষার্থীকে কিছু কাজ শিখতে হবে। পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষা হল শিশুর সমস্ত শক্তি মূলত মানসিক বৃদ্ধির স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশ। শিক্ষকের কাজ হবে শিশুর বিভিন্ন শক্তি ও বিভিন্ন সত্তাবলীর স্বরূপ ভালোভাবে জানা। সুতরাং শিশুর প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষককে পরিচিত হতে হবে ও সেই প্রকৃতি অনুযায়ী শিশুর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy):

শিশুর প্রকৃতিকে ভালভাবে জানা মানেই হল শিশুর মনোবিজ্ঞানের সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়া এবং সেই মনোবৈজ্ঞানিক আদর্শের উপর ভিত্তি করেই শিশুর শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলাই হবে সার্থক

শিক্ষাদানের প্রথম সোপান। শিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক করে তোলার আদর্শের পিছনে পেস্তালৎসী মূলত তাঁর সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করেছিলেন। পেস্তালৎসী শিক্ষাতত্ত্বের অন্যতম একটি দিক হল যে, তিনি শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপকরণ বলে মনে করতেন। শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুর নৈতিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করবে তাই নয়, সেই সাথে বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও অনুরূপ সংস্কার এবং পরিবর্তন আনবে। সমাজের উন্নয়ন ও পুনঃগঠনে শিক্ষার পরিহার্যতা পেস্তালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের মুলকথা। পেস্তলৎসীর মতে শিক্ষা কোনো বিশেষ শ্রেণি বা দলের জন্য নয়, বরং শিক্ষা হল সর্বজনীন এবং তাতে প্রত্যেকের আজন্ম অধিকার রয়েছে। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনগণের জন্য সর্বজনীন শিক্ষা মূলত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। পেস্তালৎসী লক্ষ্য করেছিলেন যে, শিশু যে প্রাকৃতিক শক্তি, আগ্রহ, সম্ভাবনা ও বিকাশোন্মুখতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে সেগুলিকে শিক্ষার নামে নস্ট করা হয় কারণ সত্যিকারের শিক্ষা হবে এগুলিকে পূর্ন ও বাধাহীনভাবে বিকশিত হতে দেওয়া। তাই তাঁর মতে আদর্শ শিক্ষা হল শিশুর মানসিক, নৈতিক, দৈহিক প্রভৃতি দিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। পেস্তালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের মূল বিষয় হল যে, তিনি শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে একটা সহজ ও প্রীতিময় আবহাওয়া সৃষ্টি করার কথা বলেছিলেন।

শিক্ষন পদ্ধতি (Method of Teaching):

পেস্তাসৎসী বলেছিলেন প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে হলে, শিক্ষাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে, শিক্ষাকে বাস্তব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক করতে হবে। তাই তিনি বস্তুকেন্দ্রিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন। পেস্তালৎসী মূলত রুঁশোর প্রকৃতিবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এনিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বুঝেছিলেন যে পৃথিবীকে যদি প্রকৃতির হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয় তবে শীঘ্রই তা কাঁটাগাছ ও আগাছায় পরিপূর্ণ হবে, তেমনি শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

- শিক্ষাদানের কৌশল হবে পর্যবেক্ষণ (Observation) ও ইন্দ্রিয়ানাভূতি (Sense perception)।
- ভাষা শিক্ষা হবে মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে।
- শিক্ষাদানের সময় বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানে বিন্যস্ত করতে হবে।
- শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, তথ্য পরিবেশনের উপর নয়।
- শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীদের মতামত এর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুস্থ ও সুন্দর থাকে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করা নয় বরং শিক্ষার্থীরা যাতে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের শিক্ষিত করতে পারে সেই অনুযায়ী তাদের প্রস্তুত করাই হল তাঁর প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

পাঠ্যক্রম (Curriculum):

"I want to psychologize education" অর্থাৎ পেস্তালৎসী শিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পেস্তালৎসী পাঠ্যক্রম তৈরি করেছিলেন। মৌখিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বস্তুভিত্তিক পাঠদান (Object Lesson)-এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি চাইতেন যে শিশুরা মূর্ত বিষয়বস্তু (Concrete Lesson) পর্যবেক্ষণ করে শিখবে। তিনি শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিক্ষাকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষা হবে শিশুর বয়স অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিন এবং এর সাথে সাথে কঠিন বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাগ করে শিক্ষা দিতে হবে। পেস্তালৎসীর প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমে লেখাপড়া, গণিতও মূলত মানসিক গণিত (Mental Mathematics) স্থান পেয়েছিল। পাঠ্যক্রমে ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি পরিচয় (Natural Study), অঙ্কন (Drawing), সঙ্গীত (Music), শরীরচর্চা, কৃষিকার্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি মূলত সামাজিক কল্যাণের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাকে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর বিদ্যালয় এর পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে লেখাপড়া ও গণিত (Reading, Writing, Arithmatic)-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল বিশ্ব প্রকৃতির অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য ধ্বনি (Sound), অবয়ব (Form) এবং সংখ্যার (Number) জ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই তিনি পাঠ্যক্রমে এই তিনটি মৌলিক উপাদান চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রকৃতি পরিচয় শিক্ষার্থীদের মনে বহির্জগৎ সম্পর্কে কৌতুহল জাগ্রত করে এবং ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মনে সহজে চেতনা জাগ্রত করে। তিনি শিক্ষার্থীদের জৈবিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য নিয়মিত দেহচর্চাকে শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং সঙ্গীতও তার পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল।

পেস্তালৎসী তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষণের ফলস্বরূপ একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর নাম উনি দেন বস্তুভিত্তিক পাঠদান (Object Lesson)। এই পদ্ধতির মূল নীতি হল যে, শিশুর শিক্ষা নিছক ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া হবে না, কোন মূর্ত বস্তুকে (Concrete Object) কেন্দ্র করে দিতে হবে এবং এর ফলে বস্তুটি সম্পর্কে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করবে তা বাস্তবধর্মী ও স্থায়ী হবে। এছাড়া এর সাহায্যে শিশুর পর্যবেক্ষণ ও কুশলতা বৃদ্ধি পাবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর সমগ্র মনের বিকাশসাধন সম্ভবপর হয়ে উঠে। পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষা হল মনের ছেদহীন বিকাশ এবং তা আসে মনের এমন কতকগুলি বিশেষ দিকের চর্চা থেকে। যার ফলে মনের এই বিশেষ দিকগুলোর চর্চাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর বৃদ্ধির যে কোন স্তরেই তার মানসিক বিকাশ সুষম ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। এই চর্চাও আবার নির্ভর করবে কথার উপর নয় বরং মূর্ত বস্তু (Concrete Object) পর্যবেক্ষণের উপর। মূলত শিক্ষার এই মৌলিক ব্যাখ্যা থেকেই পেস্তালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠদান (Object Lesson) এর পদ্ধতিটি জন্ম লাভ করেছে। পেস্তালৎসী প্রাথমিক শিক্ষায় মানসিক গণিতের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। পেস্তালৎসীর প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমে গণিত শেখানো হত মূর্ত বস্তুর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। লেখা ও আঁকা উভয় ক্ষেত্রেই সরলরেখা, বক্ররেখা প্রভৃতির সমাবেশের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা কুশলতা অর্জন করতো।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বানান করে অক্ষর শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে তার স্থানে উচ্চারণ করে

শব্দাংশ শিক্ষার পদ্ধতির অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছিল। ফলে ভাষা লেখাও অনেকবেশী সহজসাধ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতিও তিনি একইভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন। পেস্তালৎসী সর্বদাই চাইতেন যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে জ্ঞান বা বিদ্যা দেওয়া নয় বরং তার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকশিত করা যাতে শিশুর মানসিক শক্তির সাথে সাথে তার অর্জিত জ্ঞানকেও সুসমন্বিত করা যায়। সুতরাং শিক্ষাদান সর্বদাই শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে হবে। শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে যাতে শিশু ভালভাবে লিখতে পারে এবং শিক্ষণ সর্বদা সাধারণ ও সহজবস্তু দিয়ে শুরু হবে ও ধীরে ধীরে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ অনুযায়ী এগিয়ে যাবে।

বিদ্যালয় (School):

পেস্তালৎসী এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে, শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ বিকাশ ও তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনই হল শিক্ষার লক্ষ্য এবং এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা সম্ভব বিদ্যালয়ের মধ্যে। পেস্তালৎসীর মতে বিদ্যালয়ের পরিবেশ কৃত্রিম ও কঠোর হবে না বরং বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে গৃহের মত প্রীতিময় ও মধুর অর্থাৎ বিদ্যালয় হবে গৃহেরই প্রতিচ্ছবি (Transformed Home)। পেস্তালৎসী তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে কেবল লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুতোকাটা, কাপড়বুনা ইত্যাদি নানা প্রকার কার্যাবলিকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করেছিলেন। বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষার্থী স্নেহ ও প্রীতির মধ্য দিয়ে বড় হতে পারে তার উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। পেস্তালৎসীর মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা হবে সবার জন্য অর্থাৎ বিশেষ কোনো শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর জন্য নয়।

শিক্ষক (Teacher):

পেস্তালৎসীর মতে পর্যবেক্ষণ (Observation) এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sense-perception) হল সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি। সুতরাং শিক্ষা হল সামগ্রিক বিকাশের জন্য। আর এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে শিক্ষার প্রতিটি এককের জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সময় দিতে হবে। যাতে শিক্ষার্থী ভালভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সর্বদা ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

শৃঙ্খলা (Discipline):

পেস্তালৎসীর মতে শিক্ষা হল শিশুর প্রকৃতিদত্ত শক্তিগুলির সুষম বিকাশ এবং এই বিকাশ আসবে শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংহত কার্যাবলির মাধ্যমে। সুতরাং, শৃঙ্খলা হতে হবে মুক্ত শৃঙ্খলা। তাঁর মতে, শৃঙ্খলার বাধা নিষেধ থাকলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের দিকগুলি ব্যাহত হয়। সুতরাং শৃঙ্খলা হতে হবে মুক্ত এবং তা কোনো ভাবে আরোপিত হবে না।

গ্রন্থ (Writings)

- How Gertrude Teaches Her Children
- Leonard and Gertrude
- Letters on Early Education
- The Evening Hours of a Hermit
- Christopher and Elizababeth
- The Education of Man
- Letters of Pestalozzi on the Education of Infancy : Addressed to Mother

অবদান (Contribution):

শিক্ষায় পেস্তালৎসীর সব থেকে বড় অবদান হল মনোবৈজ্ঞানিক ধারার (Psychological Tendency) প্রবর্তন। পাঠ্য বিষয়কে শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সাজানোর কথা তিনি সর্বপ্রথম বলেছিলেন। পেস্তালৎসী রুঁশোর বৈপ্লবিক চিন্তাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্যকরূপে প্রয়োগ করে প্রগতিশীল শিক্ষার রূপটি স্পষ্ট করতে সহায়তা করেছিলেন। শিশুর শিক্ষা তিনি প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিতে চাননি, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের পক্ষাপাতী ছিলেন। প্রগতিশীল শিক্ষার রূপটি বিশ্বের সামনে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি ও সমাদর আদায় করেছিলেন।

সীমাবদ্ধতা (Limitation):

- তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ছিল না।
- তিনি মূলত রুঁশোর চিন্তাধারাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্ধভাবে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।
- তাঁর শিক্ষাদর্শনের কিছু কিছু বিষয় বাস্তবায়নে সমস্যা রয়েছে।
- পেস্তালৎসীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে।

উপসংহার (Conclusion) :

পেস্তালৎসী সুইজারল্যান্ড (Switzerland)-এ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল "Learning by head, hard and heart". এই মহান শিক্ষাবিদ 1827 সালের 17 ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেছিলেন। তাঁর অবদানের ফলে 1830 সালের মধ্যে সুইজারল্যান্ড -এ নিরক্ষরতার পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। শিক্ষার যুগসন্ধিক্ষণে পেস্তালৎসীর আবির্ভাব হয়েছিল এবং মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের মুহূর্ত শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পেস্তালৎসীর দ্বারাই শিক্ষাজগতে বহু নতুন বিষয় আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এবং বর্তমানে শিক্ষায় নানা সমস্যা নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে নানাবিধ গবেষণা চলছে এর মূলে পেস্তালৎসীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষাকে সত্যিকারের অর্থে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তৃতীয় একক

ফ্রডারিক উইলহেম অগাস্ট ফ্রয়েবেল
(Friedrich Wilhelm August Froebel)

ভূমিকা (Introduction):

ফ্রেডারিক উইলহেম অগাস্ট ফ্রয়েবেল 1782 সালের 21 এপ্রিল জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন চার্চের পুরোহিত। ফ্রয়েবেল-এর জন্মের পর তাঁর মাতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং ফ্রয়েবেলের মাতার মৃত্যু হয় যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় মাস বছর। ফ্রয়েবেলের পিতা পুনরায় বিবাহ করেন এবং ফ্রয়েবেল বিমাতার কাছে মানুষ হন। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত হয়ে ফ্রয়েবেল প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রকৃতির প্রতি সেবামূলক মনোভাব জাগ্রত হয়। প্রকৃতি চিন্তা থেকে ঈশ্বর চিন্তা ফ্রয়েবেলের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

1802 সাল থেকে 1805 সাল অবধি তিনি জমি পরিদর্শক (Land Surveyor) হিসাবে কাজ করেন। 1805 সালে ফ্রয়েবেল ফ্রাঙ্কফুটে নির্মাণরীতি (Architecture) নিয়ে পড়াশুনা করেন। 1802 সাল থেকে 1812 সাল অবধি ফ্রয়েবেল ভাষা এবং বিজ্ঞান নিয়ে গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Unitersity of Gottingen) পড়াশুনা করেন। 1812 সাল থেকে 1816 সাল অবধি খনিবিজ্ঞান/ধাতুবিদ্যা (Mineralogy) অধ্যয়ন করেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় (Univesity of Berlin)-এ।

ফ্রয়েবেল ছিলেন জোহান হেনরিক পেস্তালৎসীর অনুগামী। 1805 সালে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর কর্মের ব্যাপ্তি বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁর জীবনে অত্যন্ত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে 1816 সালে তাকে স্টকলহোম (Stockholm)-এ অধ্যাপকের জন্য আহ্বান করা হয় কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে German General Educational Institute স্থাপন করেন।

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education):

মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐক্য বিদ্যমান তাকে উপলব্ধি করা। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে সেই চরম সত্যের উপলব্ধি করা। এর জন্য বাইরের কোনো প্রচেষ্টার দরকার নেই তার কারণ শিশু নিজেই হল সক্রিয়। এই সক্রিয়তার মাধ্যমে তার সকল সক্রিয়তা বিকশিত হয়ে উঠবে। শিক্ষকের কাজ হবে শুধু তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy):

ফ্রয়েবেল ছিলেন মূলত ভাববাদী এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে জগতের সমস্ত জীবন ও প্রকৃতির সত্তার মধ্যে একটি শক্তি বিরাজ করছে। এই শক্তি হল ঈশ্বর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবজীবনের ও সমগ্র বিশ্বজগতের মূলে আছে এক একক অধ্যাত্মশক্তি এবং মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সেই আধ্যাত্মিক শক্তি ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা।

রুশো ও পেস্তালৎসীর ন্যায় ফ্রয়েবেলের সমস্ত শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা শিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, Come let us live for the children. ফ্রয়েবেল মূলত ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক। তিনি ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant), জর্গ উইলহেম ফ্রেডারিক হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel), জোহান গটলিব ফিচ্‌ট (Johann Gotlieb Fichte) প্রমুখ বিখ্যাত দার্শনিকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ফ্রয়েবেল জেন-ব্যাপটিস্ট পিয়েরী আন্তনে ডে মনেট কেভালিয়ের ডে ল্যামার্কের (Jean-Beptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarek)-এর বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শনে ভাববাদ ও বিবর্তনবাদ এই দুই বিপরীত চিন্তাধারার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল এবং তাঁর শিক্ষাদর্শনে আধ্যাত্মবাদ, বিবর্তনবাদ, মনোবৈজ্ঞানিক কর্মবাদ মিশ্রিত হয়ে গেছে। ফ্রয়েবেল-এর শিক্ষাদর্শনের মূল বিষয়বস্তুকে নিম্নে বিবৃত করা হল :

আধ্যাত্মিক একতার তত্ত্ব (Theory of Divine Unity):

ফ্রয়েবেলের মতে সমগ্র বিশ্বে নিহিত রয়েছে এক আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং ঈশ্বর সমস্ত শক্তির উৎস ও সবকিছু এক আধ্যাত্মিক ঐক্যে বাঁধা। তাঁর মতে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হবে বিশ্বের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক একতাকে উপলব্ধি করা ও এই আত্মোপলব্ধিই হল প্রকৃত শিক্ষা। কেবলমাত্র সক্রিয়তার সাহায্যেই শিশুর অন্তরস্থিত আধ্যাত্মিক একতাকে জাগিয়ে তোলা যায়।

আত্মসক্রিয়তার তত্ত্ব (Theory of Self Activity):

শিশুর অন্তর্নিহিত সক্রিয়তাকে বিকশিত করার জন্য বাইরের কোনো শক্তির প্রয়োজন নেই এবং শিশুর সহজাত আত্ম-সক্রিয়তা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ফ্রয়েবেল এই তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সর্ববস্তুর চিরন্তন ঐক্য বা অভিন্নতা এবং মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল এই শাশ্বত স্বর্গীয় একতাকে উপলব্ধি করা ও বিকশিত করা। শিক্ষার লক্ষ্যও তাই হওয়া উচিত এবং এর জন্য বাইরের কোনো প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই কারণ শিশু নিজেই স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হতে পারে। শিশুর এই অভ্যন্তরীণ সক্রিয়তাকেই ফ্রয়েবেল যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ও গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

উন্মেষণ তত্ত্ব (Theory of Unfoldment) :

ফ্রয়েবেলের ধারণা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। ফ্রয়েবেল এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন উন্মেষণ (Unfoldment)। শিশু ভবিষ্যতে যা হবে তা শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই নিহিত থাকে ও শিশু এই বহুমুখী ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বিকশিত হতে থাকে। শিক্ষাকে উন্মেষণ প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করার ফলেই ফ্রয়েবেল উদ্ভিদ জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর

বৃদ্ধির তুলনা করেছেন। একটি বীজের মধ্যে যেমন সমগ্র বৃক্ষটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি একটি শিশুর মধ্যে সমস্ত কিছু সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং শিশুর ক্রমবিকাশে কোনোভাবেই বাধা প্রদান করা উচিত নয়।

পাঠ্যক্রম (Curriculum):

ফ্রয়েবেল প্রকৃতি পরিচয় (Nature Study)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে, শিশুর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র বিকাশে সহায়ক হল মূলত প্রাকৃতিক জ্ঞান। ফ্রয়েবেল তাঁর প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে গণিত, ভাষা, অংকন, মাটির কাজ, কাঠের কাজ, বাগানের কাজ, নাচ, গান, খেলা ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। ফ্রয়েবেল তাঁর প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন কারণ তাঁর মতে এগুলির দ্বারা ঈশ্বর চেতনার বিকাশ ঘটে থাকে শিশুদের মধ্যে।

ফ্রয়েবেল প্রকৃতি পরিচয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন, কারণ তাঁর মতে প্রকৃতি শিশুর কাছে এক বিরাট ঐক্যের সংকেত বহন করে নিয়ে আসে এবং এই সংকেত দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হলে শিশু তার মানসিক জীবনে ঐক্য আনতে পারবে, ফলে তার নৈতিক জীবনের বিকাশ এর পথ সুগম হবে।

ফ্রয়েবেলের মতে ভাষা হল মূলত সাংকেতিক ভাব যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বসত্তার সঙ্গো ঐক্য স্থাপনে সম্ভবপর হতে পারবে। তাঁর মতে যোগাযোগ যেহেতু কথোপকথনের মাধ্যমে আসে তাই তিনি কথা বলার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

ফ্রয়েবেল গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে ধর্ম যেমন – হৃদয়ের সাথে যুক্ত তেমনি গণিত ও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাথে যুক্ত। গণিত মানুষের বৌদ্ধিক শক্তিকে যেমন বিকশিত হতে সহায়তা করে ঠিক তেমনি বিশ্বজগতের ঐক্যের সূত্র খুঁজে বের করতে সহায়তা করে থাকে।

ফ্রয়েবেল হাতের কাজের উপরও প্রচুর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর বর্ণিত পাঠ্যক্রমে হাতের কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ তাঁর মতে এর শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে। ফ্রয়েবেল হাতের কাজ বলতে বুঝিয়েছেন কাদা, বালি, কাঠ, কাঠের গুঁড়ো দিয়ে নানা জিনিস গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে ঘনবস্তুর সঙ্গো শিশুর নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠে। আবার কাগজের কাজ, মাদুর বোনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে, হস্ত সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়ে। নতুন বস্তু সৃষ্টির মাধ্যমে শিশু আনন্দ উপলব্ধি করে ও নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এর দ্বারা শিশু প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টির আনন্দ ও পরোক্ষভাবে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারে।

ফ্রয়েবেল নাচ, গান, খেলাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন কারণ এগুলির মাধ্যমে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বজগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়ে থাকে। ফ্রয়েবেল ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান পাঠকে অনুবন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার কথা বলেছিলেন। ফ্রয়েবেল অঙ্কন পাঠকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন কারণ তাঁর মতে এর দ্বারা শিশুর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে থাকে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটে থাকে।

বিদ্যালয় (School):

ফ্রয়েবেলের মতে বিদ্যালয় হবে ক্ষুদ্র সমাজ যেখানে শিশুরা সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলি যেমন– সহযোগিতা, সহমর্মিতা, কর্তব্যবোধ, ন্যায়, সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি অর্জন করবে। ফ্রয়েবেল এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে ঐক্য বিরাজ করছে বিদ্যালয়েও সেই ঐক্যের প্রতিফলন হওয়া উচিত এবং এইরকম বিদ্যালয়ের দ্বারা শিশু সমাজ জীবনের উপযোগী প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। তাই ফ্রয়েবেল বিদ্যালয়কে “Epitome of the World” (বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যালয়ের কাজ হল পাঠদানের মাধ্যমে শিশুকে জ্ঞান প্রদান করা নয় বরং শিশুকে একটি জীবন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া।

শিক্ষক (Teacher):

ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে পরম শাশ্বত ও আধ্যাত্মিক ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে তা উপলব্ধি করা এবং এর জন্য বাইরের কোনো শক্তির প্রয়োজন নেই। ফ্রয়েবেলের মতে শিশুরা হল উদ্যানের চারাগাছ ও শিক্ষক হবেন মালী। শিক্ষকের কাজ হল শিশুকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বিকশিত হতে সাহায্য করা এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের একটি সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এছাড়াও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ অনুযায়ী বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মবিকাশে সহায়তা করবেন কারণ তাঁর মতে স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে তার থেকে ভালো ফল লাভ করা সম্ভবপর হবে না।

শৃঙ্খলা (Discipline):

ফ্রয়েবেল কৃত্রিম বা আরোপিত শৃঙ্খলার বিশেষ বিরোধী ছিলেন এবং শিশুর বিকাশ যাতে স্বাধীন ও সক্রিয়ভাবে হতে পারে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা শিখবে স্বীয় কাজকর্মের (Self-activities) মাধ্যমে এবং জোর করে কোনো বাঁধাধরা কিছু শিক্ষার্থীদের উপর চাপানো চলবেনা। তাঁর মতে শৃঙ্খলা সামাজিক জীবনযাপনের উপযোগী হবে যা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের দলগত কাজকর্ম ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিখবে। ফ্রয়েবেলের মতে, শারীরিক শাস্তি ও শাসন এর কোন স্থান নেই শৃঙ্খলা রক্ষায়।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching):

ফ্রয়েবেলের মতে আত্ম-সক্রিয়তাই হবে শিক্ষণের মূল ভিত্তি। তাঁর মতে খেলাই হল শিক্ষার মূল মাধ্যম ও খেলার দ্বারাই শিশু আনন্দ, স্বাধীনতা ও তৃপ্তি লাভ করে থাকে। ফ্রয়েবেল তাঁর বর্ণিত শিক্ষা পদ্ধতিতে মৌখিক শিক্ষার চেয়ে আত্ম-প্রকাশের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নার্সারি গান (Nursery Songs), মাদার প্লে (Mother play) এবং উপহার ও কাজ (Gift and Occupation)-এর ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। মাদার প্লে শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে এবং সহযোগিতামূলক কার্যের পরিবেশের সুযোগ সৃষ্টিতে

সহায়তা করে থাকে।

ফ্রয়েবেল 1837 সালে 'Bad Blackenburg'-এ শিশু শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং দুবছর পর এর নামকরণ করা হয় 'Kindergarten' নামে। ফ্রয়েবেল অনুভব করেছিলেন যে সমগ্র পৃথিবীর পুনর্গঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন। 'Kindergarten' -এর অর্থ হল শিশু উদ্যান অর্থাৎ তাঁর মতে, বিদ্যালয় হল একটি উদ্যানস্বরূপ। শিশুরা হল সেই উদ্যানের চারাগাছ ও শিক্ষক হলেন তার মালী। শিক্ষার দ্বারা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করা হয়। ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষা জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, শারীরিক শাস্তি ও শাসন ইত্যাদির স্থান শিক্ষাক্ষেত্রে গৌণ হওয়া উচিত।

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে ও এই আত্মসক্রিয়তাকে তিনি শিক্ষণের মূল পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শিশুর এই আত্মসক্রিয়তা সব থেকে সার্থকভাবে প্রকাশ পেতে পারে খেলার মাধ্যমে। কারণ ফ্রয়েবেলের মতে শিশু নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে ও খেলার মাধ্যমে চিরশাশ্বত সত্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে। তিনি কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রকৃতির সাহায্যে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং যথার্থই বলেছেন, Nature reveals God to the child. অর্থাৎ প্রকৃতি শিশুর সম্মুখে ঈশ্বরের ধারণা প্রস্ফুটিত করে।

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি :

তিনি কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বস্তুভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি ও হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বস্তুগুলির নাম দিয়েছেন 'উপহার' (Gift) ও কাজগুলির নাম দিয়েছেন 'বৃত্তি' (Occupation)। এইসব বস্তুর মাধ্যমে ফ্রয়েবেল জগতের নিয়মাবলিকে সাংকেতিকভাবে শিশুর কাছে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। এগুলির মাধ্যমে শিশু বস্তুজগত সম্পর্কে ধারণা পেয়ে থাকে এবং এগুলি শিশুর অন্তদর্শনে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি, কাঠের কাজ, তাঁত বোনা, ছবি আঁকা ইত্যাদিকে তিনি বৃত্তি হিসাবে নির্বাচন করেছেন এবং এগুলির মাধ্যমে শিশু নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষণ পদ্ধতির আর একটি দিক হল ছড়া ও গানের মাধ্যমে শিক্ষাদান। গানকে তিনি দু-ভাগে ভাগ করেছেন– মায়ের গান ও খেলার গান। তিনি সাতটি মায়ের গান ও পঞ্চাশটি খেলার গানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। গানগুলির উপযোগিতার দিক থেকে তিনি তাদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা–

১) ছোট শিশুদের জন্য রূপকথার গান। এর দ্বারা শিশুর কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করা যায়।

২) অপেক্ষাকৃত বড়োদের জন্য বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি বিষয়ক গান।

৩) চন্দ্র, সূর্য, তারা প্রভৃতি বিবরণ সংকলিত গান।

৪) নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী উপদেশমূলক গান।

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:

- আত্মসক্রিয়তা (Self-activity) এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষা (Playway Education) এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় শিশুদের ছড়া, গান ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে।
- শিশুদের ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালনার প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে এবং শিশু বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়।
- শিক্ষায় আনন্দানুভুতি সৃষ্টি করা কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এর জন্য ফ্রয়েবেল শিশুদের খেলার সুযোগ প্রদান করার কথা বলেছেন।
- সংগীত কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গানের ও তালের প্রতি শিশুরা স্বাভাবিকভাবে আকৃস্ট হয় ফলে শিশুদের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়।
- এই পদ্ধতিতে প্রকৃতি অনুশীলনের (Nature Study) ফলে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে।

উপহার ও হাতের কাজ (Gift and Occupation):

শিক্ষার জন্য ফ্রয়েবেল দুটি ধারণার কথা বলেছিলেন যথা– উপহার (Gift) এবং হাতের কাজ (Occupation)। তিনি শিশুর মানসিক স্তর অনুযায়ী ও জগতের মৌলিক নিয়মগুলির প্রতীক হিসেবে উপহার ও বহু সংখ্যক শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আকর্ষণকারী হাতের কাজ আবিষ্কার করেছেন।

গোলক হচ্ছে ঐক্য ও সুখ-সামঞ্জস্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গোলক হল ঈশ্বরের প্রতীক। বল-এর মাধ্যমে গোলক তথা ঈশ্বরকে বোঝা ও বিশ্বের নিয়ম বোঝা অনেকটা সহজ হয়।

কাঠের তৈরি গোলক, কিউব ও সিলিন্ডার-এর মধ্যে দিয়ে শিশু তার পূর্ব পরিচিত গোলকের তুলনা করে নতুন দুটি আকারের পার্থক্য ও সাদৃশ্য বুঝতে পারে।

আবার কাঠের ঘনককে 4 টি সমান ছোট ঘনকে খণ্ডিত করা এবং এর সাহায্যে চেয়ার, সিংহাসন, দরজা, সিঁড়ি করা যায়। ফ্রয়েবেল এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে সমস্ত কিছুর মূল উৎস হল এক অর্থাৎ ঈশ্বর এবং এর থেকে নানা বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে।

উপহারগুলি থেকেই শিশু বিভিন্ন রূপ ও শ্রেণির সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে এবং জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির নানা রূপ গঠনে শিশু উৎসাহিত হয়ে থাকে। উপহার (Gift) হল বিভিন্ন ধরনের কিউব, বল ইত্যাদি এবং উপহারগুলি হল প্রতীক বিভিন্ন বিষয়ের; যেমন– বল হল আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। উপহারগুলির আকৃতি অপরিবর্তনশীল কিন্তু কাজগুলি হল পরিবর্তনশীল আকারের বস্তু যেমন– মাটি, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি। উপহারগুলি পাবার পর কাজ (Occupation) আরম্ভ হয় এবং উপহার ও কাজের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ফ্রয়েবলের দ্বারা বর্ণিত হাতের কাজের ধারণা উপহার থেকে অনেক পরিণত এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির অনুশীলনের ব্যবস্থা মূলত অনেকটাই মনোবিজ্ঞানসম্মত।

মূলত পেস্তালৎসীর বস্তুভিত্তিক পদ্ধতিটিকেই (Objective Lesson) ফ্রয়েবেল অনেকটা পরিবর্তিত করে গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রয়েবেল বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট সংখ্যক মূর্ত বস্তুর প্রবর্তন করেছিলেন এবং এগুলির মধ্যে কিছুকে তিনি উপহার (Gift) ও আবার কিছুকে কাজ (Occupation) নাম দিয়েছিলেন। ফ্রয়েবেল উপহারগুলিকে বিশেষ বিশেষ আকৃতিসম্পন্ন ও বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতীকরূপে শিশুর কাজে উপস্থাপিত করানোর ব্যবস্থা করেন এবং যে সমস্ত বস্তুর আকৃতি পরিবর্তনশীল সেগুলি কাজের (Occupation) পর্যায়ে পরে। যেমন– বালি, মাটি, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি।

ফ্রয়েবেলের মতে, শিশু একা হলেও সে যে আর দশজনের মধ্যে একটা বিরাট সত্তার অন্তর্গত একটি অংশ, এই চরম সত্যটা শিশুর পক্ষে নিতান্তই জানা প্রয়োজন। সুতরাং, যৌথকর্ম, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি ফ্রয়েবেল প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর পেছনে ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতিটির অবদান অনস্বীকার্য।

খেলা, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা ইত্যাদি বহুবিদ কাজকে শিশুর দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত রাখা হয়েছে যার মধ্যে খেলা অন্যতম। ফ্রয়েবেলের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী উপকরণ হল গল্প, এগুলি শিশুদের মন থেকে শুরু করে তাদের ভাষা, গান, খেলা সকল বস্তুকেই প্রভাবিত করে থাকে।

গ্রন্থ (Writings):

- The Education of Man
- Autobiography of Friedrich Froebel
- The Pedagogics of the Kindergarten
- Inventing Kindergarten : An Autobiography of Friedrich Froebel
- Letters on the Kindergarten
- Revival : Autobiography of Friedrich Froebel
- Mother-play and Nursery Songs

অবদান (Contribution):

- ফ্রয়েবেল হলেন এমন একজন শিক্ষাবিদ যিনি কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী শিশুর সক্রিয়তার একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক করা যায়। ফ্রয়েবেল বলেছিলেন যে শিশুর ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম হল খেলা। ফলে শিক্ষায় খেলার গুরুত্ব বর্তমানে দ্রুত প্রাসঙ্গিক হতে পেরেছে।
- ফ্রয়েবেল শিক্ষায় হাতের কাজ, গল্প বলা, গান ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং শিক্ষাকে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় ও বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, ফলে শিক্ষায় স্বাধীনতা দানের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। কারণ, শিক্ষায় বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ও কৃত্রিমতা সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে রাখার ব্যাখ্যা ফ্রয়েবেল তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতিতে বলেছিলেন। ইহা

ছাড়াও তিনি পাঁচ থেকে আট বছরের শিশুদের শিক্ষার কথা বলেছিলেন, যাতে শৈশবের শিক্ষাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা যায় এবং এর দ্বারা শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে কার্যকরী করা সম্ভবপর হবে।

- খেলাকে শিক্ষায় তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং শিশুদের দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয় সতেজ করে তোলার ব্যাপারে নানা ধরনের উপহার ও কাজের ব্যবহার করেছেন, ফলে এর দ্বারা বহির্জগতের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আসে।
- শিক্ষায় আত্ম-সক্রিয়তা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা ফ্রয়েবেল আলোকপাত করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা, গল্প, গান, অংকন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাকে সহজ ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার সার্থক প্রয়াস করেছিলেন।
- ফ্রয়েবেল দলবদ্ধ কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং বিভিন্ন উপহার ও কার্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় চর্চার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
- ফ্রয়েবেল কিন্ডারগার্টেনে যে উপহারগুলির কথা বলেছেন এর একটি বিশেষ অনুক্রম রয়েছে। ফ্রয়েবেল রুঁশোর প্রগতিশীল শিক্ষানীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।
- তিনি তাঁর বিদ্যালয়কে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন এবং বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা বর্তমানে শিক্ষায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
- ফ্রয়েবেল যুক্তি প্রদান করেছিলেন যে, শিক্ষকের কার্য শিক্ষার্থীর উপর জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং তার আত্ম সক্রিয়তা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা।
- ফ্রয়েবেল শিশুর শিক্ষা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম থেকে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন এবং শিশুর কর্ম নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা দান করেছেন।
- ফ্রয়েবেলই সর্বপ্রথম শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার কথা বলেছিলেন এবং বৃত্তিসমূহের মাধ্যমে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন।

সীমাবদ্ধতা (Limitation):

- পরিবেশ-এর প্রভাব ফ্রয়েবেল মূলত স্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে যেহেতু শিশুর চরম পরিণতি তার জন্মের মধ্যেই নিহিত থাকে, তাই পরিবেশের কোনো শক্তিই তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে না।
- ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বে পরিবর্তনের কোনো মূল্য স্বীকার করা হয়নি এবং সমস্ত ঘটনাই পূর্ব নির্ধারিত ও সত্যিকারের নতুন বা অপ্রত্যাশিত বলে কিছুই নেই। তাঁর মতে শিশুর পরিণতি পূর্ব নির্ধারিত, তাই শিশুকে যে শিক্ষাটি দেওয়া হোক বা না হোক শিশু তার লক্ষ্যে গিয়ে ঠিক পৌঁছবেই। সুতরাং, শিক্ষকের গুরুত্ব অনেকটাই কম প্রদান করা হয়েছে।

- ফ্রয়েবেল বর্ণিত "Theory of Unfoldment" অনুযায়ী পরিবেশের কোনো ক্ষমতা নেই শিশুর শিক্ষাকে প্রভাবিত করার।
- শিক্ষায় প্রতীকের ব্যবহার এর ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারে প্রতীকের ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। প্রতীকের মাধ্যমে কোনো বিমূর্ত বিষয় শিশুকে শিক্ষাদান করা অনেকটাই কষ্টসাধ্য বিষয়।
- ফ্রয়েবেল প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি মূলত শিশুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন নি।
- কিন্ডারগার্টেন প্রথায় লিখন ও পঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।
- শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে ফ্রয়েবেল বংশধারাকেই গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং ফ্রয়েবেল পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করেননি কিন্তু শিশুর বিকাশ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল এবং কেবলমাত্র বংশগতি একমাত্র ইহার নির্ধারক হিসাবে কাজ করতে পারেনা।
- ফ্রয়েবেল উপহার কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট যুক্তি প্রদান করতে পারেন নি, ফলে কিসের ভিত্তিতে উপহার নির্বাচিত করতে হবে তা মূলত অনেকটাই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য।
- ফ্রয়েবেলের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রকৃতি পরিচয় (Nature Study) এবং বস্তুভিত্তিক পাঠদান (Object Lesson) এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র এদের সাহায্যে শিশুকে সবকিছু শিখানো সম্ভবপর হয় না।
- প্রতিটি শিশু তার আগ্রহ, রুচি, সামর্থ্য অনুযায়ী পৃথক, তাই সমস্ত শিশুর শিক্ষা এক ধরনের হতে পারেনা, কিন্তু ফ্রয়েবেল শিশুদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য রয়েছে তা স্বীকার করেননি।
- ফ্রয়েবেল যেসব উপহার এর কথা উল্লেখ করেছেন তার মূলে কোনো যুক্তি বা নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং এগুলি সকল দেশের জন্য উপযোগীও নয়।
- ফ্রয়েবলের শিক্ষা পদ্ধতি উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে কার্যকরী পদ্ধতি নয়।
- ফ্রয়েবেল তাঁর কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে যে 'উপহার' এর কথাগুলি করেছেন তা কোনো যুক্তির ভিত্তিতে হয়নি বরং এগুলির পটভূমি হল ফ্রয়েবেল-এর দর্শন ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য।
- কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঠদান এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন, যার ব্যবস্থা করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর নয়।

উপসংহার (Conclusion):

কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দার্শনিকগণ সরব হয়েছিলেন এবং তাঁরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে সহায়তা করেছিলেন। মূলত ফ্রয়েবেলের কর্ম প্রচেষ্টার জন্যই শিক্ষা বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক ও যান্ত্রিকতার বাধন থেকে মুক্ত। বংশগতির প্রভাব শিক্ষায় যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা ফ্রয়েবেল সকলের প্রতি

দৃষ্টিপাতে সমর্থ হন এবং পুঁথিগত বিদ্যালয়ে শিক্ষা যা চার দেওয়ালের মধ্যে আছে তার দ্বারা সার্থক শিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর হয় না; এই ধারণাটিও মূলত ফ্রয়েবেলের কিন্ডারগার্টেন তাঁর জীবনদর্শনের সাথে সাথে অবলুপ্ত হয় তা নয় বরং এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমগ্র দেশে সমাদৃত হয়, ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই বিদ্যালয়ের অনুকরণে শিশুদের জন্য একাধিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে।

ফ্রয়েবলের জীবনদর্শনের মধ্যে ভাববাদ (Idealism) এবং বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ (Scientific Evolution)-এর সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর জীবন-দর্শনে প্রাচীন ভারতীয় উপনিষদের প্রতিধ্বনি দেখা যায়। জগতের সমগ্র জীবন ও প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে একই শক্তি বিরাজ করছে এবং এই শক্তি মানুষের জীবনের সমস্ত ঘটনাকে একক নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। ফ্রয়েবেল মূলত এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তি আন্তরিক উপলব্ধির মাধ্যমে বহির্জগতের পরিণতিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবে।

ফ্রয়েবেল শিশুর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষকের দায়িত্ব ও পুননির্ধারণ করেন কারণ তাঁর মতে শিক্ষকের কাজ হল শিশুর মধ্যে আত্মসক্রিয়তা জাগ্রত করা, জ্ঞান দান করা নয়। শিশুকে তার মনোধর্মী অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে, এটাই ছিল তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথা। তিনি শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানধর্মী করে তোলার জন্য উপহার ও বৃত্তির ব্যবহার করেছিলেন এবং আধুনিক অর্থে এগুলিকেই শিক্ষণ সহায়ক প্রদীপণ (Teaching Aids) হিসাবে বিবেচনা করা যায়। আর এ সমস্ত কিছুর জন্য ফ্রয়েবেলের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি 1852 সালের 21 শে জুন পরলোক গমন করেন।

চতুর্থ একক
মারিয়া মন্তেস্বরী
(Maria Montessori)

ভূমিকা (Introduction):

মারিয়া মন্তেস্বরী 1870 সালের 31শে আগষ্ট ইটালির চিয়ারাভেলী (Chiaravalle) নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মারিয়ার পিতার নাম ছিল অ্যালসান্‌ড্রো মন্তেস্বরী (Alessandro Montessori) এবং মাতার নাম ছিল রেনিলডে স্টোপ্পানি (Renilde Stoppani)। ছোটোবেলা থেকেই মারিয়া মন্তেস্বরী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, আত্মসচেতন এবং চূড়ান্ত আশাবাদী। তিনি অতি সহজেই কোনো বিষয় শিখতে পারতেন ও উপলব্ধি করতে পারতেন।

ছয় বছর বয়সে মারিয়া মন্তেস্বরী, 1876 সালে 'Public Elementary School'-এ ভর্তি হন, তের বছর বয়সে অর্থাৎ 1884 সালে মারিয়া 'Regia Scuola Technica Michelangelo Buonarroti' তে ভর্তি হন। ষোল বছর বয়সে অর্থাৎ 1886 সালে মারিয়া মন্তেস্বরী 'Regio Institute Technico Leonardo da Vinci' তে ভর্তি হন এবং কুড়ি বছর বয়সে স্নাতক হন। 1893 সালে মারিয়া মন্তেস্বরী রোম বিশ্ববিদ্যালয় (University of Rome)-এ ভর্তি হন এবং 1896 সালে প্রথম ইটালিয় মহিলা হিসাবে মেডিসিনে স্নাতক হন। তিনিই ছিলেন প্রথম ইটালিয় মহিলা চিকিৎসক এবং রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসিক চিকিৎসা বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। মারিয়া মন্তেস্বরী যদিও একজন প্রশিক্ষিতা শিক্ষিকা ছিলেন না কিন্তু তিনি শিক্ষার তত্ত্বগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এর দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে শিশুদের যেভাবে পড়ানো উচিত তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তাদেরকে পড়ানো হচ্ছে। তিনি চাইতেন যে শিশুর জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলিকে এমন সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করা উচিত যাতে শিশুদের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে। তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যেখানে শ্রেণিকক্ষে সমষ্টিগত শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই বলা হয় মারিয়া মন্তেস্বরী শ্রেণি শিক্ষার মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। (She tolled the knell of class teaching.)

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education):

মারিয়া মন্তেস্বরী বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল শিশুর অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার বিকাশ সাধন। শিশুর মধ্যে যে জন্মগত ক্ষমতা রয়েছে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মেষে সাহায্য করাই হল শিক্ষার কাজ। তাই মারিয়া মন্তেস্বরী স্ব-শিখন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শিক্ষাদর্শন (Philosophy of Education):

মারিয়া মন্তেস্বরীও মূলত জেন মার্ক গেসপার্ড ইটার্ড (Jean Marc Gaspard Itard) এবং এডোয়ার্ড সেগুইন (Edouard Seguin), ফ্রেডারিক উইলিয়াম অগাস্ট ফ্রয়েবেল (Friedrich Wilhelm August Froebel), জ্যাঁ জ্যাকুইস রুঁশো (Jean-Jacques Rosseau), জোহান হেনরিক্ পেস্তালৎসী (Johann Heinrich Pestalozzi)-এর শিক্ষাদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এমন একটি নীতির বিকাশ ঘটালেন যার সর্বপ্রথম ছিল ইন্দ্রিয়গুলোর ক্ষিপ্রতা দান এবং অতঃপর বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণ। মারিয়া মন্তেস্বরীর জীবন দর্শনের মূলে ছিল সেবামূলক মনোভাব আর এই সেবার অনুপ্রেরণা রূপান্তরিত হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অজ্ঞতাই মানুষের জীবনের সমস্ত রকম বিপর্যয়ের কারণ তাই তার সার্বিক উন্নতি করতে হলে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ তিনি শিক্ষাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, Education is the active help given to the normal expansion of the life of the child. অর্থাৎ শিশুর স্বাভাবিক জীবন বিকাশে তাকে যে সক্রিয় সহায়তা করা হয় তাই হল শিক্ষা।

মারিয়া মন্তেস্বরীর কাছে শিক্ষা কোনো আদর্শ নয় বরং কতকগুলো কৌশলের সমন্বয়। তিনি বিশ্বাস করতেন শিশু কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর দিক থেকে সে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, মারিয়া মন্তেস্বরী তাঁর শিক্ষাদর্শনে এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং এই ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হল দুটি : একটি হল বিকাশ এবং অপরটি হল স্বাতন্ত্র্য। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শিশুর জীবন বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching):

মারিয়া মন্তেস্বরী ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন ও ত্রুটিযুক্ত শিশুদের চিকিৎসা ও মানসিক উন্নয়ণের জন্য সেগুইন ও ইটার্ডের পরিকল্পিত পদ্ধতিগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং এদের অভাবিত সাফল্য লক্ষ্য করে তিনি স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষার মতোই পদ্ধতি প্রয়োগের কথা অনুধাবন করলেন। তৎকালীন সময়ে শিক্ষা ছিল মূলত পুঁথিকেন্দ্রিক; পুঁথিগত বিদ্যা আহরণ ছিল শিক্ষার্থীদের একমাত্র কাজ, শিক্ষক ছিল একমাত্র বক্তা এবং শিক্ষার্থী ছিল নিষ্ক্রিয় শ্রোতা; ফলে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক শিক্ষক পরিবেশিত জ্ঞান শিক্ষার্থীকে গলাধঃকরণ করতে হত। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্ত্বার কোনো স্বীকৃতি ছিল না, তাদের সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, কর্মপ্রবণতা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ প্রবাহ বেতের শাসনে অবদমিত হত। পিন্‌বদ্ধ প্রজাপতি শ্রেণির মতো তারা নিশ্চল থাকত। (Crows of butterflies transfixed with pins.) মারিয়া মন্তেস্বরী শিশুদের এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রুখে দাঁড়ালেন এবং 1907 সালে রোম-এ প্রতিষ্ঠা করলেন কাসা দাই বামবিনি (Casa dei Bambini) যার অর্থ হল- শিশুদের জন্য গৃহ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবহার শুরু করলেন যা অসামান্য সফলতা লাভ করল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পদ্ধতি ‘মন্তেস্বরী পদ্ধতি’ নামে বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করল।

মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাধীনতা এবং এই ব্যবস্থায় শিশুর

স্বাধীনতাই প্রথম ও শেষ কথা। (Freedom first, freedom second and freedom last.) মারিয়া মন্তেস্বরী ছিলেন শিশু প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল ও নৈব্যক্তিক পর্যবেক্ষক এবং বাস্তববাদী সংস্কারক। তিনিই শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা ও আত্মসক্রিয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক করে তুলতে সহায়তা করেছিলেন। শিশুর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতাকে একত্র হিসাবে গণ্য করেছেন এবং একে শিশুর আত্মবিকাশে অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। তিনি চাইতেন যে, স্বাধীনতা ও আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

আত্মসক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বা ‘Auto-Education’-এর কথাও বলেছেন। আত্মশিক্ষণের মাধ্যমে যেমন আত্মবিশ্বাস ঘটে তেমনি আত্মবিকাশ না হলে আত্মশিক্ষণও সম্ভবপর নয় অর্থাৎ উভয়েই পরস্পর নির্ভরশীল। কাজের মাধ্যমে শেখা (Learning by Doing) এবং নিজে শেখা (Self-learning)। এটাই হল মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আত্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিসত্ত্বা-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠে। মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বিষয় হল মানসিক প্রস্তুতি (Mental Set)। মারিয়া মন্তেস্বরী বলেছিলেন যে শিশুর মধ্যে যখন শেখার আগ্রহ আপনা থেকে জন্মাবে শিশু তখনই শিখবে। শিশু মনের থেকে কিছু শিখতে চাওয়ার আগ্রহের সময়টি মারিয়া মন্তেস্বরী বলেছিলেন, ‘Psychological Moment’। তাঁর মতে পরিণত ব্যক্তি হয়ে ওঠার সমস্ত গুণই শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, শিক্ষার কাজ হল উপযুক্ত সহায়তা দানের মাধ্যমে সেগুলোকে প্রকাশ করে তোলা। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন করা ও সেই সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ সাধন করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মারিয়া মন্তেস্বরী বিশ্বাস করতেন।

মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষণ পদ্ধতি মূল তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেগুলি হল নিম্নরূপ:

প্রথমত: শিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি শিশুর ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার (Sense Training) উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। শিশুরা প্রধানত ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় বহির্জগত থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। মারিয়া মন্তেস্বরী তাঁর চিকিৎসা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে শিশুদের মধ্যে মানসিক অনগ্রসরতার জন্য দায়ী হল তাদের ইন্দ্রিয় পরিচালনার অক্ষমতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে না বলে শিশুরা অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং তার ফলে তারা মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে প্রথমেই তার ইন্দ্রিয়কে অভিজ্ঞতা গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই কারণে তিনি বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলোকে বলা হয় ‘ডিডাকটিক্ অ্যাপারেটাস’ (Didactic Apparatus)।

দ্বিতীয়ত: মারিয়া মন্তেস্বরী শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার্থীরা নিজের চেষ্টায় যা শিখবে তাই হল প্রকৃত শিক্ষা। এই ধরনের আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষণকে তিনি বলেছেন স্বয়ং শিক্ষা (Auto-education), স্বয়ং শিক্ষা তাঁর মতে আনন্দদায়ক। তিনি যে, ‘ডিডাক্টিক্ অ্যাপারেটাস’ ব্যবহার করেন, তাতে শিশুদের ভুল ও ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আচরণ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় সমস্ত রকম মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

তৃতীয়ত: মারিয়া মন্তেস্বরী তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে স্বাধীনতার নীতি (Principle of Freedom) প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর স্বয়ং শিক্ষার নীতি অনুযায়ী শিক্ষাকে আত্মক্ষমতার বিকাশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর সেই আত্মক্ষমতার বিকাশ পরিপূর্ণভাবে করতে হলে, শিশুকে কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তিনি এই স্বাধীনতাকেই শিক্ষার যোগ্য মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষণ সংক্রান্ত এই তিনটি নীতিই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এগুলো পৃথকভাবে স্বাধীন নীতি নয়। স্বয়ং শিক্ষার জন্য নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রস্তুত করতে হবে। তাই ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ এবং ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার করে স্বয়ং শিক্ষা হবে স্বাধীন পরিবেশ। স্বাধীনতা না দিলে স্বয়ং শিক্ষা হবে না অর্থাৎ শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই তিনটি নীতিই অপরিহার্য।

শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ :

মারিয়া মন্তেস্বরী শিক্ষণ নীতিগুলোকে কেবলমাত্র যুক্তিভিত্তিক অবস্থায় ছেড়ে দেন নি। তিনি সেগুলোকে ব্যবহার করেছিলেন। তার প্রয়োগক্ষেত্র ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি তাঁর পরিচালিত বিদ্যালয়ে এই নীতিগুলোকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করেছিলেন।

প্রথমত: শিক্ষার্থীদের জীবনযাপনের উপযোগী কিছু অভ্যাস গঠনের জন্য তিনি কতকগুলো সাধারণ কাজের অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মারিয়া মন্তেস্বরী মনে করতেন শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার পূর্বে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। পরনির্ভরশীলতা স্বাধীনতার পথে অন্তরায়। তাই কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা, দাঁত মাজা, নখ কাটা, আসবাবপত্র পরিষ্কার করা, জুতো পরিষ্কার করা ইত্যাদির মতো কাজগুলো তাদের করতে দেওয়া হত যাতে তারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া শিশুর দৈহিক পেশী সঞ্চালনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে এই জাতীয় দৈহিক চর্চার সুযোগ দান করেন। হাতের কাজ, হাঁটা ইত্যাদির মাধ্যমে এই জাতীয় দৈহিক চর্চা সম্ভবপর হয় জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে আত্মনির্ভর হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষাক্ষেত্রে মারিয়া মন্তেস্বরী ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের (Sense Training) নীতিকে সরাসরিভাবে প্রয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি "Didactic Apparatus" গুলো ব্যবহার করেন। এগুলো দ্বারা শিক্ষার্থীরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশ হয় এবং শিখন উপযোগী দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি আসে। 'ডিডাকটিক অ্যাপারেটাস্' (Didactic Apparatus) গুলোর মধ্যে আছে কাঠের বিভিন্ন আকারের টুকরো, কাগজ, আসবাবপত্র, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, পেনসিল, বিভিন্ন রঙের উল, বাক্স, ঘন্টা, ঘনক, বিভিন্ন তাপমাত্রার জল ইত্যাদি। এই সমস্ত বস্তুগুলোর মাধ্যমে শিশু, আকার, ওজন, রং ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পায়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের দেওয়ার জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রার জল অনুভব করতে দেওয়া হয়। অনেক সময় শিরিস কাগজ স্পর্শ করাও দেখতে দেওয়া হয়। শব্দানুভূতির জন্য বাক্সে বিভিন্ন পরিমাপের নুড়ি ঢুকিয়ে শব্দ সৃষ্টি করা হয়। আকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আকৃতির কাঠের টুকরোগুলো ব্যবহার করা হয়। ওজন বোঝার জন্য বিভিন্ন ওজনের জিনিস তাদের তুলনা করতে দেওয়া হয়।

শিক্ষিকা শিশুদের সামনে একটি উপকরণ নিয়ে আসবেন এবং প্রত্যেকটির নাম বলবেন। যেমন রং-এর হিসাবে— এটা নীল, ওটা লাল, সেটা সবুজ ইত্যাদি এবং এইভাবে শিক্ষিকা শিশুদের বিভিন্ন রং ও তাদের নাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দেবেন। এরপর শিক্ষিকা শিশুদের সামনে যে-কোনো একটি রং-এর নাম করে তাদের সেটি দেখাতে বলবেন; এইভাবে শিশুদের মনে তিনটি প্রক্রিয়া একসাথে চলে– সংযোগ প্রক্রিয়া (Association), প্রত্যাভিজ্ঞা প্রক্রিয়া (Process of Recognition) এবং স্মৃতির পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়া (Process of Recall)। ফলে এইভাবে শিশুর শিখন শক্তিশালী হয়।

তৃতীয়ত: এই ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের পর শিশুদের লেখাপড়া ও গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মারিয়া মন্তেস্বরীর পদ্ধতিতে পড়ার আগে লেখা শেখানো হয়। লেখা শেখানোর ক্ষেত্রে তিনি শিখন সঞ্চালনের নীতিকে ব্যবহার করেছিলেন।

মারিয়া মন্তেস্বরীর প্রবর্তিত শিক্ষায়, শিক্ষার্থীরা মূলত বিভিন্ন বর্ণের আকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। শিরিস কাগজে বর্ণগুলোকে কেটে বোর্ডের উপর আটকানো হয় এবং শিশুদের হাত দিয়ে সেগুলোকে স্পর্শ করতে বলা হয়। এরপর ধীরে ধীরে শিশুরা পেনসিলের ব্যবহার করে। সেই স্পর্শানুভূতিকে সঞ্চালিত করা হয়। শিক্ষার্থীরা যখন বর্ণগুলোর স্পর্শানুভূতি গ্রহণ করে তখন তাদের মধ্যে পড়ার প্রস্তুতি আসে। এরপর একটি বিশেষ পাতলা লোহার চারকোণ বিশিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে পেনসিল ধরে শিশু লেখা অভ্যাস করে। ঐ ফ্রেম কাগজের উপর রেখে তার ভেতর ও বাইরে লাইন টানতে হয়। পড়া শেখানোর জন্য মন্তেস্বরী কার্ড ব্যবহার করেছেন এবং এক একটি কার্ডে বিভিন্ন শব্দ লেখা থাকে; আর এই শব্দগুলো হল শিশুর পরিচিত বস্তুর নাম। সেগুলো বার বার উচ্চারণ করার পর বস্তুর বা বস্তুর ছবির নিচে শিশুকে সেটি স্থাপন করতে বলা হয় এবং এর নাম লিখতে বলা হয়। বাক্য শেখানোর ক্ষেত্রেও এই ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে শব্দ ও বস্তুর মধ্যে একটা সংযোগবোধ হয় শিশুর মনে ওই শব্দটি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হবে এবং শিশু বাক্যও শিখবে। প্রত্যক্ষ বস্তুর সাহায্যে গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন নানা রং-এর পুঁতির মালা, সিড়ি, রঙিন মার্বেল, প্লেটের ফ্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত শিকের মধ্যে রঙিন পুঁতি বা মার্বেল (দশটি করে রাখা থাকবে) ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, শিশু সবকিছুই শিখবে মূর্ত বস্তু বা ‘Concrete Object’-এর সাহায্যে অর্থাৎ কোনোরূপ বিমূর্ত বিষয়ের সাহায্যে নয়। এভাবেই শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লিখিত উপকরণগুলোর সাহায্যে রূপ, রং, আকার, শব্দ, স্পর্শের বিভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারবে। তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অনুভূতি, কাজ ও বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানকে একসূত্রে গাঁথতে ও শিখতে পারবে এবং অন্তর্জাত শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে, আত্মসক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলতে পারবে।

পাঠ্যক্রম (Curriculum):

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী পাঠদানের সাথে সাথে একসঙ্গে সকলে মিলে কোনো কিছু শেখার মধ্যে দিয়ে শিশুর সামাজিকীকরণও ঘটবে বলে মারিয়া মন্তেস্বরী বিশ্বাস করতেন। মূলত এই আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি যে পাঠ্যক্রম রচনা করেছেন তার মধ্যে আছে— ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ,

আত্মশিখন, কাজ বা সক্রিয়তা। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভাষা, গণিত, জ্যামিতিক অঙ্কণ, লেখা ইত্যাদি। শিশুদের শিক্ষার জন্য মূল যে তিনটি বিষয়ই বেছে নিয়েছিলেন তা হল : লেখা (Writing), পড়া (Reading), গণিত (Arithmetic)। এছাড়া, শিশুকে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলো সাধারণ অভ্যাস ও দক্ষতা গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেমন - দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অভ্যাস, নিজের জামাকাপড় পরিষ্কার রাখার অভ্যাস ইত্যাদি। এছাড়া শিশুর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য তিনি পাঠ্যক্রমের মধ্যে শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেছিলেন। শিশু শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য এবং তার সক্রিয়তার অভ্যাস গঠনের জন্য মারিয়া মন্তেস্বরী খুব সাধারণ কিছু হাতের কাজ (Craft) পরিচালনার কথাও বলেছেন।

শিক্ষিকা (Directress):

মারিয়া মন্তেস্বরী তার প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে নিজেরাই শিক্ষালাভ করতে পারে। তাই গতানুগতিক শিক্ষকের স্থান নেই বরং এর স্থানে আছে নীরব পর্যবেক্ষক ও সহানুভূতিশীল পরিচালিকা এবং যিনি শিক্ষার্থীর পাশে থাকবেন একজন স্নেহময়ী মাতার মতো পরিচালিকারূপে (Directress)। তিনি শিক্ষার্থীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন, তার কাজ হল শিশুদের শাসন না করা বরং স্নেহ বিতরণ করা। তিনি হবেন শিশুর বন্ধুর মতো যিনি স্নেহে, মমতায় শিশুর আত্মবিকাশ প্রক্রিয়াকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলবেন। তিনি খেয়াল রাখবেন শিশু যাতে তার নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য, আত্ম-অভিব্যক্তি ও নিজ স্বভাবধর্ম পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে।

বিদ্যালয় (School):

মারিয়া মন্তেস্বরীর সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যক্রম পদ্ধতি, শিশু এবং শিক্ষক– এ সমস্ত কিছুর সমাহারেই সংগঠিত হয়েছে মারিয়ার বিদ্যালয়ে। তাঁর শ্রেণিকক্ষহীন শিশু নিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের সান্নিধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের ব্যক্তিশিশু। শিশু এখানে বেড়ে উঠবে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় আত্মসক্রিয়তার মধ্য দিয়ে। শিশু নিকেতনে শিশুদের ব্যবহৃত ছোটো ছোটো চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, নানা ধরনের শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি– প্রতিদিন নিজেরাই বহন করে এনে তাদের কাজ শুরু করবে। ফলে ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে শিশুদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়বোধ গড়ে উঠবে। মারিয়া মন্তেস্বরীর বিদ্যালয়ে পুরস্কার ও শাস্তির স্থান ছিল না কারণ মারিয়া এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে শাস্তি শিশুদের মধ্যে দোষ দূর করতে সক্ষম হয় না বরং শিশুর মধ্যে নৈতিক অবনতি আনে এবং পুরস্কার ও শাস্তি শিশুর মধ্যে লোভ ও অহংকারবোধের জন্ম দেয়। মারিয়া মন্তেস্বরী চাইতেন যে, বিদ্যালয়ে শিশুরা সক্রিয়ভাবে চলাফেরা শিখুক এবং কোনো ধরনের বিষয় যাতে শিশুদের গতিকে ব্যাহত না করতে পারে এর প্রতি মারিয়া অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। মারিয়া মন্তেস্বরী এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে, শিশুর সম্ভাবনাগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া উচিত বিদ্যালয়গুলোতে। মারিয়া মন্তেস্বরী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ছোটো ছোটো হালকা চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শিশুরা নিজেরাই এদের নড়াচড়া করাতে পারত অর্থাৎ

বিদ্যালয়ে সবকিছুই ছিল স্বাধীন ও গতিশীল। শ্রেণিকক্ষকে পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রয়োজনের সময় চেয়ার টেবিলের বিন্যাস ও পরে ওইগুলোকে ঠিক জায়গায় রেখে দেওয়া, নিজের যন্ত্রপাতি ও উপকরণের যত্ন নেওয়া, খাবার সময় নিজে নিজে গ্লাস এবং ডিসের ব্যবহার করা ও খাদ্য পরিবেশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুরা সক্রিয় ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আত্মকর্মকে আশ্রয় করে সহজাত সম্ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে।

শৃঙ্খলা (Discipline):

মারিয়া মন্তেস্বরীর মতে শিশু শিক্ষা পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা অর্থে মুক্ত বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলাই হল মূল কথা। তিনি শিশুর স্বাধীনতাকেই প্রথম ও শেষ বলে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুর মনকে নাড়া দিতে পারলেই শিশু সব বুঝতে পারে। সুতরাং বিধি ও নিষেধের শৃঙ্খলায় তাকে বেঁধে না রেখে তার স্বাধীন সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে বাধা না দিলে শিশু নিজে থেকেই আত্মসংযমী ও আত্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠবে। তাই শৃঙ্খলা হতে হবে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা যা কৃত্রিমভাবে আরোপিত হবে না। মন্তেস্বরী শিক্ষা পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সামগ্রিক ও অবাধ স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার নয় বরং সক্রিয় কাজই হল স্বাধীনতার মূলবস্তু। শৃঙ্খলা আসবে স্বাধীন কাজের মধ্য দিয়ে এবং শৃঙ্খলা বাইরের থেকে চাপানো কোনো শাসন নয়। শৃঙ্খলা স্বেচ্ছাকৃত নীতিনিয়ম ও আদর্শের অনুকরণ, শৃঙ্খলা আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মনোবৃত্তি। স্বাধীনতার পরিমণ্ডলেই শিশুর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ হয়ে থাকে।

গ্রন্থ (Writings):

- The Montessori Method
- The Absorbent Mind
- The Discovery of the Child
- The Montessori Reader
- The Secret of Childhood
- The Advanced Montessori Method
- The Mass Explained to Children
- The Child in the Family
- Dr. Montessori's Own Handbook
- Education for a New World
- To Educate the Human Potential

অবদান (Contribution):

মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হল :

স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা : শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে মনের বিকাশ সাধনই হল মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষা পদ্ধতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কর্তৃত্বময়ী শিক্ষিকার বদলে তিনি স্থান দিলেন সহানুভূতিশীল পরিচালিকার (Directress)।

সক্রিয়তা : শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং সক্রিয়মূলকভাবে শিক্ষা লাভ করবে। শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থার পক্ষপাতী মন্তেস্বরী ছিলেন না।

ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ : ডিডাক্‌টিক্‌ অ্যাপারেটাস-এর ব্যবহারের দ্বারা শিশুরা খেলা করবে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য :প্রতিটি শিশু তাদের নিজস্ব ক্ষমতা, বুদ্ধি, আচার ব্যবহার ইত্যাদিতে পৃথক। তাই প্রত্যেক শিশুর জন্য একই পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা যাবে না বরং প্রত্যেক শিশুকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যতা অনুযায়ী বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে।

সীমাবদ্ধতা (Limitation):

- প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রভূত পরিমাণে 'Didactic Apparatus'-এর মতো সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার।
- মারিয়া মন্তেস্বরীর পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ (Sense Training)-এর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ-এর মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিত করা যায় না।
- মারিয়া মন্তেস্বরীর পদ্ধতিতে শিশুর সৃজনমূলক কর্মের দিকটির সঠিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।
- মারিয়া মন্তেস্বরী নানাবিধ শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলোর সাহায্যে নতুন কিছু করার সুযোগ নেই এবং বাস্তব জীবনের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বাস্তব জীবনের সাথে এদের যোগসূত্র অনেকটাই কম।
- মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী। মনকে খণ্ডিত করে, মানসিক অনুভূতিকে অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ও প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের আলাদা অনুশীলনের ব্যবস্থা করে তিনি মনোবিভাজনবাদ (Compartmentalisation of the Mind) ও মানসিক উৎকর্ষণ তত্ত্বকেই (Mental Discipline) পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন।
- মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের গতিবিধির উপর স্বাধীনতা থাকলেও বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহারের বাইরে যাবার উপায় নেই; ফলে এই উপকরণগুলোই নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দেয় কারণ এগুলো শিক্ষার্থীদের আচরণ ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে রাখে।

উপসংহার (Conclusion):

জীবনের শেষ দিনগুলোতেও মারিয়ার জীবন পূর্বের ন্যায়ই স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ উদ্দীপনা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকত। 1952 সালের 6 মে মারিয়া মন্তেস্বরী 82 বছর বয়সে নেদারল্যান্ডস (Netherlands)–এর নরডিজ্ক আন জে (Noordwijk an Zee) নামক স্থানে পরলোক গমন করেন। মারিয়া মন্তেস্বরী এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা হল শিশুর আভ্যন্তরীণ উন্মেষণ বা বিকাশ; তাই বাইরে থেকে কোনো শক্তির হস্তক্ষেপের স্থান নেই। শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। এজন্য শিশুকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এর থেকেই জন্ম নিয়েছে মারিয়া মন্তেস্বরীর স্বয়ংশিক্ষার (Auto-education) ধারণাটি। মারিয়া মন্তেস্বরী মূলত তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র শিশুদের নয়, মানব প্রকৃতিরও অনেক বিষয় উন্মোচন করতে সহায়তা করেছিলেন। মারিয়া মন্তেস্বরীর লিখিত গ্রন্থসমূহ সারা বিশ্বে পড়ানো হচ্ছে এবং অনুবাদিত হচ্ছে। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার প্রকৃতিই অনেকটা সার্থকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মূলত মারিয়া মন্তেস্বরীই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বাস্তবায়নে মারিয়া মন্তেস্বরীর অবদান অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক - জ্যাঁ জ্যাকুইস রুঁশো

রুঁশোর মতে শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় নয়। শিশুর অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের বিকাশ সাধনই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শৈশবে শিশুর শরীর-স্বাস্থ্য গঠন করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য এবং এ সময়ে তার নৈতিক অথবা সামাজিক শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। বাল্যকালে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর ইন্দ্রিয় ও মানসিকবৃত্তির অনুশীলন। কৈশোরে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সত্যিকারের জ্ঞান আহরণ এর এই সময়ে শিশু প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে থাকবে। রুঁশো বলেছিলেন – The child is a book which the teacher is to read from page to page. অর্থাৎ শিক্ষার্থী হল একটি গ্রন্থ যার প্রতিটি পৃষ্ঠা শিক্ষককে পড়তে হবে। রুঁশোর মতে মানসিক প্রকৃতি বলতে বুঝায় শিশুর প্রকৃতিদত্ত শক্তি, সম্ভাবনা, চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ইত্যাদির সমন্বয় কে। রুঁশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিকল্পিত হবে। সাধারণত শিশু বড় হবার সাথে সাথে পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির চাপে তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়ে যায় এবং তাকে কতগুলি কৃত্রিম আচরণ ও অভ্যাস শিখতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু এই শিক্ষা হল প্রকৃতিবিরোধী শিক্ষা। শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে রুঁশোর ব্যাখ্যা হল—প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও।

দ্বিতীয় একক: জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী

পেস্তালৎসী বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার সম্ভব। তিনি শিক্ষাকে সমাজ সংস্কারের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষাকে জনজাগরণের পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে সর্বজনীন করার প্রচেষ্টাই সারা জীবন করে গেছেন। পেস্তালৎসী শিক্ষাকে সামাজিক উন্নতির হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেছেন আর এটাই হল তাঁর শিক্ষাদর্শনের সামাজিক যৌক্তিকতা। তিনি বলেছিলেন শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। (Natural progressive and harmonious development of all power of the human being.) তিনি জীবন বিকাশ কে উদ্ভিদ বৃদ্ধির সাথে তুলনা করেছিলেন কারণ বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে ঠিক তেমনি শিশুর মধ্যে ও বিকাশের সব রকম সম্ভাবনা থাকে। উদ্ভিদ যেমন পরিবেশ থেকে তার স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ করে বড় হয়, শিশু ও পরিবেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগাড় করে নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে বড় হতে থাকে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর মধ্যে বৃদ্ধির উপাদান প্রবেশ করানো নয় বরং শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর এই স্বাভাবিক বিকাশের পথে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তা দেখা। শিক্ষায় পেস্তালৎসীর সব থেকে বড় অবদান হল মনোবৈজ্ঞানিক ধারার (Psychological Tendency) প্রবর্তন। পাঠ্য বিষয়কে শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সাজানোর কথা তিনি প্রথম বলেছিলেন।

তৃতীয় একক: ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রয়েবেল

ফ্রয়েবেল ছিলেন মূলত ভাববাদী এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে জগতের সমস্ত জীবন ও প্রকৃতির সত্তার মধ্যে একটি শক্তি বিরাজ করছে। এই শক্তি হল ঈশ্বর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবজীবনের ও সমগ্র বিশ্বজগতের মূলে আছে এক একক আধ্যাত্মশক্তি এবং মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সেই আধ্যাত্মিক শক্তি ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐক্য বিদ্যমান তাকে উপলব্ধি করা। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে সেই চরম সত্যের উপলব্ধি করা। এর জন্য বাইরের কোন প্রচেষ্টার দরকার নেই তার কারণ শিশু নিজেই হল সক্রিয়। এই সক্রিয়তার মাধ্যমে তার সকল সক্রিয়তা বিকশিত হয়ে উঠবে। শিক্ষকের কাজ হবে শুধু তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিক্ষায় আত্ম-সক্রিয়তা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা ফ্রয়েবেল আলোকপাত করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা, গল্প, গান, অংকন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাকে সহজ ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার সার্থক প্রয়াস করেছিলেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা বর্তমানে শিক্ষায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

চতুর্থ একক : মারিয়া মন্তেস্বরী

মারিয়া মন্তেস্বরী শিক্ষার তত্ত্বগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এর দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে শিশুদের যেভাবে পড়ানো উচিত তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তাদেরকে পড়ানো হচ্ছে। তিনি চাইতেন যে শিশুর জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলিকে এমন সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করা উচিত যাতে শিশুরা ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে। তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যেখানে শ্রেণিকক্ষে সমষ্টিগত শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মারিয়া মন্তেস্বরীর কাছে শিক্ষা কোনো আদর্শ নয় বরং কতকগুলো কৌশলের সমন্বয়। তিনি বিশ্বাস করতেন শিশু কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর দিক থেকে সে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, মারিয়া মন্তেস্বরী তাঁর শিক্ষাদর্শনে এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং এই ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনিই শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা ও আত্মসক্রিয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক করে তুলতে সহায়তা করেছিলেন। শিশুর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতাকে একত্র হিসাবে গণ্য করেছেন এবং একে শিশুর আত্মবিকাশে অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। তিনি চাইতেন যে, স্বাধীনতা ও আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। আত্মসক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বা 'Auto-Education'-এর কথাও বলেছেন। আত্মশিক্ষণের মাধ্যমে যেমন আত্মবিশ্বাস ঘটে তেমনি আত্মবিকাশ না হলে আত্মশিক্ষণও সম্ভবপর নয় — অর্থাৎ উভয়েই পরস্পর নির্ভরশীল। কাজের মাধ্যমে শেখা (Learning by Doing) এবং নিজে শেখা (Self-learning)। এটাই হল মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আত্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিসত্তা-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠে। মারিয়া মন্তেস্বরীর শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বিষয় হল মানসিক প্রস্তুতি (Mental

Set)। মারিয়া মন্তেস্বরী বলেছিলেন যে শিশুর মধ্যে যখন শেখার আগ্রহ আপনা থেকে জন্মাবে শিশু তখনই শিখবে। শিশু মনের থেকে কিছু শিখতে চাওয়ার আগ্রহের সময়টি মারিয়া মন্তেস্বরী বলেছিলেন, 'Psychological Moment'। তাঁর মতে পরিণত ব্যক্তি হয়ে ওঠার সমস্ত গুণই শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, শিক্ষার কাজ হল উপযুক্ত সহায়তা দানের মাধ্যমে সেগুলোকে প্রকাশ করে তোলা। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন করা ও সেইসঙ্গে সামাজিক কল্যাণ সাধন করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মারিয়া মন্তেস্বরী বিশ্বাস করতেন।

অনুশীলনী

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) 'Emile' এই গ্রন্থটি কে লিখেছিলেন?
২) বস্তুভিত্তিক পাঠদান (Object Lesson) কে উদ্ভাবন করেছিলেন?
৩) ফ্রয়েবেল কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) 'উপহার' ও 'বৃত্তি' বলতে কি বোঝায়?
২) নেতিবাচক শিক্ষা কি?
৩) উন্মেষণ তত্ত্ব কি?

৩ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৬০টি শব্দ

১) রুঁশো প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম-এর ধারণা লিখ।
২) পেস্তালৎসীর প্রবর্তিত শিক্ষণ পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩) ফ্রয়েবেল- এর মতে শিক্ষকের ধারণাটি লিখ।

৪ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১০০টি শব্দ

১) শিক্ষায় রুঁশোর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২) পেস্তালৎসী-এর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
৩) মন্তেস্বরীর শিক্ষণ পদ্ধতির মূল তিনটি নীতি আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক দিকসমূহ

- ❖ **প্রথম একক** : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা: অর্থ, প্রকারভেদ, কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব
- ❖ **দ্বিতীয় একক** : প্রেষণা: অর্থ, প্রকারভেদ, উপাদানসমূহ, শিক্ষায় প্রেষণার উপযোগিতা
- ❖ **তৃতীয় একক** : বুদ্ধি: অর্থ, তত্ত্ব (চার্লস স্পিয়ারম্যান এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, লুইস লিয়ন থার্স্টোর্ণ এর বহু উপাদান তত্ত্ব), শিক্ষামূলক প্রয়োগ
- ❖ **চতুর্থ একক** : সৃজনশীলতা: অর্থ, সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক দিকসমূহ

(Psychological Aspects in Education)

উদ্দেশ্য (Objectives):

- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি বৈষম্যের প্রকারভেদ, কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা প্রেষণার অর্থ, প্রেষণার চক্র, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, নির্ধারকসমূহ, শিক্ষায় প্রেষণার প্রভাব, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা বুদ্ধির অর্থ, বুদ্ধির তত্ত্ব, বুদ্ধির শিক্ষামূলক প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতার অর্থ, সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face):

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির মধ্যে যে জন্মগত ক্ষমতা বা সম্ভাবনা রয়েছে তার যথাযথ বিকাশ সাধন করা আর এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক শিক্ষা নানা দিক দিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর নির্ভরশীল। কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ নতুন নতুন জ্ঞানকে সহজে বুঝতে, গ্রহণ করতে এবং আত্মস্থ করতে পারবে সেই প্রতিক্রিয়াগুলো চিহ্নিত বা আবিষ্কার করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এই অধ্যায়ে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রেষণা, বুদ্ধি, ও সৃজনশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শ্রেণিতে বিভিন্ন ধরনের সামর্থ্য, আগ্রহ, মনোভাব, চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা রয়েছে। তাছাড়া বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ, মনোভাব, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে নানা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। শিক্ষার্থীগণকে তাদের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকাশে সহায়তা দান করার জন্য তাদের সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, সামর্থ্য (Potentialities), স্বাতন্ত্র্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে ধারণা দান করার পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সাধন করতে সহায়তা দান করে।

প্রাণীর যে-কোন ধরনের শিখনের পেছনে থাকে এক অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যম। যাকে মনোবিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন প্রেষণা। প্রেষণা ব্যক্তির অভাববোধ থেকে সৃষ্ট এমন এক উত্তেজিত অবস্থা যা তাকে নির্দিষ্ট

লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ আচরণ নির্বাচন করতে বাধ্য করে এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে। শিক্ষকদের উচিৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টিতে সাহায্য করা যাতে তার মধ্যে শেখার আগ্রহ বাড়ে। তার পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, সকল শিক্ষার্থীকে একই পন্থায় প্রেষিত করা যায় না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ, মনোভাব, বুদ্ধি, শেখার, ধরন ইত্যাদির দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। প্রেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা এবং শিক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষক কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের প্রেষিত করবেন এ ব্যাপারে আলোচনা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

অপর যে দিকটির উপর এই অধ্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল বুদ্ধি। দেখা গেছে কোনো কিছু দ্রুততার সঙ্গে শেখা, বিশেষ করে চিন্তামূলক কোনো কিছু শেখা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রার উপর। মনোবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা শিক্ষাকে বুদ্ধির প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান নানা তথ্য সরবরাহ করে। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আধুনিক মনোবিদ্যা বুদ্ধি পরিমাপের নানা নির্ভরযোগ্য পন্থা আবিষ্কার করে শিক্ষার অনেক জটিল সমস্যাকে সমাধান করে দিয়েছে।

মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতির অগ্রগতির মূলে রয়েছে সৃজনশীলতা। এই সৃজনশীলতার অভাবে সামাজিক ও সংস্কৃতিক অগ্রগতি বুদ্ধ হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ সাধন। সে দিক থেকে শিক্ষা মনোবিদ্যার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের কীভাবে চিহ্নিত করবেন এবং কীভাবে উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, পরিচর্যা দিয়ে তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকশিত করে তুলবেন এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম একক

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা: অর্থ, প্রকারভেদ, কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব

(Individual Difference: Meaning, Types, Influence in Education)

ভূমিকা (Introduction):

স্বাতন্ত্র্য হল যে-কোনো সজীব প্রাণীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। তাই একই ফলের বীজ থেকে উৎপন্ন দুটি গাছ, কোনো কুকুর, বেড়াল বা কোন পশুর থেকে জন্ম নেওয়া দুটি বাচ্চা, যে-কোনো পাখির থেকে জন্ম নেওয়া দুটি বাচ্চা, কিংবা একই বাবা-মায়ের দুটি মানব শিশুদের যদি পরস্পর মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখব কোনো দুটি সজীব প্রাণীই হুবহু একই রকম হয় না। এমনকী যমজ দুটি শিশুর মধ্যেও কোনো না কোনো পার্থক্য বর্তমান থাকে।

মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে তা প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। Plato, Aristotle, Rousseau– এই প্রভেদ স্বীকার করেছেন। Plato- মানুষের মৌলিক বিভিন্নতা অনুযায়ী তাদের কয়েকটি দলে ভাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বংশানুক্রমে বিশ্বাসী Galton- এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত করেন। এছাড়া Cattell, Alfred Binet প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণও এ ব্যাপারে নানা গবেষণা করেন।

সংজ্ঞা (Definition):

ব্যক্তি বৈষম্যের সংজ্ঞায় প্লেটো বলেছেন— কোনো দুজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ একইরকমভাবে জন্মায় না। প্রকৃতিগতভাবেই একজন অন্য কারও থেকে আলাদা হয়; একজন কোনো একটি পেশার জন্য উপযুক্ত, এবং অন্য কোনো পেশার জন্য উপযুক্ত। (Plato - No two persons are born exactly alike; but each differs from the other in natural endowments, one being suited for one occupation and the other for another.)

ক্যাটার গুড— ব্যক্তি বৈষম্য হল কোনো একটি বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পার্থক্য বা বৈষম্য। (Cater Good- Individual differences stand for “the variations or deviations among individuals in regard to a single characteristic or a number of characteristics.)

মানুষে মানুষে এই পার্থক্য হওয়ার কারণ কী, কিংবা এই পার্থক্য কত ধরনের হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুশীলনের জন্য মনোবিদ্যার যে শাখা গড়ে উঠেছে তাকে বলে পার্থক্য অনুশীলনকারী মনোবিদ্যা বা Differential Psychology ।

ইংরেজিতে বলা হয় No two individuals are alike। তাই দেখা যায় একই বয়সের দু'জন ব্যক্তি কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কারও রঙ মাঝারি। কেউ অল্পেতেই রেগে ওঠে, কেউ আবার শান্ত স্বভাবের। কেউ নিষ্ঠুর, কেউ কোমল প্রকৃতির। কেউ বাস্তবধর্মী, কেউ কল্পনাবিলাসী। কেউ মিশুক, কেউ অমিশুক। কেউ প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ আবার কম বুদ্ধি সম্পন্ন, কারও বুদ্ধি মাঝারি ধরনের ইত্যাদি নানা ধরনের পার্থক্য ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে কোনো না কোনোভাবে পৃথক করে রেখেছে। ব্যক্তির এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক করে রেখেছে, তাকেই মনোবিদ্যায় বলা হয় ব্যক্তিগত বৈষম্য বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য (Individual Difference)।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকারভেদ (Types of Individual Difference) :

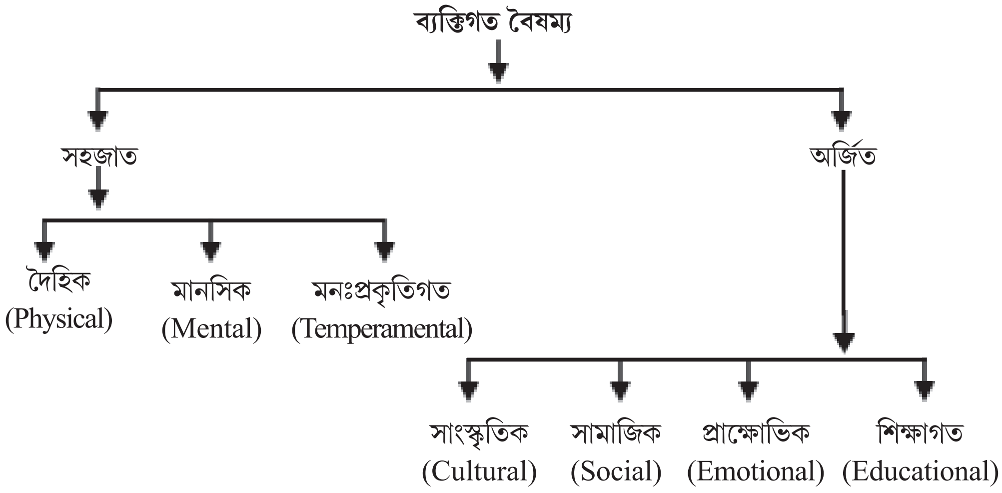

মানুষের মধ্যে যে বৈষম্যগুলি দেখা যায় তাদেরকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়— ১) সহজাত (Inborn) ২) অর্জিত (Achieved)

১) **সহজাত বৈষম্য :** শিশু জন্মের সময় তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পেয়ে থাকে বংশধারার পার্থক্য অনুযায়ী সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়, একেই বলে সহজাত বৈষম্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি শিশু তার বাবা-মা বা তার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পেতে পারে। যেমন— ফর্সা বাবা-মায়ের সন্তানগণ ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে বাবা-মা ছাড়াও পূর্ববর্তী বংশধরদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও শিশু জন্মগতভাবে লাভ করতে পারে।

২) **অর্জিত বৈষম্য :** সহজাত বৈষম্যের মূলে যেমন বংশগতির প্রভাব রয়েছে, তেমনি অর্জিত বৈষম্যের মূলে রয়েছে পরিবেশের প্রভাব। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় পরিবেশ বলতে বোঝায়— ব্যক্তির চারপাশের যেসব ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাকৃতিক পরিবেশ অথবা সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে বোঝায়: যেমন— শিশুর সামাজিক আচার আচরণ, শিক্ষা, সংগীত শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের সু-অভ্যাস আয়ত্ত করা ইত্যাদি। এই অর্জিত বৈশিষ্ট্যের মানও সবার একই হয় না। এখানেও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

সহজাত ও অর্জিত বৈষম্যেও আবার নানা ধরনের হয়। নিম্নে তা আলোচিত হল—

১. সহজাত বৈষম্য:

দৈহিক বৈষম্য : দৈহিক দিক থেকে এক ব্যক্তির সঙ্গো অন্য ব্যক্তির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন—একই বয়সের দু'জন ব্যক্তির মধ্যে চেহারা, উচ্চতা, ওজন, দৈহিক স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা, দৈহিক শক্তি ইত্যাদির দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এর ফলে একজনের চেহারার সঙ্গো অন্যজনের চেহারার অমিল দেখা যায়। কেউ লম্বা কেউ বেঁটে, কেউ কালো কেউ ফর্সা, কেউ রোগা কেউ মোটা, কারও শারীরিক শক্তি বেশি কারও কম, কারও কর্মক্ষমতা বেশি কারও কম। তাছাড়া গলার স্বর, অঙ্গাভঙ্গির দিক থেকেও একজনের সঙ্গো অন্যজনের তফাৎ লক্ষ করা যায়। এই দৈহিক বৈষম্য জাতিগত কারণেও হয়। আর এই কারণে একজন নিগ্রো ব্যক্তির সঙ্গো একজন ইউরোপীয়ানের গায়ের রঙ, চেহারা ইত্যাদি দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায়।

মানসিক বৈষম্য : মানসিক প্রক্রিয়াগত দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য লক্ষ করা যায়। যেমন—কেউ তাড়াতাড়ি শেখে, কারও শিখতে দেরি হয়। কেউ কোনো বিষয় দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারে কেউ বেশিদিন মনে রাখতে পারে না। মনে করার ক্ষেত্রেও কেউ অনায়াসে যা মনে করতে পারে কারও পক্ষে তা মনে করতে দেরি হয়। তাছাড়া অনুরাগের ক্ষেত্রও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। বুদ্ধির দিক থেকেও এক ব্যক্তির সঙ্গো অন্য ব্যক্তির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ফলে কারও বুদ্ধি প্রখর, কেউ মাঝারি বুদ্ধির, আবার কেউ বুদ্ধির দিক থেকে তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়। মনোযোগদানের ক্ষমতার দিক থেকেও এক ব্যক্তির সঙ্গো অন্য ব্যক্তির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া বিশেষ মানসিক ক্ষমতা প্রদর্শনের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। ফলে কেউ কণ্ঠ সংগীতে, কেউ বা যন্ত্র সংগীতে দক্ষতা দেখাতে পারে, আবার কেউ নৃত্যে, কেউ বা হস্তশিল্প ইত্যাদিতে দক্ষতা দেখাতে পারে।

মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য : মনঃপ্রকৃতিগত দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য দেখা যায়। আর এই কারণেই দেখা যায় কেউ কোমল প্রকৃতির, কেউ উগ্র প্রকৃতির, কেউ কেউ ধীর-স্থির ও ঠান্ডা মেজাজের, আবার কারও মেজাজ খুবই রুক্ষ। কারও আচরণ অত্যন্ত আক্রমণধর্মী আবার কেউ সহজেই অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

২. অর্জিত বৈষম্য:

সাংস্কৃতিক বৈষম্য : প্রত্যেক জনসমাজেরই নিজস্ব প্রথা, রীতি-নীতি, আচরণধারা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার ইত্যাদির একটি নিজস্ব ভাণ্ডার থাকে, যাকে ঐ সমাজের সংস্কৃতি বলা হয়। সেই বিশেষ সমাজে যে শিশুটি জন্মায় সে সেই সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারটির অধিকারী হয়। একটি দেশের সংস্কৃতির সঙ্গো অন্য দেশের সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েছে। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই এই সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে বড়ো হয়ে ওঠা মানুষদের সঙ্গো অন্য সংস্কৃতির মানুষদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঠিক এই কারণেই একজন ভারতীয়ের সঙ্গো একজন ইউরোপীয়ান বা আফ্রিকানের পার্থক্য দেখা যায়।

সামাজিক বৈষম্য : শিশু একটি সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, তারপর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে সে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। শিশুর জীবনে প্রথম সামাজিক সংগঠন হল পরিবার। প্রত্যেক পরিবারেরই কতগুলি নিজস্ব আদর্শ, ভাব এবং আচরণ ধাঁচ রয়েছে, যা ঐ পরিবারের শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে আত্মস্থ করে। ফলে দেখা যায় দুটি ভিন্ন পারিবারিক পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা দুটি শিশুর আদর্শ, আচরণ ধাঁচ, রুচি, বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ বৈষম্য লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে শিশু ক্রমশ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, ক্লাব, অফিস ইত্যাদি আরও নানা ধরনের সামাজিক সংগঠনের অংশীদার হয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যও ক্রমশ বাড়তে থাকে।

প্রাক্ষোভিক বৈষম্য : প্রক্ষোভ প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও এর তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য রয়েছে। এই কারণেই দেখা যায় কেউ হয়তো অল্পেতেই রেগে যান আবার কেউ অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তাই সহজে রাগ করেন না। কেউ খুব সামান্য কারণে যেমন আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে আবার কেউ অল্পেতেই হতাশায় ভেঙে পড়েন। কেউ আবার আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে যেমন সর্বদা নির্দিষ্ট মাত্রাকে বজায় রেখে চলেন আবার কোনো ব্যাপারে সহজে নিরাশ হন না। কেউ রাগ হলে অন্যকে আক্রমণ করেন, জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন, এমনকি হত্যার (Murder) মতো অপরাধও করে ফেলতে পারে। আবার কেউ রাগ হলে কারও সঙ্গে কথা বলতে চান না তার চেহারায় কেবল রাগের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রাক্ষোভিক প্রকাশের ভিন্নতা চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়— দু'জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষক শ্রেণি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে তিরস্কার করলেন। এদের মধ্যে একজন সিদ্ধান্ত নিল আর এ ধরনের কাজ করবে না। অন্যজন পরদিন থেকে বিদ্যালয়ে না আসার সিদ্ধান্ত নিল। কখনও দেখা যায় কোনো ঘটনা একজনকে আনন্দ দিতে পারে অন্যজনকে কষ্ট দিতে পারে। যেমন— রাস্তা দিয়ে একটি বাচ্চা কুকুরকে যেতে দেখে একটি ছেলে তার গায়ে একটি বড়ো ঢিল ছুঁড়লে কুকুরের বাচ্চাটি যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালাল। এটি দেখে ছেলেটির খুব মজা লাগলো তাই সে হাসতে লাগলো কিন্তু অন্য আরেকটি ছেলে কুকুরের বাচ্চাটির এই অসহায় অবস্থা দেখে এবং কষ্ট দেখে মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেল।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর প্রক্ষোভমূলক বৈষম্যের পেছনে পরিবার, বিদ্যালয়ের সঙ্গী-সাথী এবং চারদিকের পরিবেশ প্রভৃতির এক সম্মিলিত প্রভাব বর্তমান থাকে।

শিক্ষাগত বৈষম্য : শিক্ষার ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী যে-কোন অর্জিত আচরণকেই শিক্ষামূলক আচরণ বলা যায়। কিন্তু এখানে শিক্ষাকে সেই অর্থে বিচার না করে সাধারণ ভাষায় শিক্ষাকে যে অর্থে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী কোনো বিশেষ বিষয়ে যে সুসংবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত জ্ঞান অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছে এবং বিভিন্ন জনের পারদর্শিতার মধ্যে কতটা বৈষম্য রয়েছে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় শিক্ষার ব্যাপারে কৌতূহল বা আগ্রহ একই শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সমান নয়। কারও বেশি, কারও মাঝারি, কারও কম। কেউ কোন একটি বিষয় তাড়াতাড়ি শেখে, কেউ শেখে দেরিতে। কারও সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক, কারও বিজ্ঞানে, কারও অঙ্কনে, কারও সঙ্গীতে

কারও খেলাধুলায় ইত্যাদি। মনোযোগের পরিসরের বিচার করলেও দেখা যায় কেউ কোনো একটি বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগকে ধরে রাখতে পারে, কেউ তা পারে না। শিক্ষাগত পারদর্শিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও কারও পারদর্শিতা খুব উন্নতমানের, কারো মাঝারি, কারো নিম্নমানের।

শিক্ষাগত এই ধরনের বিভিন্নতার মূলে রয়েছে শিক্ষার্থীর নিজস্ব পূর্ব অভিজ্ঞতা, বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে তার অভিযোজনের মাত্রা, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ (Causes of Individual Difference)

কেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায় এ নিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণ নানা ধরনের কারণের উল্লেখ করেছেন, এরমধ্যে প্রধান কারণগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা হল—

১) **বংশগতি (Heredity) :** ব্যক্তিগত বৈষম্যের পেছনে বংশগতির এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বংশগতির বিভিন্নতার কারণেই ব্যক্তির গায়ের রঙ, উচ্চতা, মুখের গড়ন, চুল ও চোখের তারার রঙ ইত্যাদি বিভিন্ন হয়ে থাকে। বংশগতিবাদীগণ দেখিয়েছেন ব্যক্তির বুদ্ধি বংশগতির দ্বারা প্রাপ্ত হয়। কাজেই বংশগতভাবে যে যেমন বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তাকে হাজার চেষ্টা করেও বাড়ানো যায় না। তবে উপযুক্ত পরিবেশ জন্মগত বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে। বুদ্ধির মতো অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের মূলেও রয়েছে বংশগতভাবে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা।

২) **পরিবেশ (Environment) :** আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের মূলে কেবলমাত্র বংশগতি নয় পরিবেশেরও এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশ বলতে কেবলমাত্র বস্তু পরিবেশকে বোঝায় না, সামাজিক পরিবেশকেও বোঝায়। সামাজিক পরিবেশ বলতে বোঝায় সামাজিক সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, সামাজিক উত্তরাধিকার, আচার-আচরণ, আদর্শ ইত্যাদি সবকিছুর মিলিত প্রভাব। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন শিশুর জন্মগতভাবে প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বকে পরিবেশের পরিবর্তনের দ্বারা উন্নত করে তোলা যায়। আর এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন বংশধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তৈরি হয়। পরিবেশের বিভিন্নতা ব্যক্তির চিন্তা বুদ্ধি, আচরণ, কার্যকলাপ, প্রবণতা, জীবন-যাপন কৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করে যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য সৃষ্টির এক বিশেষ কারণ।

৩) **জাতিগত প্রভেদ (Racial Difference) :** বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যা এক জাতির ব্যক্তির সঙ্গে অন্য জাতির ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। যেমন– জাপানিগণ ভদ্র এবং কঠোর পরিশ্রমী হয়। এরা কম কথা বলা পছন্দ করে। ভারতীয়গণ শান্তির পিয়াসী। রাশিয়ানগণ লম্বা এবং মজবুত দেহের অধিকারী হয়। জার্মানিগণ সময়নিষ্ঠ হয়।

৪) **লিঙ্গগত প্রভেদ (Sex Difference) :** নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক গঠন, হাঁটা-চলার ধরন, গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাছাড়া নারীরা সাধারণত কোমল স্বভাবের এবং পুরুষদের স্বভাবে তুলনামূলক কাঠিন্য দেখা যায়। পরিশ্রমসাধ্য কাজের ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষরা নারীদের

তুলনায় বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে। ভাষাগত সামর্থ্যে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে। স্মরণ ক্ষমতা ও সৌন্দর্য ভাবনায় পুরুষদের তুলনায় নারীদের ক্ষমতা প্রখরতর। অন্যদিকে সংখ্যা গণনা বা হিসেবের ব্যাপারে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে। আবেগ প্রকাশের দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় নারীদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ বেশি।

৫) **সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা (Difference in Social Status) :** সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা ব্যক্তিগত বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে, যা তাদের প্রতিক্রিয়ার ধরনের মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। আর্মি-আলফা অভীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলা যায় জনবহুল এলাকায় বসবাসকারী মানুষেরা কম জনবসতিপূর্ণ এলাকা বা গ্রামীণ পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা মানুষদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান হয় এবং শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধাও এরা বেশি ভোগ করে।

৬) **অর্থনৈতিক অবস্থার ভিন্নতা (Difference in Economic Condition) :** মনোবিজ্ঞানীগণ তাদের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষ করেছেন বৃত্তিগত আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বুদ্ধির সাধারণ মাত্রার সঙ্গো এক নিকট সম্পর্ক বর্তমান। দেখা গেছে উচ্চ বৃত্তিমূলক স্তরে যেসব অভিভাবকগণ রয়েছেন তারা সাধারণত তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বাস্তব ও বৌদ্ধিক পরিবেশ বেশি দিতে পারেন যা তাদের সন্তানদের মধ্যে দ্রুত সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। লক্ষ করা গেছে যেসব ছেলেমেয়েরা উচ্চবিত্ত পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে ওঠে তারা নিম্নবিত্ত পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের তুলনায় বুদ্ধির প্রকাশের দিক থেকে বেশি দক্ষতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক পার্থক্যের কারণে শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা, আবেগ প্রকাশের ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

৭) **বিকাশের হারের বিভিন্নতা (Difference in Development Rate):** বিকাশের হারের বিভিন্নতা ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য দায়ী থাকে। দেখা গেছে কোনো শিশুর তার সমবয়সীদের তুলনায় খুব দ্রুত বিকাশ ঘটে, কারও বিকাশ হয় ধীরগতিতে এই বিকাশ শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ইত্যাদি যে কোনো ধরনেরই হতে পারে। কারণ প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব বিকাশের গতি রয়েছে। তাই স্বাভাবিক কারণে একই বয়সের দুটি শিশুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

৮) **ব্যক্তিত্ব (Personality):** ব্যক্তিত্বের ভিন্নতার কারণেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন– কেউ হয় অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের, কেউ বহির্মুখী। কেউ অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, কেউ সদা হাস্যময়। কেউ অস্থির চিত্তের, কেউ শান্ত স্বভাবের, কেউ উদ্যমী আবার কেউ নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির। কেউ কৃপণ, কেউ উদার প্রকৃতির। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব (Influence of Individual Difference in Education):

আধুনিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ ঘটিয়ে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শেখার ক্ষমতা, আবেগের প্রকাশ, প্রবণতা ইত্যাদি আলাদা আলাদা। এই অবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে গেলে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আগে মনে করা হত শ্রেণিকক্ষে যত শিক্ষার্থী আছে তারা মানসিক

দিক থেকে সমান। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি আবিষ্কারের ফলে এ ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার কোন্ কোন্ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা নিম্নে আলোচনা করা হল—

১) **শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা:** প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত তাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, আগ্রহ, প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারণা গঠন করা এবং সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে তাদেরকে সেইভাবে শিক্ষাদান করা। আর এইজন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারেন।

২) **শ্রেণির আকার সীমিত করা :** শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমানে কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপচে পড়া ভিড় থাকে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় শ্রেণিকক্ষের আয়তন ছোটো করা প্রয়োজন।

৩) **বহুমুখী পাঠ্যক্রম অনুসরণ :** যেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য রয়েছে তাই সকল শিক্ষার্থী একইরকম পাঠক্রম থেকে উপকৃত হতে পারে না। তাই শিক্ষকের উচিত ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভাবনাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, ক্ষমতা, প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বহুমুখী পাঠক্রম গড়ে তোলা যা তাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তাদের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ে আগ্রহকে গড়ে তুলবে।

৪) **বহুমুখী পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ :** কেবলমাত্র বহুমুখী পাঠক্রমই নয় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যকে গুরুত্বদান করে পাঠদান পদ্ধতিতেও বিভিন্নতা আনা প্রয়োজন। তাই শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী খেলাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, মন্তেস্বরী পদ্ধতি, গল্প বলা পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫) **ব্যক্তিগত বৈষম্যভিত্তিক প্রদীপণ নির্বাচন :** শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তাকে ভিত্তি করে শিক্ষক পাঠদানকালে এমন ধরনের শিক্ষামূলক প্রদীপণ নির্বাচন করবেন যা পাঠের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করে।

৬) **সহপাঠক্রমিক ব্যবস্থা :** সকল শিক্ষার্থীই পাঠক্রমিক বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে সমর্থ নাও হতে পারে। তাই তাদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমিক বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়েরও যেমন– নাটক, সংগীত, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, এন.সি.সি, এন.এস.এস ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। পাঠ্যক্রমিক বিষয়ে পারদর্শিতা না দেখাতে পারলেও হয়তো কোনো শিক্ষার্থী সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়ে পারদর্শিতা দেখানোর মাধ্যমে তৃপ্তি খুঁজে পেতে পারে।

৭) **গৃহকাজ :** ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা মাথায় রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গৃহকাজ দেবেন।

৮) **শিক্ষাগত নির্দেশনা :** শিক্ষালাভ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন সময় নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয়

শিক্ষামূলক নির্দেশনা দান করবেন। যেমন— অনেক সময় শিক্ষার্থীগণ বৃত্তি নির্বাচন, বই নির্বাচন, বিষয় নির্বাচন, সহপাঠ্যক্রমিক কাজ নির্বাচনসহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক সমস্যায় পড়ে সেক্ষেত্রে শিক্ষকগণ এমনভাবে উপযুক্ত নির্দেশনা দান করবেন যাতে সে নিজেই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পায়।

৯) **শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নমুখী কাজ :** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নমুখী কাজ দিয়েও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যের মোকাবেলা করতে পারেন। এক্ষেত্রে একই ধরনের আগ্রহ বা প্রবণতার অধিকারীদের দিয়ে Homogeneous বা সমজাতীয় দল গঠন করে কাজ করতে দেওয়া কিংবা কখনও Heterogeneous বা বিসমজাতীয় দল গঠন করে Co-operative Learning এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উপসংহার (Conclusion):

আলোচনার উপসংহারে বলা যায় প্রাচীণকালে যেখানে সবার জন্য একই ধরনের শিক্ষার কথা বলা হত, সেখানে খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই তাদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পেত। উপযুক্ত পরিবেশ বা সুযোগের অভাবেই বহু প্রতিভাই অঙ্কুরে বিনস্ট হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সমস্ত সভ্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই ব্যক্তিগত বৈষম্যকে প্রাধান্য দিয়ে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব রুচি, সামর্থ্য ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে। যা ব্যক্তিকল্যাণের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ সাধনেরও সহায়ক হচ্ছে।

দ্বিতীয় একক

প্রেষণা: অর্থ, প্রকারভেদ, উপাদানসমূহ, শিক্ষায় প্রেষণার উপযোগিতা (Motivation: Meaning, Types, Factors, Implication of Education)

ভূমিকা (Introduction):

যে-কোনো সংগঠনকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে গেলে তার জন্য কোনো না কোনো শক্তির প্রয়োজন। যেমন বৈদ্যুতিক পাখা চালাতে গেলে বিদ্যুৎ প্রয়োজন, গাড়ি চালাতে গেলে জ্বালানি প্রয়োজন। ঠিক তেমনি মানবদেহ সংগঠনকে ক্রিয়াশীল করতে গেলেও এক বিশেষ শক্তির প্রয়োজন। কী সেই শক্তি? মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন সেই শক্তি হল 'প্রেষণা'। আরও স্পষ্টভাবে বললে বলা যায়— মনোবিজ্ঞানীগণের মতে মানুষের যে-কোনো সক্রিয়তামূলক আচরণের পেছনে থাকে কোনো না কোনো চাহিদাজনিত অভাববোধ এবং চাহিদা পূরণের চেষ্টা। এই চাহিদা পূরণের জন্য সচেষ্ট হওয়ার জন্য যা মানুষকে উদ্দীপিত করে তা হল মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যম। তবে এই উদ্যম সম্পর্কে মানুষ কখনও সচেতন থাকে কখনও বা অচেতন। মনোবিজ্ঞানীগণ এই উদ্যমেরই নাম দিয়েছেন প্রেষণা।

অর্থ (Meaning):

প্রেষণা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Motivation। Motivation শব্দটি Latin (ল্যাটিন) শব্দ 'Movere' থেকে এসেছে। যার অর্থ হল 'to move' অর্থাৎ গতিশীল হওয়া। আবার, প্রেষণা শব্দটি বাংলা শব্দ 'প্রেষ' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এই শব্দের অর্থ 'চাপ'। আমাদের চাহিদা বা অভাববোধ থেকে মনের ভেতরে বা বাহিরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে যে তাড়না বা উদ্যম সৃষ্টি হয়, তাকেই প্রেষণা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি প্রাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি যেভাবে একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গতি লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিকে/লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তাকেই প্রেষণা বলা হয় অর্থাৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হলে যে সক্রিয় বা গতীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা বলে। এই অবস্থা উদ্দেশ্য লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার উদয় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গতীয় অবস্থা চলতে থাকে।

সংজ্ঞা (Definition):

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রেষণার সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন এবং তার কিছু হল নিম্নরূপ—

কোহেন– প্রেষণা হল এমন কিছু যা কোনো কাজকে উৎসাহিত বা তাড়িত করে যা সেই ব্যক্তি করে বা করতে চায়। (Cohen - Something that drives people to do what they do.)

উলফক্— প্রেষণা হল এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা কোনো আচরণকে উদ্বুদ্ধ করে, নির্দেশিত করে এবং সংরক্ষণ করে। (Woolfolk - An internal state that arouses, directs and maintains behaviour.)

ব্যারন— প্রেষণা হল একটি শক্তি যা লক্ষ্যাভিমুখী আচরণকে উজ্জীবিত ও নির্দেশিত করে। (Baron - The force that energies and directs a behaviour towards a goal.)

মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রেষণা বলতে কী বোঝায় তা এক কথায় বলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাই এখানে প্রেষণার কার্যকরী সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করা হয়েছে–

প্রেষণা হল ব্যক্তির মনের অভাব বোধ থেকে সৃষ্ট এমন উত্তেজিত অবস্থা বা তাড়না যা তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ধরনের আচরণ নির্বাচন করতে এবং আচরণ করতে বাধ্য করে। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে।

প্রেষণাচক্র :

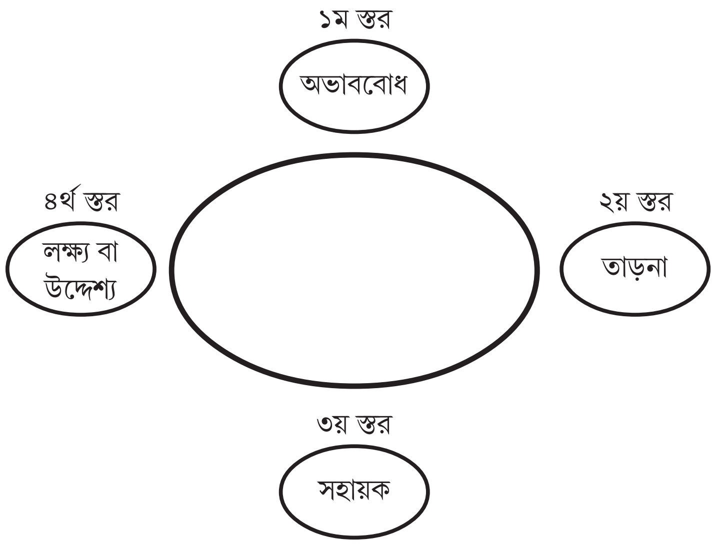

চিত্র : প্রেষণা চক্র

প্রেষণা বিশ্লেষণ করলে চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর লক্ষ করা যায়। এই স্তরগুলি চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে প্রেষণাচক্র সম্পন্ন করে। স্তরগুলি হল– (১) ব্যক্তি মনের অভাববোধ বা চাহিদা (Need), (২) তাড়না (Drive), (৩) নির্বাচিত আচরণ (Selected Behaviour), (৪) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (Goal)।

প্রেষণাচক্রের প্রথম স্তরে ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে অভাববোধ তৈরি হয় বা চাহিদা জাগে। দ্বিতীয় স্তরে চাহিদা পূরণের জন্য মনে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যাকে বলা হয় তাড়না। তৃতীয়স্তরে লক্ষ্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য ব্যক্তির মনে যে তাড়না সৃষ্টি হয় তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রাণী যেসব

আচরণ করে তাকে সহায়ক আচরণ বলে। চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তর হল লক্ষ্যবস্তু লাভ করা বা উদ্দেশ্য সাধন করা। লক্ষ্যবস্তু লাভ করলে ব্যক্তির অস্বস্তিকর অবস্থা দূর হয় এবং তৃপ্তি লাভ করে। আবার নতুন কোনো চাহিদা জাগে এবং তৃপ্তি লাভের চেষ্টা চলে। এভাবেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাণীর জীবনে প্রেষণা চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় যে প্রেষণা কখনোই চিরস্থায়ী নয়। যদি উদ্দেশ্য পূরণ অসম্ভব হয়ে থাকে তখন ঐ বিষয়ে প্রেষণা চলে যায়।

প্রেষণাচক্রটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যাক –

যে-কোনো চাহিদার মূলে থাকে অভাববোধ। মনে করা যাক কোনো ব্যক্তির মধ্যে জলের চাহিদা জেগেছে। ফলে তার মধ্যে জলের অভাববোধ দেখা দেবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জলের অভাবে ব্যক্তির মধ্যে এক অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হল যাকে বলা হবে তাড়না। তৃতীয় পর্যায়ে তাড়নার ফলে ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য সে সহায়ক আচরণ অর্থাৎ জলের খোঁজ করবে। চতুর্থ পর্যায়ে জল পেয়ে গেলে তা পান করে তার অস্বস্তি দূর করবে এবং তাতে তার তৃপ্তি লাভ হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পানীয় জল পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে এই অস্বস্তিকর অবস্থা বজায় থাকবে এবং সে সহায়ক আচরণ করবে। তবে যদি দেখা যায় ঐ মুহূর্তে পানীয় জল পাওয়া অসম্ভব তখন সে সহায়ক আচরণ করা থামিয়ে দেবে এবং প্রেষণা চলে যাবে। তার মধ্যে অতৃপ্তি বোধ দেখা দেবে। কখনো কখনো তা হতাশা, ক্রোধ ইত্যাদি ধরনের আবেগ সৃষ্টি করে।

প্রেষণার বৈশিষ্ট্য (Features of Motivation):

যে-কোনো প্রেষণ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়—

১) **চাহিদা ও অভাববোধ :** প্রেষণা ব্যক্তিগত চাহিদা এবং তার থেকে উদ্ভূত অভাববোধ থেকে সৃষ্টি হয়।

২) **কর্ম সম্পাদনের সহায়ক :** প্রেষণা নিজে কোনো কাজ সম্পন্ন করে না, কিন্তু কর্মসম্পাদনে বিশেষ সহায়তা করে।

৩) **লক্ষ্যাভিমুখে চালনা :** প্রেষণা ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করে এবং এর পরিণতি হিসাবে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়।

৪) **অন্য উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে না :** প্রেষণার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল অন্য কোনো উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত না করে প্রেষণা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে।

৫) **চিরস্থায়ী নয় :** প্রেষণা কখনই চিরস্থায়ী নয়। যদি কখনও কোনো উদ্দেশ্য পূরণ অসম্ভব হয়ে থাকে তখন প্রেষণা চলে যায়।

৬) **উদ্দেশ্য সচেতনতা :** যে-কোনো প্রেষণাযুক্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। তা না হলে ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত ক্রিয়া নির্বাচন করা সম্ভব হবে না।

৭) **প্রেষণাযুক্ত ক্রিয়ার সহাবস্থান :** কোনো বিশেষ মুহূর্তে মানুষের মধ্যে একাধিক চাহিদা, তাড়না ও প্রেষণার উদ্ভব ঘটতে পারে। তবে আমাদের সীমিত ক্ষমতার জন্য এবং কোনো বিশেষ চাহিদাটির তীব্রতার

কারণে ঐ বিশেষ চাহিদাটির প্রতিই আমাদের অভিমুখীতা দেখা যায়। তাছাড়া অনেক সময় একই প্রেষণার তাগিদে আমরা একের অধিক লক্ষ্যবস্তুর প্রতিও অগ্রসর হয়ে থাকি।

৮) ভারসাম্য বজায় রাখা : বিভিন্ন সময় ব্যক্তির মধ্যে দৈহিক মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যেসব চাহিদার সৃষ্টি হয়, প্রেষণা ক্রিয়া ব্যক্তিকে উদ্দীপিত করে সেই চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তৃপ্তি প্রদানের চেস্টা করে। ফলে ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

৯) ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক : ব্যক্তি জীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রেষণা যে কেবলমাত্র ইতিবাচক দিক থেকেই কাজ করে তা নয় কখনও-কখনও নেতিবাচক দিক থেকেও ক্রিয়াশীল হতে পারে। যেমন— সাধারণভাবে প্রশংসা ব্যক্তির মধ্যে ইতিবাচক দিক থেকে প্রেষণা জাগায়। অন্যদিকে নিন্দা ব্যক্তির মধ্যে নেতিবাচক দিক থেকে প্রেষণা জাগায়। ফলে দেখা যায় নিন্দার ভয়ে ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রেই নানা অন্যায় বা অসামাজিক আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

১০) প্রেষণার হ্রাস-বৃদ্ধি : যে-কোনো চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে প্রেষণা জাগে, তা তৃপ্ত হবার পর সেই প্রেষণার প্রাবল্য হ্রাস পায়। পরবর্তী সময়ে আবার আরেক ধরনের প্রেষণার সৃষ্টি হয় এবং তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তার তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রেষণার প্রকারভেদ (Types of Motivation): প্রেষণা মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে—

১) অন্তর্জাত (Intrinsic), ২) বহির্জাত (Extrinsic)।

১) অন্তর্জাত প্রেষণা : ব্যক্তির এক বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থার দরুন যখন তার মধ্যে কোনো বিশেষ ধরনের আচরণ করার তাগিদ অনুভূত হয় তখন তাকে বলে অন্তর্জাত প্রেষণা। যেমন– ইন্দ্রাণী নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়, কারণ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশটি তাকে আকর্ষণ করে।

২) বহির্জাত প্রেষণা : বাহ্যিক উদ্বোধকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তি যখন কোনো আচরণ করার তাগিদ অনুভব করে তাকে বলে বাহ্যিক প্রেষণা বা বহির্জাত প্রেষণা। যেমন– ইন্দ্রনীল প্রায়ই নানা ছুতোয় স্কুল কামাই করে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ নোটিশ জারি করলেন, যে ছাত্রের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতকরা 75 শতাংশের কম হবে তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। লক্ষ করা গেল এখন থেকে ইন্দ্রনীল আর স্কুল কামাই করে না।

এর থেকে বোঝা যায় প্রেষণা ভেতর থেকে আসতে পারে। যেমন, ইন্দ্রাণীর। আবার বাইরের কোনো কারণও ব্যক্তিকে প্রেষিত করতে পারে। যেমন– পরীক্ষায় যদি বসতে না দেওয়া হয় এই ভয়ে ইন্দ্রনীল এখন থেকে বিদ্যালয়ে যায়।

অত্যধিক প্রেষণার প্রভাব :

জীবনের 'অতি' কোনো বিষয়ের মতো অত্যধিক প্রেষণাও (Excessive Motivation) ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ অত্যধিক প্রেষিত অবস্থায় আবেগের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়, যা সহজ পরিস্থিতিকেও জটিল করে তুলতে পারে। যেমন— অর্ণব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পেয়ে মহাখুশি। কারণ সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই তার দারুণভাবে জানা। কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টির উত্তর সে আগে লিখবে তা সে ভাবছে।

পরীক্ষা শেষে আনন্দে লাফাতে লাফাতে সে বাড়ি এল। বাড়ি এসে প্রশ্নপত্রটি আবার দেখতে গিয়ে তার চোখে পড়ল, প্রশ্নপত্রে যেখানে পাঁচটি একক থেকে একটি করে নির্বাচন করে মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে, সেখানে সে ভুল করে চারটি একক থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখেছে।

প্রেষণার নির্ধারক সমূহ (Factors of Motivation):

মনোবিদগণের মতে কতগুলো উপাদান বা শর্ত ব্যক্তির প্রেষণার গতি নির্ধারণ করে। এগুলিকে প্রেষণার নির্ধারক বলা হয়। নির্ধারকগুলো নিম্নরূপ :-

আগ্রহ : আগ্রহ প্রেষণা ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ব্যক্তি তার কোনো চাহিদাকে তৃপ্ত করতে চাইলে চাহিদা তৃপ্তির উপযোগী বিভিন্ন লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে থেকে যেটির প্রতি তার অনুরাগ বা আগ্রহ রয়েছে সেটিকেই সে নির্বাচন করে চাহিদা তৃপ্ত করে। যেমন– ক্ষুধার সময় যখন ব্যক্তির মধ্যে খাদ্যের চাহিদা জাগে তখন তার সামনে উপস্থিত বিভিন্ন খাদ্যবস্তু যেমন— মাছ-ভাত, রুটি-সবজি, বিভিন্ন ধরনের ফল, ইত্যাদির মধ্যে যার প্রতি ব্যক্তির আগ্রহ রয়েছে সেটিকেই সে নির্বাচন করবে।

কৌতূহল : কৌতূহল প্রেষণা সৃষ্টির অন্যতম উপাদান। তাই কোনো বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হলে তা যতক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি বর্তমান থাকে। যেমন– কারও কাছ থেকে পাওয়া রঙিন কাগজে মোড়া উপহারের প্যাকেটটির ভিতরে কী আছে তা জানার জন্য যে কৌতূহল সৃষ্টি হয় তা যতক্ষণ না প্যাকেটটি খুলে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকে।

উৎকণ্ঠা : কোনো বিষয়ে উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ তৈরি হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎকণ্ঠার কারণটি দূর হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। যেমন– হাতে সময় কম। ব্যক্তি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌঁছতে পারে। এই অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয় তা নির্দিষ্ট স্থানটিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত বজায় থাকে।

মূল্যবোধ : প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রচলিত সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের একটি নিজস্ব মাপকাঠি থাকে, যাকে ঐ ব্যক্তির মূল্যবোধ বলে। এটিই ব্যক্তিকে বিভিন্নমুখী আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই বলা যায় ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধ প্রেষণ ক্রিয়ার নির্ধারক। যেমন— বাসে উঠে বসার পর কোনো ব্যক্তি লক্ষ করলেন একজন বৃদ্ধ লোক বাসে উঠেছেন কিন্তু বসার জন্য কোনো সিট না পেয়ে দাঁড়িয়েই যাচ্ছেন। তা দেখে ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ তার সিটটি ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ লোকটিকে সেখানে বসতে বললেন। এক্ষেত্রে তার মূল্যবোধের ধারণা অনুযায়ী এটাকেই উচিত কাজ বলে মনে করছেন, যা তাকে এই কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

সাফল্য : ব্যক্তি যখন কোনো কাজে সফলতা লাভ করে এবং তার ফলে তার মধ্যে যে তৃপ্তিবোধের জাগরণ ঘটে সেটাই পুনরায় তাকে নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করতে প্রেরণা জোগায়। ইংরেজি একটি প্রবাদ বাক্যে বলা হয়– 'Nothing succeeds like success' অর্থাৎ সাফল্যের চেয়ে প্রেরণাদায়ক আর কিছুই নেই। যেমন– শ্রেণিতে শিক্ষকের প্রদত্ত কোনো কাজ যখন শিক্ষার্থী সঠিকভাবে করতে সমর্থ হয় তখন তা তাকে তৃপ্তি দেয় এবং পরবর্তী কাজটিও সে সাফল্যের সঙ্গে করতে উৎসাহ বোধ করে।

অভ্যাস : ব্যক্তি যখন অভ্যাসবশত কোনো কাজ করতে অগ্রসর হয় তখন বলা যায় ব্যক্তির অভ্যাসই তাকে ঐ কাজটি করতে প্রেষিত করছে। যেমন– ঘুম থেকে উঠে যার চা-পানের অভ্যাস আছে সে ঘুম ভাঙলেই চা পানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে এবং যতক্ষণ না সে চা পান করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা বজায় থাকবে। এক্ষেত্রে তার অভ্যাসই তাকে চা-পানের জন্য প্রেষিত করছে।

পরিবেশ : নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী পরিবেশ ব্যক্তিকে ঐ কাজটি করতে প্রেষিত করে। যেমন– কোলাহল বর্জিত শান্ত-সুন্দর, পরিচ্ছন্ন শ্রেণি পরিবেশ শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযাগী হতে প্রেষিত করে।

আত্মবিশ্বাস : ব্যক্তির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস কাজ করে যে তার পক্ষে কাজটি যথাযথভাবে করা অবশ্যই সম্ভব। এটাই তাকে কাজটি সঠিকভাবে করতে প্রেষণা জোগায়। যেমন— কোলকাতার ২৪ পরগনার মাসদুর রহমান যে বিশ্বে প্রথম মানুষ, যিনি তার অসার পা নিয়েও ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন।

নিউজিল্যান্ডের জেফ্‌লো এবং মার্ক ইংলিশ নামে দুজন ব্যক্তি যাদের দুটো পা-ই নেই। এই অবস্থায় তারা এভারেস্টের চূড়োয় উঠে এভারেস্ট বিজয় করেছেন।

এই দুটো উদাহরণই প্রমাণ করে 'আমি পারব' এই আত্মবিশ্বাসই তাদেরকে প্রেষিত করে সাফল্যের চূড়োয় পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

উদ্বোধক : বিভিন্ন ধরনের উদ্বোধক, প্রেষণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই উদ্বোধক মূর্ত বস্তু বা বিমূর্ত ধারণা দুই-ই হতে পারে। সাধারণত লক্ষ্যবস্তুকেই উদ্বোধক বলা হয়ে থাকে। উপযুক্ত উদ্বোধক নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়, যা ব্যক্তিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো নির্দিষ্ট আচরণ সম্পাদনে আগ্রহী করে তুলতে পারে। যেমন— শ্রেণির সকলের সামনে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার প্রশংসা করে তার মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়। যা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

ইচ্ছা : কোনো কিছু পাওয়ার বা লাভ করার ইচ্ছা ব্যক্তিমনে প্রেষণার একটি শক্তিশালী নির্ধারক হিসাবে কাজ করে। যেমন– পরিবারের লোকজন, সহপাঠী, শিক্ষক, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রশংসা বা অনুমোদন পাওয়ার ইচ্ছা, প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ইচ্ছা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছার বাস্তবায়ন প্রেষণা হিসাবে কাজ করে।

শিক্ষায় প্রেষণার প্রভাব (Influence of Motivation in Education):

মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন শিক্ষার সাথে প্রেষণার এক অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। প্রেষণা ছাড়া শিখন সম্ভব নয়। শিখন শিক্ষার্থীকে নতুন জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে এবং দক্ষতা প্রদান করে, আর প্রেষণা শিক্ষার্থীকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ্য লাভ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারমধ্যে এই অবস্থা বজায় থাকে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর শিক্ষার্থীর মনে যে সন্তুষ্টি জাগে তা তাকে পরবর্তী কাজ করতে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলে। তাই বলা যায় শিখন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। এই কারণে আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা একটি অতি প্রয়োজনীয় আলোচনা ও অনুশীলনের বিষয়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্তভাবে প্রেষণা সৃষ্টি করতে না পারলে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ সম্ভব নয়। তবে এই তাগিদ যাকে মনোবিজ্ঞানীগণ প্রেষণা বলেন তা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কারণ সকল শিক্ষার্থীদের মনে একই পন্থায় এই তাগিদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ কোনো বিশেষ পরিস্থিতি একজনের মধ্যে তাগিদ সঞ্চার করলেও অন্যজনের মধ্যে নাও করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সরাসরি প্রেষণা সঞ্চার করতে পারেন না, তিনি শুধুমাত্র অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন। শিক্ষক যে বিভিন্ন ধরনের উপায়গুলি অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণার উন্মেষ ঘটাবেন সেক্ষেত্রে তার প্রধান প্রচেষ্টা থাকবে শিক্ষার্থীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রেষণা সৃষ্টি করার। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি শিখনের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করবেন যাতে সেই বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি তিনি লক্ষ রাখবেন শিখনের বিষয়বস্তুটি যাতে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যও ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়। আর এইভাবে অভ্যন্তরীণ প্রেষণা জাগ্রত হলেই শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখনের পথে এগিয়ে যেতে থাকবে। শিক্ষার্থীর স্বয়ং শিখন (Self-learning) প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং সে আন্তরিকভাবে শিক্ষায় মনোনিবেশ করবে।

কিন্তু অনেক সময় শিক্ষার্থীর বুদ্ধির অপরিপক্বতা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে চেতনার অভাব ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের জন্য স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। তখন বহির্জাত প্রেষণার (External Motivation) সহায়তা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে বাহ্যিক প্রেষণা কৃত্রিম। প্রকৃতপক্ষে এটিকে বহির্জাত প্রেষণা বলার কারণ হল এটি শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত থাকে না। এক্ষেত্রে কিছু বাহ্য-প্ররোচকের (External Incentive) সহায়তায় শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করতে হয়। কিছু অন্তর্জাত ও বহির্জাত প্রেষণার সৃষ্টিকারী উপাদানের উল্লেখ করা হল যা শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করে থাকে—

অন্তর্জাত প্রেষণা সৃষ্টিকারী উপাদান :

কৌতূহল : শিক্ষক শিক্ষাদানকালে বিষয়টিকে এমনভাবে পরিবেশন করবেন যাতে বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীর এই কৌতূহলই তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে প্রেষিত করবে।

আত্মবিশ্বাস : শিক্ষার্থীর মধ্যে এমনভাবে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা যাতে সে বিশ্বাস করে যে, সে কাজটি করতে পারবেই। আর এই আত্মবিশ্বাসই তাকে পাঠের বিষয়বস্তুটিকে আয়ত্ত করতে সহায়তা করবে।

বোধগম্যতা ও পরিনমনের স্তর অনুযায়ী ব্যাখ্যা : শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক পরিনমনের স্তর অনুযায়ী এবং সহজে সে যেভাবে বুঝতে পারে সেভাবে পাঠের বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে সে সহজেই প্রেষিত হবে এবং বিষয়টির প্রতি মনোযাগী হয়ে উঠবে। তাই শিক্ষক পাঠদানকালে অবশ্যই এই বিষয়টির প্রতি নজর দেবেন।

পাঠের উপযোগী পরিবেশ গঠন : আলো-হাওয়াযুক্ত, কোলাহল বর্জিত শান্ত-সুন্দর, পরিচ্ছন্ন শ্রেণি

পরিবেশ, শিক্ষার্থীকে প্রেষিত করে পাঠে মনোযোগী হতে সহায়তা করে। এইভাবে শিক্ষক পাঠের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে পারেন।

বৃহৎ লক্ষ্য স্থাপন : শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সামনে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী বৃহৎ লক্ষ্য স্থাপন করে এবং তাকে ভিত্তি করে জীবনে এগিয়ে যাওয়া এবং বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন দেখালে তা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করবে।

বহির্জাত প্রেষণা সৃষ্টিকারী উপাদান:

প্রশংসা ও পুরস্কার : শিক্ষক, শিক্ষার্থীর প্রশংসা করে অর্থাৎ বিমূর্ত পন্থায় কিংবা কোনো বস্তুধর্মী পুরস্কার প্রদান করে অর্থাৎ মূর্ত বিষয়ের সহায়তায় তার মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারের চেষ্টা করতে পারেন, তবে মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রাথমিক পর্যায়ে বস্তুধর্মী পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে প্রেষণা সঞ্চারের চেষ্টা করলেও পরবর্তী পর্যায়ে বিমূর্ত পন্থায় প্রেষণা সঞ্চারের চেষ্টা করা উচিত। তবে বস্তুধর্মী পুরস্কার কিংবা প্রশংসার মতো ভাষামূলক পুরস্কার দান ইত্যাদি যে-কোনো পন্থায়ই প্রেষণা সঞ্চারের চেষ্টা করা হোক না কেন দেখতে হবে তা যাতে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর অন্তজ প্রেষণা জাগ্রত করতে পারে।

শাস্তি : সাধারণত পুরস্কারকে ইতিবাচক এবং শাস্তিকে নেতিবাচকভাবে প্রেষণা সৃষ্টির মাধ্যম বলে মনে করা হয়। শাস্তির ভয় শিক্ষার্থীকে নানা অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকতে প্রেষিত করে। তবে মনোবিজ্ঞানীদের মতে দৈহিক শাস্তির পরিবর্তে মনোবিজ্ঞানসম্মত শাস্তিই উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টির মাধ্যমে শিখনের পথকে সুগম করে তোলে। সর্বোপরি শাস্তিদানকালে শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে তিনি যাতে কখনও উত্তেজিত বা ক্রোধান্ধ হয়ে শিক্ষার্থীকে শাস্তি না দেন।

প্রতিযোগিতা : পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব শিক্ষার্থীদের মনে অন্যের তুলনায় অধিক সাফল্য লাভের প্রেরণা জোগায়। তাই শিক্ষাদানকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করতে পারেন। তবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ফলে ছাত্রদের মধ্যে যাতে হতাশার সঞ্চার না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন–১) ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অর্থাৎ এক শিক্ষার্থীর সঙ্গো অন্য শিক্ষার্থীর প্রতিযোগিতা ২) দলগত প্রতিযোগিতা অর্থাৎ একদল শিক্ষার্থীর সঙ্গো অন্যদল শিক্ষার্থীর প্রতিযোগিতা ৩) আত্মপ্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর নিজের পূর্বেকার যোগ্যতাকে অতিক্রম করে অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। তবে তাদের মধ্যে আত্মপ্রতিযোগিতা সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও বাঞ্ছিত প্রচেষ্টা।

অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা : শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে তার মনে প্রেষণার সঞ্চার করতে পারেন। এজন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হবে। শিক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে তার অগ্রগতির ফলাফল দেখে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে প্রতিটি ছাত্রের উন্নতি বা অগ্রগতির একটি তালিকা সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিখন সহায়ক প্রদীপণের ব্যবহার : বিভিন্ন দৃষ্টি ও শ্রবণগ্রাহ্য প্রদীপণ ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলে শিক্ষাদানের একঘেয়ামী থেকে মুক্তি দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন অভিমুখী প্রেষণা সঞ্চার করতে পারেন।

উপসংহার (Conclusion):

সবশেষে বলা যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাই শিক্ষক বিদ্যালয়ে বা শ্রেণিকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি লক্ষ রাখবেন যাতে শিক্ষার্থীরা অবাঞ্ছিত ভুল বা লক্ষ্যবিহীণ আচরণ বা অভিজ্ঞতা, অবসাদ, হতাশা ইত্যাদির শিকার না হয় এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) যাতে অটুট থাকে। এজন্য পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে সহায়তা করবে এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। আর এভাবেই প্রেষণা সৃষ্টির সমস্ত আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে।

তৃতীয় একক

বুদ্ধি: অর্থ, তত্ত্ব (চার্লস স্পিয়ারম্যান এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, লুইস লিয়ন থার্স্টোন-এর বহু উপাদান তত্ত্ব), শিক্ষামূলক প্রয়োগ

(Intelligence: Meaning, Theories -- Charles Spearman's Two Factor Theory, Louis Leon Thurstone's Multiple Factor Theory)

ভূমিকা (Introduction):

দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনের সময় এরকম প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে শিশুটি বা ব্যক্তিটি খুব বুদ্ধিমান বা কম বুদ্ধি সম্পন্ন। সাধারণত ব্যক্তি বা শিশুটির আচরণকে পর্যবেক্ষণ করে, অন্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে আমরা এ ধরনের মন্তব্য করে থাকি। যেমন– বলা হয় বাচ্চাটি বেশ বুদ্ধিমান কারণ এই বয়সেই কী সুন্দর গুছিয়ে উত্তর দেয় কিংবা এই বয়সেই কী সুন্দর নিজের কাজ নিজে করতে পারে। আবার যদি কোনো ব্যক্তিকে পরিস্থিতির সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে দেখি, তাকে বুদ্ধিমান বলি। আর যে পারে না তাকে বলি বুদ্ধি কম,অর্থাৎ বুদ্ধিকে নানারকম কাজে ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে মাপতে চেষ্টা করি। মনে করা হয় ব্যক্তির সকল ধরনের সাফল্যের মূলে রয়েছে বুদ্ধি। ঊনবিংশ শতকে হার্বার্ট স্পেন্সার এবং স্যার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন প্রথম বলেন যে, মানুষের মধ্যে এক ধরনের সাধারণ ক্ষমতা আছে যা ব্যক্তিকে উন্নত কাজ ও চিন্তায় সক্ষম করে।

অর্থ (Meaning):

বুদ্ধি কী? এককথায় মনোবিজ্ঞানীরা তা বোঝাতে পারেন নি। মনোবিদ্যায় তাই বুদ্ধি একটি প্রবল বিতর্কের বিষয়। বাকিংহাম বলেছেন– শিখনের ক্ষমতাই হল বুদ্ধি। (Buckingham- Intelligence is the ability to learn.)

স্টার্ন বলেছেন– বুদ্ধি হল জীবনের নতুন নতুন সমস্যা এবং অবস্থার সাথে সঙ্গাতিবিধানের এক মানসিক ক্ষমতা। (Stern- Intelligence is the mental adaptabality to new problems and condition of life.)

টারম্যান বলেছেন– বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা। (Terman- Intelligence is ability to carry on abstract thinking.)

ওয়েসলার বলেছেন— বুদ্ধি হল ব্যক্তির উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করা, যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করা এবং পরিবেশের সঙ্গে কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করার একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। (Wechsler- Intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully to think rationally and to deal effectively with the environment.)

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বুদ্ধি কোনো একক মানসিক ক্ষমতা নয়। বিভিন্ন প্রকার আচরণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেই দিক থেকে বিচার করে বুদ্ধির সাধারণ সংজ্ঞায় বলা যায়—

বুদ্ধি হল এমন একটি মানসিক শক্তি যার সাহায্যে আমরা সূক্ষ্ম, জটিল ও বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারি, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল সহজে আয়ত্ত করতে পারি, অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি এবং প্রয়োজনবোধে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে সংযত করে কোনো একটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য আমাদের কর্মশক্তিকে নিয়োগ করতে পারি।

বুদ্ধির তত্ত্ব (Theories of Intelligence):

বুদ্ধির সংজ্ঞার মতো বুদ্ধির গঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা যায়। বুদ্ধির গঠন সংক্রান্ত প্রাচীন মতবাদগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) রাজতন্ত্রবাদ (Monarchic View), (২) সামন্ততন্ত্রবাদ (Oligarchic View), ৩) অরাজকবাদ (Anarchic View)।

১) **রাজতন্ত্রবাদ :** এই মতবাদ অনুযায়ী বুদ্ধিকে একটি কেন্দ্রীয় মানসিক শক্তি বলা হয়েছে যার নির্দেশে ব্যক্তির সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

২) **সামন্ততন্ত্রবাদ :** এই মতবাদ অনুযায়ী বুদ্ধি কোনো একক মানসিক ক্ষমতা নয়। বুদ্ধি কতগুলি প্রাথমিক মানসিক ক্ষমতার সমন্বয়। যেগুলি ব্যবহার করে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজ সম্পন্ন করে।

৩) **অরাজকবাদ :** বুদ্ধি কতগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ উপাদানের সংগঠন। তাদের প্রভাবেই ব্যক্তি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ আচরণ করে। বুদ্ধি সম্পর্কে এই তিন ধরনের ধারণা শিক্ষাবিদদের মধ্যে বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ধারণাগুলি গবেষণাভিত্তিক না হওয়ায় তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। আধুনিককালে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণের গবেষণা থেকে বুদ্ধি সম্বন্ধে যেসকল মতবাদ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে দুটির বর্ণনা করা হল-

স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman's Two Factor Theory):

ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী চার্লস এডওয়ার্ড স্পীয়ারম্যান (Charles Edward Spearman) 1904 সালে American Journal of Phychology-তে বুদ্ধি সম্পর্কিত তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলটি 'General Intelligence Objectively Determined and Measured' নামে এক প্রবন্ধে প্রথম প্রকাশ করেন। স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বটি পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্পীয়ারম্যান বহু শিক্ষার্থী এবং ছেলে-মেয়েদের বৌদ্ধিক কাজ বা বিচার বিবেচনামূলক কাজ সম্পাদন করার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত করেন যে মানুষের যে-কোনো ধরনের বৌদ্ধিক কাজ বা বিচার বিবেচনামূলক কাজ করার জন্য দুই ধরনের মানসিক উপাদান বা ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এদের একটি হল

সাধারণ মানসিক উপাদান বা *general factor*। যাকে সংক্ষেপে 'g' নাম দেন। অন্যটি হল ঐ নির্দিষ্ট কাজের বিশেষ উপাদান বা *special factor* । যাকে তিনি সংক্ষেপে 's' নাম দেন। যেমন—

গান করার পারদর্শিতার জন্য লাগে— 'g' এর কিছুটা + গান করার 's'

সাহিত্যে পারদর্শিতার জন্য লাগে— 'g' এর কিছুটা + সাহিত্যের 's'

ছবি আঁকার পারদর্শিতার জন্য লাগে— 'g' এর কিছুটা + ছবি আঁকার 's'

স্পীয়ারম্যানের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটিমাত্র 'g' উপাদান বা সাধারণ উপাদান রয়েছে। আবশ্যিক উপাদান যা সব ধরনের বৌদ্ধিক কাজে বর্তমান থাকে। এর পরিমাণ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক। অপর উপাদানটি হচ্ছে 's' উপাদান। যেহেতু বিভিন্নতার দিক দিয়ে কাজ অসংখ্য রকমের হতে পারে, সেহেতু সংখ্যার দিক দিয়েও 's' অসংখ্য হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির মধ্যে একাধিক 's' উপাদান থাকতে পারে এবং এই 's' উপাদান সব কাজের জন্য একই রকম হয় না। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য যেমন এটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। আবার পৃথক পৃথক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই 's' এর পরিমাণে পার্থক্য থাকে। বিষয়টিকে একটি জ্যামিতিক চিত্রের আকারে প্রকাশ করলে তা দেখতে নিম্নরূপ হয়—

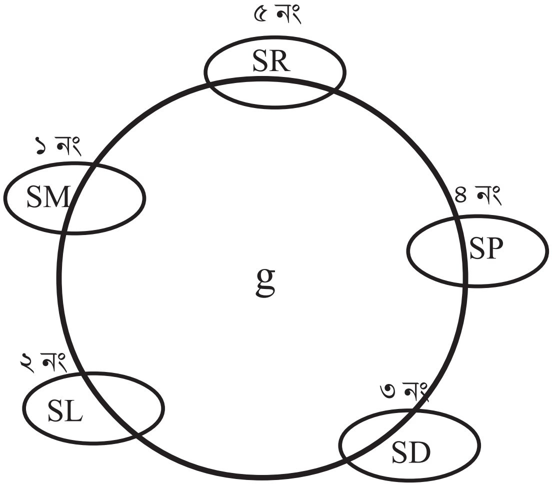

উপরোক্ত জ্যামিতিক চিত্রটিতে বড়ো বৃত্তটি হল সাধারণ উপাদান বা 'g' । আর ছোটো ছোটো উপবৃত্তগুলি হল এক একটি বিশেষ ধরনের বুদ্ধিমূলক কাজ। এক্ষেত্রে ১ নং কাজ অর্থাৎ সংগীত -এ (Music) ব্যক্তির পারদর্শিতার জন্য লাগছে g + সংগীতের বিশেষ দক্ষতা বা, ২নং কাজ অর্থাৎ সাহিত্য-এ (Literature) বিশেষ পারদর্শিতার জন্য লাগছে g + সাহিত্যে ব্যক্তির বিশেষ পারদর্শিতা বা SL, তৃতীয় কাজ অর্থাৎ নৃত্যে (Dance) পারদর্শিতার জন্য লাগছে g + নৃত্যে ব্যক্তির বিশেষ পারদর্শিতা বা SD, চতুর্থ কাজ অর্থাৎ ছবি আঁকার (Painting) বিশেষ পারদর্শিতার জন্য লাগছে g + ছবি আঁকায় ব্যক্তির বিশেষ বা SP, পঞ্চম কাজ অর্থাৎ আবৃত্তি করার (Recitation) বিশেষ পারদর্শিতার জন্য লাগছে g + আবৃত্তি করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিশেষ পারদর্শিতা বা SR।

স্পীয়ারম্যান তাঁর তত্ত্বটিকে গাণিতিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি রাশিবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন যাকে রাশিবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সহগতি। সহগতির পরিমাণকে বলা হয় সহগাঙ্ক। এটিকে ইংরেজি 'r' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

স্পীয়ারম্যান বৈপরীত্য (a), সম্পূর্ণ করা (p), পার্থক্যকরণ (b), বর্জন করা (q) এই বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সহগাঙ্ক নির্ণয় করে দেখিয়েছেন, তারা বিশেষ নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মকে তিনি বিশেষ একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করেন। এটি হল—

$$rap \times rbq - raq \times rbp = 0$$

একে স্পীয়ারম্যান টেট্রাড সমীকরণ বলেছেন। $rap \times rbq - raq \times rbp$ কে বলেছেন টেট্রাড পার্থক্য বা অন্তর। টেট্রাড সমীকরণে এই সহগাঙ্কের মান বসালে টেট্রাড অন্তর শূন্য হয়। তবে সবসময় এই অন্তর শূন্যই হবে এমন কোনো কথা নেই। পর্যবেক্ষণের নানা ত্রুটির কারণে এর কিছু তারতম্য হতে পারে।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের সংস্কার :

পরবর্তীকালে নানাবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে স্পীয়ারম্যান তার মতকে কিছুটা পরিবর্তন করে Group Factor বা দলবদ্ধ উপাদানের ধারণাকে স্বীকৃতি দেন, যা সাধারণ ক্ষমতার মতো সর্বজনীন নয় আবার বিশেষ ক্ষমতার মতো নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এর মাঝামাঝি একাধিক বৌদ্ধিক কাজে এর প্রয়োজন হয়। তবে সব কাজে নয়।

সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য : সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বা g উপাদানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) শিশু জন্ম থেকে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়। এটি বংশগতভাবে প্রাপ্ত হয়।

২) কোনো শিক্ষা, অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণের সাহায্যে এটিকে পরিবর্তন করা যায় না।

৩) সব ধরনের কাজের জন্য এটি আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হয়।

৪) নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এই সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বিকাশ হয়ে থাকে। তারপর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

৫) যে ব্যক্তির মধ্যে এই সাধারণ মানসিক ক্ষমতা যত বেশি থাকে সে বিশেষধর্মী কাজে তত সফলতা পায়।

৬) সাধারণ মানসিক ক্ষমতা সবার মধ্যে থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে পরিমাণের দিক থেকে এটি আলাদা আলাদা হয়।

বিশেষ মানসিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য : বিশেষ মানসিক ক্ষমতা বা s উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) এই ক্ষমতা অর্জিত। যেমন– গান শেখা, সেলাই শেখা, কোনো কৌশল শেখা।

২) এই ক্ষমতা পরিবর্তনশীল। বিশেষ ধরনের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সাহায্যে এটি পরিবর্তন করা

যায়। চর্চার সাহায্যে এর দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

৩) ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

৪) কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা একাধিক হতে পারে। যেমন— কেউ গণিতে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি সংগীতেও দক্ষ হতে পারে, ভালো লেখকও হতে পারে।

৫) জটিল কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ক্ষমতা একত্রিত হয়ে কাজ করে।

৬) এই ক্ষমতা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সহযোগী হিসাবে ক্রিয়াশীল হয়। এককভাবে এই ক্ষমতা কাজ করে না।

সাধারণ ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ মানসিক ক্ষমতা	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা
১. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা জন্মগত।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা জন্মগত ও অর্জিত।
২. এই ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা প্রশিক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত। এক্ষেত্রে বয়সের সীমারেখা নেই।
৩. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা সর্বজনীন।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সর্বজনীন নয়।
৪. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা একটি একক ক্ষমতা।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সংখ্যায় বহু ও পরস্পরনিরপেক্ষ।
৫. কর্মভেদে সাধারণ মানসিক ক্ষমতার পরিমাণে পার্থক্য ঘটে।	কর্মভেদে বিশেষ মানসিক ক্ষমতার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়।
৬. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপে বুদ্ধি অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এর সূচক হল বুদ্ধ্যঙ্ক।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপে প্রবণতা অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এর কোনও সূচক নেই।
৭. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা অনুশীলনসাপেক্ষ নয়।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা অনুশীলনসাপেক্ষ।
৮. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা স্বাধীন হওয়ায় এককভাবে কাজ করতে পারে।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা এককভাবে পারেনা, এটি সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সহযোগী হয়ে কাজ করে।
৯. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে কর্মনিপুণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তৈরি করতে পারে না।	বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সহায়তায় কর্মনিপুণ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তৈরি করতে পারে।

থার্স্টোনের বহু উপাদান তত্ত্ব (Thurstone's Multiple Factor Theory):

প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী লুইস লিয়ন থার্স্টোন (Louis Leon Thurstone) স্পীয়ারম্যানের সাধারণ শক্তি বা g এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে সহগতি (Co-relation) থাকলেও তার পরিমাণ খুব কম। সেইজন্য সেগুলির মধ্যে একটি মাত্র সাধারণ উপাদান আছে এরকম সিদ্ধান্ত করা যায় না। থার্স্টোনের মতে আমাদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক উপাদান আছে। এই উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি রাশিবিজ্ঞানের একটি নতুন পদ্ধতির অবতারণা করেন। এই পদ্ধতির নাম 'সরল গঠন' (Simple Structure) পদ্ধতি।

থার্স্টোন 240 জন ছাত্রের ওপর 56 ধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে তার ফলাফল ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রে সাতটি প্রাথমিক মানসিক শক্তির (Primary Mental Ability) অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। এগুলি হল—

১) স্থান বিষয়ক প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা (Spatial Ability) : কোনো কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত বস্তু বা বস্তুগুলি কতটা স্থান দখল করে থাকবে তা কাল্পনিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। যেমন— বসার ঘরটি বিভিন্ন আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে হলে কোন্ কোন্ আসবাবপত্রগুলি ঠিক কীভাবে রাখলে ঘরের ভিতরের স্থানটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং কোন্ বস্তু কতটা স্থান দখল করে থাকবে তা মনে মনে চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাটিকে সংক্ষেপে S অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

২) সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষমতা (Numerical Ability) : দ্রুত ও সঠিকভাবে সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা, গণনা করা, সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারা, সংখ্যার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে পারার ক্ষমতা এই শ্রেণির অন্তর্গত। এই ক্ষমতা বেশি থাকলে ব্যক্তি সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষমতায় দক্ষ হবে। এটিকে সংক্ষেপে N অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩) ভাষা বোধের ক্ষমতা (Verbal Comprehension Ability) : অন্যের ভাষা বোঝা, সাবলীলভাবে ব্যবহার করতে পারা। যেমন— পড়া, লেখা, শোনা। এটিকে সংক্ষেপে 'V' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৪) ভাষাগত উৎকর্ষতা (Word Fluency) : উপযুক্ত সময় দ্রুত উপযুক্ত শব্দ বা বাক্য চয়ন করে মনের ভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতা। যেমন– একজন সুবক্তা খুব দ্রুততার সঙ্গে সঠিক সময় সঠিক শব্দ চয়ন করে নিজের মনের ভাবকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারেন। ভাষাগত উৎকর্ষতাকে সংক্ষেপে 'W' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৫) স্মৃতি (Memory) : মানসিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ অনেকটাই নির্ভর করে স্মৃতির উপর। স্মৃতি হল আমাদের সব ধরনের শিখন ও অভিজ্ঞতাজনিত তথ্যের সংরক্ষণ ভাণ্ডার। যে যত দ্রুত মনে রাখতে ও মনে করতে পারে তার স্মৃতি তত প্রখর মনে করা হয়। এটিকে সংক্ষেপে 'M' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৬) প্রত্যক্ষণের দ্রুততা (Perceptual Speed) : আমরা আমাদের পাঁচটি গ্রাহক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। প্রয়োজনবোধে নিজের মতো করে সাড়া দিতে পারি। যে ব্যক্তির যথাযথভাবে দ্রুত প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা রয়েছে তিনি কম সময়ে অনেক বেশি

তথ্য আহরণ করতে পারেন, অনেক দ্রুত উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারেন এবং সমস্ত ক্ষেত্রে তৎপর আচরণ করতে পারেন। সংক্ষেপে এটিকে 'P' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন— একজন দক্ষ Proof reader এর মধ্যে এই ক্ষমতা বর্তমান থাকে যা তাকে দ্রুত ও সঠিকভাবে কাজটি করতে সহায়তা করে।

প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হল তাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ ও দক্ষ করে তোলা।

৭) **যৌক্তিক ক্ষমতা (Reasoning Ability) :** দৈনন্দিন জীবনে চলার ক্ষেত্রে যুক্তিশক্তি মানুষের অন্যতম হাতিয়ারগুলোর মধ্যে একটি, যা অন্য প্রাণীদের তুলনায় তাকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। যার যৌক্তিক ক্ষমতা যত বেশি তার পক্ষে তত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, বিভিন্ন ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করা, বিমূর্ত ধারণা গঠন করা, কোনো ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারা ইত্যাদি সম্ভব হয়। এটিকে সংক্ষেপে 'R' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

থার্স্টোনের মতে বুদ্ধি হচ্ছে উপরোক্ত সাতটি সামর্থ্যের এক সম্মিলিত রূপ। অবশ্য সমস্ত বুদ্ধিমূলক কাজে যে সাতটি সামর্থ্যই উপস্থিত থাকে তা নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এবং প্রয়োজন অনুসারে সাতটি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সামর্থ্যগুলো একত্রিত হয়ে ঐ বিশেষ কাজটি সম্পন্ন করে। এভাবে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সামর্থ্যগুলো কখনও বা সবগুলো একত্রিত হয়ে কাজটি সম্পন্ন করে। তবে কোন্ কোন্ শক্তি কখন জোটবদ্ধ হবে তা কাজটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তত্ত্বটিকে একটি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল—

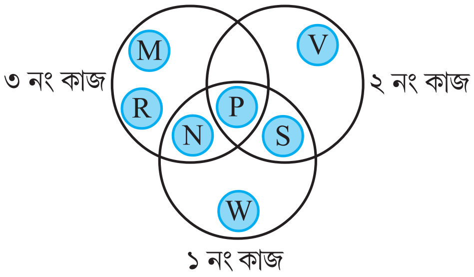

থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তির তত্ত্বের চিত্ররূপ

চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে ১ নং কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্থান বিষয়ক প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা (S), সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষমতা (N), প্রত্যক্ষণের দ্রুততা (P), ভাষাগত উৎকর্ষতার ক্ষমতা (W) প্রয়োজন। ২ নং কাজে ভাষা বোধের ক্ষমতা (V), প্রত্যক্ষণের দ্রুততা (P), স্থান বিষয়ক প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা (S) প্রয়োজন। ৩নং কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্মৃতি (M), যৌক্তিক ক্ষমতা (R), সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষমতা (N), প্রত্যক্ষণের দ্রুততা (P) প্রয়োজ্য। বলা বাহুল্য– কাজ!টর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কোন্ কোন্ শক্তি কখন জোট বাঁধবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিশুদের ক্ষেত্রে এই সাতটি উপাদানের সবক'টি পাওয়া যায়নি। পরিবর্তে একটি পেশিগত ক্ষমতা (Motor ability) পাওয়া গেছে। আরও পরবর্তীকালের গবেষণায় স্মৃতি (M)

উপাদানটি পরিত্যক্ত হয় বিভিন্ন বয়সের জন্য যে মৌলিক উপাদানগুলি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়, তা হল —

৫-৭ বছর — V, P, S, পেশিগত ক্ষমতা

৭-১১ বছর — V, P, S, R, N

১১-১৭ বছর — V, S, R, N, W

থার্স্টোনের মতে দুটি কাজে যত বেশি পরিমাণে সাধারণ উপাদান থাকবে, ঐ দুটি কাজের মধ্যে তত বেশি সহ সম্পর্ক দেখা যাবে। স্পীয়ারম্যানের 'g' বা সাধারণ উপাদানের মতো কোনো উপাদানই সব ধরনের বৌদ্ধিক কাজে প্রয়োজন হয় না।

বুদ্ধির শিক্ষামূলক প্রয়োগ (Educational Implication of Intelligence):

শিক্ষার সঙ্গো বুদ্ধির এক নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। বুদ্ধি ছাড়া শিখন অসম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় বুদ্ধি হচ্ছে শিখনের মূলভিত্তি। শিখন কতটা কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করে বুদ্ধির মাত্রার উপর। এছাড়া শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে কোনো বিষয় বুঝতে, চিন্তা করতে, ধারণা গঠন করতে, সমস্যার সমাধান করতে, ভাষাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে বুদ্ধির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিও বুদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ এটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে নিম্নবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীর তুলনায় উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা সহজ। উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কম সময়ে কম পরিশ্রমে বেশি শিখতে পারে।

শিক্ষার যে বিভিন্ন দিকগুলি বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নিম্নরূপ -

চিহ্নিতকরণ : শ্রেণিতে বিভিন্ন মাত্রার বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ থাকে। এদের কেউ উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ মাঝারি, আবার কেউ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণিতে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমাত্রার শিক্ষার্থী রয়েছে তা মানা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষককে বিভিন্ন বুদ্ধিমাত্রার শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করণে সহায়তা করে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষা পরিকল্পনা করেন।

শিক্ষার্থী নির্বাচন : শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের সামর্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। কোনো কোনো শিক্ষামূলক কোর্সের জন্য উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে ছাত্রদের নির্বাচন করতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মানসিক বিকৃতি চিহ্নিতকরণ : শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা তার শিক্ষামূলক অগ্রগতির সহায়ক। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নানারকম মানসিক অসুস্থতায় ভোগে। বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষক অনেক সময় প্রাথমিকভাবে এইসব মানসিক অসুস্থতা নির্ণয় করতে পারেন এবং চিকিৎসার জন্য বিশেষকদের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, যাদের মানসিক বিকৃতি আছে তাদের IQ সাধারণের তুলনায় কম হয়।

শিক্ষামূলক অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা : শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হতে পারবে তার অনেকটাই নির্ভর করে তার বুদ্ধির উপর। কারণ মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 70 এর নীচে তারা 10/11 বছর পর্যন্ত প্রথম শ্রেণিতে পড়ে থাকে। চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ চতুর্থ শ্রেণির বেশি এগোতে পারে না। যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 70-85 এর মধ্যে তারা সর্বোচ্চ অষ্টম শ্রেণির পাঠ সমাপ্ত করতে পারে। যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 85-100 এর মধ্যে তারা মাঝারি ধরনের শিক্ষার্থী হিসাবে বিবেচিত হয়। আর যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক 100 বা তার উপরে তারা চেষ্টা করলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারে।

তাই শিক্ষক যদি আগে থেকে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্বানুমান করে সেই অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন।

শ্রেণিকরণ : একই মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে রেখে পাঠদান করলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই সুবিধা হয় এবং পাঠদান বিশেষ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। সময় ও শক্তির অপচয় কম হয়। বুদ্ধির অভীক্ষা শিক্ষককে একই মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করে শ্রেণিকরণ করতে বিশেষ সহায়তা দান করে।

শিক্ষামূলক নির্দেশনা : শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন তার শিক্ষামূলক সাফল্যকে তরান্বিত করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে উপযুক্ত ধারণার অভাবে শিক্ষার্থী ভুল বিষয় নির্বাচন করে, যা তার জীবনে ব্যর্থতা বয়ে আনে। এই ব্যর্থতার হাত থেকে শিক্ষার্থীকে রক্ষা করার জন্য তাই প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষামূলক নির্দেশনা। আধুনিককালে শিক্ষামূলক নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রা পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে সে কোনো পাঠ্যক্রমিক ধারা অনুসরণ করলে উপযুক্ত সাফল্য লাভ করতে পারবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দান করা হয়, যা শিক্ষার্থীর সময় ও শ্রমের অপচয়ের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে।

উপসংহার (Conclusion):

আলোচনার উপসংহারে বলা যায় বুদ্ধি এমন একধরনের মানসিক ক্ষমতা, যার বহিঃপ্রকাশ ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে ঘটে থাকে। এই মানসিক ক্ষমতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। আর এই কারণে সব ধরনের কাজে সবাই সমান দক্ষ হয় না। শিক্ষাগত দিক থেকে বলা যায় বুদ্ধি ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে। তবে কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারা আমরা কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারিনা। উডওয়ার্থের ধারণা অনুযায়ী জ্ঞান যখন বুদ্ধির দ্বারা সুপ্রযুক্ত তখনই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

বুদ্ধির অভীক্ষা প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে তা হল বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার মতো বুদ্ধির অভিক্ষাগুলোও ত্রুটিমুক্ত নয়। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, নান্দনিক ও মূল্যবোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়গুলো বুদ্ধি অভীক্ষার যথার্থতাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। সে দিক থেকে বিচার করলে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলো আংশিক কখনও বা সম্পূর্ণভাবে অসহায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ এগুলোর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। তবে অভীক্ষাগুলোর এই সম্পূর্ণতার কথা মাথায় রেখেই শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে এবং সর্বোপরি সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষকগণ এগুলোর সর্বোচ্চমানের সঠিক ও উদ্দেশ্যমুখী প্রয়োগে সচেষ্ট হবেন।

চতুর্থ একক

সৃজনশীলতা: অর্থ, সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

(Creativity: Meaning, Identification of Creative Children, Role of Teacher)

ভূমিকা (Introduction):

আধুনিক মনোবিদ্যার যে সমস্ত ধারণা গড়ে ওঠেছে তার মধ্যে সৃজনশীলতার ধারণা একটি অতি গুরত্বপূর্ণ ধারণা। এই ধারণা গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত মানুষের চিন্তাধারার কোনো কিছু অভিনবত্ব থাকলে বা কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু আবিষ্কার করলে মনে করা হত তার মূলে রয়েছে বুদ্ধি অর্থাৎ তিনি মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত তখন তাকে প্রতিভাবান আখ্যা দেওয়া হত। কিন্তু পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানীগণ তাদের দীর্ঘদিনের গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে কেবলমাত্র ব্যক্তির বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে মানুষের এই ধরনের স্বকীয়তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। বহু বাস্তব তথ্যের সাহায্যে তা প্রমাণ করা যায় যেখানে এই ধরনের সৃজনশীল ব্যক্তির বুদ্ধ্যাঙ্ক (IQ) তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে দেখা যায় বুদ্ধিই যদি সমস্ত সৃজনমূলক কাজের উৎস হবে তবে দুজন সমবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেন একজন সৃজনমূলক কাজ করতে পারলেন অন্যজন পারলেন না তার ব্যাখ্যাও দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই এই ধরনের কাজের উৎস ক্ষমতা হিসাবে বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যায় সৃজন ক্ষমতার (Creativity) ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে।

সৃজনশীলতার অর্থ (Meaning of Creativity):

'সৃজনশীলতা' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Creare' (ক্রিয়ারে) থেকে। যার অর্থ 'to create, make'। সৃজনশীলতা শব্দটির সাধারণ অর্থ হল নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কিন্তু মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর অর্থ অনেক ব্যাপক। তবে আজও সৃজনক্ষমতা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীগণ কোনো সর্বজনগ্রাহ্য একক সংজ্ঞা দিতে পারেননি। তাই তারা সরাসরি সৃজনশীলতা কী তা ব্যাখ্যা না করে সৃজনাত্মক কাজ বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মানুষের সৃজনমূলক ক্ষমতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন -

ডেভিড আসুবেল বলেছেন - যে ব্যক্তি জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিতে এমন কোনো কর্ম সম্পাদন করে যার মধ্যে অভিনবত্ব থাকে এবং যার দ্বারা তাকে অন্যান্য সব ব্যক্তি থেকে পৃথক করা যায়, তাকেই সৃজনধর্মী ব্যক্তি বলে। (David Asubel- Creative person: an individual possessing a rare and singular degree of originality or creativity in some field or human endeavour that sets him off qualitatively from most other persons in this regard.)

রাশিয়ান মনোবিদ পেট্রাসিনস্কির মতে- সৃজনশীলতা বলতে আমরা এমন কোনো কাজকে বুঝি যার সাহায্যে এমন কোনো নতুন জিনিস তৈরি হয় যার একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক মূল্য আছে। (Pretrasinski- Creativity is an activity resulting in new product of a definite social value.)

বার্ক এর মতে— সৃজণশীলতা হল কোনো কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা যার যথার্থতা ও মৌলিকত্ব রয়েছে; যা অন্য কেউ কখনও ভাবেনি এবং যার উপযোগিতা রয়েছে। (Berk - Creativity is the ability to produce work that is original yet appropriate, something that others have not thought of but that is useful in some way.)

আধুনিককালে সৃজনক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ণয় ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনোবিদ জয় পল গিলফোর্ড (Joy Paul Guilford) এর মতবাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, বুদ্ধির একটি উপাদান অপসারী চিন্তন ক্রিয়াই (Divergent Thinking) সৃজনক্ষমতার একটি প্রধান উপাদান। গিলফোর্ডের মতে অপসারী চিন্তন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত কতগুলি বৌদ্ধিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় যা ব্যক্তির কর্মসম্পাদানের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম বলে সৃজনধর্মীতা।

এইভাবে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে সৃজনশীলতার সম্পর্কে বলা যায় যে সৃজনশীলতা হল অপসারী চিন্তন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত কতগুলি বৌদ্ধিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যাদের সমবেত প্রভাবে ব্যক্তি তার কর্মফলে সম্পূর্ণভাবে অভিনবত্ব প্রকাশ করে।

সৃজনশীলতার উপাদানসমূহ (Factor or Component of Ceratívity) :

সৃজনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করলে এর কিছু উপাদান বা factor বা component-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলি সৃজনশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন মনোবিদগণ সৃজনশীলতার কিছু উপাদানের উল্লেখ করেছেন। যেমন—

সাবলীলতা (Fluency) : সৃজনশীলতার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাবলীলতা বা Fluency। কোনও বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে সাবলীলভাবে বহু ধারণা উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে সৃজনশীলতার উৎপত্তি হয় অর্থাৎ, স্বাধীন প্রচেষ্টাবিহীন এবং সহজে চিন্তা করার ক্ষমতাই হল সাবলীলতা বা Fluency। মনোবিদগণের ধারণা অনুযায়ী সাবলীলতা বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন—

- **শব্দগত সাবলীলতা (Word fluency) :** এই ধরনের সাবলীলতা হল বিভিন্ন বর্ণ সমন্বয়ে বিশেষ অর্থযুক্ত শব্দ দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা।
- **সমন্বয়ের সাবলীলতা (Associational fluency) :** এটি হল দুটি শব্দ বা ধারণার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা। এই ধরনের সাবলীলতার মাধ্যমে দ্রুত সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ নির্বাচন করা যায়।

- **বহিঃপ্রকাশগত সাবলীলতা (Expressional fluency) :** এই ধরনের সাবলীলতা হল যে-কোনও ধারনের পরিস্থিতির উপযোগী আদর্শ ধারণা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা।
- **সিদ্ধান্তগ্রহণের সাবলীলতা (Decisional fluency) :** এই ধরনের সৃজনশীলতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা যে-কোনও ধরনের সৃজনশীলতা সম্পন্ন ব্যক্তির যে-কোনও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ এবং উপযুক্তভাবে সামগ্রিক ধারণা গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম।

নমনীয়তা (Flexibilty) : Flexibilty বা নমনীয়তা বলতে বোঝায়, কোনও বিষয়কে নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করার ক্ষমতা। এটি সাধারণত divergent thinking এর মধ্যে দেখা যায়। এই ক্ষমতা কোনো বিষয় বা সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করতে সচেষ্ট করে এবং চিন্তন কোনো ধরা বাঁধা পূর্ব নির্ধারিত পথে চলে না। নমনীয়তা বা Flexibilty দু ধরনের হয়ে থাকে—

- **স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা (Spontaneous flexibilty) :** এই ধরনের ক্ষমতার দ্বারা এক ধরনের চিন্তা ধারণা থেকে অন্য ধরনের চিন্তায়, মানসিক প্রক্রিয়া সহজেই বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ, কল্পনার (imagination) কাজে দ্রুত পরিবর্তন হয়।
- **অভিযোজনমূলক নমনীয়তা (Adaptive flexibilty) :** এই ধরনের নমনীয়তা দ্বারা ব্যক্তি যে-কোনো নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

মৌলিকত্ব (Originality) : উৎপাদনের মৌলিকত্বও সৃজনক্ষমতার আর একটি উপাদান। এই ধরনের ক্ষমতা হল নতুন কোনও ধারণার বা অভিনব কোনও ধারনার উৎপাদন। মৌলিকত্ব বলতে ভবিষ্যৎ চিন্তা বা চিন্তার স্পষ্টতাকেও বোঝানো হয়।

বিস্তৃতি (Elaboration) : সৃজনশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী আর একটি উপাদান হল বিস্তৃতির ক্ষমতা (Elaboration ability)। এই ক্ষমতার দ্বারা বিষয়বস্তু বা সমস্যা সংক্রান্ত বিস্তারিত জ্ঞান বা ধারণা সৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়।

এগুলি হল সৃজনশীলতার প্রধান উপাদান। এগুলি ব্যতীত আরও কিছু উপাদান সম্পর্কে মনোবিদগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন—

- **কৌতূহল (Curiosity) :** সৃজনশীলতা ব্যক্তির কৌতূহলী চিন্তন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ক্ষমতা ব্যক্তিকে নতুন বিষয় উদ্ভাবনে বা সমস্যার সমাধানে আগ্রহী করে।
- **সঞ্চালন (Transformation) :** এই ধরনের উপাদান সৃজনশীল ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্যে সঞ্চালিত বা প্রবাহিত হতে সাহায্য করে, যা এই ক্ষমতার সম্প্রসারণে সাহায্য করে।
- **মূল্যায়ন (Evaluation) :** এই ধরনের সৃজনশীলতার উপাদান কোনও বিষয়ে ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির সঠিক বিচার বা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। সৃজনশীল কাজের উপযোগিতা বোঝার ক্ষেত্রে এই উপাদানটি সাহায্য করে।

  এগুলিই হল সৃজনশীলতার বিভিন্ন উপাদান।

সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Creative Children):

প্রতিটি শিশুই কম-বেশি সৃজনশীল। যদিও এদের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। কারও কারও সৃজনশীলতার মাত্রা অতি উন্নতমানের হয়ে থাকে। আবার কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীলতা সহাবস্থান করতে পারে। যেমন বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পারদর্শিতা বা আইনস্টাইনের সংগীতের দক্ষতা প্রবাদপ্রতিম। এখন প্রশ্ন হল এই ধরনের উন্নত সৃজনশীলদের কীভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

মনোবিদ্যায় সৃজনশীলতা সম্পর্কে নানা গবেষণা হয়েছে। সেই গবেষণার ফল হিসাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে সৃজনশীলদের সম্পর্কে প্রাথমিক অনুমান করা যায় বা তাদের চিহ্নিত করা যায় তা হল -

কৌতূহল ও অনুসন্ধানী প্রকৃতি : সৃজনশীল শিশুদের মধ্যে তার চারপাশের পরিবেশ এবং অনুসন্ধানী প্রকৃতির হয়। এটাই তাদের বিভিন্ন সৃজনধর্মী কাজের সহায়ক হয়।

কল্পনা প্রবণতা: সৃজনশীল শিশুরা কল্পনা প্রবণ হয়। কোনো কিছু সৃষ্টি করার আগে সে বিষয়টিকে কল্পনা করতে পারে।

চিন্তন প্রকাশে স্বকীয়তা : এই ধরনের শিশুদের চিন্তা এবং তার প্রকাশের দিক থেকে মৌলিকত্ব থাকে। এরা অন্যের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয় না। আচরণের দিক থেকে এরা স্বয়ংনির্ভর থাকতে চায়।

বুদ্ধ্যাঙ্ক : এই ধরনের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষার স্কোর বা বুদ্ধ্যাঙ্ক সবসময় বেশি নাও হতে পারে। সাধারণত এদের বুদ্ধ্যাঙ্ক মাঝারি ধরনের হয়।

প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য : এদের মধ্যে প্রাক্ষোভিক ভারসাম্যের প্রভাব দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানীগণ বহু সৃজনধর্মী ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে তারা প্রাক্ষোভিক অস্থিরতায় ভোগে।

নতুনত্ব: রীতি বহির্ভূত কোনো বিষয় বা কোনো বিষয়ে নতুনত্ব থাকলে তার প্রতি সৃজনশীল শিশুদের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়।

মনোযোগ : সৃজনশীল শিশুরা একাকী মনোযোগ সহকারে কোনো কাজ করতে পারে, কিন্তু দলবদ্ধভাবে কাজ করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। যেমন- শ্রেণিতে পাঠদান চলাকালীন সময়ে সে নিমগ্ন হয়ে তার খাতায় ছবি আঁকতে পারে কিংবা জানালা দিয়ে দূরের আকাশের রামধনুর দিকে তাকিয়ে নানা বিষয়ে কল্পনা করতে পারে।

দৃঢ় বিশ্বাস : এদের মধ্যে নিজস্ব ধারণার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যা তাকে সমাজের বাধা-ধরা নিয়মকে অতিক্রম করতে সহায়তা করে।

অনুভূতি প্রবণতা : সৃজনশীল শিশুরা খুব বেশি মাত্রায় অনুভূতি প্রবণ হয়ে থাকে। তাই খুব সামান্য বিষয়ও তাদের আন্দোলিত করে।

বিদ্যালয়ের কাজকর্ম : এই ধরনের শিশুরা বিদ্যালয়ের গতানুগতিক কাজকর্মে কোনো উৎসাহ না থাকায় বিরক্তি বোধ করে এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ে ভালো ফল দেখাতে পারে না।

সামাজিক অভিযোজন : এই শিশুরা সংস্কারমুক্ত হয় তাই গতানুগতিক সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে চায় না। ফলে তাদের সামাজিক অভিযোজনে অসুবিধা হয়।

দীর্ঘসময় ব্যয় : সৃজনশীল ব্যক্তিরা তাদের নির্বাচিত কাজে ও নিজস্ব চিন্তার জগতে দীর্ঘসময় নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারে এবং ঐ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে।

উল্লিখিত এই বৈশিষ্ট্যগুলি সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণে সহায়তা করলেও এগুলিকে চূড়ান্ত হিসাবে ধরা যায় না। বিভিন্ন সময় এর ব্যতিক্রমও থাকতে পারে। তাছাড়া সবক'টি বৈশিষ্ট্যই যে একজনের মধ্যে দেখা যাবে তা নয়, এই কারণে ব্যক্তির সৃজনধর্মীতাকে শনাক্ত করার জন্য এবং পরিমাপের জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা গড়ে উঠেছে।

সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher to Nurture Creativity):

মানব সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের সৃজনমূলক আচরণের দ্বারাই সংঘঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বি-মত নেই যে, বিশ্বের এই বিশাল জনসংখ্যার অনুপাতে উন্নত সৃজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব খুবই কম। পাশাপাশি একথাও সত্য যে উপযুক্ত পরিবেশ ও সঠিক পরিচর্যার অভাবে অনেক সৃজনী প্রতিভা অকালেই বিনস্ট হয়। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশের পাশাপাশি তাকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা, শিক্ষার এই লক্ষ্যকে পূরণ করতে বিদ্যালয় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশে বিদ্যালয় তথা শিক্ষকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনধর্মী প্রতিভার সৃষ্টি করতে না পারলেও, যাদের মধ্যে সৃজনধর্মী বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলে তার সৃজন ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করতে পারেন, শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে এই দায়িত্বকে পালন করতে পারেন -

কল্পনা প্রসারের সুযোগ : শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য তাদের কল্পনার প্রসারের সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে। তবে তারা যাতে অসংলগ্ন বা অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে গঠনমূলক কল্পনার ব্যবহার করতে শেখে সে ব্যাপারে শিক্ষককে যত্ন নিতে হবে।

আগ্রহ অনুযায়ী কাজের সুযোগ : সৃজনশীল কিছু করতে গেলে আচরণের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষাসূচির বাইরে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী কাজ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও উপকরণের আয়োজন রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, কাদা, পাস্টিসাইন, ইত্যাদি দিয়ে মডেল তৈরি, পুতুল তৈরি, বিভিন্ন জিনিসের প্রতিকৃতি তৈরি, চিত্রাঙ্কন, বাঁশ - বেতের কাজ, কাগজ, কাঠ বা কাপড় দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা, সুচীশিল্প ইত্যাদির আয়োজন করে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করার সময় শিক্ষার্থী কোনো উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছে কি না, যাতে পরবর্তী সময়ে তাকে সেই দিকে উৎসাহ দান করা যায়।

নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি : বোজার্সের মতে মনোবিদগণ সৃজনশীলতার উন্মেষের জন্য যে দুটি প্রধান শর্তের কথা বলেন তা হল - মানসিক নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাধীনতা। সৃজনধর্মী শিশুদের ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দরুন তারা শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে না। তাছাড়া তারা প্রাক্ষোভিক দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের এই দুর্বলতার

সুযোগ গ্রহণ করে এবং এদের উপহাস ও বিরক্ত করে। ফলে তারা আহত হয় এবং উক্ত পরিবেশে নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করে। যা তাদের ব্যক্তি সত্তার বিকাশকে কেবল বাধা দানই করে না পাশাপাশি তাদের সৃজনী ক্ষমতার প্রকাশকেও ব্যাহত করে, সৃজন ক্ষমতার বিকাশের স্বার্থে তাই শিক্ষককে এ ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হয়।

অপসারী ও অভিসারী চিন্তনে উৎসাহদান : মনোবিজ্ঞানীগণের মতে সৃজনধর্মীতা অপসারী ও অভিসারী উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্যকেই ধারণা করতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কাজ কর্মের মাধ্যমে তাদের এই ধরনের চিন্তাকে উৎসাহিত করলে তাদের সৃজনধর্মীতা উৎসাহিত হবে।

মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পরিবর্তন : গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা সৃজনধর্মী শিক্ষার্থীদের যথার্থ মূল্যায়ন অসম্ভব। তাই পরীক্ষা ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন করে এমন সব প্রশ্নের আয়োজন রাখা প্রয়োজন যার উত্তর দিতে গেলে শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র পুস্তক নির্ভর হলে চলবে না স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। এভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সৃজনধর্মীতাকে উৎসাহিত করতে পারেন।

Brain Storming বা মস্তিষ্কে ঝড় তোলা : Brain Storming এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনা, ধারণা ও চেতনার জগতে ঝড় তোলার চেষ্টা করা। এই জন্য শিক্ষকগণ যে যে পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন তা হল -

(ক) সমস্যার উপাস্থাপন।

(খ) সম্ভাব্য সমাধানের অন্বেষণে উৎসাহিত করা।

(গ) বিভিন্ন সমাধানের সম্ভাবণাগুলির বিচারকরণ।

(ঘ) স্বাধীন বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সূত্র গঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

Brain Storming এর মাধ্যমে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতায় উৎসাহিত করতে পারেন।

নির্দেশনা ও পরামর্শদান : বিভিন্ন বিষয়ে সৃজনক্ষমতার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে উৎসাহ দেবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করে সৃজনশীলতার উপযুক্ত বিকাশ ও প্রকাশে সহায়তা দান করতে পারেন।

উপসংহার (Conclusion):

আলোচনার উপসংহারে যে বিশেষ দিকটির কথা উল্লেখ না করলে সৃজনশীলতার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হল সৃজণশীলতাকে পরিপুষ্ট করে ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। যে ব্যক্তি যত বেশি সৃজনশীল তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তত গভীর। বিখ্যাত লেখক, কবি, গন্থাকার, উপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বৈজ্ঞানিকদের মতো সৃজণশীল ব্যক্তিদের ক্রিয়াকর্মের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সাধারণ মানুষদের তুলনায় তাদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা অনেক বেশি গভীর। তাদের এই অসাধারণত্বই তাদের সৃজণমূলক চিন্তাকে পরিপুস্ট করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কাজেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজণশীলতার বিকাশ ঘটাতে চাইলে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক : ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যতা: অর্থ, প্রকারভেদ, কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব

ব্যক্তিগত বৈষম্যের অর্থ : এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির চেহারা, উচ্চতা, ওজন, গায়ের রঙ, বুদ্ধি, মনোযোগ দানের ক্ষমতা ইত্যাদি নানা ধরনের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাকেই বলে ব্যক্তিগত বৈষম্য।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকারভেদ : ব্যক্তিগত বৈষম্যকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

১) সহজাত অর্থাৎ যা শিশু জন্মসূত্রে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে লাভ করে। এই বৈষম্যকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, তা হল— ক) দৈহিক চেহারা, স্বাস্থ্য, উচ্চতা, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি দিক থেকে এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির তফাৎ হয়। খ) মানসিক ক্ষমতা অর্থাৎ মনোযোগ, বুদ্ধি, আগ্রহ ইত্যাদির দিক থেকে পার্থক্য হয় গ) মেজাজগত দিক থেকে পার্থক্য হয়। তাই কেউ শান্ত মেজাজের, কেউ বা উগ্র মেজাজের, কেউ হয় আক্রমণধর্মী, কেউ অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

২) অর্জিত বৈষম্য— জন্মের পর ব্যক্তি পরিবেশের প্রভাবে যা আয়ত্ত করে। এই বৈষম্যকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—

- ক) সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে এক সমাজের মানুষের সঙ্গে অন্য সমাজের মানুষের পার্থক্য ঘটে।
- খ) ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে বড়ো হওয়ার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক পার্থক্য ঘটে।
- গ) প্রাক্ষোভিক পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘটে। ফলে কেউ অল্পেতেই রেগে ওঠে, কেউ ধৈর্যশীল, কেউ উদ্যমী, কেউ হতাশাগ্রস্ত।
- ঘ) শিক্ষাগত দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ : ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নানা কারণে হয়। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায়— বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, ব্যক্তির উপর পরিবেশের প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক, স্বভাবগত বা কাজের দক্ষতামূলক ইত্যাদির দিক থেকে ভিন্নতা, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে পার্থক্য, অর্থনৈতিক অবস্থার ভিন্নতার কারণে পার্থক্য, এক ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির বিকাশের হারের পার্থক্য, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্বের ভিন্নতাজনিত পার্থক্য ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব : আধুনিক শিক্ষায় মনে করা হয় শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিগত বৈষম্যভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা যেসব দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা হল—

১) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষামূলক সহায়তা দানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। ২) শ্রেণির আকার ছোটো হলে শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখা সম্ভব। ৩) বহুমুখী পাঠক্রম অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান করা সম্ভব। ৪) বহুমুখী পাঠদান পদ্ধতি যেমন— প্রজেক্ট পদ্ধতি, ডাল্টন পদ্ধতি, গল্প বলা পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। ৫) বহুমুখী প্রদীপণ ব্যক্তিগত বৈষম্যভিত্তিক শিক্ষাদানে সহায়তা করে। ৬) বিভিন্নমুখী সহপাঠক্রমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ৭) ব্যক্তিগত বৈষম্যকে অনুসরণ করে গৃহকাজ দান। ৮) বিভিন্ন শিক্ষাগত সমস্যা দূরীকরণের জন্য শিক্ষাগত নির্দেশনা দান। ৯) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির নিরিখে Homogeneous ও Heterogeneous দল গঠন করে বিভিন্নমুখী কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয় একক : প্রেষণা: অর্থ, প্রকারভেদ, উপাদানসমূহ, শিক্ষায় প্রেষণার উপযোগিতা

প্রেষণার অর্থ : প্রেষণা হল ব্যক্তির মনের অভাব বোধ থেকে সৃষ্ট এমন উত্তেজিত অবস্থা বা তাড়না যা তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ ধরনের আচরণ নির্বাচন করতে এবং তা আচরণ করতে বাধ্য করে। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে।

প্রেষণা চক্র : প্রেষণাকে বিশ্লেষণ করলে চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর লক্ষ করা যায়। এই স্তরগুলি চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে প্রেষণাচক্র সম্পন্ন হয়। স্তরগুলি হল– ১) ব্যক্তিমনের অভাববোধ বা চাহিদা, ২) তাড়না, ৩) নির্বাচিত আচরণ ও ৪) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

প্রেষণার বৈশিষ্ট্য : প্রেষণা ব্যক্তিগত চাহিদা এবং তার থেকে উদ্ভুত অভাব বোধ থেকে সৃষ্ট হয়। কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। এটি কোনো উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত না করে ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। এটি চিরস্থায়ী নয়। ব্যক্তি উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। কোনো বিশেষ মুহূর্তে মানুষের মধ্যে একাধিক চাহিদা, তাড়না ও প্রেষণার উদ্ভব ঘটতে পারে। ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করে ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য বজায় রাখে. ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিক থেকেই ক্রিয়াশীল হয়। কোনো চাহিদা পূরণের মাধ্যমে প্রেষণার প্রাবল্য হ্রাস পায় সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন প্রেষণা সৃষ্টি হয়।

প্রেষণার প্রকারভেদ : প্রেষণা দুই ধরনের— ব্যক্তির বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থার দরুন যখন তার মধ্যে কোনো বিশেষ ধরনের আচরণ করার তাগিদ অনুভূতি হয় তাকে বলে অন্তর্জাত প্রেষণা, আর বাহ্যিক উদ্বোধকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তি যখন কোনো আচরণ করার তাগিদ অনুভব করে তাকে বলে বাহ্যিক প্রেষণা বা বহির্জাত প্রেষণা।

অত্যধিক প্রেষণার প্রভাব : অত্যধিক প্রেষণা ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। অত্যধিক প্রেষিত অবস্থায় আবেগের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়।

প্রেষণার নির্ধারকসমূহ : ১) ব্যক্তি তার চাহিদা তৃপ্ত করার জন্য আগ্রহের বিষয়বস্তুকেই নির্বাচন করে। ২) কোনো বিষয়ে কৌতূহল ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করে। ৩) কোনো বিষয়ে উৎকণ্ঠা ব্যক্তির মধ্যে

প্রেষণা সৃষ্টি করে। ৪) ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ করতে বাধ্য করে। ৫) কোনো বিষয়ে সাফল্য পরবর্তী কাজ করতে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে। এগুলো ছাড়াও ব্যক্তির নিজস্ব অভ্যাস, আত্মবিশ্বাস, ইচ্ছা সর্বোপরি পরিচ্ছন্ন, কোলাহল বর্জিত পরিবেশ ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারে সহায়তা করে।

শিক্ষার প্রেষণার প্রভাব : শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুর প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করে, শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটিয়ে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার স্তর অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। পাঠের উপযোগী পরিবেশ গঠন করে, শিক্ষার্থীর সামনে ভবিষ্যতের জন্য বৃহৎ লক্ষ্য স্থাপন করে যেমন অন্তর্জাত প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারেন। তেমনি প্রশংসা-পুরস্কার, শাস্তি দিয়ে, প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দান করে, এবং শিখন সহায়ক বিভিন্ন প্রদীপন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর মনে বহির্জাত প্রেষণার সঞ্চার করতে পারেন।

তৃতীয় একক : বুদ্ধি: অর্থ, তত্ত্ব (চার্লস স্পিয়ারম্যান এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, লুইস লিয়ন থার্স্টোন এর বহু উপাদান তত্ত্ব), শিক্ষামূলক প্রয়োগ

বুদ্ধি কী এককথায় মনোবিজ্ঞানীগণ তা প্রকাশ করতে পারেননি। তবে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বুদ্ধির যে কার্যকরী সংজ্ঞা দেওয়া যায় তা হল - বুদ্ধি এমন এক ধরনের মানসিক শক্তি যার সাহায্যে আমরা সূক্ষ্ম, কুটিল ও বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারি, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল সহজে আয়ত্ত করতে পারি, অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি এবং প্রয়োজনবোধে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে সংযত করে কোনো একটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য আমাদের কর্মশক্তিকে নিয়োগ করতে পারি।

বুদ্ধির তত্ত্ব : বুদ্ধির প্রাচীন মতবাদগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

(ক) রাজতন্ত্রবাদ (খ) সামন্ততন্ত্রবাদ (গ) অরাজকবাদ

আধুনিককালে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণের গবেষণা থেকে বুদ্ধি সমন্ধে মতবাদ গড়ে উঠেছে তার দুটি হল-

(১) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব : স্পীয়ারম্যানের মতে মানুষের যে-কোনো ধরনের বৌদ্ধিক কাজ বা বিচার বিবেচনামূলক কাজ করার জন্য দুই ধরনের মানসিক উপাদান বা ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এর একটি হল সাধারণ মানসিক উপাদান বা General Factor, সংক্ষেপে ‘g’ উপাদান। অন্যটি হল বিশেষ মানসিক উপাদান বা Special Factor, সংক্ষেপে ‘s’ উপাদান। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটি মাত্র ‘g’ উপাদান এবং অনেক ‘s’ উপাদান রয়েছে। কারণ একজন ব্যক্তি যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে, সেই হিসাবে ‘s’ ও বিভিন্ন হয়। এই ‘s’ সব কাজের জন্য একই রকম হয় না। স্পীয়ারম্যান তার তত্ত্বটিতে গাণিতিক যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের সহগাঙ্ক নির্ণয় করে

দেখিয়েছেন যে, তারা একটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলে। যাকে তিনি একটি বিশেষ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করেন এবং তার নাম দেন টেট্রাড সমীকরণ।

সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য : সব ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জন্মগত এই ক্ষমতাটি শিক্ষা বা প্রশিক্ষকের সাহায্যে পরিবর্তনযোগ্য নয়। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এটি বিকশিত হয় তারপর এর বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্ষমতা ব্যক্তির মধ্যে যত বেশি থাকবে বিশেষধর্মী কাজে সে তত সফল হবে। এটি সবার মধ্যে থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে এর পরিমাণ ভিন্ন হয়।

বিশেষ মানসিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য : এই ক্ষমতা অর্জিত। শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সাহায্যে পরিবর্তনযোগ্য। চর্চার সাহায্যে এর দক্ষতামূলক বিকাশ ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন। এই ক্ষমতা একাধিক হতে পারে। জটিল কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ক্ষমতা একত্রিত হয়ে কাজ করে। সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সহযোগী হিসাবে এটি কাজ করে, এককভাবে নয়।

(২) থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তির তত্ত্ব : থার্স্টোনের মতে আমাদের বুদ্ধির মূলে সাতটি প্রাথমিক মানসিক শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। যা পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। এই প্রাথমিক মানসিক শক্তিগুলি হল স্থান প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা, সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষমতা, ভাষাবোধের ক্ষমতা, ভাষাগত উৎকর্ষতা, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণের দ্রুততা এবং যৌক্তিক ক্ষমতা। তবে সকল বুদ্ধিমূলক কাজেই এই ক্ষমতা সবসময় উপস্থাপিত থাকবে তা নয়। কখনো কখনো থাকে। তবে কোন্ কোন্ শক্তি কখন জোটবন্ধ হবে তা কাজটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দুটি কাজের মধ্যে যত বেশি সাধারণ উপাদান থাকবে তত বেশি সহসম্পর্ক দেখা যাবে। স্পীয়ারম্যানের ‘g’ উপাদানের মতো কোনো উপাদানই সব ধরনের বৌদ্ধিক কাজের জন্য প্রয়োজন হয় না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিশুদের মধ্যে এই সাতটি উপাদানের সবক'টি পাওয়া যায় নি। পরিবর্তে পেশীগত ক্ষমতা এবং আরও পরবর্তীকালের গবেষণায় ‘স্মৃতি’ উপাদানটি পরিত্যক্ত হয়।

শিক্ষামূলক প্রয়োগ : বুদ্ধি ছাড়া শিক্ষা অসম্ভব। শিখন কতটা কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন বুদ্ধিমাত্রার শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে শিক্ষককে সেই অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করতে সহায়তা করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষামূলক কোর্সের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনে, মানসিক বিকৃতির চিহ্নিতকরণে, শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক অগ্রগতি সম্পের্ক ধারণা গঠনে, বিভিন্ন মেধা সম্পন্নদের শ্রেণিকরণে, শিক্ষামূলক নির্দেশনা দান করতে বুদ্ধির অভীক্ষা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বুদ্ধির শিক্ষামূলক প্রয়োগ : শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধির এক নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। বুদ্ধি ছাড়া শিখন অসম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় বুদ্ধি হচ্ছে শিখনের মূলভিত্তি। শিখন কতটা কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করে বুদ্ধির মাত্রার উপর। এছাড়া শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে কোনো বিষয় বুঝতে, চিন্তা করতে, ধারণা গঠন করতে, সমস্যার সমাধান করতে, ভাষাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে বুদ্ধির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিও বুদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ এটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে নিম্নবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীর তুলনায় উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা সহজ। উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কম সময়ে কম পরিশ্রমে বেশি শিখতে পারে।

বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারি, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল সহজে আয়ত্ত করতে পারি, অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে পারি, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি এবং প্রয়োজনবোধে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে সংযত করে কোনো একটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য আমাদের কর্মশক্তিকে নিয়োগ করতে পারি।

চতুর্থ একক: সৃজনশীলতা: অর্থ, সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

সৃজনশীলতার অর্থ : বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করে সৃজনশীলতার যে কার্যকরী সংজ্ঞা দেওয়া যায় তা হল- অপসারী চিন্তন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত কতগুলি বৌদ্ধিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যাদের সমবেত প্রভাবে ব্যক্তি তার কর্মফলে সম্পূর্ণভাবে অভিনবত্ব প্রকাশ করে।

সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিতকরণ : যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে সৃজনশীল শিশুদের চিহ্নিত করা যায় তা হল -

সৃজনশীল শিশুরা কৌতূহলী ও অনুসন্ধানী হয়, তারা কল্পনা প্রবণ হয়, তাদের চিন্তাধারার প্রকাশের মধ্যে স্বকীয়তা থাকে, বুদ্ধ্যাঙ্কের দিক থেকে এরা মাঝারি ধরনের হয়, এদের মধ্যে প্রাক্ষোভিক অস্থিরতা দেখা যায়, বিষয়ের নতুনত্ব তাকে আকর্ষণ করে, একাকী কাজ করলে মনোযোগ সহকারে করে কিন্তু দলগত কাজে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, নিজের ধারণার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, এরা খুব অনুভূতি প্রবণ হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক কাজকর্মে খুব একটা উৎসাহ বোধ করে না, সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে চায় না ফলে সামাজিক অভিযোজনে অসুবিধা হয়, তাদের নিজস্ব নির্বাচিত কাজে ও নিজস্ব চিন্তার জগতে দীর্ঘসময় ধরে নিমগ্ন থাকতে পারে।

সৃজনশীলতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা : নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারেন -

শিক্ষার্থীদেরকে গঠনমূলক কল্পনার ব্যবহারে উৎসাহদান করে, তাদের আগ্রহ অনুযায়ী কাজের সুযোগের ব্যবস্থা করে, তাদের জন্য নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করে, অপসারী ও অভিসারী চিন্তনে উৎসাহ দান করে, প্রশ্নপত্রের পুস্তক নির্ভর উত্তর দানের পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতার প্রয়োগ করে উত্তর দানের সুযোগের ব্যবস্থা করে, Brain Storming এর ব্যবস্থা করে এবং উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ ১ মানের প্রশ্ন

১) বহির্জাত প্রেষণার উপাদান হল—
(ক) কৌতুহল (খ) আত্মবিশ্বাস (গ) শাস্তি (ঘ) বৃহৎ লক্ষ্য স্থাপন

২) "বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা"— কথাটি কে বলেছেন?
(ক) স্টার্ন (খ) টানম্যান (গ) ওয়েসলার (ঘ) স্পেনসার

৩) দ্বি-উপাদান তত্ত্বের জনক হলেন—
(ক) স্পীয়ারম্যান (খ) থার্স্টোন (গ) বার্ক (ঘ) আসুবেল

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) "Creativity" কথাটির কোন শব্দ থেকে এসেছে?
২) প্রেষণা কত প্রকার ও কি কি?
৩) ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেগুলি কি কি?

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) মানসিক বৈষম্য বলতে কি বোঝায়?
২) স্থান প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা (Spatial Ability) বলতে কি বোঝায়?
৩) প্রেষণার স্তরগুলি কি কি?

৪ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১০০টি শব্দ

১) ব্যক্তিগত বৈষম্যের কয়েকটি কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২) প্রেষণার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখ।
৩) সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য লিখ।

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়সমূহ

- প্রথম একক : সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি: অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, প্রকারভেদ, শিক্ষামূলক উপযোগিতা
- দ্বিতীয় একক : শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় এর গুরুত্ব
- তৃতীয় একক : মূল্যবোধের শিক্ষা : অর্থ, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিষয়ের উপায় সমূহ
- চতুর্থ একক : জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতা বোধের শিক্ষা: অর্থ, জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরণে শিক্ষার ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়সমূহ
(Some Issues of Education)

উদ্দেশ্য (Objectives):

- শিক্ষার্থীরা সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, প্রকারভেদ, শিক্ষামূলক উপযোগিতা সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার অর্থ, প্রকারভেদ এবং শিক্ষায় এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধের শিক্ষার অর্থ, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিকাশের উপায় সমূহ সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষার অর্থ, এদের জাগরণে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face) :

শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলোর সংস্কার ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সার্থক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বর্তমানে কেবলমাত্র মানসিক শক্তিগুলোর উৎকর্ষতা সাধনের ব্যবস্থা থাকবে না। থাকবে শিক্ষার্থীর দেহ, প্রক্ষোভ, সামাজিক আচরণ প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলোরই সমানভাবে উন্নতি সাধনের ব্যাপক আয়োজন। তাই বিদ্যালয়ে জ্ঞানমূলক কার্যাবলি যেমন লিখন, পঠন ছাড়াও খেলাধুলা, অভিনয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি নানা কাজ ধীরে ধীরে স্থান পেতে শুরু করল। শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষাবিদগণ এই কাজগুলোর মূল্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করতে শুরু করলেন। সেই জন্য এই কাজগুলোর নাম দেওয়া হল সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি (Co-Curricular Activities) অর্থাৎ এই কাজগুলোকে বিদ্যালয় অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের বাইরে কোনো কাজ বলে মনে করা হবে না। এক কথায় বই পড়া, লেখা, অঙ্ক কষা ইত্যাদি কাজগুলো সম্পন্ন করা যেমন শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য, তেমনি খেলাধূলা, নাচগান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সম্মেলন ইত্যাদি কাজগুলোও সম্পন্ন করা তার সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজনীয়। তাই সহ পাঠ্যক্রমিক কাজগুলোকে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হল।

শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাবধারার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধাঘটিত দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধান করতে না পারলে শিক্ষাকার্যে ব্যাঘাত ঘটে। এই রকম একটি সম্পূর্ণ

পরস্পর বিরোধী বিষয় হল শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার ধারণা। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। আবার যখন শিক্ষক শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত, শিক্ষার্থীরা তখন খেলার স্বাধীনতা পেতে অধীর হয়ে উঠে। কিন্তু স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা এই দুই-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অন্তর্জাত শৃঙ্খলায় ব্যক্তি শৃঙ্খলার আরোপিত সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলে নিজের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে, যেমন– খেলার সময় শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপর কতগুলো বিধিনিষেধ নিজেরাই আরোপ করে নেয় এবং সকলে স্বেচ্ছায় সেগুলো মেনে চলে। সুতরাং দেখা যায় খেলার মধ্যে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটতে দেখা যায়। অতএব শিক্ষাকে সার্থক ও কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থী যাতে একাগ্রতা, আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা এই গুণগুলির অধিকারী হয় তা দেখাই শিক্ষার কাজ।

সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাপনের ধারার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। কৃষি, শিল্প, ধর্ম, সামাজিক বিন্যাস, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের প্রভাব এসে পড়েছে। এই সার্বিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় আধুনিকতা। কিন্তু এই আধুনিক ধারার সবকিছুই ব্যক্তি জীবনে আশীর্বাদ নয়। জীবন পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ যদি সেই পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে না পারে তাহলে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। যে সমাজে কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধের কাঠামো নেই সে সমাজের সংগঠনটিই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই প্রত্যেক সমাজের প্রথম কর্তব্য হল যে আগামীদিনের নাগরিকদের সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করা এবং সেগুলো যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে তাদের শিক্ষা দেওয়া। সামাজিক আচরণের দিক দিয়ে কতগুলো কাম্য মূল্যবোধ হল সুনাগরিকতা, বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি। এই মূল্যবোধগুলো সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মূল্যবোধ সমাজের স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা বজায় রাখে। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ বিকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে দেখা হচ্ছে।

সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করছে। ভারতবর্ষের সকল মানুষ কোনোদিন একই ভাষায় কথা বলেনি। একই ধর্ম অনুসরণ করেনি, তা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়ার সমতা দেখা গেছে। এর একটাই কারণ, জাতীয় সংহতি এবং জাতীয় আনুগত্য। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যখন ঐক্যের অনুভূতি জাগরিত হয় তখন তাকে জাতীয় সংহতি বলে। আধুনিককালে এই মনোভাবের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ব্যক্তিদিগকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে। তাই এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তির চিন্তা অন্য রাষ্ট্রের ব্যক্তিদের খুব সহজে প্রভাবিত করেছে। তাই অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিকতাবোধ অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সমাজকে উপলব্ধি করা এবং বিশ্ব-মানব সমাজে নিজের সমাজের অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর জন্য চেষ্টা করাই হল আন্তর্জাতিকতাবোধ। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ যেদিন ভাবতে শিখবে পৃথিবীর যা কিছু ভাল তার অধিকারী সে এবং যা কিছু খারাপ তার জন্যও দায়ী সে। সেদিন থেকেই সকলের মধ্যে পৃথিবীকে সুন্দর করার মনোভাব জাগরিত হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়েই সার্থকভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইভাব জাগ্রত করা যেতে পারে।

প্রথম একক

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি: অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, প্রকারভেদ, শিক্ষামূলক উপযোগিতা

(Co-curricular Activities : Meaning, Objectives, Classification, Importance in Education)

ভূমিকা (Introduction):

শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের ধারণা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাদর্শ, পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল কিছু জ্ঞান অর্জন করা এবং শিক্ষার্থীদের মনে কিছু জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। কাজেই জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটানোই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। তখন শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে, উপযুক্ত জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার নির্বাচন করে যদি যেগুলো চর্চার সুযোগ করে দেওয়া যায়। তবে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তিগুলোর বিকাশ হবে এবং তার ফলে ব্যক্তির জীবন উন্নত হবে। এই বিষয়কে বলা হয় মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of Formal Discipline)। এই চিন্তাধারা মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দির প্রথম দশক পর্যন্ত ব্যক্তির চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে, শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সেসব বিষয়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করা হতো যেগুলো শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করত। কিন্তু আধুনিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণার প্রবর্তন হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা বলতে মূলত বোঝায়, শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রচেষ্টাকে। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ শুধুমাত্র মানসিক গুণাবলির বিকাশের দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই আধুনিককালের শিক্ষাবিদদের মতে, শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশ করা। এই বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলো হল– মানসিক বিকাশ (Mental Development), দৈহিক বিকাশ (Physical Development) , আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual Development), কর্মদক্ষতার বিকাশ (Vocational Development), সামাজিক বিকাশ (Social Development), অবসরযাপনের সমতার বিকাশ (Development in the Use of Leisure Time) প্রভৃতি শিক্ষার এই লক্ষ্যের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ধারণার ও পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন নতুন ধারণার প্রবর্তন হয়েছে। এই ধারণার মধ্যে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির ধারণা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

অর্থ (Meaning):

শিক্ষাক্ষেত্রে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি এর নাম দ্বারা শিক্ষাবিদরা বোঝাতে চেয়েছেন জ্ঞানমূলক পাঠ্য বিষয়গুলো চর্চার সঙ্গো সঙ্গো শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য খেলাধুলা, বিতর্ক, অভিনয়, নাচ-গান ও বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কাজের অনুশীলন সমান গুরুত্বপূর্ণ। 'সহ' বলতে এক্ষেত্রে সহযোগী বোঝায় না, 'সহ' বলতে পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলীকেই বোঝায়। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলিকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী

প্রধান দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। কতগুলো কাজ কে গতানুগতিকভাবে শ্রেণি কক্ষের মধ্যে পরিচালনা করা যায়। এগুলোকে শ্রেণিকক্ষে পরিচালিত কার্যাবলি (Class Room Activities) বলা যেতে পারে। অন্যদিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত কতগুলো কাজ শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালিত হয়। এগুলোকে বহিঃশ্রেণিগত কার্যাবলি (Out of Class Room Activities) বলা যায়। শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের জন্য শ্রেণি অন্তর্ভূক্ত কাজের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি বহিঃশ্রেণিগত কাজ গুলো ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানে 'সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি' কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অনেক ব্যাপক। সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমের যে অংশ সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করে তাকে বলা হয় সহপাঠ্যক্রম। এটি পাঠ্যক্রমের অংশ বা বহির্ভুক্ত কোনো পৃথক বিষয় নয়। সহপাঠ্যক্রম, পাঠ্যক্রমের মূল সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

মনোবিদ এইচ.এন.রিভলিন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– যে সকল কার্যাবলি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সামগ্রিক বিকাশ এবং অপরাপর জীবন বিকাশের দিক গুলোতে সাহায্য করে, তাদের বলা হয় সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি।

(H. N. Rivlin- The activities which contribute to the pupils' complete and comprehensive development along with our traditional effort for intellectual development may be called Co-curricular activities.)

সাধারণভাবে বলা যায়, যে সব বৌদ্ধিক কার্যাবলির শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সহায়তা এবং তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক হয়। পাঠ্যক্রমের সহযোগী ওই সব কার্যাবলিকে বলা হয় 'সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি'। 'সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি' এই কথার মধ্যে দিয়ে উন্নত, বৈচিত্র্যময় কার্যবলি ও অভিজ্ঞতা সমূহকে বোঝানো হয়– যেগুলো বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু যেগুলো শিক্ষর্থীর দৈহিক, মানসিক পরিপূর্ণ বিকাশের ও পরিপোষনের জন্য, তাকে সামাজিক দিক থেকে সচেতন করার জন্য ও যোগ্য করার জন্য এবং সর্বোপরি তার চরিত্র গঠনের জন্য অপরিহার্য। কাজেই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যবলি বোঝতে গেলে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষার্থীরা যথাযথ এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে, পুথিঁগত বিদ্যা ছাড়া, যে সকল কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে, সেইগুলোকেই বলা হয় 'সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি' যেমন– খেলাধুলা, গানবাজনা, কবিতা-আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, আলোচনা, সেমিনার, পত্রিকা প্রকাশনা, আলপনাদান, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি।

উদ্দেশ্য সমূহ (Objectives):

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির অপরিহার্যতা শিক্ষাবিদগণ স্বীকার করেছেন। সুতরাং বলা যায়, এই সব কার্যাবলির গুরুত্ব শিক্ষার্থীর কাছে অপরিসীম। এই সব কার্য যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে তা নয়, এগুলো শিক্ষার্থীর মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি বিকাশে ও সাহায্য করে। সুতরাং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির অনেকগুলো উদ্দেশ্য আছে। নীচে কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল—

(১) শারীরিক বিকাশ (Physical Development): সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হল শরীরচর্চা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, বিভিন্ন প্রকারের সমাজসেবামূলক কাজ, যেমন NCC প্রশিক্ষণ, NSS প্রশিক্ষণ, NSS এর বিভিন্ন কর্মসূচী, স্কাউট ইত্যাদি। এগুলো নিয়মিত চর্চার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশ ঘটে। যার ফলে শিক্ষার্থী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

(২) মানসিক বিকাশ (Mental Development): দেহ ও মন একে অপরের সঙ্গো যুক্ত। সুস্থ দেহের মধ্যে থাকে সুস্থ মন। দৈহিক বা শারীরিক বিকাশ যথাযথ হলে তার প্রভাব মনের উপর পড়ে। বিভিন্ন প্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি, যেমন- খেলাধুলো, গান-বাজনা, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়, বির্তক, আলোচনা, সেমিনার, পত্রিকা প্রকাশনা, আলপনাদান, চিত্রাঙ্গণ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানসিক বিকাশ যথাযথ হলে তা যে কোনো ধরনের শিক্ষাগ্রহণকে প্রভাবিত ও ত্বরান্বিত করে।

(৩) সামাজিক বিকাশ (Social Development): শিক্ষার্থী শিক্ষালয় তথা বিদ্যালয়ে আসে শিক্ষালাভের জন্য। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে ব্যবস্থা করে। তাকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলে। তাই বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন কার্যাবলির মাধ্যমে যেমন অভিনয়, যৌথ প্রজেক্ট, যৌথ কার্যাবলি, N.C.C, N.S.S প্রভৃতি দলীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে তৈরী করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশ ঘটে।

(৪) আত্মবিশ্বাস গঠন (Formation of Self-Confidence): সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা। শিশুরা প্রথমে পরিবারের উপর নির্ভরশীল থাকে পরবর্তী কালে বিদ্যালয় জীবনের শুরুতে তারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির দ্বারা যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কিছু কাজ দেওয়া যায় যা তারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা করে, তবে তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

(৫) সহযোগিতার মনোভাব গঠন (Formation of Cooperation): বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাবের বিকাশ ঘটে যা সমাজের পক্ষে এবং শিক্ষার্থীর সমাজ জীবনের পক্ষে একান্ত ভাবে অপরিহার্য।

(৬) চাহিদাভিত্তিক বিকাশ (Need-based Development): শিক্ষার্থী জন্মের সময় কতগুলো সম্ভাবনা বা প্রবণতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। শিশু যখন বড় হতে থাকে এবং পরিবেশের সঙ্গো ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অংশ নেয়, তখন তার প্রবণতা অনুযায়ী তার মধ্যে বিভিন্ন চাহিদার সৃষ্টি হয়। ওই চাহিদাগুলো পরিপূর্ণ না হলে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষককে ওই সমস্ত চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীর চাহিদা ভিত্তিক বিকাশ সাধন হয়।

(৭) শৃঙ্খলা গঠন (Formation of Discipline): জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীর জীবনে শৃঙ্খলার মূল্য অনেক। তাই বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করার ব্যবস্থা থাকে। মূলত সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিক

শৃঙ্খলা হল- শিক্ষার্থীদের স্বঃতস্ফূর্ত নিয়ন্ত্রণের প্রবৃত্তি। খেলাধুলোর মধ্যে স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষাবিদরা মনে করেন শৃঙ্খলা হল- শিক্ষার্থীর স্বতস্ফূর্ত নিয়ন্ত্রনের প্রবৃত্তি। খেলাধুলার মধ্যে যথেষ্ট শৃঙ্খলা থাকে। শিক্ষার্থীরা খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ গড়ে উঠে। বিভিন্ন সভায় নিয়মিত যোগদান করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গঠিত হয়।

(৮) সেবামূলক মনোভাব গঠন (Formation of Atitude Towards Help): বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিগুলো শিক্ষার্থীর মধ্যে সেবামূলক মনোভাব গঠন করে। এন. এস. এস, এন. সি. সি, স্কাউট প্রভৃতি সেবামূলক কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেবামূলক মনোভাব গঠিত হয়। সমাজের একজন সদস্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই মনোভাব গঠিত হওয়া একান্তভাবে অপরিহার্য।

(৯) বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ (Attraction for School): বিদ্যালয়ের পুথিঁগত শ্রেণিশিক্ষাতে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি চলে আসে। বিদ্যালয়ের প্রতি অনেক শিক্ষার্থী আকর্ষণবোধ করে না। কিন্তু সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির বৈচিত্র্যময় দিকগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে তারা মানসিকভাবে আনন্দ লাভ করে থাকে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি বহু অমনোযোগী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়মুখী করে তুলতে সহায়তা করে।

(১০) অবসর যাপনের শিক্ষা (Education for Leisure): সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির অপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল সঠিক পদ্ধতিতে অবসরযাপনের সময় শিক্ষা দেওয়া। শিশু অবস্থা থেকে শিক্ষার্থীরা সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি যে সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠে, সেই বিষয়গুলো ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্থভাবে অবসরযাপনের ক্ষেত্রে তাদের সহায়ক হয়।

(১১) গণতান্ত্রিক সচেতনতার বিকাশ (Development of Democratic Consciousness): গণতান্ত্রিক সচেতনতা বিকাশ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মূল্য বিকাশের ক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। দলীয় মনোভাব গঠন, সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশ করে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক বিষয়।

(১২) চরিত্র গঠন (Character Formation): শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিগুলোতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ফলে তাদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটে। সৎ-চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি যে কোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দাবী রাখে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিগুলো শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভে বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা করে। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলীর সার্থকভাবে বিকাশ করা সম্ভব নয়। নিয়মমাফিক বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলোকে যদি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ করা সম্ভব হবে। তাই শিক্ষার্থীদের সুষম বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহ উল্লেখযোগ্য।

প্রকারভেদ (Classification) :

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক-এই দুই দিক থেকেই বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। এই সব পরিবর্তন অনেকটা অংশ জুড়ে আছে পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত নতুন ধারণা। পাঠ্যক্রমের এই ধারণার অঙ্গ হিসাবে আরও একটি ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিককালে গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হল সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির ধারণা। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশে সহায়তা করে অর্থাৎ শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিকের বিকাশসাধন করা শিক্ষার কাজ। কেবলমাত্র বৌদ্ধিক কার্যাবলির সমন্বয়ে গঠিত পাঠ্যক্রম, শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের দিকে সহায়তা করতে পারে না। জীবনের সর্বোমুখী বিকাশের জন্য বাস্তব ভিত্তিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই কারণে পাঠ্যক্রমের ধারণাকে বিস্তৃত করে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলিকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বৌদ্ধিক কাজ ছাড়া পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কাজগুলোকে একত্রে বলা হয় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি। শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে। যেহেতু, এই কাজগুলো শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশে সহায়তা করে, তাই তাদের মধ্যে যথেস্ট বৈচিত্র্য আছে। ব্যক্তিগত বৈষম্য ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়। সাধারণত যে সমস্ত কাজ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি হিসাবে বিদ্যালয়ে পরিচালনা করা হয়, সেগুলো হল —

(১) শরীর চর্চামূলক কার্যাবলি (Physical Activities): শরীর-চর্চামূলক কার্যাবলি বলতে বোঝায়, সেই সব কাজকে যেগুলো মূলত শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে। সাধারণত দুই ধরনের শরীর চর্চা মূলক কাজ বিদ্যালয়ে পরিচালনা করা হয়- কতগুলো ব্যায়াম বা শুদ্ধ শরীরচর্চামূলক কাজ এবং কতগুলো আনুষ্ঠানিক খেলাধুলা যেমন ব্যায়াম, পিটি, লংজাম্প, হাইজাম্প, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, খো খো প্রভৃতি। এই ধরনের কাজে দেহ সঞ্চালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন–1964-66) উপরন্তু, তাদের প্রতিবেদনে বলেছেন– শারীর শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না, তাদের কর্মক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, শৃঙ্খলামূলক কাজ ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।

(২) শিক্ষামূলক কার্যাবলি (Educational Activities): যে সব কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধিক বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ পায়, তাদের বলা হয় বিশেষ শিক্ষামূলক কার্যাবলি। যেমন– কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, সাহিত্য-সভা, বিতর্ক-সভা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করা এই জাতীয় কাজ। এই ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষাগত দিক থেকে নানা উদ্দেশ্য সাধন করে এবং শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করে।

(৩) সৃজনাত্মক কার্যাবলি (Creative Activities): বিদ্যালয়ের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির যে সব কার্য শিক্ষার্থীর সৃজনশীল গুণের বিকাশে সাহায্য করে, তাদের সৃজনাত্মক কার্যাবলি বলে। এই ধরনের কার্যাবলি হল– অভিনয়, কবিতা আবৃত্তি, গান-বাজনা, অঙ্কন, নৃত্যশৈলী, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, সেমিনার ইত্যাদি। এগুলোর শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত বিভিন্ন গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার নান্দনিক রুচি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

(৪) আত্মপ্রকাশমূলক কার্যাবলি (Activities for Self-expression): যে সমস্ত কার্যাবলিতে অংশ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্ষমতাকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় তাদের বলা হয় আত্মপ্রকাশমূলক কার্যাবলি। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল- প্রকৃতি পরিচয়মূলক কার্যাবলি, বিভিন্ন সংগ্রহশালা ভ্রমণ, বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

(৫) সামাজিক কার্যাবলি (Social Activities): যে সমস্ত সহপাঠ্যক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে সেগুলোকে বলা হয় সামাজিক কার্যাবলি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– রক্তদান শিবির পরিচালনা, সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও বিদ্যালয় পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যাবলি, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, এন. সি. সি ইত্যাদির মত কাজগুলো শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ সামাজিক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির যে শ্রেণিবিভাগ তার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। তাছাড়া উদাহরণস্বরূপ যে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর দ্বারা শিক্ষার্থীর একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে না। একই কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হতে পারে। তবে যেকোন কাজই বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজ হিসাবে নির্বাচন করা হোক না কেন, তার সুপরিচালনা প্রয়োজন। যেমন– সহপাঠ্যক্রমিক কাজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে তবেই তাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম অথবা খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের দিয়ে একই রকম কাজ করানো যায় না, কারণ দৈহিক বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে। তাই বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়াম, খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। বিদ্যালয়ের সময় তালিকার (Time-Table) মধ্যে এই জাতীয় কাজ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকবে। শারীর-শিক্ষার কাজ যখন পরিচালিত হবে, তখন সকল শিক্ষার্থী একই সঙ্গে অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষক যেমন শ্রেণিকক্ষে বৌদ্ধিক কাজ পরিচালনা করেন। তেমনি এই কাজও পরিচালনা করবেন। যে কোন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালিত হয় অন্যান্য বৌদ্ধিক কাজের মতই। তাই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ, সেই কাজ পরিচালন এবং মূল্যায়ন, এই কাজগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে হয়।

শিক্ষামূলক উপযোগিতা (Importance of Education):

বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির শিক্ষামূলক উপযোগিতা সম্পর্কে সমস্ত শিক্ষাবিদরা একমত পোষণ করেছেন। সেই কারণে বর্তমানে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিকে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মধ্যে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি নানা দিক থেকে শিক্ষার্থীদের বিকাশে সহায়তা করে এবং শিক্ষা প্রতিক্রিয়াকে সার্থক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তাছাড়া শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলোকে সফল করে তুলতেও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির সাহায্য করে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির শিক্ষামূলক উপযোগিতাগুলো হল–

(১) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিশুর প্রাথমিক চাহিদা ও প্রবণতাগুলোকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই জন্মগত কিছু প্রবণতা ও চাহিদা থাকে। এই চাহিদা ও প্রবণতাগুলোর তৃপ্তির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর

জীবনের সমতা বজায় থাকে এবং পাশাপাশি ব্যক্তি সত্তার সুষম বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিষয়সমূহ জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলোকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। এক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার ফলে শিক্ষার্থী তার চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে এবং শিক্ষাকে প্রবণতাভিত্তিক করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

(২) শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাসের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সমাজ জীবনে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে পারে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার এই দায়িত্ব সহপাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পালন করা সহজ হয়। দলগত ভাবে শিক্ষার্থীরা যখন বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজে অংশ গ্রহণ করে, তখন তাদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলির বিকাশ হয়। পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও সহযোগিতার মনোভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে উঠে।

(৩) শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হলে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশ গ্রহণ করার ফলে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় অর্থাৎ এই ধরনের কাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতন করে তুলে এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। এই ধরনের আত্মসচেতনতা এবং আত্মবিশ্বাস সামগ্রিকভাবে জীবন-বিকাশের সহায়ক।

(৪) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি বিদ্যালয়ের বৌদ্ধিক কাজের একঘেয়েমি দূর করে পাঠ্যক্রমের তাত্ত্বিক বিষয়গুলির মধ্যে বৈচিত্র আনতে সহায়তা করে। ফলে আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষাকার্য সম্পাদিত হয়।

(৫) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি বৌদ্ধিক কাজে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে। শিক্ষার্থীরা যে কাজ নিজে সঞ্চার করতে পারে সেকাজে তাদের আগ্রহ বেশী থাকে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশ গ্রহণ করার সময় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করে সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। ফলে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতি তাদের আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয়।

(৬) কিছু কিছু সহপাঠ্যক্রমিক কাজ, শিখন সহায়ক উপকরণ (Teaching Aids) হিসাবে কাজ করে। মনোবিদদের মতে বিমূর্তজ্ঞানের বিষয় বস্তুকে মূর্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারলে, তাদের শিখন কার্যকরী হয়। বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিমূর্ত জ্ঞানের সামগ্রিক বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে সহায়তা করে।

(৭) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্জাত শৃঙ্খলাবোধ গঠন করে। প্রত্যেক সহপাঠ্যক্রমিক কাজের কিছু নিয়ম কানুন আছে। সেই কাজে অংশ গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীকে ঐ সমস্ত নিয়মগুলো মেনে চলতে হয়। ফলে, এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করতে করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার প্রবণতা গড়ে উঠে।

(৮) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কাজের যোগ আছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এই

সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ বৃত্তিমুখী জীবনের প্রশিক্ষণ পায় এবং পরবর্তীকালে জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির উপযোগিতা অপরিসীম।

(৯) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষৎ জীবনে অবসরকালীন সময় কাটানোর সুস্থ কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। মানুষের কর্মজীবনে নিয়মিত কিছু অবসর থাকে। এই অবসর সুস্থভাবে যাপন করা স্বাভাবিক জীবনের একটি দিক। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের সুস্থ জীবন বিকাশে সহায়তা করে।

(১০) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির অনুশীলন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে অনেক বেশী প্রাণবন্ত করে তোলে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সহজ ও মধুর হয়, শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ এই দুটি কাজ ভালো হয়। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কর্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে।

উপসংহার (Conclusion):

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যায়, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা করে। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার্থীদের আধুনিক জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে না। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা আধুনিক জীবনের প্রশিক্ষণ পায় এবং শিক্ষাকে জীবনের চাহিদার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। তাই ভারতবর্ষের প্রতিটি বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রবর্তন করতে হলে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে এই চেষ্টাই করা হয়েছে। এখানে, কর্মভিত্তিক শিক্ষা (Work Education), সমাজ সেবা (Social Service), শারীর শিক্ষা (Physical Education) ইত্যাদির মত কাজকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সব কাজ কে শিক্ষার্থীর পক্ষে যেমন আবশ্যিক করা হয়েছে, তেমনি এই সব কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রেও শিক্ষকের দায়িত্ব আবশ্যিক করা হয়েছে। C. C. E. (Continuous and Comprehensive Evaluation) শিক্ষা পদ্ধতিতেও দুই ধরনের পদ্ধতি থাকে। একটি হল Scholastic এবং অপরটি হল Co-Scholastic শিক্ষা পদ্ধতি। এই Co-Scholastic পদ্ধতি হল সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির আরেকটি রূপ যা সর্বত্র স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যদি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে উপযুক্ত মনোভাব গড়ে উঠে তাহলে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির সুফল প্রত্যেকে ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

দ্বিতীয় একক

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় এর গুরুত্ব
(Discipline and Freedom: Meaning, Types, Importance in Education)

ভূমিকা (Introduction):

শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাবধারার মুখোমুখি হতে হয়। এই রকম একটি ভাবমূলক দ্বন্দ্বের সন্ধান পাওয়া যায় শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা দুটি ধারণায় এবং এই দুটি ধারণা সাধারণত পরস্পর বিরোধী। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় এই দুটি ধারণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং একথা সকল শিক্ষাবিদ স্বীকার করে নিয়েছেন। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন বা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অভিমুখী আচরণ সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করা শিক্ষার একটি ব্যবহারিক সমস্যা। শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রিত রূপ থেকেই শিক্ষাবিদগণ শৃঙ্খলা স্থাপনের সমস্যা অনুভব করেছেন। শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হবে বা পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে, এটিও ছিল সমস্যার বিষয়। তবে অন্যান্য সমস্ত সমস্যা সমাধানের মত শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে ও সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে। এই অধ্যায়ে শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা এই দুটি ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অর্থ (Meaning):

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা: প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা ছিল, বাইরে থেকে আরোপিত আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল। শিক্ষা তখন ছিল পুঁথিনির্ভর। শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্যান্য আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী 'শাসন' বা 'দমনকেই' শৃঙ্খলা হিসাবে বর্ণনা করা হতো। সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, সেগুলোকে দমননীতির মাধ্যমে অপসারণ করতে পারলে, প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হবে এগুলো ছিল প্রাচীন ধারণা। দমনমূলক তত্ত্ব (Repressionistic Theory) কে প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মত অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অনুশাসনের প্রয়োজন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা অনুশাসন মেনে না চললে শাস্তি দেওয়া হত অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী শৃঙ্খলা স্থাপনের একমাত্র উপায় ছিল দৈহিক পীড়ন। বলা হতো Spare the Rod and Spoil the Child অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের দৈহিক পীড়ন না করলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাবে না, এই ছিল ধারণা। সুতরাং, দমন মূলক তত্ত্বের মূল কথা ছিল শৃঙ্খলা বিদ্যালয়ে স্থাপন করতে হলে, দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অপ্রয়োজনীয় আচরণগুলোকে দমন করতে হবে। শৃঙ্খলা সম্পর্কে এই ধারণা মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ রুঁশো সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি মধ্যযুগীয় সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার

ত্রুটিগুলো তুলে ধরেন। তিনি তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে বলেছেন, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্যাতনের প্রয়োজন নেই। শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে। স্বাধীনভাবে কাজ করার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার্থীরা ভালমন্দ বিচার করে, নিজেদের আচরণ সংশোধন করবে। এইভাবে অবাধ স্বাধীনতাদানের মাধ্যমে শৃঙ্খলা স্থাপনের রীতিকে বলা হয় 'অবাধ প্রকাশের তত্ত্ব' (Expressionistic Theory)। তবে দেখা গেছে এই মতবাদকে সর্বজনীন ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রয়োগ করা হয়নি। তাই এই তত্ত্বের বিকল্প হিসাবে আর একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যাকে বলা হয়- 'প্রভাবিত করার তত্ত্ব' (Impressionistic Theory)। এই তত্ত্বে শৃঙ্খলা স্থাপনের একটি মধ্যবর্তী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য শিক্ষক শিশুদের এমন ভাবে প্রভাবিত করবেন, যাতে শিশু এটা উপলব্ধি না করে যে শিক্ষকতার উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষকের চারিত্রিক প্রভাবে ধীরে ধীরে নিজের আচরণ কে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সুশৃঙ্খলা জীবন যাপন করবে।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা:

বর্তমানে শিক্ষা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, ক্ষমতা ইত্যাদিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রেষণাকে কাজে লাগিয়ে পাঠদান পদ্ধতি পরিচালনা করা হয়। আবার শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকেও ও গ্রহণযোগ্য নীতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর আপন প্রকৃতিতে, প্রাকৃতিক নিয়মে শিক্ষা গ্রহণ করবে। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরোপিত কোন নিয়ন্ত্রণ নয়। শৃঙ্খলা হল আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-control)। শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ভাবে সক্রিয় থাকতে পছন্দ করে। তাদের এই সক্রিয়তাকে বাঁধা দেওয়া উচিত নয়। সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে কতগুলো চাহিদা তৃপ্তিতে সহায়তা করে এবং সেগুলো তাদের আনন্দ দেয়। স্বাভাবিক নিয়মে যে আচরণগুলো তার চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং তার কাছে আনন্দদায়ক সেগুলোই শিক্ষার্থীরা পুনরাবৃত্তি করে। এটা হল সাধারণ মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ম। আধুনিককালে শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা গঠনে এই নীতিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। শিক্ষার্থী তার নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হবে এবং তার ফলে শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে। এই ধরনের শৃঙ্খলা বাইরে থেকে আরোপিত নয়; আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্তর থেকে উৎসারিত। তাই একে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা (Spontaneous Discipline) বা মুক্ত শৃঙ্খলা (Free Discipline)। এই শৃঙ্খলা মনোবিজ্ঞান সম্মত। সুতরাং, আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা হল শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের ধারণা অনুযায়ী– স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীর অন্তর থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার স্পৃহার তাড়নায় যে আত্মনিয়ন্ত্রণ তাই হল শৃঙ্খলা। শিক্ষাবিদ স্যার পার্শিনান্ বলেছেন– আচরণগত বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের যে স্পৃহা জাগ্রত হয়, তাকেই শৃঙ্খলা বলা হয়।

শৃঙ্খলার এই ধারণাটি দুটি পর্যায়ে আছে। প্রথমত, যা ভাল নয় বা আপাত দৃষ্টিতে মন্দ তাকে স্বাভাবিক ভাবে ত্যাগ করার প্রবণতা। দ্বিতীয়ত, যা কিছু ভাল এবং গ্রহণযোগ্য তাকে সহজভাবে গ্রহণ করা। সুতরাং, বলা যেতে পারে শৃঙ্খলা মানুষের চিন্তাধারা, আচরণ এবং অনুভূতির আত্মনিয়ন্ত্রণ।

শৃঙ্খলার আধুনিক ধারণার প্রবর্তক হলেন রুঁশো (Roussesu)। তাঁর মতে শিশু স্বাভাবিক ভাবে নিষ্পাপ। সে স্বভাবতই স্বাধীনভাবে জন্মায় কিন্তু সমাজ তাকে নানা রকম বিধিনিষেধের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে। এই কৃত্রিম শৃঙ্খলা শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা স্বরূপ। শিশুকে তাই অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রকৃতির কাছে বাধা পেলে শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে শৃঙ্খলা বোধ জাগবে। 'আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে' – এই অভিজ্ঞতা শিশু আগুনে হাত দিয়ে অর্জন করবে। এইভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে শিশু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শৃঙ্খলাবোধ অর্জন করবে তা চিরস্থায়ী হবে। মন্তেস্বরী স্পষ্টভাবে বলেছেন– 'কবরের নীরবতাকে শৃঙ্খলা বলে না'। শিশুরা 'পিনবিদ্ধ একসারি প্রজাপতি' হয়ে নিশ্চল হয়ে থাকবে একে শৃঙ্খলা বলা যায় না। তাই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে ডাল্টন প্ল্যান, মন্তেস্বরী পদ্ধতি, কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট পদ্ধতি, হিউরিস্টিক পদ্ধতিতে আন্তর্জাত শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রকারভেদ (Types):

শিক্ষাবিদগণ শৃঙ্খলাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা অন্তর্জাত শৃঙ্খলা (Internal Discipline) এবং বহির্জাত শৃঙ্খলা (External Discipline)।

(১) অন্তর্জাত শৃঙ্খলা (Internal Discipline): যখন কোন কাজ করার সময় শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলে কারও প্ররোচনা বা শাসন ছাড়াই শিক্ষার্থী কাজটিতে নিজের আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করে এবং নিজেই পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলো নিজের উপর বিধি-নিষেধের অনুশাসন আরোপ করে, তখন তার মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখা দেয় তাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বলা হয়। এই অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা- স্বাভাবিক শৃঙ্খলা (Natural Discipline), আত্মশৃঙ্খলা (Self-discipline), অস্তিবাচক শৃঙ্খলা (Positive Discipline), মুক্ত শৃঙ্খলা (Free Discipline) ইত্যাদি। এই ধরনের অন্তর্জাত শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণের উপর বিদ্যালয়, শিক্ষক পরিচালক, কোন ব্যক্তি কারও কোন নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী এবং শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহের ফলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শৃঙ্খলা দেখা যায়। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর স্বাধীন ও মুক্ত প্রচেস্টা থেকে দেখা দেয়। সেখানে শিক্ষার্থী শৃঙ্খলার নিয়ম-কানুন মেনে চলে নিজের আগ্রহ ও প্রয়োজনের প্রেরণায়, কোন বাইরের শক্তির চাপে নয়। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে যে– যখন কোন চিত্রকর একটি নতুন ছবি আকেঁন বা কোন সুরকার কোন নতুন সুর সৃষ্টি করেন বা কোন ভাস্কর নতুন মূর্তি গড়েন তখন তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই বহু নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। চিত্রকরের তুলির টান, রঙের মিশ্রণ, অঙ্কনের ভঙ্গি-এ সমস্তই শৃঙ্খলার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে থাকে। তেমনি সুরকারের থেকে তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে সংহতি রেখে নতুন রাগিনী সৃষ্টি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলে। বস্তুত সমস্ত নতুন সৃষ্টির মূলে আছে এই অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। এই জন্যই অন্তর্জাত শৃঙ্খলাকে আত্মশৃঙ্খলা (Self-discipline) নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

(২) বহির্জাত শৃঙ্খলা (External Discipline): এই শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হয় না। এর জন্য মনোযোগ, একাগ্রতা, আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো

স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায় না এবং নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, শাস্তির ভয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জোর করে শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থী বাইরের প্রবল শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে শৃঙ্খলা মেনে চলে। এই বহির্জাত শৃঙ্খলা (External Discipline), কৃত্রিম শৃঙ্খলা (Artifitial Discipline) এবং নেতিবাচক শৃঙ্খলা (Negative Discipline) প্রভৃতি নামেও পরিচিত। ইংরেজী ভাষায় আদেশ ও অর্ডার (Order) কথাটি ব্যবহার করা হয়। যে শৃঙ্খলা বাইরে থেকে আরোপিত, কৃত্রিম ও নেতিবাচক তাকে শৃঙ্খলা বলা যায় না। সেটি প্রকৃত পক্ষে 'শৃঙ্খল' পদবাচ্য। যে সব থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কোন প্রবণতা দেখা যায় না, সে সবক্ষেত্রে বাইরে থেকে চাপ বা ভীতির সৃষ্টি করে তা রাখা হয়, একেই আরোপিত শৃঙ্খলা বলা হয়। সাধারণত এই ধরনের আদেশ বা আরোপিত শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোন প্রচলিত প্রথার সাহায্যে পরিচালকেরা শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। বন্দি শিবির, জেলখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আরোপিত শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা হয়।

শিক্ষায় শৃঙ্খলার গুরুত্ব (Imporrtance of Discipline in Education):

শৃঙ্খলা ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজ জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে কাজ পরিচালনার জন্য ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব আধুনিককালের সমস্ত শিক্ষাবিদ স্বীকার করে নিয়েছেন। শৃঙ্খলা আত্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আসে। কিন্তু আত্মপ্রচেষ্টায় নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসে তার চেষ্টা আবশ্যিকভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে করতে হবে। শৃঙ্খলা এমন একটি ধারণা যে এই শৃঙ্খলা ছাড়া শিক্ষা কার্যকরী হবে না; আবার শিক্ষা ছাড়া শৃঙ্খলা স্থাপনের মানসিকতা গড়ে উঠবে না। শিক্ষাবিদ্‌গণ বলেছেন, যে কোন শিক্ষা পরিকল্পনাকে বা যে কোন শিক্ষণ পদ্ধতিকে সার্থক করতে হলে শৃঙ্খলা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। শৃঙ্খলা থাকলেই শিক্ষার্থী তার নিজের জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন বিকাশ সাধনে সহায়তা করা আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, আবার এই উদ্দেশ্য সফলতা বজায় রাখার জন্য শৃঙ্খলা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার গুরুত্বের কথা কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় গুরুগৃহে অবস্থানের সময় কঠোর ব্রম্মচর্য পালন করা হতো। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল শৃঙ্খলা স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমিক শিক্ষায়ও দেখা যায় প্রকৃতির নিগূঢ় শৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান করার নীতি, আজও যা প্রচলিত আছে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে যে উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখোমুখি ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষাকে জাতি গঠনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে হলে বিদ্যালয় জীবনে অবশ্যই, শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে সমাজ জীবনেও স্থায়ী শৃঙ্খলা আসবে।

শিক্ষায় শৃঙ্খলার স্থাপন নিম্ন লিখিতভাবে করা যেতে পারে —

প্রথমত: বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা নির্ভর করে প্রধানত বিদ্যালয় পরিচালনার উপর। বিদ্যালয়ের কোন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার প্রতিকার করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত: পাঠ্যক্রম হবে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও চাহিদা ভিত্তিক। পাঠ্যক্রমে সৃজনধর্মী বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতে পারলে শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসবে।

তৃতীয়ত : শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। তাদের মতামত প্রকাশের অবাদ সুযোগ দিলে তা শৃঙ্খলার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে আগ্রহী হবে।

চতুর্থত : বিদ্যালয়ে শিক্ষায় শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে অত্যন্ত ঘনিষ্ট। শিক্ষকদের পারস্পারিক সম্পর্ক, পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে সহায়তা করে থাকে।

পঞ্চমত : বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিয়ে দায়িত্ববোধ জাগানো যায়। বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রার্থনা সভার আয়োজন, বিতর্ক সভার ব্যবস্থা, খেলাধুলা, বিভিন্ন উৎসব পালন, মনীষীদের জন্ম দিবস পালন, সমাজ সেবামূলক কাজ ইত্যাদি বিষয় গুলোর দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর ন্যস্ত করলে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সহজ হয়।

প্রকারভেদ (Types): স্বাধীনতা দু-প্রকারের হতে পারে। প্রকৃত স্বাধীনতা ও কৃত্রিম স্বাধীনতা।

প্রকৃত স্বাধীনতা : প্রকৃত স্বাধীনতা হল সে স্বাধীনতা যা শিক্ষার্থীকে কোনও গঠনমূলক ও সৃজনমূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার উন্নয়ণ ঘটায়। কোন বস্তু বা চিন্তা সৃষ্টি করতে হলে বা গঠণমূলক কিছু করতে হলে বা শিল্পীর অন্তরের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে চাই স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা। এর ফলেই সত্যিকারের সৃষ্টি পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।

কৃত্রিম স্বাধীনতা : কৃত্রিম স্বাধীনতার আরেক নাম স্বেচ্ছাচার। নিজের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় না। যদি সেই ক্ষমতা অপব্যয়িত হয় এবং কোন গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত না হয় তাহলে তা স্বেচ্ছাচার মূলক আচরণ হয়ে উঠে অর্থাৎ যেখানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নেই, অথচ কেবল মাত্র স্বাধীনতা আছে সে স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা নয়। তাহল স্বাধীনতার বিকৃত রূপ এবং তাকেই বলে কৃত্রিম স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচার থেকে কখনও কোন গঠনমূলক কাজ বা নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে না। স্বেচ্ছাচার অপচয় ও ধ্বংসের পরিপোষক মাত্র।

শিক্ষায় এর গুরুত্ব (Importance in Education):

সার্থক শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত আবশ্যক এই কথাটি বহু পূর্বে বহু শিক্ষাবিদগণ প্রচার করে এসেছেন। বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এ কথাটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়নি। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, ব্রিটিশ দার্শনিক কমেনিয়াস প্রভৃতি বহু মনীষীই শিশু স্বাধীনতাকে সমর্থন করে গেছেন। কিন্তু যিনি প্রথম সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করেন তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী

দার্শনিক রুঁশো। তাঁর ভাষায়- শিশুকে প্রকৃতিতে ছেড়ে দাও সে তার যা খুশী করুক। তিনি আরোও বলেন যে- শিশু যখন জন্মায়, তখন সে কোনো রকম কু-প্রবৃত্তি বা মন্দ প্রবণতা নিয়ে জন্মায় না। তার মন তখন নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ থাকে। কিন্তু সে যখন সমাজের দুর্নীতির সংস্পর্শে আসে তখনই তার মন কলুষিত হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল শিক্ষানায়কগণ রুঁশোর প্রচারিত এই শিশু স্বাধীনতার আদর্শটিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন। রুঁশোকে সেইজন্য শিশু স্বাধীনতার জনক বলা যেতে পারে। আধুনিক শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দানের পরিকল্পনাটি। এই জন্যই বর্তমান যুগের প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিক্ষায় কেন শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে তার সমর্থের দুটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে–

১) দর্শনশাস্ত্রমূলক যুক্তি

২) মনোবিজ্ঞানমূলক যুক্তি।

১) দর্শনশাস্ত্রমূলক যুক্তি : দর্শনের দিক দিয়ে শিক্ষার্থীকে পূর্ণবিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে অপ্রকাশিত পরমসত্তাকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে হলে তাকে দিতে হবে সবধরনের আচরণের অবাধ স্বাধীনতা। এই স্বাধীন সক্রিয়তার নাম দেওয়া হয়েছে আত্মসক্রিয়তা। খেলাভিত্তিক শিক্ষাকে আত্মসক্রিয়তার অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ফ্রয়েবেল প্রবর্তিত কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে খেলাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, শিক্ষার্থী বা শিশুর পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করছে স্বাধীনতার উপর। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অর্থ হল তার সুষ্ঠু বিকাশ প্রচেষ্টাকে ক্ষুন্ন করা। স্বাধীনতার স্বপক্ষে দর্শনভিত্তিক এই যুক্তিটি ভাববাদী শিক্ষাবিদদের দেওয়া। এই যুক্তির ফলেই কমেনিয়াস, ফ্রয়েবেল, পেস্তালৎসী, মন্তেস্বরী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি ভাববাদী শিক্ষকরা তাদের উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু স্বাধীনতার উপর এত গুরুত্ব দিয়ে গেছেন।

২) মনোবিজ্ঞানমূলক যুক্তি: শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি প্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতি ঘটানো। শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন কতগুলো সহজাত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। সেগুলোর পূর্ণ বিকাশেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা ও তার জীবন প্রয়াসের অভীষ্ট পরিণতি দেখা দেয়। যদি কোন কারণে প্রকৃতি প্রদত্ত গুণগুলোর যথাযথ বিকাশ না ঘটে তবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। তাই বলা যায়, মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করার অর্থ হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোর পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করা। অতএব শিক্ষাকে যদি সুষ্ঠু ও সার্থক করে তুলতে হয়, তাহলে শিক্ষা প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ইচ্ছা ও আত্মসক্রিয়তার স্বাভাবিক গতিপথকে অনুসরণ করবে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের দিতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপ তার বিকাশ প্রয়াসের পথে বাধার সৃষ্টি করবে না। কর্নেল পার্কার, জন ডিউই, কিল প্যাট্রিক, মন্তেস্বরী প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এই মনোবৈজ্ঞানিক কারণেই শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদানের আয়োজন করেছেন।

উপসংহার (Conclusion):

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা দুটি বিষয় সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা খর্ব হয়, যখন শিক্ষক শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত, শিক্ষার্থীরা তখন খেলার স্বাধীনতা পেতে অধীর হয়ে ওঠে। সুতরাং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গেলে স্বাধীনতা থাকে না। আবার স্বাধীনতা রক্ষা করতে গেলে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। এটি হল সাধারণ একটি অভিজ্ঞতা। কিন্তু স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অন্তর্জাত শৃঙ্খলায় শিক্ষার্থী শৃঙ্খলার আরোপিত সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে নিজের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে। যেমন — খেলার মধ্যে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপর কতগুলো বিধিনিষেধ নিজেরাই আরোপ করে নেয় এবং সকলেই স্বেচ্ছায় সেগুলো মেনে চলে। সুতরাং, খেলার মধ্যে শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার একটি সুন্দর সমন্বয় ঘটতে দেখা যায়। আবার কোন গীতিকার যখন একটি নতুন সুর সৃষ্টি করেন, ভাস্কর যখন একটি নতুন মুর্তি গড়েন অথবা কবি যখন একটি কাব্য রচনা করেন তখন তারা সকলেই স্বতঃপ্রনোদিতভাবে অন্তর্জাত শৃঙ্খলার প্রভাবে কতগুলো নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। এর জন্য তাদের স্বাধীনতার অভাব ঘটছে বলে তাঁরা মনে করেন না। এই ভাবে বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা আধুনিককালের শিক্ষাবিদরা দেখিয়েছেন যে, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে বৈপরিত্যের সম্পর্ক নেই। যেকোন সার্থক সৃষ্টির জন্য শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা দুটিই প্রয়োজন রয়েছে। শৃঙ্খলাকে যেমন আধুনিক অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা হিসাবে বিচার বিবেচনা করতে হবে তেমনি স্বাধীনতাকেও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু স্বাধীনতার তাৎপর্য স্বেচ্ছাচার নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যে স্বাধীনতা দানের কথা বলা হয়েছে তা উদ্দেশ্যমূলক। সেই উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের কল্যাণ সাধন করা। সুতরাং, শিক্ষার ব্যক্তি কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার সমন্বয়িত প্রয়োগ যা শিক্ষাক্ষেত্রে একান্তভাবে কাম্য।

তৃতীয় একক

মূল্যবোধের শিক্ষা : অর্থ, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিকাশের উপায় সমূহ

(Value Based Education : Meaning, Need, Ways of Inculcating Value through Education)

ভূমিকা (Introduction):

শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সাধন করা হয়। ব্যক্তিজীবনের বহুমুখী বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য, আর এই বহুমুখী বিকাশের ফলে ব্যক্তি আদর্শ জীবনের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠে। তাই ব্যক্তি জীবন এবং শিক্ষায় মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিষয়টির গুরুত্ব আজকাল বৃদ্ধি পেয়েছে সেটি হল মূল্যবোধের বিষয়টি। শিক্ষার যে কোনো কার্যক্রমে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূল্যবোধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতিগত দিক থেকে মানুষ যুক্তিবাদী এবং মানুষের বিচার বিবেচনার ক্ষমতা রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষকে বস্তুধর্মী স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও, মানসিকভাবে এসেছে অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার কারণেই চারিত্রিক অবমূল্যায়ন ঘটছে। মানুষ দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী আচরণে নিজেকে লিপ্ত করছে। তার ফলস্বরূপ মানুষের চারিত্রিক অবমূল্যায়ন ঘটছে। এই অবমূল্যায়নের মূল কারণ হল 'অনুপযুক্ত শিক্ষা'। সমাজ-সংগঠনের মধ্যে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, শিক্ষার উন্নতি ঘটছে না। তাই শিক্ষাবিদগণ মূল্যবোধের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাধারণভাবে মানুষের জীবনের আদর্শ ত্রিমাত্রিক (Self-determination), আত্মোপলব্ধি (Self-realization), এবং আত্মসমন্বয়ন (Self-integration)। এই তিনটি মাত্রার মধ্যে ব্যক্তি তার জীবনাদর্শকে বেছে নেয়। ব্যক্তির মধ্যে আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা জাগ্রত হলে মূল্যবোধের বিকাশ হয়।

অর্থ (Meaning):

মূল্যবোধ কথাটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কারণ মানুষ কয়েকটি ধারণার সন্নিবেশের মাধ্যমে সেই অনুযায়ী চলার পথ নির্ণয় করে লক্ষ্যে পৌঁছায়। সমাজ অনুমোদিত পথ ও লক্ষ্য মানুষকে যোগ্য, দক্ষ, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন এবং সামাজিক নাগরিক হিসাবে গঠন করতে সাহায্য করে। এটিই হল মানুষের মূল্যবোধ, সমাজে কতগুলো ধারণা রয়েছে, যেমন– অতিথি-বৎসলতা, ভ্রাতৃপ্রেম, সহযোগিতা এগুলোকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এই মূল্যবোধগুলো সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মূল্যবোধ সমাজের স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা বজায় রাখে।

মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে মূল্যবোধ হল জটিল এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের আচরণ। মানুষের দ্বারাই এই আচরণ সম্ভব। মূল্যবোধ সম্পর্কিত আচরণগুলোর কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন—

১. শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিখন ও অভিজ্ঞতার ফলে তার সহজাত আচরণগুলোর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এগুলো হল– কোনো শিশুর অর্জিত আচরণ।

২. এই অর্জিত আচরণগুলো শিশুর মধ্যে কতগুলো জৈব মানসিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে।

৩. কিছু জৈব মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অভ্যাস গঠিত হয়।

৪. কয়েকটি অভ্যাস নিয়ে শিশু যখন বেড়ে উঠতে থাকে তখন তার মধ্যে সেন্টিমেন্ট এবং মনোভাব তৈরি হয়।

৫. পরিণত বয়সে সেন্টিমেন্টগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটে এবং ব্যক্তির সবধরনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শেষ পর্যায়ে জৈব-মানসিক সংগঠনকে মূল্যবোধ বলে। দার্শনিক, সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধকে বিচার করলে বলা যায়, মূল্যবোধ হল– জৈব-মানসিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত উচ্চপর্যায়ের সংগঠন যা মানুষের মধ্যেই দেখা যায়, এটি একটি একক জীবনদর্শন যা ব্যক্তি মানুষকে চলার পথ দেখায়।

মূল্যবোধ বা ‘Value’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল– নির্বাচনের যোগ্যতা (Worthiness to be chosen), অর্থাৎ কোন্ বিষয়টিকে জীবনে প্রাধান্য দেওয়া হবে– বিদ্যাকে, না অর্থ-সম্পত্তিকে বা অন্য কিছুকে? অর্থাৎ কাউকে বা কোনো কিছুকে মূল্য দেওয়া মানে তাকে বেছে নেওয়া এবং তার সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা। মূল্যবোধের উৎস হল জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা বিভিন্ন পারিবেশিক অবস্থা, জীবন জগৎ সম্পর্কে ধারণা। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে— ভাববাদী দর্শন (Idealism) মতে মূল্যবোধ শাশ্বত, চিরন্তন, প্রকৃতিবাদী (Naturalist) ও বস্তুবাদী (Materialist)- এ বিশ্বাসী দার্শনিকগণ মনে করেন, মূল্যবোধ লুকিয়ে আছে প্রকৃতি বা বস্তুর মধ্যে, মানুষের কাজ হল তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার মাধ্যমে ওইগুলো আবিষ্কার করা। প্রয়োগবাদী (Pragmatist) ও অস্তিত্ববাদী (Existentialist) দার্শনিকরা বলেন, মূল্যবোধ ব্যক্তিভিত্তিক এবং পরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠে। যে কাজ বা যে বস্তু মানুষকে সফলতা দেয়, তারই মূল্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। মূল্যবোধই মানুষকে কর্মে প্রেরণা যোগায়।

এটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। যেমন নিজের সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের প্রবণতার (Parental Instinct) দ্বারা। পরবর্তী সময়ে মায়ের মনে যখন তার সন্তানকে কেন্দ্র করে আনন্দ, দুঃখ, ভয়, রাগ ইত্যাদির মত অনুভূতি সঞ্চারিত হয়, তখন তার ঐসব আচরণ আরো ব্যাপক জৈব-মানসিক প্রবণতার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে একটি সমন্বয়িত শক্তিশালী জৈব-মানসিক প্রবণতা গড়ে তোলে। এটি হল অপত্য স্নেহের সেন্টিমেন্ট। এই অপত্য স্নেহ যখন নিজের সন্তানকে ছাড়িয়ে অন্যান্য শিশুর মধ্যে বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণভাবে মাতৃত্ব সকল শিশুর প্রতি মমত্ববোধে পরিণত হয়। মায়ের এই যে সকল

শিশুকে স্নেহের চোখে দেখা এটাই মায়ের বা নারীজাতির জীবন দর্শন। এই একই জৈব মানসিক সংগঠনকে বলা হয় মাতৃত্বের মূল্যবোধ।

সংজ্ঞা (Definition):

গার্ডন উইলিয়ার্ড আলপোর্ট বলেছেন– মূল্যবোধ হল জৈব-মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলির এমন এক কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা যা ব্যক্তিকে সক্রিয়তার দিক থেকে পরিবেশের এক বৃহৎ অংশকে সমগুণ সম্পন্ন ভাবতে সক্ষম করে তোলে এবং তাকে সঠিক এবং উন্নত আচরণ করার প্রেরণা জোগায়। (G.W. Allport- Values are centralised systems of psycho-physical dispositions capable of making a larger portion of the environment functionally equivalent to the individual and generating in him appropriate type of adaptive and impressive behavior.)

এম.টি রামজে এর মতে– মূল্যবোধ হল আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রার্থিত। মূল্যবোধ হল জীবনে চলার পথে নির্দেশক, ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ, সমাজ কল্যাণকর, অভিযোজন সহায়ক এবং ব্যক্তির কৃষ্টি রক্ষাকারী। (M.T. Ramje- A value is what is desired or what is sought. Values may be operationally conceived as those guiding principles of life which are conductive to one’s physical and mental health as well as to social welfare and adjustment and which are is trune with one’s culture.)

মূল্যবোধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়– ধর্ম, বিশ্বাস, নৈতিকতা, জীবনদর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ– যা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিকে ধারণ করে থাকে সে সবই এই মূল্যবোধের অন্তর্গত। মূল্যবোধের ভিত্তি প্রধানত ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র। সত্য, সততা, শৃঙ্খলা, পবিত্রতা প্রভৃতির শিক্ষা প্রধানত দর্শন ও ধর্মের মধ্য থেকেই উৎসারিত হয়।

প্রয়োজনীয়তা (Need) :

বর্তমান তথ্যকেন্দ্রিক এবং জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটেছে। ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকগুলো যেমন– দৈহিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে কাম্য দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস, মূল্যবোধ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বেড়ে গেছে। মূল্যবোধে প্রয়োজনীয়তা হল–

১. বর্তমানে দেশ বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। তাই ভবিষ্যতের নাগরিক এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে যার সাহায্যে আগামীদিনের পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করতে সক্ষম হবে এবং উৎপাদনশীল দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। ভারতবর্ষ সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি, গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন মূল্যবোধ গঠন করতে হবে যা সমতা, ন্যায়বিচার, জাতীয়ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে।

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজের মধ্যে যান্ত্রিকতা, বিষয় সর্বস্বতা, শিল্পাধিক্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানুষের মনে সুখ ও শান্তির অভাব দেখা দিয়েছে। হতাশা, হিংসা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অস্থিরতা, দুর্নীতি, লোভ ইত্যাদি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সত্ত্বেও বিশ্ব আজ হিংসায় উন্মত্ত। তাই এই দূরীকরণে মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

৩. আর্থিক বিকাশ সত্ত্বেও জনগণের একটা বড় অংশ আজও দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে। ফলে মানুষ চাইছে সমগ্র বিশ্বকে তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে। তার থেকে জন্ম নিচ্ছে লোভ, লালসা এবং অনেক অবাঞ্ছিত আচরণ। মানুষের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবের ফলে চরিত্র ও মূল্যবোধের সংকট দেখা দিচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় থেকে উত্তরণের জন্য মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে।

৪. সমাজতত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ জাগরণ বিশেষ প্রয়োজন। কোনো বিশেষ সমাজ বলতে বোঝায় একটি সংস্কৃতি, আচরণধারা, জ্ঞান প্রভৃতির ভাণ্ডারটিকে। কোনো সমাজকে বেঁচে থাকতে হলে ঐ বিশেষ ঐতিহ্যের ভাণ্ডারটি আগামীদিনের সমাজের নাগরিকদের হাতে তুলে দিতে হবে। এইভাবে সমাজ এক গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীতে বেঁচে থাকে। মূল্যবোধের দ্বারা শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় থাকে। যে সমাজে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধের কাঠামো নেই, সে সমাজের সংগঠনটিই দুর্বল ও অসংহত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য হয়।

৫. সামাজিক আচরণের দিক দিয়ে কতগুলো কাম্য মূল্যবোধ হল সুনাগরিকতা, দলবিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি সকল সমাজের নাগরিকদের এই মূল্যবোধগুলো আহরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৬. ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়েও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আহরণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সুষ্ঠু, সার্থক ও সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য আধুনিক সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কতগুলো মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিভিন্ন সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কতগুলো মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিভিন্ন সমাজে মূল্যবোধের কাঠামো বিভিন্ন হলেও কতগুলো মূল্যবোধ সব সমাজেই অভিন্ন। যেমন, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বন্ধুত্ব, কর্তৃব্যপরায়নতা এই মূল্যবোধগুলো ব্যক্তিগত জীবনে আহরণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

৭. শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ আহরণ বিশেষ প্রয়োজন। সমাজে বসবাস করতে হলে কোন্ আচরণটি করণীয়, কোন্ আচরণটি করণীয় নয়, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করতে হবে এ সবই নির্ভর করে মূল্যবোধ আয়ত্ত করার উপর।

৮. প্রতিটি ব্যক্তির কাছে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ একটি বিশেষ অনুভূতি। এর জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ। মানুষের জীবনের যে আদর্শগুলো আছে, যে মানবীয় সুপ্ত সত্তা তার মধ্যে আছে তা সর্বক্ষেত্রেই সমান। সেই সুপ্ত মানবীয় উপাদানগুলোকে জাগ্রত করার জন্য মূল্যবোধ বিশেষভাবে কার্যকরী।

৯. ব্যক্তির আচরণে সামঞ্জস্যতা আনার জন্য মূল্যবোধ প্রয়োজন। ব্যক্তির আচরণ মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় জৈব মানসিক প্রবণতার দ্বারা। তাই মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনের আচরণগত অসামঞ্জস্যতা দূর করতে সহায়তা করে।

১০. মানবজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত আছে জাতীয়তাবোধ এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ। এই মূল্যবোধগুলো মানবসমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়। সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধ আহরণ এবং সেগুলো জীবনে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মূল্যবোধ একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মানবজীবনে মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা সময় উপযোগী একটি বিষয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃত মূল্যবোধ জাগ্রত হলে, সে সামাজিক দিক থেকে অনেক বেশি উপযোগী হয়ে উঠে। জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত চাহিদার সঙ্গে সমাজের চাহিদার সমন্বয় সাধন করে উপযুক্ত আচরণ করতে পারে। শিক্ষার্থীর সঠিক কর্মপন্থা নির্বাচন এবং সামাজিক জীব হিসাবে সঠিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবার জন্য বর্তমানে মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিকাশের উপায় সমূহ (Ways of Inculcating Value through Education) :

শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ডিউইর ভাষায় শিক্ষার লক্ষ্যেরই একটি অঙ্গ হল মূল্যবোধ। শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক অতি নিবিড়। একথা খুবই সত্য যে একটি সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে সমাজের জনগণের উন্নয়ন ও প্রগতি নির্ভর করে সমাজের মূল্যবোধের কাঠামোর উপর। এই মূল্যবোধ কি প্রকারের এবং তা ভালো কি মন্দ সেটি বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল সেই মূল্যবোধের কাঠামোটি কতটা সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত।

কতকগুলো মূল্যবোধ সকল সমাজেই স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়ে থাকে। সেগুলোকে শাশ্বত বা স্থায়ী মূল্যবোধ বলা হয়। এই মূল্যবোধগুলোকে শাশ্বত বলা হয় এই অর্থে যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপনের মৌলিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলোর সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সম্পাদন এই মূল্যবোধগুলোর উপর নির্ভর করে। সকল সমাজের মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করেছে যে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও তৃপ্তিকর করতে হলে এই মূল্যবোধগুলো অনুযায়ী আচরণ করা অবশ্য দরকার। এই শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর অন্তর্গত হল, সত্যবাদিতা, সততা, সৌন্দর্যবোধ, কৃতজ্ঞতা, দয়া ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল যুগের সকল সমাজেই এই মূল্যবোধগুলোকে মানবজীবনের নীতি নির্ধারক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া আরও কতকগুলো মূল্যবোধের উল্লেখ করা যায় যেগুলো শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর মতো চিরস্থায়ী না হলেও বর্তমান ও উন্নত মানবজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক আদর্শ, সমাজচেতনা, জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই মূল্যবোধগুলো মানব সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়।

সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধসমূহের আহরণ এবং সেগুলোর জীবনে যথাযথ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে একটি সমাজের স্থায়িত্ব এবং প্রগতি। সেজন্য শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নতুন নাগরিকদের মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এই শিক্ষা শুরু হবে শৈশব শিক্ষার স্তর থেকেই। কেননা মূল্যবোধের শিক্ষা বা আহরণ নির্ভর করে উপযোগী মানসিক সংগঠন বা মনোভাব গঠনের উপর।

আর সেই উপযোগী মানসিক সংগঠন বা মনোভাব শিক্ষার্থীকে শেখানো সম্ভব একমাত্র সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই। শিক্ষা, বর্তমানে মূল্যবোধের সংকট কাটিয়ে উঠে শিক্ষার্থীদের মনে নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে বিভিন্ন দিকে সহায়তা করে যেমন—

প্রথমত : প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে নিছক উপদেশের সাহায্যে কোনো মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের শেখানো সম্ভব নয়। নিছক মৌখিক উপদেশের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ প্রচেষ্টা থাকে। তার কারণ কিন্তু শিক্ষার্থীদের ঔদ্ধত্য বা অবাধ্যতা নয়। তারা যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছে এটা তারই লক্ষণ।

নিছক মৌখিক উপদেশের পরিবর্তে যে বস্তুটি বিশেষ কার্যকর সেটি হল বাস্তব আচরণ বা দৃষ্টান্ত। সেজন্য যে মূল্যবোধ শেখানো দরকার বলে মনে করা হবে সে সম্বন্ধে যাতে শিক্ষার্থীর সামনে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় তার আয়োজন করাই সবচেয়ে বেশি ফলপ্রদ।

তা বলে উপদেশের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে উপদেশদানের পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত : বিভিন্ন মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা যাতে অবহিত হয় তার জন্য প্রয়োজন নিয়মিতভাবে আলোচনা সভার আয়োজন করা। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ আলোচনার বিষয় নিয়ে বিতর্কসভার আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজনেতা প্রভৃতিরা একত্রিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন এবং বিভিন্ন যুক্তির উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করবেন।

তৃতীয়ত : বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী এদিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে প্রভাবতি করতে পারে। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রসঙ্গে ক্ষুদিরাম বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতিদের জীবন কাহিনি শিক্ষার্থীদের মনে ওই বিশেষ মূল্যবোধটি প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সাহায্য করে। অস্পৃশ্যতার আদর্শের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধি, আর্ত সেবার ক্ষেত্রে মাদার টেরেসা প্রভৃতি ব্যক্তির জীবন কাহিনি ওই বিশেষ বিশেষ মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করে থাকে।

চতুর্থত : যুক্তিভিত্তিক মনের কাছে যুক্তিপূর্ণ আবেদন বিশেষভাবে কার্যকর হয়। বিকাশমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবাদিতা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে। সেই জন্য কোনও মূল্যবোধের যুক্তিধর্মী ভিত্তিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল্যবোধ শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত মূল্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

পঞ্চমত : আধুনিক গণসংযোগের মাধ্যমগুলো মূল্যবোধের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। এদিক দিয়ে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা যেমন ব্যাপক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। সুপরিকল্পিত কাহিনি, নাটক প্রভৃতির উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে ঈপ্সিত মূল্যবোধ গঠন করা যেতে পারে। অপরদিকে এই সকল গণমাধ্যমগুলোর পরিবেশন যদি সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকৃত মূল্যবোধ গঠন করতে পারে।

ষষ্ঠত : দৃষ্টান্ত, উপদেশ, আলোচনা প্রভৃতি মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলেও সামাজিক পরিবেশে সক্রিয়তাকে এই শিক্ষার একটি অতি কার্যকর পদ্ধতি বলে বর্ণনা করা যায়। আধুনিক মানবজীবনে যে সকল মূল্যবোধকে সমাদৃত করা হয় সেগুলির অধিকাংশই মানুষের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তার ফলে শিক্ষার্থীর প্রকৃত সামাজিক পরিবেশই হল সেই সকল মূল্যবোধ শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বাস্তব পরিবেশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিলে তারা প্রয়োজনীয় মূল্যবোধগুলো অনেক বেশি কার্যকরভাবে আহরণ করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল্যবোধ শিক্ষার্থীরা অনেক সহজে এবং স্থায়ীভাবে আহরণ করতে পারে যদি তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ভারতীয় সমাজে মূল্যবোধের যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা উপযুক্ত শিক্ষা পরিকল্পনার দ্বারা দূর করা সম্ভব। এই মূল্যবোধের শিক্ষার অর্থ, কতকগুলো মূল্যবোধ শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। একটি ভারতীয় আদর্শ মূল্যবোধের সৃষ্টি করে সেটিকে পরোক্ষভাবে শিশুর মধ্যে সঞ্চালিত করাই হবে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

মূল্যবোধের সংকট (Crisis of Value)

ঐতিহাসিক বিচারে বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। এই অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাপনের ধারার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে; চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস হয়েছে। কৃষি, শিল্প, ধর্ম, সামাজিক বিন্যাস, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্তক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের প্রভাব এসে পড়েছে। এই সার্বিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় আধুনিকতা। কিন্তু, এই আধুনিকধারার সবকিছুই ব্যক্তির জীবনে আশীর্বাদ নয়। জীবন পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তি যদি সেই পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে না শেখে, তাহলে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে এবং বাস্তবে তাই ঘটছে। আধুনিক ভারতীয় সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, সমাজজীবনকে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ-এর মত নানা ধরনের অসুস্থতা আক্রমণ করেছে। এগুলো কিন্তু প্রকৃত রোগ নয়; রোগের লক্ষণ। আমাদের এই রোগগুলোর মূল কারণ খুঁজে বের করা দরকার। আর তা অনুসন্ধান করতে গেলে, সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

আধুনিক সমাজে যে পরিবর্তন ঘটছে তার মূলে আছে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিবিদ্যার উন্নতি। এই পরিবর্তনের হার অত্যন্ত দ্রুত। ফলে, ব্যক্তির জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রীর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনগুলো এত দ্রুত হারে হচ্ছে না অর্থাৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রীর সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজ সংগঠনের পরিবর্তনের হারের মধ্যে সব সময়ে কিছু পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। বিশেষভাবে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের হার যথেষ্ট বেশি। একেই বলা হয় কৃষ্টিমূলক পশ্চাৎবর্তিতা। (Cultural Lag)। সমাজের কৃষ্টি যেমন গতিশীল, তেমনি আধুনিকতাও একটি গতিশীল ধারণা। কিন্তু তাদের গতির পার্থক্য হওয়ার দরুন, সামাজিক কৃষ্টিমূলক অগ্রগতি সব সময় পেছনে থাকে। আর এই ফলেই ব্যক্তিজীবনে অভিযোজনমূলক সমস্যাগুলো দেখা দেয়। যে ব্যক্তি অশৈশব বিশেষ সামাজিক কৃষ্টির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, তার পক্ষে হঠাৎই সবরকম দৃষ্টিভঙ্গী বা আচার আচরণ

পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এই পরিবর্তনের জন্য আরও সময় দরকার। কিন্তু, এই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে বক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে কিছু দ্বন্দ্বের শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব থেকেই জীবন সংকটের (Crisis of Life) উদ্ভব। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংকট দেখা দেয়। এইসব সংকটের মধ্যে মূল্যবোধের সংকট (Crisis of Values) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধের সংকট সমাজবন্ধ মানুষের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। বর্তমানে, ভারতীয় সমাজ জীবনে, সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতামুখী আচরণ লক্ষ্য করা যায়, সেগুলোর মূল উৎস হল ভারতীয় সমাজজীবনে মূল্যবোধের সংকট।

ব্যক্তিজীবনে মূল্যবোধের সংকট বিভিন্ন পর্যায়ে হতে পারে। প্রত্যেক সমাজের কিছু রীতি-নীতি আছে। এই রীতি-নীতিগুলো বিশেষ কতকগুলো জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জীবনাদর্শের সঙ্গে বর্তমান জীবনের সংঘাতের জন্য, ব্যক্তি সামাজিক রীতি-নীতিগুলোকে অনেক সময় অর্থহীন মনে করা হয়। এর ফলে যে সংকটের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় সামাজিক সংকট। আবার, ধর্মীয় অনুশাসনগুলো অনেক সময় ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ নির্ধারণ করে কিন্তু আধুনিক সমাজে ধর্মীয় সংস্থাগুলো, ব্যক্তির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে, ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয়মূল্যবোধের সংকট দেখা দিচ্ছে। আবার, আধুনিক কারিগরিবিদ্যা নির্ভরশীল সমাজে দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী ভারতবাসীরা তাদের নিজস্ব কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেছে। এর ফলে এক কৃষ্টিভুক্ত মানুষের সঙ্গে অপর কৃষ্টিভুক্ত মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ যেমন এসেছে, তেমনি কৃষ্টিমূলক সংঘাতও দেখা দিয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে কৃষ্টিগত মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে। অনেকক্ষেত্রে মানুষ তার নিজের কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে পরিত্যাগ করছে। এমন কি তাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ দেখা দিচ্ছে। গতানুগতিক সমাজে ব্যক্তির যা নৈতিক মূল্যবোধগুলো ছিল, সেগুলো আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে কার্যকরী হচ্ছে না। ফলে, ব্যক্তিজীবনের নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সংঘাত দেখা দিচ্ছে। প্রাচীন নীতিবোধ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আর সেই কারণে সমাজের মধ্যে নানা ধরনের দুরাচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ভারতীয় সমাজে মূল্যবোধের সংকট বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে। সামাজিক, ধর্মীয়, কৃষ্টি এবং নৈতিক, সমস্ত পর্যায়ের গতানুগতিক মূল্যবোধগুলো আধুনিককালে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, আর এইসব মূল্যবোধের সংকট থেকেই সার্বিকভাবে সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে আচরণগত বৈষম্য প্রকাশ পাচ্ছে।

উপসংহার (Conclusion) :

শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মানুষের জীবনের যে কোনো ধরনের মূল্যবোধ শিক্ষার দ্বারা বিকাশ করা সম্ভব। শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদর্শ জীবনের অধিকারী করে গড়ে তোলা যায়, তাই শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিকাশের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তির মূল্যবোধগুলোই আদর্শ জীবনের মৌলিক উপাদান। শুধুমাত্র উপদেশের সাহায্যে কোনো মূল্যবোধ শিক্ষার্থীকে শেখানো সম্ভব নয়। মৌখিক উপদেশের পরিবর্তে যে বিষয়টি বিশেষ কার্যকরী সেটি হল বাস্তব আচরণ বা দৃষ্টান্তমূলক বিভিন্ন উদাহরণ। ইংরেজিতে একটি উক্তি আছে, হাজার নীতিকথার চেয়ে একটি দৃষ্টান্ত অনেক ফলপ্রসূ। সে জন্য যে মূল্যবোধ শেখানো দরকার বলে মনে করা হবে সে সম্বন্ধে যাতে শিক্ষার্থীর

সামনে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় তার আয়োজন করাই সবচেয়ে বেশি ফলপ্রদ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী এদিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। 1970 সালের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক শিক্ষা বৎসর উপলক্ষে N.C.E.R.T প্রাথমিক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর যে সেমিনার আয়োজন করে সেখানে মূল্যবোধ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেমিনারে প্রাথমিক স্তরে গান্ধিজি প্রস্তবিত মূল্যবোধগুলো গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগুলো হল–(১) কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদা, (২) সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ, (৩) অন্যান্য ধর্মের প্রতি মর্যাদা, (৪) ভয়হীনতা, (৫) সত্যবাদিতা, (৬) অহিংসা, (৭) পবিত্রতা, (৮) সেবা এবং (৯) শান্তি।

ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রক 1972 সালে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার উপর লিখিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন– সম্ভবত এই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবিকতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ চর্চা করা। বিদ্যালয়ে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। গণমাধ্যম ও গণসংগঠনের সাহায্য এই বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে। বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির সংশোধনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্দিষ্ট একজন বা কয়েকজন শিক্ষকের দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

চতুর্থ একক

জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষা: অর্থ, জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরণে শিক্ষার ভূমিকা

(National Integration and International Understanding: Meaning, Role of Education for National Integration and International Understanding)

ভূমিকা (Introduction):

শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা যায়। সমাজের উপযুক্ত সদস্য হওয়ার অর্থ হল সমাজের সচেতনতা লাভ করা এবং সমাজের সংরক্ষণ ও অগ্রগতির কাজে সহায়তা করা। একটি সমাজ বা বৃহত্তর অর্থে একটি জাতি ও তার জীবন গতিশীল ও ক্রমবিকাশমান। সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রচেষ্টায় জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে। সেই কারণে সমাজে সুযোগ্য সদস্য সংখ্যা যতই বাড়ে ততই শক্তিশালী সমাজের উত্থান ঘটে। শিক্ষার দ্বারাই এই সুযোগ্য সদস্য গড়ে তোলা যায়। ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অতি প্রাচীন হলেও জাতি হিসাবে পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়, কেননা ভারতবর্ষের নানা জাতি, নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এসে প্রভুত্ব করেছে, তারপর কালক্রমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভারবর্ষের একজন হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষের জীবন ধারায় বৈচিত্র্যের শেষ নেই। ভারতবর্ষে তাই দেখা যায় একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে, একই শাসন ব্যবস্থার অধীন হয়েও বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীজীবন গড়ে উঠেছে। এই সকল সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী চেতনা, সাম্প্রদায়িকতাবোধ, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি আলাদা হওয়ায় দল, উপদল, সংঘ, সম্প্রদায়, সম্প্রসারনের ভয়ঙ্কর ইচ্ছায় ব্যক্তি একে অপরকে পরাভূত করতে চাইছে। প্রাদেশিকতা, মৌলবাদ প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে জাতীয় সংহতি (National Integration) বজায় রাখার বিষয়টি। তা না হলে জাতীয় জীবন ক্রমে ক্রমে বিপর্যস্ত ও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে। তাই জাতীয় সংহতির প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত জরুরী, সকলকে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। দেখতে হবে কিভাবে অবিচার, অন্যায়, অসাম্যকে দূর করা যায় এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব বজায় থাকে।

অর্থ (Meaning):

জাতীয় সংহতি বিষয়টি বোঝাতে নানা শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন —

জাতীয় বোঝাপড়া, জাতীয়তাবোধ, প্রক্ষোভগত সংহতি ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দের অর্থ বোঝার আগে ‘জাতির সংজ্ঞা’ বা জাতির বৈশিষ্ট্য কী তা জানা থাকা দরকার। একটি ‘জাতি’ গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো প্রয়োজন হয় —

১) একটি সাধারণ ভূখন্ড বা একটি ভৌগোলিক একতা।

২) একটি সাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন।

৩) একটি সাধারণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সংস্কৃতি।

আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থেকে থাকে। যেমন- ভাষা, ধর্ম এবং একটি সরকার। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্তই ব্যক্তিকে একত্রিত করে একটি 'জাতি' গঠন করে অর্থাৎ বলা যায়– একদল মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তখনই তারা একটি 'জাতি' গঠন করে। জাতীয়তাবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'জাতির' প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে সুনিবিড় অনুভূতি এবং ঐকান্তিক বিশ্বাস থাকবে। সকলে এক জাতি, এক প্রাণ-একতা। জাতীয় সংহতির মূলে রয়েছে এই একাত্মবোধ। 1947 সালের 15^{th} August দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতবর্ষের 'জাতীয় সংহতি' রক্ষার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় সংহতির মনোভাবটি জাগিয়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জাতীয় সংহতি এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে বর্জন করে খণ্ডাংশের পরিবর্তে সমগ্র দেশের প্রতি কোন জাতির আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করে। জাতীয় সংহতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে এবং তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়গত গুনাবলীকে সামগ্রিকভাবে জাতীয় সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে শেখায়।

সংজ্ঞা (Definition):

ডরোথি থম্পসনের মতে– জাতীয় সংহতি হল একটি অনুভূতি যা একটি দেশের নাগরিকদের একত্রে বেঁধে রাখে। (Dorothy Thompson - National integration is a feeling that binds the citizens of a country.)

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছেন– জাতীয় সংহতির দ্বারা আমরা আমাদের মন এবং হৃদয়ের সংহতি বুঝি যা পৃথকিকরণের অনুভূতিকে ভুলিয়ে রাখে। (Pt. Jawahar Lal Nehru- By National integration I mean the integration of our minds and hearts, the supression of feelings of Separation.)

1964 - 66 সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে জাতীয় সংহতি বলতে বুঝিয়েছে–

১) জাতীয় ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা।

২) দেশের আপামর জনগনের জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি, দেশের বিভিন্ন অংশের উন্নতির জন্য সবরকম অসমতা দূরীকরণ।

৩) নাগরিকতার মূল্য সম্বন্ধে এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে জানা এবং খণ্ড অংশের পরির্বতে সমগ্র দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শণ।

৪) উন্নত মানের এবং নিরপেক্ষ শাসন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি, দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহারের আশ্বাস।

৫) দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের সাংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধা দেখানো।

জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় সমূহ (Barriers in order to achieve National Integration):

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেশা যাবে যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত যাযাবর মানুষের ছোট ছোট দল ধীরে ধীরে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখল এবং ক্রমশ সংঘবদ্ধ সুসংহত একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হল। পরে সময় যত এগিয়ে চলল ততই এ ধরনের অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠীতে পরিণত হল এবং কালক্রমে তাদের পারস্পরিক একাত্মবোধ এমনই গভীর হয়ে উঠল যে তারা নিজেদের একটি অভিন্ন জাতি বলে পরিচয় দিতে শিখল। ভারত, মিশর, ব্যবিলন, গ্রীস, চিন, মধ্য ইউরোপের দেশগুলোতে এইভাবে নানা জাতির উদ্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে ভারত বিভিন্ন দেশীয় এবং বিদেশী শাসকদের অধীনে ছোট ছোট খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলো একে একে সুসংবদ্ধ হতে থাকে এবং একটি অভিন্ন ভারতীয় জাতিরূপে সচেতনতার শুরু হয়। ধীরে ধীরে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে সাফল্য যে ভারতবাসীদের জাতীয় সংহতিকে এক দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অন্তর্গত রাজ্যগুলোর মধ্যে নানা কারণে মতান্তর দেখা দেয়, যা জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এর মূল কারণ হিসাবে কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত : ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে ঐক্যবোধ দেখা গিয়েছিল, তা মূলত সাময়িক। স্বাধীনতা লাভের পর যখন দেখা গেল, তাদের সাম্প্রদায়িক কোনও ইচ্ছাই চরিতার্থ হচ্ছে না, তখন তারা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। ফলে পারস্পরিক বিদ্বেষের মনোভাব দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। আর ওই মনোভাব জাতীয় সংহতি স্থাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দ্বিতীয়ত : ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন সর্বত্র সমান হওয়া সম্ভব নয়। কোনও অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য খুব বেশি পাওয়া যায়, আবার কোথাও চাষ আবাদের জমি খুব উর্বর। এই প্রাকৃতিক রসদ বণ্টনের তারতম্যকে মেনে নিলেও, ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার যে তারতম্য তাকে সহজভাবে সকলে মেনে নেন না। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা বিচার করলে দেখা যায়, দেশের কোনও অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সব সময় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অথচ পাশাপাশি কোনও অঞ্চলকে বার বার উপেক্ষা করা হয়েছে। এই ধরনের উন্নয়নমূলক বৈষম্য মানুষের মনে পারস্পরিক সন্দেহের মনোভাব জাগিয়ে, জাতীয় সংহতি স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করছে।

তৃতীয়ত : ধর্মান্ধতা ভারতবর্ষে জাতীয় অসংহতির আর একটি প্রধান কারণ। ভারতবাসীরা প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী। প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে কিছু সংস্কার যুক্ত আছে। এখন ভারতবর্ষে যেহেতু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী

মানুষ বাস করে, সেহেতু এক ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে অন্য ধর্মের সংস্কারের সংঘাত হয়। এই সংঘাত কখনও কখনও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মানুষের এই ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয়গুরু ও রাজনীতিবিদরা, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকেন। ফলে ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষের মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সঞ্চার করে, আর তার ফলশ্রুতি হিসাবে অসংহতির ভয়াবহ উপসর্গগুলো দেখা দেয়।

চতুর্থত : স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে শিক্ষা নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাকমিশন ও শিক্ষানীতি চালু হওয়া সত্ত্বেও ভারতের সকল নাগরিককে আজও শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

পঞ্চমত : ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতার এত বছর পরেও মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। কিছু ব্যক্তির হাতে অগাধ সম্পদ রয়েছে আবার কিছু ব্যক্তি দুবেলা দু-মুঠো খেতে পারেনা। এই অবস্থায় দিনের পর দিন অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে।

ষষ্ঠত : ভারতবর্ষ হল বৈচিত্রের পীঠস্থান, এখানে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, ধর্মগত, জাতিগত, শ্রেণিগত অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। কেবলমাত্র একজন আদর্শ নেতাই পারে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এ জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করছে।

সপ্তমত : আজও দেশের নাগরিকদের একটি অংশের জনগণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই অশিক্ষিত লোকেরা দেশের ভাল মন্দ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। সুতরাং, তারা সমাজের মধ্যে একটি শ্রেণির সৃষ্টি করে এবং সামাজিক সংহতি স্থাপনের সকল রকম চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং, বর্তমান ভারতীয় সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষার সুযোগের অভাব, জাতীয় অসংহতি সৃষ্টির মূল কারণ।

জাতীয় সংহতি জাগরণে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education for National Integration)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় অনৈক্যের মূলে নানারকম সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা কাজ করছে। উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আরও ছোটোখাটো অনেক কারণ আছে। তবে এখন প্রশ্ন হল— কিভাবে জাতীয় সংহতি স্থাপন করা যায়। এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথাও ঠিক যে জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে না পারলে, দেশের সার্বিক উন্নতি করা সম্ভব হবে না বা জাতিকে শক্তিশালী করা যাবে না। তাই এই বিষয়ে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে। শিক্ষা এ বিষয়ে সকল নাগরিকের মনে সচেতনতা আনতে পারে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে, সংহতি স্থাপনের কথা বলেছেন। এই জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে হলে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ শিক্ষাকে ওই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন—

প্রথমত : জাতীয় অনৈক্যের মূলে আছে অর্থনৈতিক বৈষম্য অর্থাৎ, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করলে জাতীয় সংহতি স্থাপনের পথ সুগম হবে। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন

জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে এবং মাধ্যমিক স্তরের শেষে শিক্ষার্থীরা যাতে কিছু বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষার্থীদের মনে ঐক্যের উপাদানকে বড় করে তুলে ধরার জন্য ইতিহাসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ গতানুগতিক রাজনৈতিক ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা বর্জন করতে হবে। ইতিহাস যাতে ভারতীয় সমাজের মূল ঐক্যের সুরটি তুলে ধরতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়ত : জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে হলে সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলোর বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। তাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে মাতৃভাষা শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যে যাতে অন্য রাজ্যের ভাষা পড়ার সুযোগ থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ পাবে।

চতুর্থত : পাঠ্য পুস্তক রচনা ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার ব্যাপারে যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করতে পারলে, জাতীয় সংহতি স্থাপনের কাজ সহজ হয়। যেসব পাঠ্যপুস্তকে আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার গুরুত্ব দেয় সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। যে কোনও আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার গুরুত্ব দেয় সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। যে কোনও পাঠ্য বিষয়ের পুস্তক যার মধ্যে জাতীয় সংহতির মূল সুরটি ফুটে উঠেছে, সেরকম পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে হবে। N.C.E.R.T আদর্শ পুস্তক রচনার ব্যাপারে কতকগুলো নীতি নির্ধারণ করেছে। সেগুলো অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে জাতীয় পুস্তক পর্ষৎ, বিভিন্ন ভাষায় রচিত পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এইসব ব্যবস্থা প্রসারিত হলে জাতীয় সংহতি স্থাপনের কাজ সহজ হবে।

পঞ্চমত : বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যের ভাষা সহজে শিখতে পারে, তার জন্য ভাষা সংক্রান্ত নিয়মকানুন বা ব্যাকরণ শিথিল করতে পারলে ভাল হয়। শিক্ষার্থীরা যত বেশি সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষা শিখতে পারবে, তত পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কাজ সহজ হবে। তাছাড়া পরস্পরের মানসিকতাও তারা সহজে উপলব্ধি করতে পারবে। এই মানসিক সাযুজ্য জাতীয় সংহতি স্থাপনে সহায়তা করবে।

ষষ্ঠত : জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে দেশের অশিক্ষিত মানুষদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া এইসব বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে যে কোনও সামাজিক ঘটনা সম্পর্কেও নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হবে। এতে করে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কমে যাবে।

সপ্তমত : শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনের গোঁড়ামী দূর করতে পারলে জাতীয় সংহতি স্থাপন করা সম্ভব হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে যদি প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতিগুলো তুলে ধরা যায়, তাহলে তারা উপলব্ধি

করবে যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি একই, এই বোধ থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষ মন থেকে দূর হবে এবং জাতীয় সংহতি স্থাপনের কাজ সহজ হবে।

অষ্টমত : সর্বজনীন শিক্ষা জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। একটি সুসংহত ব্যক্তি গঠনে শিক্ষা সহায়তা করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব। এছাড়া সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বয় গড়ে তোলা যায় শিক্ষার মাধ্যমে।

নবমত : জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা জাতীয় সংহতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষের মধ্য থেকে গোঁড়ামি, হিংসা, কুসংস্কার দূরীকরণে সহায়তা করে। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারলে ওই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের মানুষদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলবে এবং জাতীয় সংহতিকে ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক পদ্ধতির দ্বারা জনগণের মধ্যে একটি একতার ও সংহতির মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। জাতির প্রতি আনুগত্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা একমাত্র উন্নত সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির সকল অজ্ঞতা দূর করা যায়।

জাতীয় সংহতির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা (Need and Significance for National Integration):

জাতীয় সংহতি হল মূলত এক ধরনের মানসিক অনুভূতি। কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনগণ ভাষা, ধর্ম, প্রথা, কৃষ্টি, ইত্যাদির ভিত্তিতে যখন নিজেদের মধ্যে গভীর একাত্মতা অনুভব করে তখনই জাতীয় সংহতি স্থাপিত হয়। নানা কারণে এই জাতীয় সংহতি প্রয়োজন —

১) বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে জাতীয় সংহতি একান্ত প্রয়োজন, শুধু তাই নয়, দেশের অভ্যন্তরে ধর্ম, ভাষা ও জাত-পাতকে কেন্দ্র করে যে সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো কাজ করছে তার মূল উৎপাটন করতে ও জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন।

২) ভারতবর্ষের বিশাল বিস্তৃতি, জাতিগত পার্থক্যের জন্যই জাতীয় সংহতির প্রয়োজন। এদেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, জাতি ও ভাষাগত পার্থক্য, রীতিনীতিগত বিভিন্নতা যতটা প্রকট পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন নেই। এইসব বিভিন্নতার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাতের সম্ভাবনা থাকে। তাই সকলের এক জাতির অর্ন্তগত এই চেতনা যদি থাকে, তাহলে যেকোন সমস্যাই আসুক, শান্তিপূর্ণভাবে আপোষে তার মীমাংসা সম্ভব হয়।

৩) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক আদর্শকে সফল করে তুলতে হলে ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্য থাকা আবশ্যক। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির ফলে প্রাণহানি ও জাতীয়

সম্পত্তির প্রভূত ক্ষয় সাধন হয়। তাই ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে জাতীয় সংহতির একান্ত প্রয়োজন।

৪) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গো সম্পর্ক নানা কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রীতিপূর্ণ থাকছে না। জাতীয় চেতনার অভাবে আজও এ দেশের কিছু ব্যক্তির বিদেশের প্রতি আনুগত্য অত্যন্ত প্রবল। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য রূপে বর্তমান দেখা দিয়েছে। জনগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব বজায় থাকলে দেশ যে কোন ধরনের বিকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে।

এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণভেদ, আঞ্চলিকতার মতো বিষয়গুলো জাতীয় সংহতিকে বিঘ্নিত করে। তাই একটি শক্তিশালী জাতি গঠন, বিভিন্ন বৈষম্য দূরীকরণ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একতা আনা এবং বিভিন্ন ধরনের বিকাশ, প্রগতি ও শান্তির প্রয়োজনে জাতীয় সংহতি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিকতাবোধ
(International Understanding)

ভূমিকা (Introduction):

ব্যক্তির প্রথম আবির্ভাব সমাজে ঘটেনি বরং ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে সমাজ গড়ে সামাজিক হয়েছে। ব্যক্তি জৈবিক জীবনের তাগিদে, জীবিকার প্রয়োজনে, সুখশান্তিতে বসবাস করার জন্য গোষ্ঠীবন্ধ হয়েছিল। সেই গোষ্ঠীবন্ধতা থেকেই বিবর্তনের পথ ধরে এসেছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি। এমনিভাবেই ব্যক্তির মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু মানবসভ্যতার বিকাশ যত বেশী ঘটেছে, ব্যক্তির মধ্যে ততই যান্ত্রিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা বেড়েছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত ক্রমশ বাড়ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে অগণিত নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রাণহানি থেকে এর সূত্রপাত। তাই এখন প্রয়োজন বিশ্বশান্তি। সম্প্রীতি ও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বোঝাপড়া না হলে আগামীদিনে বিশ্বব্যাপী সংঘাত আরও বাড়বে। তাই আন্তর্জাতিকতাবোধ বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ধারণাটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি শুধু তার রাষ্ট্রেরই সভ্য নয় সে একজন বিশ্বের নাগরিকও বটে, আর এই ধারণাটি হল আন্তর্জাতিকতাবোধ। আবার বলা যায়, আন্তর্জাতিকতাবোধ হল নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষমতা। এই বোধকে জাগ্রত করতে হলে বিশ্বের সব জাতির কৃষ্টিকে সমমর্যাদা দিতে হবে এবং প্রত্যেক জাতির ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোকে যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা নয়, কোনো বিশেষ সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা নয়, সামগ্রিকভাবে মানব কল্যাণই আজ সকলের কাম্য।

অর্থ (Meaning):

পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সমাজকে উপলব্ধি করা এবং বিশ্বমানব সমাজে নিজের সমাজের মূল্য সমন্ধে সচেতন হয়ে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর জন্য চেস্টা করাই হল আন্তর্জাতিকতাবোধের মূল কথা।

অলিভার গোল্ড স্মিথের মতে - আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হল একটি অনুভূতি যার দ্বারা বোঝানো হয় যে একজন ব্যক্তি কেবল মাত্র কোনো একটি রাষ্ট্রের সদস্য নয়, বরং বিশ্বের একজন সদস্য। (Oliver Gold Smith - International Understanding is a feelling that the individual is not only a member of his state but a member of the world.)

ডঃ ওয়ালটার. এইচ. সি. লিউইস আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হল নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির পাস্পারিক আচরণ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষমতা। এককথায় জাতি, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ধারণা কে বর্জন করে যে আদর্শকে ওই গুলোর জায়গায় আরোপ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বা আন্তর্জাতিকতাবোধ বলে। (Dr. Walter H.C Lewis- International Understanding is the ability to observe critically and other, irrespective of the nationality or culture to which they may belong.)

ডঃ আত্মানন্দ মিশ্র আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বলতে বোঝায় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্দুত্ব পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা— প্রতিটি দেশের নিজেদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকবে। (Dr. Atmananda Mishra- International Understanding refers to friendship and harmony against different nations of the world and also includes co-operation amongst them each one maintaining its identity and soverignty as usual.)

উপরের সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আন্তর্জাতিকতাবোধ বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এবং তা হল—

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হল এমন একটি ধারণা যার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বা দেশের জনগণ নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও পরিচিতি বজায় রেখে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও একতা গড়ে তুলবে, একের বিপদে অন্যরা সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণে ব্রতী হবে এবং সমগ্র পৃথিবীবাসীর সুখশান্তি বজায় রাখবে এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে বিশ্বমানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে।

আন্তজাতিকতাবোধ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of the Devolopment for Intenational Understanding):

সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষারও একটি সামাজিক উদ্দেশ্য হল বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তনশীল এবং ক্রমবর্ধমান জটিল চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করা। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম থেকেই সমগ্র মানুষের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আজ বিভিন্ন

দেশ খুব কাছাকাছি উপস্থিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রত্যেক দেশ এবং তার জনগণ অপর দেশের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে কিছু প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল—

১) রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রবাসীর মধ্যে আন্তর্জাতিক মনোভাব গঠন করা প্রয়োজন। যুদ্ধভীতি ব্যক্তির মনের মধ্য থেকে দূর করতে না পারলে ব্যক্তির শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যক্তির মধ্য আন্তর্জাতিকতাবোধ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

২) বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উগ্র জাতীয়তাবোধ এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, ব্যক্তির মন থেকে দূরীভূত হচ্ছে বিশ্বমানবতার আদর্শ। এই উগ্র জাতীয়তাবোধকে প্রশমিত করতে গেলে আন্তর্জাতিকতাবোধের মনোভাব জাগরণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

৩) বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সমৃদ্ধতা আনার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পারস্পারিক নির্ভরশীলতা। এই জন্য প্রয়োজন সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এই ধারণার বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিকতাবোধ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

৪) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আজ এক ভয়াবহ সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তির মন থেকে মুছে যাচ্ছে প্রীতি, সৌহাদ্য ও ঐক্য যা বিশ্বমানবতাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতাবোধের জাগরণ।

৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আজ বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থান করলেও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা থেকে যাচ্ছে। কেননা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র কয়েক মুহূর্তেই বিশ্বসভ্যতা এবং মানবিকতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আজ ও 'নাগাসাকি' ও 'হিরোশিমা' দুঃখময় স্মৃতি পৃথিবীবাসীর মন থেকে মুছে যায়নি। তাই শান্তি এবং উন্নতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতাবোধ।

৬) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়েছে, তা হল বিশ্বের এক একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নিজস্ব সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে চায়। এই মনোভাবকে দূর করতে গেলে প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতাবোধ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিকতাবোধের এই ধারণাটি বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের কাছে প্রয়োজন। বিশ্ব উপনীত হয়েছে এক সংকটময় মুহূর্তে। এই ক্ষেত্রে একমাত্র শিক্ষাই পারে ব্যক্তির মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করতে। কেবল প্রগতি বা উন্নতির প্রয়োজনে নয় বরং ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আন্তর্জাতিকতা বোধের প্রয়োজন। কোনো আইন করে নয়, বা জোর করে বল প্রয়োগের দ্বারা নয়, শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বোধের ক্ষেত্রটি প্রসারিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিকতাবোধের জাগরণে, শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education for International Understanding):

পৃথিবীব্যাপী আজ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি শান্তির সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। মানব সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছে যুদ্ধের দ্বারা, হিংসার দ্বারা মানবকল্যাণ হতে পারে না, রাষ্ট্রের কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না। ব্যক্তির সংঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতাবোধ থেকেই আন্তর্জাতিকতার জন্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাদের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে পারা, বিশ্ব মানব সমাজের উন্নতিতে নিজস্ব সমাজের অবদানকে যথাযথভাবে বোঝা এবং বিশ্বশান্তি ও পারস্পরিক মৈত্রী স্থাপনে সচেস্ট থাকাই আন্তর্জাতিকতাবোধের মূলমন্ত্র। এই বোধ একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত করা সম্ভব। শিক্ষা ব্যক্তির চাহিদা পূরণের কৌশল, তাই সমস্ত দেশে শিক্ষার শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে আন্তর্জাতিকতাবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাই ব্যক্তির মধ্যে এই সার্বজনীনবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে, শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল নিম্নরূপ ঃ

১) শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির বিকাশ ছাড়া আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ হয় না। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে যখন নিজস্ব ধারণা গঠন করতে পারবে এবং নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে পারবে, তখনই আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি স্থাপনের কাজ সহজ হবে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে এই ধরনের তথ্যমূলক বিষয় পাঠ্যক্রমে থাকতে হবে।

২) শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে উগ্রজাতীয়তাবোধকে দূর করার চেস্টা করতে হবে। নিজস্ব রাষ্ট্র বা সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখার, প্রবণতা আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শিক্ষামূলক কর্মসূচি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে বিশ্বমানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিকতা বোধের জাগরণে সহায়তা করা।

৩) শিক্ষার্থীর মনে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার মনোভাব জাগিয়ে তোলাই হবে আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদার ও আস্থার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

৪) পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাসের জন্য চাই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাবোধ। প্রত্যেক দেশের ব্যক্তিকে তার দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো না কোনো বস্তুর জন্য অন্য দেশের ব্যক্তির শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়। এই পারস্পারিক নির্ভরশীলতা সম্পর্ক শিক্ষার দ্বারাই শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলে তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে পড়ে। এই সহানুভূতি থেকেই জাগে আন্তর্জাতিকতাবোধ।

৫) শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে পারলে সুস্থ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজ সহজ হবে। জীবনের এই সব মূল্যবোধ শ্রেণি ও জাতি ভেদে পৃথিবীর সর্বত্র সমান। সুতরাং সবদেশের শিক্ষার্থীদের যদি এই মূল্যবোধ গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তাহলে তারা মানসিক দিক থেকে অনেক কাছাকাছি এসে যাবে।

উপসংহার (Conclusion):

জাতীয়তাবোধ হল একটি ভাবগত মানসিক ধারণা, জাতীয়তাবোধ হল জনসমাজের মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ বা স্বাতন্ত্র্যবোধ। সমাজ বা জনসমাজ ভাবগত ঐক্যবোধের ভিত্তিতে একাত্ম হলে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হলে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবোধ হল এমন একটি মহান আদর্শ যা শুধু কোনো জাতিকে ঐক্যবন্ধ করে না বরং সেই সঙ্গে দেশপ্রেম ও সংকীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আত্মত্যাগের প্রেরণা জোগায়। অপরদিকে আন্তর্জাতিকতাবোধ হল একটি মানসিক অনুভূতি যা মানুষকে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত করে। এটি একটি আদর্শ। ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ জাতীয় গন্ডির মধ্যে আবন্ধ না রেখে তার পরিবর্তে সে নিজেকে বিশ্বের একজন নাগরিক বলে মনে করে অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবোধ হল জাতি সমূহের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও কলহের পরিবর্তে সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও সহযোগিতার মাধ্যমে এমন এক সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে জাতিসমূহ নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে পারস্পারিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎকর্ষসাধন করতে পারে।

ব্যক্তির মধ্যে জন্মগতভাবে কতগুলো প্রবণতা থাকে যেগুলো পারস্পারিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। যুযুৎসা প্রবৃত্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মত প্রবৃত্তিগুলো ব্যক্তিকে স্বার্থপর করে তোলে। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের এইসব কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংকীর্নতার গন্ডি থেকে, উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে বিশ্বমানবাত্মার সন্ধানে এগিয়ে যেতে হবে। এই উপলব্ধিই আন্তর্জাতিকতাবোধের মূল ভিত্তি। শিক্ষাই ব্যক্তির জীবনকে সংকীর্ণতার গন্ডি থেকে মুক্ত করে তাকে বিশ্ব মানবাত্মার উন্মুক্ত প্রান্তরে পৌঁছে দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনো বিভেদ নেই। জাতীয়তাবোধ ব্যক্তির মনে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং এবং এই ভালবাসা-ই ক্রমে বিশ্ববাসীর প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি যার ভালবাসা নেই, সে বিশ্ববাসীকে ভালবাসতে পারে না। দেশবাসীর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার থাকলে ব্যক্তির মনে বিশ্ববাসীর প্রতি ভাসবাসার সৃষ্টি হয়— যা আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্থ করে। আন্তর্জাতিকতাবোধ জাতিসমমূহের এমন একটি যৌথ পরিবার গঠন করতে চায়, যেখানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাতি ও রাষ্ট্র সমাজ এবং সমমর্যাদার আধিকারী, প্রতিটি জাতি এমন একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে প্রতিটি জাতি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার বন্ধনে আবন্ধ হতে পারে। আদর্শ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জাতিগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ বা সংঘাত থাকতে পারেনা। কারণ জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের মূল কথা হল — নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক
সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি: অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, প্রকারভেদ, শিক্ষামূলক উপযোগিতা

অর্থ (Meaning):

শিক্ষাক্ষেত্রে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি দ্বারা শিক্ষাবিদরা বোঝাতে চেয়েছেন জ্ঞানমূলক পাঠ্য বিষয়গুলো চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য খেলাধূলা, বিতর্ক, অভিনয়, নাচ-গান ও বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কাজের অনুশীলন সমান গুরুত্বপূর্ণ। 'সহ' বলতে এক্ষেত্রে সহযোগী বোঝায় না, 'সহ' বলতে পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কার্যাবলীকেই বোঝায়। পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত কার্যাবলিকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রধান দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। কতগুলো কাজ কে গতানুগতিকভাবে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে পরিচালনা করা যায়। এগুলোকে শ্রেণিকক্ষে পরিচালিত কার্যাবলি (Class Room Activities) বলা যেতে পারে। অন্যদিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত কতগুলো কাজ শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালিত হয়। এগুলোকে বহিঃশ্রেণিগত কার্যাবলি (Out of Class Room Activities) বলা যায়। শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের জন্য শ্রেণি অন্তর্ভূক্ত কাজের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি বহিঃশ্রেণিগত কাজ গুলো ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানে 'সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি' কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অনেক ব্যাপক। সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমের যে অংশ সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করে তাকে বলা হয় সহপাঠ্যক্রম। এটি পাঠ্যক্রমের অংশ বা বহির্ভুক্ত কোন পৃথক বিষয় নয়। সহপাঠ্যক্রম, পাঠ্যক্রমের মূল সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির যে শ্রেণিবিভাগ তার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। তাছাড়া উদাহরণস্বরূপ যে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর দ্বারা শিক্ষার্থীর একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে না। একই কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হতে পারে। তবে যেকোন কাজই বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজ হিসাবে নির্বাচন করা হোক না কেন, তার সুপরিচালনা প্রয়োজন। যেমন– সহপাঠ্যক্রমিক কাজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে তবেই তাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম অথবা খেলাধূলা নির্বাচন করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের দিয়ে একই রকম কাজ করানো যায় না, কারণ দৈহিক বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে। তাই বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যায়াম, খেলাধূলা নির্বাচন করতে হবে। বিদ্যালয়ের সময় তালিকার (Time-Table) মধ্যে এই জাতীয় কাজ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকবে। শারীর-শিক্ষার কাজ যখন পরিচালিত হবে, তখন সকল শিক্ষার্থী একই সঙ্গে অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষক যেমন শ্রেণিকক্ষে বৌদ্ধিক কাজ পরিচালনা করেন। তেমনি এই কাজও পরিচালনা করবেন। যে কোন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালিত হয় অন্যান্য বৌদ্ধিক কাজের মতই। তাই উদ্দেশ্যের

ভিত্তিতে এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ, সেই কাজ পরিচালন এবং মূল্যায়ন, এই কাজগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে হয়।

দ্বিতীয় একক

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় এর গুরুত্ব

অর্থ (Meaning):

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ীশৃঙ্খলা: প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা ছিল, বাইরে থেকে আরোপিত আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল। শিক্ষা তখন ছিল পুথিঁনির্ভর। শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্যান্য আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী 'শাসন' বা 'দমনকেই' শৃঙ্খলা হিসাবে বর্ণনা করা হতো। সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, সেগুলোকে দমননীতির মাধ্যমে অপসারন করতে পারলে, প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হবে এগুলো ছিল প্রাচীন ধারণা। দমনমূলক তত্ত্ব (Repressionistic Theory) কে প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মত অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অনুশাসনের প্রয়োজন। পাঠের সময় শিক্ষার্থীরা অনুশাসন মেনে না চললে শাস্তি দেওয়া হত অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী শৃঙ্খলা স্থাপনের একমাত্র উপায় ছিল দৈহিক পীড়ন। বলা হতো Spare the Rod and Spoil the Child অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের দৈহিক পীড়ন না করলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাবে না এই ছিল ধারণা। সুতরাং, দমনমূলক তত্বের মূল কথা ছিল বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হলে, দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অপ্রয়োজনীয় আচরণগুলোকে দমন করতে হবে। শৃঙ্খলা সম্পর্কে এই ধারণা মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ রুঁশো সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি মধ্যযুগীয় সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো তুলে ধরেন। তিনি তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে বলেছেন, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্যাতনের প্রয়োজন নেই। শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে। স্বাধীনভাবে কাজ করার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার্থীরা ভালমন্দ বিচার করে, নিজেদের আচরণ সংশোধন করবে। এইভাবে অবাধ স্বাধীনতা দানের মাধ্যমে শৃঙ্খলা স্থাপনের রীতিকে বলা হয় 'অবাধ প্রকাশের তত্ত্ব' (Expressionistic Theory)। তবে দেখা গেছে এই মতবাদকে সর্বজনীন ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রয়োগ করা হয়নি। তাই এই তত্ত্বের বিকল্প হিসাবে আর একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যাকে বলা হয়- 'প্রভাবিত করার তত্ত্ব' (Impressionistic Theory)। এই- তত্ত্বে শৃঙ্খলা স্থাপনের একটি মধ্যবর্তী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য শিক্ষক শিশুদের এমন ভাবে প্রভাবিত করবেন, যাতে শিশু এটা উপলব্ধি না করে যে শিক্ষকতার উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষকের চারিত্রিক প্রভাবে ধীরে ধীরে নিজের আচরণ কে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সুশৃঙ্খলা জীবন যাপন করবে।

প্রকারভেদ (Types):

শিক্ষাবিদ্‌গণ শৃঙ্খলাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা অন্তর্জাত শৃঙ্খলা (Internal Discipline) এবং বহির্জাত শৃঙ্খলা (External Discipline)।

(১) অন্তর্জাত শৃঙ্খলা (Internal Discipline): যখন কোন কাজ করার সময় শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলে কারও প্ররোচনা বা শাসন ছাড়াই শিক্ষার্থী কাজটিতে নিজের আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করে এবং নিজেই পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলো নিজের উপর বিধি-নিষেধের অনুশাসন আরোপ করে, তখন তার মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখা দেয় তাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বলা হয়। এই অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা- স্বাভাবিক শৃঙ্খলা (Natural Discipline), আত্মশৃঙ্খলা (Self-discipline), অস্তিবাচক শৃঙ্খলা (Positive Discipline), মুক্ত শৃঙ্খলা (Free Discipline) ইত্যাদি। এই ধরনের অন্তর্জাত শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণের উপর বিদ্যালয়, শিক্ষক পরিচালক, কোন ব্যক্তি কারও কোন নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী এবং শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলা দেখা যায়। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর স্বাধীন ও মুক্ত প্রচেস্টা থেকে দেখা দেয়। সেখানে শিক্ষার্থী শৃঙ্খলার নিয়ম-কানুন মেনে চলে নিজের আগ্রহ ও প্রয়োজনের প্রেরণায়, কোন বাইরের শক্তির চাপে নয়। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে যে– যখন কোন চিত্রকর একটি নতুন ছবি আকেঁন বা কোন সুরকার কোন নতুন সুর সৃষ্টি করেন বা কোন ভাস্কর নূতন মূর্তি গড়েন তখন তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতনতুন ভাবেই বহু নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। চিত্রকরের তুলির টান, রঙের মিশ্রণ, অঙ্কনের ভঙ্গী-এ সমস্তই শৃঙ্খলার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে থাকে। তেমনি সুরকারের থেকে তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে সংহতি রেখে নতুন রাগিনী সৃষ্টি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলে। বস্তুত সমস্ত নতুন সৃষ্টির মূলে আছে এই অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। এই জন্যই অন্তর্জাত শৃঙ্খলাকে আত্মশৃঙ্খলা (Self-discipline) নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

(২) বহির্জাত শৃঙ্খলা (External Discipline): এই শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হয় না। এর জন্য মনোযোগ, একাগ্রতা, আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায় না এবং নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, শাস্তির ভয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জোর করে শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থী বাইরের প্রবল শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে শৃঙ্খলা মেনে চলে। এই বহির্জাত শৃঙ্খলা (External Discipline)। কৃত্রিম শৃঙ্খলা (Artifitial Discipline), নেতিবাচক শৃঙ্খলা (Negative Discipline) প্রভৃতি নামেও পরিচিত। ইংরেজীভাষায় আদেশ ও অর্ডার (Order) কথাটি ব্যবহার করা হয়। যে শৃঙ্খলা বাইরে থেকে আরোপিত, কৃত্রিম ও নেতিবাচক তাকে শৃঙ্খলা বলা যায় না। সেটি প্রকৃত পক্ষে 'শৃঙ্খল' পদবাচ্য। যে সব থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কোন প্রবনতা দেখা যায় না সে সবক্ষেত্রে বাইরে থেকে চাপ বা ভীতির সৃষ্টি করে তা রাখা হয়, একেই আরোপিত শৃঙ্খলা বলা হয়। সাধারণত এই ধরনের আদেশ বা আরোপিত শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোন প্রচলিত প্রথার সাহায্যে কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। বন্দী শিবির, জেলখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আরোপিত শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা হয়।

শিক্ষায় এর গুরুত্ব (Importance in Education):

সার্থক শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত আবশ্যক এই কথাটি বহু পূর্বে বহু শিক্ষাবিদ্গণ প্রচার করে এসেছেন। বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এ কথাটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায় নি। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, রোমান শিক্ষক কুইন্টিলিয়ান, ব্রিটিশ দার্শনিক কমেনিয়াস প্রভৃতি বহু মনীষীই শিশু স্বাধীনতাকে সমর্থন করে গেছেন। কিন্তু যিনি প্রথম সুস্পস্ট ভাষায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করেন তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক রুঁশো। তাঁর ভাষায়- শিশুকে প্রকৃতিকে ছেড়ে দাও সে তার যা খুশী করুক। তিনি আরোও বলেন যে- 'শিশু যখন জন্মায়, তখন সে কোনো রকম কু-প্রবৃত্তি বা মন্দ প্রবণতা নিয়ে জন্মায় না। তার মন তখন নিস্পাপ ও নিষ্কলুষ থাকে। কিন্তু সে যখন সমাজের দুর্নীতির সংস্পর্শে আসে তখনই তার মন কলুষিত হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দির প্রগতিশীল শিক্ষানায়কগন রুঁশোর প্রচারিত এই শিশু স্বাধীনতার আদর্শটিকে মনে প্রানে গ্রহণ করেন। রুঁশোকে সেই জন্য শিশু স্বাধীনতার জনক বলা যেতে পারে। আধুনিক শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট হল শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দানের পরিকল্পনাটি। এই জন্যই বর্তমান যুগের প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা।

তৃতীয় একক
মূল্যবোধের শিক্ষা : অর্থ, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিষয়ের উপায় সমূহ

মূল্যবোধ বা 'Value' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল– নির্বাচনের যোগ্যতা (Worthiness to be chosen), অর্থাৎ কোন্ বিষয়টিকে জীবনে প্রাধান্য দেওয়া হবে– বিদ্যাকে, না অর্থ-সম্পত্তিকে বা অন্য কিছুকে? অর্থাৎ কাউকে বা কোনো কিছুকে মূল্য দেওয়া মানে তাকে বেছে নেওয়া এবং তার সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা। মূল্যবোধের উৎস হল জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা বিভিন্ন পারিবেশিক অবস্থা, জীবন জগৎ সম্পর্কে ধারণা। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে— ভাববাদী দর্শন (Idealism) মতে মূল্যবোধ শাশ্বত, চিরন্তন, প্রকৃতিবাদী (Naturalist) ও বস্তুবাদী (Materialist)- এ বিশ্বাসী দার্শনিকগণ মনে করেন, মূল্যবোধ লুকিয়ে আছে প্রকৃতি বা বস্তুর মধ্যে, মানুষের কাজ হল তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার মাধ্যমে ওইগুলো আবিষ্কার করা। প্রয়োগবাদী (Pragmatist) ও অস্তিত্ববাদী (Existentialist) দার্শনিকরা বলেন, মূল্যবোধ ব্যক্তিভিত্তিক এবং পরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠে। যে কাজ বা যে বস্তু মানুষকে সফলতা দেয়, তারই মূল্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। মূল্যবোধই মানুষকে কর্মে প্রেরণা যোগায়।

শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ বিকাশ:

শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ডিউইর ভাষায় শিক্ষার লক্ষ্যেরই একটি অঙ্গ হল মূল্যবোধ। শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক অতি নিবিড়। একথা খুবই সত্য যে একটি সমাজের

সংহতি ও স্থায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে সমাজের জনগণের উন্নয়ন ও প্রগতি নির্ভর করে সমাজের মূল্যবোধের কাঠামোর উপর। এই মূল্যবোধ কি প্রকারের এবং তা ভালো কি মন্দ সেটি বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল সেই মূল্যবোধের কাঠামোটি কতটা সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত।

কতকগুলো মূল্যবোধ সকল সমাজেই স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়ে থাকে। সেগুলোকে শাশ্বত বা স্থায়ী মূল্যবোধ বলা হয়। এই মূল্যবোধগুলোকে শাশ্বত বলা হয় এই অর্থে যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপনের মৌলিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলোর সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সম্পাদন এই মূল্যবোধগুলোর উপর নির্ভর করে। সকল সমাজের মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করেছে যে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও তৃপ্তিকর করতে হলে এই মূল্যবোধগুলো অনুযায়ী আচরণ করা অবশ্য দরকার। এই শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর অন্তর্গত হল, সত্যবাদিতা, সততা, সৌন্দর্যবোধ, কৃতজ্ঞতা, দয়া ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল যুগের সকল সমাজেই এই মূল্যবোধগুলোকে মানবজীবনের নীতি নির্ধারক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

চতুর্থ একক

জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধের শিক্ষা: অর্থ, জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরণে শিক্ষার ভূমিকা

অর্থ (Meaning):

জাতীয় সংহতি বিষয়টি বোঝাতে নানা শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন– জাতীয় বোঝাপড়া, জাতীয়তাবোধ, প্রক্ষোভগত সংহতি ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দের অর্থ বোঝার আগে 'জাতির সংজ্ঞা' বা জাতির বৈশিষ্ট্য কী তা জানা থাকা দরকার। একটি 'জাতি' গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো প্রয়োজন হয় —

১) একটি সাধারণ ভূখন্ড বা একটি ভৌগোলিক একতা।
২) একটি সাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন।
৩) একটি সাধারণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সংস্কৃতি।

আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থেকে থাকে। যেমন- ভাষা, ধর্ম এবং একটি সরকার। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্তই ব্যক্তিকে একত্রিত করে একটি 'জাতি' গঠন করে অর্থাৎ বলা যায় — "একদল মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তখনই তারা একটি 'জাতি' গঠন করে"। জাতীয়তাবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'জাতির' প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে সুনিবিড় অনুভূতি এবং ঐকান্তিক বিশ্বাস থাকবে। সকলে এক-এক জাতি, এক প্রাণ-একতা। জাতীয় সংহতির মূলে রয়েছে এই একাত্মবোধ। 1947 সালের 15^{th} August দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতবর্ষের 'জাতীয় সংহতি' রক্ষার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যত নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় সংহতির মনোভাবটি জাগিয়ে তোলার উপর

গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জাতীয় সংহতি এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে বর্জন করে খণ্ডাংশের পরিবর্তে সমগ্র দেশের প্রতি কোন জাতির আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করে। জাতীয় সংহতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে এবং তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়গত গুনাবলীকে সামগ্রিকভাবে জাতীয় সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে শেখায়।

আন্তর্জাতিকতাবোধ

অর্থ (Meaning):

পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সমাজকে উপলব্ধি করা এবং বিশ্বমানব সমাজে নিজের সমাজের মূল্য সমন্ধে সচেতন হয়ে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর জন্য চেষ্টা করাই হল আন্তর্জাতিকতাবোধের মূল কথা।

অলিভার গোল্ড স্মিথের মতে - আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হল একটি অনুভূতি যার দ্বারা বোঝানো হয় যে একজন ব্যক্তি কেবল মাত্র কোন একটি রাষ্ট্রের সদস্য নয়, বরং বিশ্বের একজন সদস্য। (Oliver Gold Smith - International Understanding is a felling that the individual is not only a member of his state but a member of the world.)

ডঃ ওয়ালটার. এইচ. সি. লিউইস আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হল নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষমতা। এককথায় জাতি, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ধারণা কে বর্জন করে যে আদর্শকে ওই গুলোর জায়গায় আরোপ করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বা আন্তর্জাতিকতাবোধ বলে। (Dr. Walter H.C Lewis- International Understanding is the ability to observe critically and other, irrespective of the nationality or culture to which they may belong.)

ডঃ আত্মানন্দ মিশ্র আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বলতে বোঝায় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্দুত্ব পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা– প্রতিটি দেশের নিজেদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকবে। (Dr. Atmananda Mishra- International Understanding refers to friendship and harmony against different nations of the world and also includes co-operation amongst them eachone mainta ining its identity and soverignty as usual.)

উপরের সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আন্তর্জাতিকতাবোধ বা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এবং তা হল —

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হল এমন একটি ধারণা যার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বা দেশের জনগণ নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও পরিচিতি বজায় রেখে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও একতা গড়ে তুলবে, একের বিপদে অন্যরা সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যানে ব্রতী হবে এবং সমগ্র পৃথিবীবাসীর সুখশান্তি বজায় রাখবে এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে বিশ্বমানবতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

অনুশীলনী

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝ?
২) বহির্জাত শৃঙ্খলার অপর নাম কি?
৩) দুটি সৃজনাত্মক কার্যাবলীর উদাহরণ দাও।

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের তিনটি মৌলিক উপাদান কি কি?
২) আন্তর্জাতিকতাবোধের মূল কথা কি?
৩) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলতে কি বোঝ এবং এর একটি উদাহরণ দাও।

৩ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৬০টি শব্দ

১) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর যে কোন তিনটি উদ্দেশ্য লিখ।
২) অন্তর্জাত শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩) মূল্যবোধের কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা লিখ।

৪ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১০০টি শব্দ

১) শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করা যায়– তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২) জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায়গুলি সংক্ষেপে লিখ।
৩) আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায় : নির্দেশনা ও পরামর্শদান

- প্রথম একক : ব্যক্তিত্ব ঃ অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ
- দ্বিতীয় একক : নির্দেশনা: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় নির্দেশনার গুরুত্ব
- তৃতীয় একক : পরামর্শদান: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায়পরামর্শদানের গুরুত্ব
- চতুর্থ একক : অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ: অর্থ, কারণসমূহ, প্রকারভেদ (শ্রেণি থেকে পালানো, মিথ্যে ভাষণ, ভীরুতা, চুরি করা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা) -এর প্রতিরোধের উপায়সমূহ

পঞ্চম অধ্যায়

নির্দেশনা ও পরামর্শদান
(Guidance and Counselling)

উদ্দেশ্য (Objectives):

- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিত্বের অর্থ, সংজ্ঞা, স্বরূপ, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা নির্দেশনার অর্থ, সংজ্ঞা প্রকারভেদ, শিক্ষায় নির্দেশনার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা পরামর্শদানের অর্থ, সংজ্ঞা, পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, শিক্ষায় পরামর্শদানের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা অপসঙ্গতিমূলক আচরণের অর্থ, সংজ্ঞা, কারণসমূহ, ধরন, প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি অবগত হবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face):

ব্যক্তিত্বের (Personality) বিকাশ দুটো শক্তির উপর নির্ভর করে। একটি হল বংশগতি (Heridity) অপরটি হল পরিবেশ (Environment)। ব্যক্তি মানসের যে-কোনো অগ্রগতি এই দুই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো বিশেষ অবস্থায়, বংশগতি কতটা ব্যক্তির বিকাশে সহায়তা করবে, তা নির্ভর করে পরিবেশ তার উপর কতটা ক্রিয়াশীল। আবার পরিবেশ ব্যক্তির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ণয় করে দেবে বংশগতি। এইভাবে ব্যক্তিজীবনে প্রতিনিয়ত এক সংগ্রাম চলছে। জীবনধারণের তাগিদে পরিবেশের সঙ্গে মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলছে। কোনো বিশেষ মুহূর্তে কোনো বিশেষ আচরণ এই সংগ্রামেরই ফল। ব্যক্তির দৃষ্টির অগোচরে নানারকম ঘটনা ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সুতরাং, ব্যক্তিত্ব দৈহিক, মানসিক সমস্ত রকম শক্তি সম্ভাবনার একটি সুষম সমন্বয়।

বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় বেশিরভাগ ব্যক্তিই পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সমাজ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না। সেইজন্য 'নির্দেশনা' এই ধারণাটি বিগত কয়েক দশক ধরে অভাবনীয়ভাবে উন্নত হয়েছে। নির্দেশনার চাহিদাটি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে যাতে পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি সহজেই সংগতিবিধান করতে পারে। 'নির্দেশনা' কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, আজকাল সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ প্রমুখ সকলেই এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক কথায় প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি মানব কল্যাণে আগ্রহী তিনিই যথাযোগ্য নির্দেশনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সমস্যা আসে, আর সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সে সাহায্য প্রার্থনা করে। ব্যক্তিই এই পারস্পরিক নির্ভরতার নীতির উপর ভিত্তি করেই পরামর্শদান ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পরামর্শদান এবং পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে ব্যক্তিই একটি মৌলিক চাহিদা। বিজ্ঞান ও কারিগরীর যুগে এর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং যেগুলো পরিতৃপ্তির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে সহায়তা দানের পদ্ধতি স্থির করা হয়। পরামর্শদানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে কাজ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাক্ষেত্র প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে পরামর্শদানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

মানব সভ্যতা যতই অগ্রসর হচ্ছে; ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন ততই জটিল আকার ধারণ করছে। সমস্যা বহুল জীবনে সব সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে, সব ধরনের চাহিদা পরিপূরণ করে সংগতি বিধান প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। দেহের কোনো বিশেষ অংশের ক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে আমাদের দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়, তেমনি মানসিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সংগঠিত না হলে মানসিক অপসংগতি দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে এ ধরনের মানসিক অপসংগতি নানা রকম আচরণগত সমস্যার সৃষ্টি করে। অপসংগতিমূলক আচরণ শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই মানসিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে অপসংগতিমূলক আচরণ যতদূর সম্ভব দূর করতে হবে।

প্রথম একক

ব্যক্তিত্ব ঃ অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ
(Personality: Meaning, Nature, Type)

ভূমিকা (Introduction):

ব্যক্তিত্ব (Personality) এর ধারণা মূলত হল একটি বিমূর্ত (Abstract) ধারণা। এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত ধারণা প্রকাশ করা সহজ সাধ্য নয়। ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত ব্যক্তির সেইসব অসাধারণ ও আকর্ষণীয় গুণাবলিকে ব্যক্তির মনে করা হয় যা ব্যক্তিকে বিশিষ্টতা দেয় অর্থাৎ অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে। যার চালচলন কথাবার্তা ব্যক্তির মনে সম্ভ্রম জাগায় না, তাকে আমরা 'ব্যক্তিত্বহীন' বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনোবিদ্যায় 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটি এই রকম লৌকিক অর্থে ব্যবহার করা হয় না। মনোবিদ্যায় বলা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব আছে। যার চালচলন কথাবার্তা সম্ভ্রমজনক তার যেমন ব্যক্তিত্ব আছে তেমনি যার কথাবার্তা সাধারণ তারও ব্যক্তিত্ব আছে। ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত বোঝানো হয় ব্যক্তির সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সমূহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য।

অনেক সময় ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারাকে বোঝানো হয়। আবার অনেক সময় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এই শব্দ দুটিকে সমার্থক বলে মনে করা হয়। যদিও এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিত্বকে চরিত্রের সঙ্গে দেখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব চরিত্র থেকে ব্যাপকতর এবং চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান মনে করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বের সব উপাদানের নৈতিকমূল্য নির্ধারণ করা হয় না। আবার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিকে অভিন্ন বলেও মনে করা হয়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে, সেই কারণে তাদের অভিন্ন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তিত্ব শব্দটির প্রয়োগগত পরিবর্তন হয়েছে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological Meaning): ইংরেজী পারসোনালিটি (Personality) কথাটি গ্রীক প্রতিশব্দ 'পার্সোনা' (Persona) থেকে এসেছে। পার্সোনা শব্দটির অর্থ হল মুখোশ। প্রাচীনকালে রোমে অভিনেতারা মুখোশ পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং পারসোনালিটি শব্দটির উৎপত্তি যে শব্দটির থেকে, সেটি আসলে একটি ছদ্ম, মিথ্যা বা ব্যক্তি যেভাবে অপরের কাছে প্রকাশিত হয় তাকেই বোঝাত। পরবর্তীকালে পার্সোনা শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থ হয়ে দাঁড়ায় নাটকের অভিনেতা। মনোবিদ্ সিসারো (Cicero) 'Persona' শব্দের চারটি অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। তা হল :

ক) কোনো ব্যক্তি যেভাবে অপরের কাছে প্রকাশিত হয়। (As one appears to others.)

খ) ব্যক্তি জীবনে যে ভূমিকায় অভিনয় করে। (The part someone plays in life.)

গ) কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সমবায় যা ব্যক্তিকে তার কাজের উপযোগী করে তোলে। (An assembling of personal qualities that fit a man for his work.)

ঘ) স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা (Distinction and dignity.)

সংজ্ঞা (Definition):

বিভিন্ন বিখ্যাত মনোবিদ ও শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের ধারণা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

রবার্ট সেসানস্ উডওয়ার্থ : ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গো বলেছেন– ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক প্রকৃতি। (Robert Sessions Woodworth - Personality can be broadly defined as the total quality of an individual’s behaviour.)

উইলিয়াম ম্যাকডুগাল-এর মতে- ব্যক্তিত্ব কতগুলি সহজাত বৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। (William Mcdougal - Personality is nothing but the function of some innate dispositions.)

এডউইন গেরিগাস বোরিং ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — ব্যক্তিত্ব হল, ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গো এক বিশেষ ধরনের সংগতিপূর্ণ অভিযোজন। (Edwin Garrigues Boring - Personality is defined as an individuals’s typical or consistant adjustment to his environment.)

নরম্যান এল মুন তাঁর সংজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে ঐক্য বা সংহতি আছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় বলেছেন, সামাজিক অবস্থার সঙ্গো সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতি বা ঐক্য হল ব্যক্তিত্ব। (Norman L Munn- Personality may be defined as the most characteristic integration of an individual’s structure, modes of behaviour, interest, attitude, abilities and aptitudes, especially from the standpoint of adjustment in Social Situation.)

হেনরি এডওয়ার্ড গ্যারেট এর মতে– ব্যক্তিত্ব হল আচরণের বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি।

(Henry Edward Garrett- Personality is special system or process of behaviours.)

হেনরি মর্টন প্রিন্স ব্যক্তিত্বের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে- ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির সমস্ত জন্মগত প্রবণতা। আবেগ, ঝোঁক, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এবং অর্জিত প্রবণতার সমষ্টি। (Henry Morton Prince- Personality is the sum total of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and the dispositions and tendencies acquired by experience.)

রেমণ্ড ক্যাটেল ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তির কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে করণীয় কী, ব্যক্তিত্ব তার পূর্বাভাষ দিতে সাহায্য করে। (Raymond Cattell- Personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation.)

গর্ডন উলিয়ার্ড আলপোর্ট বিভিন্ন প্রচলিত সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্বের এক পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই সংজ্ঞার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সব সংজ্ঞার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। আলপোর্ট ব্যক্তিসত্তা সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত বই- ‘Personality: A psychological Interpretation” এ বলেছেন– পরিবর্তনশীল

সক্রিয় জৈব মানসিক সত্তার যে সমন্বয় ব্যক্তির অভিযোজনমূলক আচরণ তার নিজস্বতা প্রকাশে সহায়তা করে তাই হল ব্যক্তিত্ব। (Gordon Willard Allport - Personaltiy is the dynamic organisation with in the individual of those psycho-physical system that his unique adjustment to his environment.)

আলপোর্টের সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়– ব্যক্তিত্ব সদা পরিবর্তনশীল অথচ সংগঠিত, দৈহিক মানসিক তন্ত্র বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন যে, ব্যক্তিত্ব দৈহিক এবং মানসিক এই দুই ধরনের তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত এবং এই দুই তন্ত্রই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে সর্বদা পারস্পরিক ক্রিয়া চালায়। আলপোর্টের মতে- অভ্যাস, মনোভাব, সেন্টিমেন্ট এগুলো ব্যক্তির সমস্ত রকম পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল এবং এদের সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। 'নির্ধারণ করা' (Determine) বলতে তিনি বুঝিয়েছেন— জৈব- মানসিক বা দৈহিক মানসিক তন্ত্র ব্যক্তির অভিযোজনমূলক আচরণ নির্ধারণ করে। 'অভিনব অভিযোজন' (Unique Adjustment) কথার অর্থ হল- পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক পৃথক কৌশল প্রয়োগ করে। তাই ব্যক্তিভেদে অভিযোজন মূলক আচরণ একক এবং অভিনব আচরণ।

ব্যক্তিত্বের এইসব সংজ্ঞার কোনোটিই সম্পূর্ণ হতে পারেনি। ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন ব্যক্তির ভাবনা চিন্তা, ধ্যান ধারণা, জীবনবোধ অন্তর্ভুক্ত, তেমনি তার আচার আচরণ অন্তর্ভুক্ত। আবার ব্যক্তির আবেগ অনুভূতিও কাজ করে। ব্যক্তি জীবনের সকল দিককে নিয়েই হল তার ব্যক্তিত্ব সুতরাং ব্যক্তিত্ব এক জটিল সমগ্রতা।

স্বরূপ (Nature) :

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ মূলত ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আচার আচরণকে বোঝানোর জন্য কতগুলি গুণবাচক দিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- আশাবাদী, নিরাশাবাদী, পরিশ্রমী, আয়াসী, প্রফুল্ল, বিপন্ন, উদার, সংকীর্ণ ইত্যাদি। এইসব দিক বিবেচনা করে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আলোচনা করা হল—

১) ব্যক্তি যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে সুপ্ত থাকে অনন্ত সম্ভাবনা ও শক্তি। সে সম্ভাবনা ও শক্তি কে বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে দৈহিক ও মানসিক সংগঠন। জন্মের পর থেকেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি ক্রিয়া করতে শুরু করে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা এবং পরিবেশের শক্তির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তখন থেকেই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রকাশিত হতে থাকে।

২) চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের (Adaptation) জন্য ব্যক্তির কার্যাবলি তার ব্যক্তিত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। পারিপার্শ্বিকের এই উপযোজনের পেছনে আছে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা ও বৃত্তি, যার দ্বারা ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারিত হয়।

৩) ব্যক্তিত্বের স্বরূপ হল ব্যক্তির দেহমনের এক জীবন্ত ঐক্য। ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দৈহিক বৈশিষ্ট্য।

৪) ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একটা সমগ্রতা, একটা সংহতি একটা সুসামঞ্জস্য সংগঠন, মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য গুলি ঐক্যবদ্ধ হলে একটা সুসামঞ্জস্য রূপ লাভ করে।

৫) ব্যক্তিত্বের স্বরূপ হল আত্মমর্যাদা (Self-esteem) আত্মসচেতনতা (Self-consciousnees) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের (Self-determination) ক্ষমতা। আত্মসচেতন মানুষ যিনি নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন

এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ তিনিই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

৬) ব্যক্তিত্বের স্বরূপ হল তা স্থির বা নিশ্চল নয়, ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধমান ও গতিধর্মী। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি সাধনের প্রচেষ্টার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়।

৭) ব্যক্তিত্বের স্বরূপ হল ব্যক্তিত্ব প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। প্রতিটি ব্যক্তি এক বিশেষ ব্যক্তি এবং এই হিসাবে তিনি অদ্বিতীয়, অন্য কারও সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

৮) সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে। সমাজের আচরণ, রীতিনীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারার প্রভৃতি সামাজিক উপাদান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে। তাই ব্যক্তিত্বে স্বরূপ হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল।

৯) প্রকৃতিগত ভাবে ব্যক্তিত্ব পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক আদান প্রদান বা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে। পরিবেশের দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কিছুটা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়, আবার পরিবেশকে ও কিছুটা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে।

১০) ব্যক্তিত্ব প্রকৃতিগতভাবে সুবিন্যস্ত, সামগ্রিক ভাবাপন্ন। এই দুয়ের সুসংবদ্ধতা ব্যক্তি জীবনে স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়।

ধরন (Types) :

ব্যক্তিত্ব এক সুসংহত সামগ্রিক সত্তা। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, স্বরূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে না। এর ফলে মনোবিদদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিত্বের কতগুলি টাইপ (Type) নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে ব্যক্তির প্রকৃতি জানার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ব্যক্তিত্বের টাইপ বলতে বোঝায়- দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণীকরণ।

ব্যক্তিত্বের এই টাইপগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন, এই ধারণা কোনো কোনো মনোবিদ পোষণ করে। এক ধরনের টাইপের বৈশিষ্ট্য অল্পমাত্রায় ও অপর টাইপের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কারও কারও মতে টাইপের বৈশিষ্ট্য সংলক্ষণের মতই স্বাভাবিক ভাবে বন্টিত থাকে । আর এক মত অনুযায়ী কোনো জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যদি কোনো দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহলে ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিবর্গ একটি গোষ্ঠী রূপে পরিগণিত হয়। গোষ্ঠীগত এই বৈশিষ্ট্যই হল টাইপ।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বোঝানোর জন্য ব্যক্তিত্বের কতগুলি টাইপের উল্লেখ করে তার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে বোঝানো যায় যা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

মানুষের ব্যক্তিত্বকে জানার ও বোঝার যত চেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের শ্রেণি বিভাগ সবচেয়ে প্রাচীন অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে কয়েকটি শ্রেণি বিভাগ করে নিয়ে তার স্বভাব ও প্রকৃতি নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মতে, মানুষের তিনটি শ্রেণি–সত্ত্বগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ সৎ, সংযমী, মিতবাক্, সরল ইত্যাদি। তমোগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ অসৎ, নিষ্ঠুর, নিম্নরুচি, অপরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। রজোগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ আমোদ ও আড়ম্বরপ্রিয়, ভোজনবিলাসী, বীর, সক্রিয়, উৎসাহী ইত্যাদি।

গ্রীক দার্শনিক থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus) ৩৭৫-২৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্বভাব অনুযায়ী মানুষকে ৩০টি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখিত শ্রেণিগুলিতে আছে স্তাবকশ্রেণি, নিশ্চিত শ্রেণি, রুচিহীন ইত্যাদি। এছাড়াও আরও যেসব শ্রেণি বিভাগের বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিছুনা কিছু শারীরিক ভিত্তি রয়েছে।

প্রাচীনকালে একসময় খুলিবিদ্যা (Phrenology) অর্থাৎ মাথার খুলির আকৃতি অনুযায়ী মানুষকে শ্রেণি বিভাগের চেস্টা ও দেহাকৃতি বিদ্যা (Physiognomy) অর্থাৎ দেহের আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগের চেস্টা ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

হিপোক্রেটিসের মতে ব্যক্তিত্বের টাইপ :

দৈহিক উৎপাদানের (Physiological factor) সঙ্গে চরিত্রগত স্বভাবকে যুক্ত করে ব্যক্তিত্বের ধারণা নির্ধারণের চেস্টা করেছেন প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (Hippocrates)। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের প্রধান চারটি টাইপ হল—

(ক) দৃঢ়প্রত্যয়ী (Sanguine) (খ) মন্থর (Phlegmatic) (গ) ক্রোধপ্রবণ (Choleric) (ঘ) বিষাদ প্রবণ (Melancholic)।

কোন্ ব্যক্তি কোন্ টাইপের অন্তর্ভুক্ত তা নির্ভর করছে তাঁর দেহে রক্ত, শ্লেষ্মা, হলুদপিত্ত বা কৃষ্ণপিত্তের প্রাধান্যের উপর। যার মধ্যে রক্তের প্রাধান্য সেই ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়ী, যার মধ্যে শ্লেষ্মার প্রাধান্য মন্থর, হলুদপিত্তের প্রাধান্য যার মধ্যে সে ক্রোধ প্রবণ এবং যার মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণের পিত্তের প্রাধান্য বিষাদ প্রবণ হয়। এই মতবাদ হল মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাক্ বৈজ্ঞানিক যুগের কথা। যদিও বর্তমানে এই সব মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যক্তিত্বের উদ্‌ঘাটন এবং শ্রেণিকরণ করা হয়েছে, মানসিক প্রকৃতি এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নিম্নরূপ ঃ

কাল গাস্টেভ য়ুঙ (Carl Gustav Jung) এর টাইপ :

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী সি.জি য়ুঙ মানষিক বৈশিস্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন—

(১) অন্তর্মুখী (Introvert), (২) বহির্মুখী (Extrovert), (৩) উভয়মুখী (Ambivert)

(১) অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব : অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা সাধারণত ভাবুক বা কল্পনা বিলাসী, আত্মকেন্দ্রীক, স্বার্থপর, অসামাজিক, অপর সম্পর্কে উদামীন ও বাস্তব বিমুখ হয়। এই ধরনের মানুষ নিজের মধ্যে এক ভাব বা কল্পনার জগৎ রচনা করতে তাকেই আশ্রয় করে থাকতে চায়। নিজের ধ্যান ধারণা ও আদর্শ থেকে সহজে পিছপা হয় না। বাইরের জগতের কর্মকোলাহল এরা পছন্দ করে না। এদের মধ্যে সামাজিকতা বোধের অভাব লক্ষ করা যায়। দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই ধরণের মানুষ অক্ষম। নতুন পরিবেশের সঙ্গে এরা সহজে সঙ্গতি সাধন করতে কারে না। বাস্তব জগতের চেয়ে চিন্তা বা কল্পনার জগৎই এদের কাছে প্রাধান্য পায়। উল্লেখযোগ্য যে, মানব সমাজের অতি উচ্চমানের, তত্বসন্ধানী, কবি ও দার্শনিকরা এই শ্রেণির অন্তর্গত।

(২) বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব : বহির্মুখী ব্যক্তিরা আবার বাহ্যকেন্দ্রিক, কর্মপরায়ণ, সামাজিক, অপরের হিতসাধনে উৎসাহী ও বাস্তবমুখী হয়। বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে নিজেদের নিয়োগ করে। কল্পনার জগতের পরিবর্তে কাজকেই প্রাধান্য দেয়। এরা কোনো ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কর্মব্যস্ততা এদের স্বভাব ধর্ম। খেলাধুলা, আলাপ আলোচনা, মেলামেশা ইত্যাদি এদের পছন্দ। এরা অত্যন্ত বাস্তববাদী হয়। বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে কাজকর্ম করে। প্রসঙ্গত সমাজের অতি উচ্চমানের রাজনীতি বিদদের ব্যক্তিত্ব বহির্মুখী।

(৩) উভয়মুখী ব্যক্তিত্ব : এই ধরনের লোকেরা অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী - এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা এক দিকে যেমন- আত্মসচেতন তেমনি অপরদিকে সামাজিক পরিবেশের প্রতিও মনোযোগী অর্থাৎ এরা আত্মকেন্দ্রিক এবং সমাজকেন্দ্রিক উভয়ই, জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষ এই শ্রেণিভুক্ত। একই ব্যক্তিত্ব কখন ও অন্তর্মুখী বা কখন ও বহির্মুখী হতে পারে। বিপদের সময় যখন মানুষ নিরাপত্তা বোধ করে না তখন হয় সে অন্তর্মুখী, আবার যে পরিবেশে নিরাপত্তা বোধ করে সেই পরিবেশে বহির্মুখী।

যুঙ (Jung) অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী এই দুই ধরনের টাইপের প্রত্যেকটির আবার চারটি করে উপটাইপের কথা বলেছেন। যেমন- সংবেদন প্রবণ (Proneto Sensation) চিন্তাপ্রবণ (Thinking) অনুভূতি প্রবণ (Feeling Type) এবং অন্তর্দৃষ্টি (Intuitive Type)। সংবেদন প্রবণ অন্তর্মুখী ব্যক্তি' বিশেষ সংবেদন পছন্দ করে এবং তাদের চিন্তার আনন্দ লাভ করে। সংবেদন প্রবণ বহির্মুখী ব্যক্তি' বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আনন্দ লাভ করে এবং তার অভাবে অস্বস্তি অনুভব করে। চিন্তাপ্রবণ অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা যেমন দার্শনিক, এরা জগতের পরিদৃশ্যমান রূপের থেকে ইন্দ্রিয়াতীত রূপের দিকে আকৃস্ট হয়। চিন্তাপ্রবণ বহির্মুখী ব্যক্তি যেমন বৈজ্ঞানিক, এরা জগতের দৃশ্যমান রূপ নিয়েই কাজ করে। 'অনুভূতিপ্রবণ অন্তর্মুখী ব্যক্তি' তীব্র ভাবাবেগকে মনে পোষণ করে ও তাকে দমন করতে পারেন। কিন্তু 'অনুভূতিপ্রবণ বহির্মুখী ব্যক্তি' ভাবাবেগকে দমন না করে বাইরে প্রকাশ করে দেন। 'অন্তদৃষ্টিপ্রবণ অন্তর্মুখী ব্যক্তি' মনের সিদ্ধান্ত বাহ্য আচরণে প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন বহির্মুখী ব্যক্তি কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজও করতে পারে।

দৈহিক বৈশিস্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ :

ক্রেৎসমার টাইপ (Kretschmer's Types) জার্মান মনোরোগ চিকিৎসক ক্রেৎসমার আকার আকৃতির দিক থেকে মানুষের কয়েকটি– দৈহিক টাইপের উল্লেখ করেন এবং ঐসব দৈহিক টাইপের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের টাইপের সম্বন্ধ নির্ধারণ করেন। প্রচুর সংখ্যক মানুষের দৈহিক আকৃতি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ক্রেৎসমার তাদের কয়েকটি টাইপে বিন্যস্ত করেন এবং বিশেষ জাতের দৈহিক আকৃতির সঙ্গে বিশেষ জাতের ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধের উল্লেখ করেন।

ক্রেৎসমার মূলত তিন রকম দৈহিক টাইপের উল্লেখ করে তাদের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ প্রকার মানসিকতার উল্লেখ করেন। দৈহিক টাইপ গুলি হল– (১) পিকনিক (Pycnic) (২) এস্থেনিক (Asthenic) (৩) এথ্লেটিক (Athletic) এছাড়া ও ক্রেৎসমার অতি বিরল সংখ্যক আরেক প্রকার টাইপের উল্লেখ করেছেন। সেটি হল (৪) ডিস্প্লাস্টিক (Dysplastic).

এক এক প্রকার দৈহিক টাইপের সঙ্গে এক এক রকমের মানসিকতা যুক্ত থাকে। যেমন—

(১) পিকনিক টাইপ ব্যক্তি : এদের দেহ স্থূলকায় এবং গোলাকার। এরা মোটাসোটা এবং চর্বিবহুল। উচ্চতা মাঝারি। এদের মাথা, বুক, পেট আকারে বড় এবং স্ফীত। মনের দিক থেকে পিকনিক জাতি ভুক্ত ব্যক্তিরা বহির্মুখী, বাস্তববাদী, পরোপকারী এবং সামাজিক। তবে, এরা অস্থির ও চঞ্চল। আবেগ ও উত্তেজনার কোনো স্থিরতা থাকে না, বার বার পরিবর্তিত হয়। হঠাৎ আনন্দ প্রকাশ করে এবং কিছুক্ষণ পরেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে এরা অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে ভালবাসে এবং বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে।

(২) এস্‌থেনিক চাইপ ব্যক্তি : এদের দেহ রোগা এবং লম্বা, পেশী ও অস্থি অপরিপুষ্ট, বক্ষদেশ ও উদর দুর্বল ও চাপা। হাত-পা, লম্বা ও সরু। মনের দিক থেকে এস্‌সেনিক জাতিভুক্ত ব্যক্তিরা অন্তর্মুখী, বাস্তববিমুখ, স্বার্থপর এবং কল্পনাবিলাশী। এরা আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকে এবং বাইরের জগতে খুব বেশি যেতে পছন্দ করে না।

(৩) এথ্‌লেটিক্ টাইপ ব্যক্তি : এই টাইপের ব্যক্তিরা অতিরিক্ত মোটা হয় না আবার অতিরিক্ত রোগাও হয় না। এদের পেশী ও অস্থি শক্ত ও পুষ্ট। পুষ্টির অভাব এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। বলিষ্ঠ মুখমন্ডল, প্রশস্ত স্কন্ধ, বক্ষদেশ, পেশী ও সুষম হস্ত ও পদের জন্য এদের সমগ্র দেহটি সুঠাম ও সুন্দর। মনের দিক থেকে এথ্‌লেটিক জাতিভুক্ত ব্যক্তিরা অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী মনোভাবের মধ্যেবর্তী। এরা তেজস্বী, কর্মঠ, বাস্তববাদী। দৈহিক আকৃতি এবং মানসিক প্রকৃতির দিক থেকে এই ধরনের ব্যক্তিরা স্বাভাবিক।

(৪) ডিস্‌প্ল্যাস্টিক টাইপ ব্যক্তি : এদের দেহ কুৎসিত ও কদাকার। অপরিণত দৈহিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। গৌণ ও যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় না। পুরুষের পুরুষালীলক্ষণ এবং স্ত্রী লোকের স্ত্রী জাতীয় লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় না। দৈহিক আকৃতির অসামঞ্জস্যতার জন্য এদের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দেয়। ফলে পলায়নী মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়। সাধারণত এরা অন্তর্মুখী।

সেলডন্ প্রস্তাবিত ব্যক্তিত্বের টাইপ (Sheldon's Personality Type) :

উইলিয়ম্ হাবার্ট সেলডন্ (William Harbert Sheldon) বহু সংখ্যক মার্কিন ছাত্রের দৈহিক আকৃতি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর মতে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যখন ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ করা হবে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিমাপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। সেলডন্ দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাণগত ভাবে নির্ধারণ করে তাদের তিনটি টাইপে নির্ধারণ করেন :

(১) এন্‌ডোমর্ফি (Endomorphy), (২) মেসোমর্ফি (Mesomorphy) এবং (৩) এক্‌টোমর্ফি (Ectomorpy)।

(১) এন্‌ডোমর্ফি দৈহিক আকৃতি (Endomorphy body type) : এই শ্রেণির লোকদের দেহের বৈশিষ্ট্য হল, এরা গোলাকার, কোমল দেহ বিশিষ্ট এবং এদের উদর প্রদেশ বিশেষ স্ফীত। যাদের উপর স্ফীত এবং মেদবহুল তাদের দৈহিক আকৃতিকে সেলডন্ এন্‌ডোমর্ফি বলেছেন।

(২) মেসোমর্ফি দৈহিক আকৃতি (Mesomorphy body type) : এদের দেহ অস্থিপেশীবহুল। দেহের গঠন দৃঢ় ও কঠিন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মেসোডার্ম (Mesoderm) থেকে পেশীসমূহের উদ্ভব হয় বলে

এবং সুসংবদ্ধ পেশী সমূহ থাকে বলে সেলডন্ তাদের দৈহিক আকৃতিকে মেসোমর্ফি বলেছেন।

(৩) একটোমর্ফি দৈহিক আকৃতি (Ectomorphy body type) : এদের দেহ স্নায়ুবহুল এবং চর্মসার। পেশীবহুল, হাত-পা লম্বা ও সরু। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের 'একটোডার্ম' (Ectoderm) থেকে চর্ম ও স্নায়ুর উদ্ভব হয় বলে, তাদের দৈহিক আকৃতিকে সেলডন্ একটোমর্ফি বলেছেন।

সেলডন্ আবার ব্যক্তিদের দৈহিক পরিমাপের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'সেভেন পয়েন্ট স্কেলে' পরিমাপ করেন। এই পরিমাপের পর তিনি ব্যক্তির দৈহিক টাইপকে তিন ধরনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এই তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব হল—(১) ভিসেরোটনিক (Viscerotonic), (২) সোমাটোটনিক (Somatotonic) এবং (৩) সেরিব্রোটনিক (Cerebrotonic)।

(১) ভিসেরোটনিক ব্যক্তিত্বের লক্ষণ : এন্‌ডোমোর্ফ মানসপ্রকৃতির দিক থেকে ভিসেরোটনিক টাইপের। এরা বিশ্রাম ও আরাম প্রিয়, ভোজনবিলাসী ও সামাজিক। এরা আমোদ প্রমোদ, হৈ চৈ ভালবাসে। এরা মনখোলা, অর্থাৎ মনের আবেগ ও অনুভূতি চেপে রাখতে পারে না। এরা সহিষ্ণু প্রকৃতির।

(২) সোমাটোটনিক ব্যক্তিত্বের লক্ষণ : মেসোমর্ফরা মানস প্রকৃতির দিক থেকে সোমাটোটনিক টাইপের। এরা উদ্যামী, বলিষ্ঠ ও তেজোদৃপ্ত। অপরের উপর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরা দৈহিক সাহসের অধিকারী। বিপদে পড়লে নিজের চেষ্টায় বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

(৩) সেরিব্রোটনিক ব্যক্তিত্বের লক্ষণ : একটোমর্ফরা মানস প্রকৃতির দিক থেকে সেরিব্রোটনিক টাইপের। এরা সংযত, সাবধানী, গোপনতাপ্রিয়, সতর্ক এবং মনোযোগী। ভবিষৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রবণতা এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক মেলামেশা এদের পছন্দ নয়। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযমের অভাব দেখা যায়। অপরিচিত লোকদের এরা বিশ্বাস করে না এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে।

ফ্রয়েড-এর ব্যক্তিত্বের টাইপ (Freud's Types) :

শিশুর যৌন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির ভিত্তিতে ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের উল্লেখ করেছেন।

(১) মুখকামী (Oral-erotic) : যৌনশক্তির বিকাশের প্রথম পর্যায়ে শিশু তার চোষণের (Sucking) মাধ্যমে চরিতার্থ করে। সে অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তির বিকাশ স্থির হয়ে থাকে তা হলে যে ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠে তা হল— এরা নৈরাশ্যবাদী এবং হিংসা পরায়ণ হয়। জীবনের ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশুদের মত আচরণ করে।

(২) পায়ুকামী (Anal-erotic) : শৈশবে যদি শিশুর মাতাপিতার প্রতি বিরাগ বা আক্রমণাত্মক ভাব দেখা যায়। তাহলে শিশু পায়ুকামী হয়। পায়ুকামী ব্যক্তিত্বের লোক একগুঁয়ে, খুঁতখুঁতে ও সুবিধাবাদী হয়। এদের কাজে নির্দিষ্ট নীতির অভাব দেখা যায় এবং কথায় ও কাজে অসংগতি লক্ষ্য করা যায়।

(৩) উপস্থকামী (Genital-erotic type) : এই ধরনের ব্যক্তি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। এরা একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ে। এর দুটি রূপ আছে,ফ্যালিক টাইপ (Phalic Type) এবং জেনিট্যাল টাইপ (Genital Type)।

প্রথম অবস্থায় শিশু মনে করে অপরের মত তার ও লিঙ্গ আছে। সাধারণ যৌন সম্পর্কের প্রশ্ন এই স্তরে আসে না। এই স্তরে শিশুদের মধ্যে আত্মকামীতা লক্ষ্য করা যায়। একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ে। এই স্তরে শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা অভিযোজনের ক্ষমতা, নির্ভর বোধ ও সহযোগিতার ভাব দেখা যায়।

উপসংহার (Conclusion):

ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন টাইপে শ্রেণিবিভাগ করা বিজ্ঞানসম্মত কিনা, এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে কারণ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আন্তরিক জৈব মানসিক প্রবণতার সমন্বয়ে গঠিত, তাই বাহ্যিক কোনো বৈশিষ্ট্যর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণি বিভাগ করা বিজ্ঞান সম্মত নাও হতে পারে। তবে যেহেতু কতগুলি গুণের ভিত্তিতে টাইপগুলি বিশ্লেষণ করা হয়, সেক্ষেত্রে কোন্ ব্যক্তি কোন্ টাইপের অন্তর্ভুক্ত তা জানা থাকলে তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের কি কি প্রলক্ষণ রয়েছে তা অনুমান করা সম্ভব হয়। এছাড়া বলা যেতে পারে অনেক সময় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়ে ব্যক্তির মধ্যে এক নতুন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে পারে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয় তার বাহ্য-আচরণের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে; যেহেতু ব্যক্তির বাহ্য আচরণ পরিবর্তনশীল এবং নানাধরনের উপাদানের উপর নির্ভর করে। তাই কোনো ব্যক্তিবিশেষকে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি টাইপের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

দ্বিতীয় একক

নির্দেশনা: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় নির্দেশনার গুরুত্ব
(Guidance: Meaning, Types, Importance in Education)

ভূমিকা (Introduction):

একটি সুশৃঙ্খল পেশামূলক কাজহিসাবে 'নির্দেশনা'র ধারণা প্রথম প্রকাশিত হয় 1905 সালে। আমেরিকার বস্টন (Boston) শহরের অধিবাসী ফ্রাঙ্ক পারসনস (Fank Parsons) নির্দেশনার ধারণা প্রথম প্রবর্তন করনে। যে সমস্ত মানুষ নিজেদের চাকুরী যোগাড় করতে পরিশ্রম করেছিল তাদের জন্য তিনি বস্টন শহরে একটি নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। 'Choosing a Vocation' নামে তিনি একটি পুস্তকও রচনা করেছিলনে। ফ্রাঙ্ক পারসনের পর জেসি. বি. ডেভিস (Jessie B. Davious) অ্যানিরিড (Anne Reed) প্রমুখ সমাজ সংস্কারক এই একই উদ্দেশ্যে কিছু কাজকর্ম করে গেছেন। 1910 সালের পর আমেরিকার বেশ কিছু পেশামূলক সংগঠন নির্দেশনা আন্দোলনের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতবর্ষে অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নির্দেশনাদানের বিষয়টি অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায়, গুরু শিষ্যের কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে নির্দেশনা দানের কাজ চলত। আমেরিকায় যখন নির্দেশনা আন্দোলন গতিলাভ করতে শুরু করে, প্রায় সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষে নির্দেশনা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ শুরু করে। 1938 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার (Applied Psychology) একটি বিভাগ স্থাপিত হয়, তখন থেকেই শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তীকালে সমস্ত রাজ্যই নির্দেশনা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে। 1952 সালে দিল্লীর Central Institute of Education -এ অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভায় নির্দেশনা কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশের সমস্ত ব্যক্তিদের একত্রিভুত করা হয়, এই আলোচনা সভায় পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ আসে। 1954 সালে এ ধরনের একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে International Association for Vocational Guidance এর অনুমোদন প্রাপ্ত All India Educational and Vocational Guidance Association প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভারতবর্ষে নির্দেশনা আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) -এর সুপারিশের ভিত্তিতে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন অষ্টম শ্রেণির পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সাতটি প্রবাহ প্রথা (Seven Stream System) প্রবর্তন করেন। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের রুচি, চাহিদা এবং গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনো একটি প্রবাহ নির্বাচন করে সেইমত পড়াশুনা করবে। যেহেতু এইসময় শিক্ষার্থীদের বয়স অত্যন্ত কম থাকে তাই বিষয় নির্বাচনের জন্য তাদের নির্দেশনা দান প্রয়োজন। কমিশনের এই সুপারিশ কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার গুলিকে কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়, এর ফলস্বরূপ বহুমুখী বিদ্যালয় গুলিতে নির্দেশনা কর্মসূচির উপযোগী

পরিকাঠামো তৈরী হতে থাকে। কমিশনের সুপারিশ ক্রমেই ভারত সরকার 1954 সালে দিল্লীতে Central Bureau of Educational and Vocational Guidance স্থাপন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার একই সঙ্গো রাজ্য সরকার গুলিকে State Bureu স্থাপনের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে নির্দেশনা কর্মসূচি চালু করার নির্দেশ দেয়। 1956 সালে All India Education and Vocational Guidance Association স্থাপনের মধ্য দিয়ে নির্দেশনা আন্দোলন সর্বভারতীয় চরিত্র লাভ করে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের যে সমস্ত সরকারী সংস্থা নির্দেশনা দান কর্মসূচি গ্রহণ করে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - Department of Educational Psychological and Foundations of Education, National Council of Educational Research and Training (NCERT), State Bureau of Guidance (SBG), State Council of Educational Research and Training (SCERT) ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা যেমন রোটারী ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব নির্দেশনা দানের কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে।

অর্থ (Meaning):

বর্তমানে আধুনিকতার সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রও এর বাইরে নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। শিক্ষা এখন শিক্ষক-কেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখন স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা কম থাকাতে বহু শিক্ষার্থী সঠিক বিষয় বেছে নিতে পারে না। অনেক সময় অভিভাবকরাও তাদের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে তাদের সন্তানদের সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেন না। বিষয় নির্বাচনে কোনো ভুল থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই সব কারণে নির্দেশনা শিক্ষার আবশ্যিক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইংরেজী Guidance শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'Guide' শব্দটি থেকে যার অর্থ হল পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা, পথ দেখানো বা নির্দেশ দেওয়া, অর্থাৎ Guidance বা নির্দেশনা হল কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার প্রচেস্টা। এই 'Guide' শব্দটি যেমন বিশেষ্যপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তেমনি ক্রিয়াপদ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যপদ হিসাবে 'Guide' হলেন একজন ব্যক্তি যিনি পথ দেখান। তিনি মানুষকে নতুন কোনো বিষয়, স্থান অথবা অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেন। ক্রিয়াপদ হিসাবে 'Guide' শব্দের অর্থ কোনো অজানা স্থান, বিষয়, অবস্থা বা ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার কাজ। সাধারণ ভাবে নির্দেশনা বলতে বোঝায় কোনো একজন ব্যক্তির অন্যএকজন ব্যক্তিকে কোনো অজানা পথে যেতে সাহায্য করার বিষয়টিকে। বর্তমানে নির্দেশনা সমস্ত মানুষের সঙ্গো, তার জীবনের সমস্তদিকের সঙ্গোই সম্পর্কযুক্ত।

সংজ্ঞা (Definition):

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের দেওয়া নির্দেশনার কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল- নির্দেশনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে - আর্থার. জে. জোনস বলেছেন - কোন ব্যক্তির পছন্দ করনে, অভিযোজনে এবং সমস্যা সমাধানে অপর কোনো ব্যক্তির সাহায্য করাই হল নির্দেশনা। (Arthur J. Jones- Guidance is the help given by one person to another in making choices, adjustment and

in solving problems.)

ক্রো এবং ক্রো এর মতে, নির্দেশনা হল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তির পরামর্শদানের দ্বারা যে কোন বয়সের যে কোন ব্যক্তিকে তার জীবনের যে কোনো সমস্যা সমাধানের নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা। (Crow and Crow - Guidance is assistance made available by personaly qualified and adequately trained men or women to an individual of any age to help him manage his own life activities his own point of view, make his own decision and carry his own burden.)

এল. এল. চিজহোল্ম বলেন যে, নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার নিজের আগ্রহ, সামর্থ্য, বিভিন্ন দিকে তার বিকাশ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পেতে সাহায্য করে। (L. L. Chisholm - Guidance seeks to help each individual become familiar with a wide range of information about himself, his interests, his abilities, his previous development in the various areas of living and his plans on ambitions for the future.)

রুথ স্ট্যাং এর মতে, নির্দেশনা হল প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তার নিজস্ব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে। (Ruth Stang- Guidance is a process of helping individual, through his own efforts, to discover a develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness.)

Encyclopeadia Britanica (U.S.A. vol. 3, P.676) তে বলা হয়েছে, নির্দেশনা এক প্রকারের প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে তার শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ও মানসিক গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে ও বিকাশে সাহায্য করে এবং যার ফলে ব্যক্তি নিজে সুখী হয় এবং সমাজের প্রয়োজনে আসে। (Guidance is the process of helping individual to discover and develop his educational, vocational and psychological potentialities and there by to achieve an optimum level of personal happiness and social usefulness.)

মুদালিয়র কমিশন- 1952-53 এর মতে- বালক বালিকাদের ক্ষমতা এবং যে পরিবেশে তারা বাস করে ও কাজ করে তার আলোকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করার জটিল এবং সাহায্যকারী শিক্ষাকেই বলে নির্দেশনা। (Mdaliar Comission 1952-53 - Guidance involves the difficult art of helping boys and girls to plan their own future wisely in full light of the factors that can be mastered about themselves and about the world in which they are to live and work.)

উপরে উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলির বিশ্লেষণ করলে বলা যেতে পারে, নির্দেশনা হল কোনো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক যে কোনো বয়সের অন্য একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সামর্থ্য, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে, পরিবেশের সাথে সংগতি সাধনে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার প্রক্রিয়া।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরোও বলা যায়, নির্দেশনার জন্য দু'ধরনের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রথমত: কোনো একজনের সামর্থ্য, প্রবণতা, আগ্রহ, প্রেষণা, আচরণধারা, দক্ষতা, পারদর্শিতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ধারণা থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত: ব্যক্তির পরিবেশে কি ধরনের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুবিধা রয়েছে, এই সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে হলে কি ধরনের যোগ্যতা বা প্রস্তুতি প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশকের ধারণা থাকা প্রয়োজন। বলা যেতে পারে, এই দুই ধরনের ধারণার সার্থক সমন্বয়ই হল নির্দেশনা।

প্রকারভেদ (Types):

পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত ভাবে অভিযোজনের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য নির্দেশনার ভূমিকা অপরিহার্য। নির্দেশনা কর্মসুচি ব্যক্তিকে তার নিজস্ব মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সাবলীলভাবে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ব্যক্তির কোনো না কোনো সময়ে বিশেষ ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হয় যাতে সে সুখী জীবন যাপন করতে পারে এবং আরো সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে, অর্থাৎ উপযুক্ত নির্দেশনাই ব্যক্তিকে সাহায্য করে বিভিন্ন কাজ সুসম্পন্ন করতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে, দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ কিভাবে করতে হয় তার পথ নির্দেশে সাহায্য করতে। বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি যে নির্দেশনা লাভ করে তা প্রয়োজন ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন -

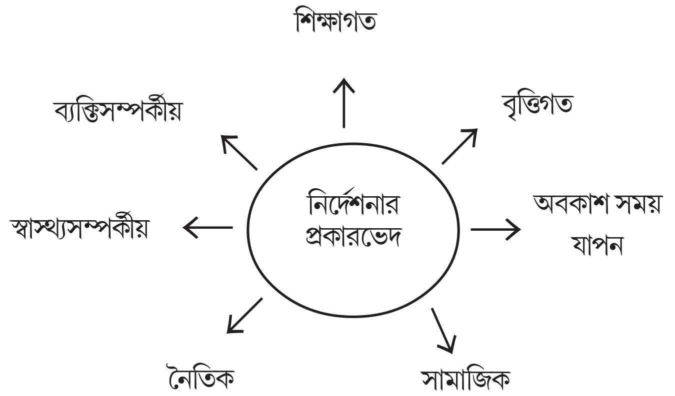

চিত্র : নির্দেশনার প্রকারভেদ

(১) শিক্ষাগত নির্দেশনা (Educational Guidance): যে নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার শিক্ষা জগতের সঙ্গে অভিযোজনে সাহায্য করে তাকে শিক্ষাগত নির্দেশনা বলে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রও জটিল হয়ে পড়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যা শিক্ষার্থীর পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ এইসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন তা না হলে ব্যক্তি জীবনেও এইসব সমস্যা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই ধরনের সমস্যা সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতনতা এবং তার সমাধানে শিক্ষাগত নির্দেশনাকেই এগিয়ে আসতে হবে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দানের বিষয়কে শিক্ষাগত নির্দেশনা বলা যায়। যেমন -

(১) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে সহায়তা করা।

(২) পাঠ্যক্রম পছন্দ করার ক্ষেত্রে সহায়তা দান।

(৩) শিক্ষামূলক কার্যক্রমে পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির চাহিদার সঙ্গো সঙ্গাতি বিধান।

(৪) সামর্থ্য এবং পারদর্শিতার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

(৫) কোনো একটি বা একাধিক বিষয়ে দুর্বলতা থাকলে তার কারণ নির্ণয় করে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া।

(৬) সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করা।

(৭) প্রেষনার অভাব ঘটলে শিক্ষার্থীদের প্রেষনার মাধ্যমে সঠিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

অনেক সময় দেখা যায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। শিক্ষার্থীর যথেষ্ট মেধা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে যাতে, শিক্ষার্থী এইসব সমস্যার সমাধান করে তার দৈহিক বিকাশের সঙ্গো সঙ্গো বৌদ্ধিক বিকাশ এবং আত্মিক বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে।

(২) বৃত্তিগত নির্দেশনা (Vocational Guidance): যে নির্দেশনা কোনো বৃত্তি নির্বাচনে বা কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তির প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে তাকে বৃত্তিগত নির্দেশনা বলা হয়। ব্যাপক অর্থে, যে নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার বৃত্তি জগতের সঙ্গো অভিযোজনে সাহায্য করে তাকে বৃত্তিগত নির্দেশনা বলে। কোনো ব্যক্তির নিজস্ব সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বৃত্তি নির্বাচন করার জন্য বৃত্তিমূলক নির্দেশনা প্রয়োজন। যে কোনো ব্যক্তিই যে কোন বৃত্তির জন্য উপযুক্ত নয়। আবার কিছু কিছু বৃত্তির জন্য শিক্ষামূলক এবং পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, তা না হলে বৃত্তিমূলক সাফল্য অর্জন করা যায় না। তাই বলা যায়, ব্যক্তির সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার পরপ্রেক্ষিতে সঠিক বৃত্তি নির্বাচনের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সহায়তা দানের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। যেমন -

(১) বৃত্তি নির্বাচন, (২) নির্বাচিত বৃত্তির উপযোগী করে শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত করা, (৩) কোনো বৃত্তির সঙ্গো যথাযথ সঙ্গাতি বিধান করতে প্রস্তুত করা, (৪) ব্যক্তিকে কর্মজগতের সঙ্গো এবং তার বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার সঙ্গো পরিচিত করানো, (৫) ব্যক্তির সামনে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের শিক্ষনীয় ও বৃত্তিমূলক উপকরণ উপস্থিত করা যাতে সে তার শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারে।

শিক্ষার্থীর নিজস্ব যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক নির্দেশনা প্রয়োজন।

(৩) ব্যক্তিগত নির্দেশনা (Personal Guidance): যে নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ করে প্রাক্ষোভিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে তাকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা বলে। হতাশা, দুশ্চিন্তা, ভয়, পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা ইত্যাদি প্রক্ষোভজনিত সমস্যা অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়। এইসব সমস্যার কারণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেভাবেই সমস্যাগুলি সৃষ্টি হোক না কেন, নির্দেশনার দায়িত্ব হল সমস্যাগুলির

সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করা। ব্যক্তিগত নির্দেশনার লক্ষ্য হল ব্যক্তি যাতে কোনোরূপ অসামাজিক কাজে লিপ্ত না হয় সে সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। অনেক সময় শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক অসাফল্য থেকে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণা, প্রক্ষোভিক অপরিণমন, অমূলক ভয় ইত্যাদি দেখা দিয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নির্দেশনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত নির্দেশদান প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে ব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকে। যেমন-

(১) শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক সমস্যা বোঝার চেষ্টা করা ও সেগুলির সমাধানে সাহায্য করে থাকে।

(২) পরিবেশের সাথে সার্থক সংগতি বিধানে সাহায্য করে থাকে।

(৩) প্রক্ষোভমূলক আচরণের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

(৪) বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের সহজে মানিয়ে নিতে পারে তার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

(৫) শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলি গুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত নির্দেশনায় নির্দেশ গ্রহণকারী এবং নির্দেশদানকারীর মধ্যে একটা সুসম্পর্ক তৈরী হয়। মানুষের এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যেগুলি সবসময় লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা যায় না, সেই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নির্দেশগত নির্দেশনা অনেক বেশি কার্যকরী।

(৪) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশনা (Health Guidance): শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক উন্নয়নের জন্য সমাজের কিছু ভূমিকা আছে। কীভাবে সুস্থ দেহ তৈরী করা যায় এবং তাকে রক্ষা করা যায় এটাই স্বাস্থ্য নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য। একমাত্র সুস্থদেহের অধিকারীরাই সুস্থমনের অধিকারী হতে পারে। তাই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার বিষয়গুলি অনুধাবন করতে, স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে নজর দিতে এবং দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের ধারা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান করে থাকে। যেমন -

(১) শারীরিক শিক্ষার একটি সুসংগঠিত কর্মসূচি অনুসরণ করতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

(২) প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা এবং এবিষয়ে সহায়তা করা হয়।

(৩) স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে বছরে একবার নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা হয়।

(৫) বিদ্যালয় পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনেও উপযুক্ত স্বাস্থ্য বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা দান করা হয়।

(৫) অবসর সময় যাপনের নির্দেশনা (Guidance for Utilisation of Leisure): শিক্ষার্থী যাতে সৃজনমূলক কাজে, মার্জিত আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অবসর সময় যাপন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখাই অবসর সময় যাপনমূলক নির্দেশনার উদ্দেশ্য। একজন শিক্ষার্থী কীভাবে তার অবসর সময় অতিবাহিত করবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়, কারণ অবসর সময় সঠিক ভাবে বিজ্ঞানসম্মত

পদ্ধতিতে অতিবাহিত হলে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। অবসর সময় যাপনের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে, যেমন -

(১) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অবসর সময় সঠিক ভাবে কাটাতে পারে।

(২) শিক্ষামূলক আগ্রহ বিকাশে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

(৩) খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

(৪) বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় যাতে শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারে সেই বিষয়ে নির্দেশনাদান করা হয়।

(৫) শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান করে অবসর সময় যাপনের নির্দেশনা।

(৬) নৈতিক নির্দেশনা (Moral Guidance): নৈতিক বিকাশ ও সঠিক চরিত্র গঠন করতে এবং নৈতিক অবনমন থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে যে নির্দেশনার সাহায্য নেওয়া হয় তাই হল নৈতিক নির্দেশনা। বর্তমানে নৈতিক মূল্য বোধের দ্রুত অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ ক্রমশ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের যুগে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য নৈতিক নির্দেশনার বিষয়টি অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। নৈতিক নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হল -

(১) ন্যায় অন্যায় বিচার করণের ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

(২) ক্ষতিকর আবেগগুলিকে সংযত করার শিক্ষা দেওয়া নৈতিক নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য।

(৩) সুচরিত্র গঠন করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস অর্জন করতে শিক্ষা দেওয়া হয় নৈতিক নির্দেশনার মাধ্যমে।

(৪) সামজের পক্ষে হিতকর নয় এমন আচরণ যাতে শিক্ষার্থীরা না করতে পারে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(৫) সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি মনোভাব গঠনে সহায়তা দান করা হয়। নৈতিক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৭) সামাজিক নির্দেশনা (Social Guidance): সামাজিক নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সমাজের সুনির্দিষ্ট আচার আচরণ, রীতিনীতি, নিয়মকানুন মেনে চলার পথ নির্দেশ করা হয়। মনোভাবের আদান প্রদান, সামাজিকীকরণ, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অর্থাৎ যে কোনো অবস্থায় সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনই হল সামাজিক নির্দেশনা। শিক্ষার্থী যাতে দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করাই এই নির্দেশনার উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এসকল দিকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে তাদের উপযুক্ত সামাজিক সংগতিবিধানে নির্দেশনা প্রয়োজন।

সামাজিক নির্দেশনার উদ্দেশ্য হল -

(১) সামাজিক সংগতিবিধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

(২) জীবন ও সমাজের প্রতি মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা।

(৩) মূল্যবোধ অর্জনে এবং ইতিবাচক জীবন দর্শনের বিকাশে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

(৪) সমাজে এবং পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করা।

(৫) সমাজের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য এবং অধিকার বোধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোতে সহায়তা করা।

শিক্ষায় নির্দেশনার গুরুত্ব (Importance of Guidance in Education):

আধুনিক শিক্ষার মূল কাজ হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার বিভিন্ন দিকে ব্যক্তির সামাজিক, বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভিক চাহিদাকে মেটানোর প্রয়াস গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তনের সঙ্গো শিক্ষার্থীদের নিজেদের মানিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই কারণে নির্দেশনার গুরুত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেড়েগেছে। বর্তমানে নির্দেশনা কেবলমাত্র ভবিষ্যতের কর্মপন্থা বা পেশামূলক কাজে সাহায্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন পেশার সঙ্গো কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে, কীভাবে কাজের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চাহিদা পূরণ করে উৎকর্ষ লাভ করবে সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জনেও নির্দেশনা সাহায্য করে। বর্তমান যুগে দ্রুততার সাথে জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তাতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে শিক্ষাপরিবেশের সঙ্গো সঙ্গাতি বিধান করতে পারছেনা। এক্ষেত্রে সামাজিক দক্ষতা অর্জন ও সঠিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা সাহায্য করে। শিক্ষামূলক বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও বৃত্তিমূলক, সামাজিক, ব্যক্তিগত, নৈতিক, দৈহিক ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা নিদের্শেনা কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত । সুতরাং একথা বলা যায় যে, বর্তমানে শিক্ষায় নির্দেশনার গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে যেমন -

(ক) শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের শিক্ষামূলক যে-কোনো প্রকার সমস্যার সমাধানে নিজস্ব পরিকল্পনা যথাযথভাবে রচনা করতে পারে, সেগুলিকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেই লক্ষ্যেই নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে সেগুলি ঠিকমত সমাধান না হলে ব্যক্তিজীবনে তার প্রভাব পড়ে। তাই এই ধরনের সমস্যা সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন করা নির্দেশনার শিক্ষাগত দিকের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) শিক্ষার্থীরা যাতে তার নিজের সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে সমাজের অগ্রগতিতে নিজেকে সবরকম ভাবে কাজে লাগাতে পারে, সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করা নিদের্শেনার শিক্ষাগত কাজ। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রাক্ষোভিক সমস্যার সমাধানের সাহায্য করা এবং এই ধরনের সমস্যাগুলি যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করা নির্দেশনার দায়িত্ব।

(গ) শিক্ষায় নির্দেশনা মূলত তিনটি কাজ করে থাকে - প্রতিকার, প্রতিবিধান ও বিকাশ (Curative, Preventive and Development), তাই শুধুমাত্র সমস্যা গ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য নয়, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী যাতে সমস্যা পীড়িত না হয় বা হলেও নিজের সঙ্গো যাতে লড়াই করতে সক্ষম হয়, সেইভাবে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত, এছাড়া সকল শিক্ষার্থীকে জীবনের বিভিন্ন দিকে অভিযোজনে প্রয়োজনীয় তথ্য

সরবরাহ করা, প্রয়োজনীয় উপকরণের অনুসন্ধান নির্দেশনার কাজ।

(ঘ) শিক্ষাদান এবং নির্দেশনা পরস্পরের পরিপূরক, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সঠিক ভাবে বুঝতে শিক্ষককে সাহায্য করা এবং তার শিক্ষণ কার্যের উন্নতিতে তাঁকে উৎসাহদানের বিষয়টিও নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মনির্দেশনা (Self direction) এবং আত্মউপলব্ধি (Self-realisation) জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করা নির্দেশনার কাজ।

(ঙ) নির্দেশনার কেন্দ্রবিন্দু হল সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উপলব্ধি করার এবং তা নিয়ে কাজ করার সামর্থ্যের উন্নতি ঘটানো। নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত এবং পুঁথিবহির্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

(চ) বর্তমানে শিক্ষা ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীই প্রধান। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত পদ্ধতি এবং কৌশলের প্রচলন হয়েছে সেগুলি অনেক বেশি কার্যকরী ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কিভাবে নিজেদের সক্রিয় করে রাখতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করে নির্দেশনা।

(ছ) নির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম বা পেশায় তাকে জায়গা করে নিতে সহায়তা করা।

(জ) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির (Co-Curricular Activities) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ জীবন বিকাশে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। শিক্ষার্থী যাতে সৃজনমূলক কাজে ও সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে সেদিকে সহায়তা করে নির্দেশনা।

(ঝ) শিক্ষার নির্দেশনার আরেকটি দিক হল শিক্ষার্থী তার পেশা বা শিক্ষাক্রম বেছে নেবার পর সফলতা ও ব্যর্থতাকে অনুসরণ করা এবং প্রয়োজনে গবেষণামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নির্দেশনা দানকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা।

(ঞ) শিক্ষা নির্দেশনা ব্যক্তির সমস্ত রকম মনোভাব এবং আচরণ ধারার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে তার জীবনের সমস্ত কাজকর্মকে সুসংহত করতে সাহায্য করে।

উপসংহার (Conclusion):

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে উপদেশ দান থেকে শুরু করে, নিয়ন্ত্রিত কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে নির্দেশনার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। নির্দেশনা ছাড়া শিক্ষার্থী জীবন এবং ব্যক্তি জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। জীবন বিকাশের সমস্ত স্তরেই নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তৃতীয় একক

পরামর্শদান: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় পরামর্শদানের গুরুত্ব

(Counselling: Meaning, Types, Importance in Education)

ভূমিকা (Introduction):

পরামর্শদান বিষয়টি অতি প্রাচীন। প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন স্তরে সবসময়ই পরামর্শদান চলছে। পরিবারে পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের পরামর্শ দিচ্ছেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁর শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে পরামর্শদান হল নির্দেশনা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরামর্শদান মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতির উপর পরামর্শদান নির্ভরশীল। বর্তমান সমাজের সঙ্গে সংগতিবিধান করতে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই সমস্যার সমাধান করাই হল পরামর্শদানের প্রধান কাজ। 'Counselling' শব্দটি ইংরেজি 'to counsel' ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ হল পরামর্শ দেওয়া। পরামর্শদান এবং পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মানুষের একপ্রকারের মৌলিক চাহিদা। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরীর যুগে পরামর্শদানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষের চাহিদা চিহ্নিত করণের জন্য এবং সেগুলি পরিতৃপ্তির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে মানুষকে সাহায্য করার বিভিন্ন পদ্ধতি স্থির করার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অর্থ (Meaning):

পরামর্শদান হল একজন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে একজন সাহায্যপ্রার্থীকে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সহায়তাদানের প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে সুসংগঠিত নির্দেশনা কর্মসূচিতে সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত স্তরে সাহায্যদান প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে পরামর্শদান প্রক্রিয়া।

সংজ্ঞা (Definition):

পরামর্শদানের সংজ্ঞা বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

কার্ল রজার্স এর মতে, পরামর্শদান হল একটি ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করা হয়।

(Carl Rogers- Counselling is a series of direct contact with the individual which aims to offer him asistance in changing his attitude and behaviour.)

হেলন এবং ম্যাকবান বলেন, সমস্যা সংক্রান্ত কোনো ব্যক্তি যখন নিজ সমস্যা সমাধানে অক্ষম, সে যখন সব রকমের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন তাকেই পরামর্শদান প্রক্রিয়া বলে। (Haln and Macbane - Counselling is a process which takes place in a one to one relatioinship between an individual be set by problems with which he can not cope alone and a professional worker whose training and experience have qualified him to help others reach solutions to various types of personal dificulties.)

প্যাটারসন বলেছেন যে, পরামর্শদান হল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এক বিশেষ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কার্যক্রম বা একটি মানসিক পদ্ধতির জন্ম দেয় এবং পরামর্শগ্রহীতার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। (Patterson- An interpersonal process employing psychological methods aimed as improving the mental health of the counseller.)

ওয়েবস্টার অভিধান এ বলা হয়েছে, আলোচনা, পারস্পরিক মত বিনিময় এবং একত্রে কথা বলা হল পরামর্শদান।

(Webster's Dictionary - Counselling is consultation, mutul interchange of opinions, deliberating together.)

1953 সালে আমেরিকার একটি ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্ববিদদের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে পরামর্শদানের একটি সংজ্ঞা গৃহীত হয়। ওই সংজ্ঞাটি হল- পরামর্শদান এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া যেখানে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর একজনের সঙ্গে সামনাসামনি কথোপকথনের মাধ্যমে শেষোক্ত ব্যক্তিকে তার সমস্যা বুঝতে এবং সমাধানে সাহায্য করে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরামর্শদান হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে এক ব্যক্তি তার কোনো সমস্যা সমাধানে দ্বিতীয় এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেন। যিনি পরামর্শ দেন তিনি হলেন পরামর্শদাতা। যিনি পরামর্শ নেন তিনি হলেন পরামর্শগ্রহীতা। উভয়ের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক থাকবে।

পরামর্শদানের প্রকারভেদ (Types of Counselling) ঃ

পরামর্শদানের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শদানের তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করা যায় -

(ক) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান (Directive Counselling)

(খ) অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদান (Non-Directive Counselling)

(গ) ঐচ্ছিক পরামর্শদান (Eclectic Counselling)

(ক) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান:

যে পরামর্শদানে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতা অপেক্ষা তার সমস্যার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয় তাকে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান বলা হয়ে থাকে। এই পরামর্শদানের প্রবক্তা হলেন ই. জি. উইলিয়ামসন (E. G. Williamson) এটি প্রধানত পরামর্শদাতাকেন্দ্রিক। এরবাকল বলেন - প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের মাধ্যমে কীভাবে ব্যক্তি সমস্যা সমাধান করবে তা শিখতে সহায়তা করা হয়। (Arbuckle -That the directive people believe counselling to be a means of helping people how to learn to solve their own problems.)

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনে করেন যে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রারম্ভিক বাল্যকালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঐ স্তরের তীব্র প্রক্ষোভমূলক ধারণা যে গুলিকে মানসিক জট বলা হয়, সেগুলি অবদমিত হয়। ফ্রয়েডের বক্তব্য অনুযায়ী প্রাপ্তবয়সে ব্যক্তি যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি বাল্যকালের অবদমিত জটের ফল। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে ঐ মানসিক জটগুলিকে মনের গভীরে অচেতন স্তর থেকে চেতন মনে তুলে নিয়ে আসা হয়। তখন সেগুলি আর সমস্যা থাকেনা।

প্রত্যক্ষ পরামর্শ পদ্ধতি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সময়সাপেক্ষ। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এই পরামর্শদানের প্রক্রিয়া চালানো হয়। এই ধরনের পরামর্শদানের ক্ষেত্রে অভিজাত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতার প্রয়োজন হয়, কারণ পুরো পরামর্শদান বিষয়টি তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির স্তর: (Stages of Directive Counselling) ই. জি. উইলিয়ামসন (E. G. Williamson) এর মতে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান ছয়টি স্তরের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়। সেগুলি হল -

(১) বিশ্লেষণ (Analysis): শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়।

(২) সংশ্লেষণ (Synthesis): সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসারে সাজানো এবং সেগুলির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করা যাতে শিক্ষার্থীর সম্পদ, দুর্বলতা, সঙ্গতি সাধনের ক্ষেত্রে ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি চিত্র পাওয়া যায়।

(৩) সমস্যা নির্ণয় (Diagnosis): এই স্তরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যার কারণ নির্ণয় করা হয়। সমস্যার কারণ নির্ণয়ের দুটি স্তর আছে। প্রথমত, সমস্যার নির্দিষ্টকরণ অর্থাৎ কীভাবে সমস্যাটি সৃষ্টি হল তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। দ্বিতীয়ত, কারণ অনুসন্ধান করার পর শিক্ষার্থীর, অতীত ও বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা হয়। তারপর রোগের কারণ নির্ণয় করা হয়। এই কারণ নির্ণয়ে সমস্যার লক্ষণ বিবেচনা করা হয়।

(৪) পূর্বাভাস (Prognosis): সমস্যার প্রতিকার না হলে ভবিষ্যতে কী ধরনের রূপ নিতে পারে সেই সম্পর্কে আগাম অনুমান এই স্তরে করা হয়

(৫) পরামর্শপ্রদান (Counselling): সমস্যাটি প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে পরামর্শদাতা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

(৬) অনুসরণ করা (Follow up): সমস্যা দূর করে শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশের সঙ্গো সংগতিবিধানে

সহায্য করা এবং পরামর্শদাতা কর্তৃক নির্দেশিত পরামর্শগুলি পরামর্শগ্রহীতা সঠিকভাবে মেনে চলছে কিনা তা লক্ষ্য করা হয় কারণ পরামর্শগুলি দেওয়ার পরও যদি সমস্যাটি দূর করা না যায় তাহলে অন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার পর্যালোচনা করা হয়।

নিম্নে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়াটিকে চিত্রাকারে দেখানো হল :

পর্যায়ক্রমের সূচনা (Starting the Session)

↓

(১) বিশ্লেষণ (Analysis)

↓

(২) সংশ্লেষণ (Synthesis)

↘

(৩) সমস্যা নির্ণয় (Diagnosis)

↗

(৪) পূর্বাভাষ (Prognosis)

↑

(৫) পরামর্শপ্রদান (Counselling)

↑

(৬) অনুসরণ করা (Follow Up)

চিত্র : পরামর্শদান-এর প্রক্রিয়া

প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Directive Counselling) : প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

(১) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা হয়। পরামর্শদাতা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে পরামর্শগ্রহীতার সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকেন।

(২) পরামর্শদাতা এখানে পরামর্শ গ্রহীতার প্রতিক্রিয়ার অনুভূতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রন অপেক্ষা বৌদ্ধিক দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

(৩) পরামর্শগ্রহীতার সমস্যা নির্ণয় করার জন্য পরামর্শদাতা বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ব্যবহার করে থাকেন যাতে সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে থাকে।

(৪) অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতাই পরামর্শগ্রহীতার সমস্যা চিহ্নিত করণে উপযুক্ত ব্যক্তি। পরামর্শদান ক্রিয়াটি তাঁর তত্ত্বাবধানেই হয়ে থাকে।

(৫) প্রত্যক্ষ পরামর্শ দান পদ্ধতিতে পরামর্শদাতাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকেন এবং তিনিই সমস্যা সমাধানে পথ নির্দেশ করে থাকেন।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Directive Counselling):

(১) এই পদ্ধতিতে পরামর্শদাতার ভূমিকা মুখ্য হওয়ার ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন– পরামর্শদাতার গ্রহণযোগ্যতা, অন্ধ অনুসরণ না করার প্রবণতা ইত্যাদি।

(২) এই পদ্ধতিতে পরামর্শগ্রহীতার অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি বিষয়গুলি উপেক্ষিত থাকে বলে পরামর্শগ্রহীতা পরামর্শদাতার সাথে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে।

(৩) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতিতে পরামর্শদাতার অভিজ্ঞতার ভিত্তি দুর্বল হলে সমগ্র প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

(খ) অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদান:

অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Non-directive Counselling. বর্তমানে এই পদ্ধতিকে Client-centred Counselling বলা হয়। এই ধরনের পরামর্শদান কৌশলের মূল প্রবক্তা হলেন কার্ল আর রজার্স (Carl Rogers) এই ধরনের পরামর্শদানে কেন্দ্রবিন্দু হলেন পরামর্শগ্রহীতা। এই পরামর্শদান কৌশলে বলা হয়েছে ব্যক্তি তার জগৎকে নিজের মতো করে দেখে। এই দেখা অবচেতন মনে প্রতীক (Symbol) -এর মাধ্যমে নিজেদের মতো করে অবস্থান করে কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে। বাস্তবের কোনো পরিস্থিতি ব্যক্তির দৃশ্যমান মনের অবচেতন অংশ থেকে ঠেলে চেতন অংশে নিয়ে আসে এবং ব্যক্তিকে সক্রিয় হতে বাধ্য করে। এই সক্রিয়তার ফলেই ব্যক্তি সমস্যামুক্ত হয়। এই ধরনের পরামর্শদানে কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধান নয়। বরং ব্যক্তিকে স্বাধীনতাদান এবং তার মানসিক জগৎকে সুসংহত করাই এই পদ্ধতির লক্ষ্য। বৌদ্ধিক দিক অপেক্ষা প্রক্ষোভমূলক দিকের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় এই ধরনের পরামর্শদানের ক্ষেত্রে।

অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের বিভিন্ন স্তর (Stages of Non- directive Counselling): কার্ল রজার্স এর মতানুযায়ী অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়া সাতটি স্তরের ম্যধ্যমে সম্পন্ন হয় -

প্রথমস্তর: এই স্তরে পরামর্শগ্রহীতা তার কোনো সমস্যা আছে বলে স্বীকার করতে চান না। সেই জন্য কোনো পরামর্শদাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। পরামর্শগ্রহীতার ব্যক্তিগত গঠন ও অনমনীয় প্রকৃতির হয়। পরামর্শদাতা কেবল বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়স্তর: এই স্তরে পরামর্শগ্রহীতা নিজের সমস্যা আছে বলে স্বীকার করে এবং তার কিছু বিষয় সম্পর্কে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে থাকে। পরামর্শগ্রহীতা নিজের সমস্যা সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত দায় করতে অস্বীকার করে তবে তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলি নমনীয় হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতার বিভিন্ন অনুভূতি সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেণ। ফলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আন্তরিক হয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্তর থেকেই চিকিৎসা শুরু হয়।

তৃতীয়স্তর: এই স্তরে পরামর্শগ্রহীতা নিজের ব্যক্তিগত বিষয়গুলি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করে ফলে চিকিৎসার কাজ সহজ হয়। তবে পরামর্শগ্রহীতা তার বর্তমান বিষয়গুলি প্রকাশ করে না, কিন্তু অতীতের কথাগুলি প্রকাশ

করে। এক্ষেত্রে পরামর্শদাতার মধ্যেই কিছু জড়তা দেখা দেয়। পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতার অতীতের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেন এবং নিঃসকোচে যাতে সে তার সমস্ত কিছু করতে পারে সে বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করেন।

চতুর্থস্তর: এই স্তরে বর্তমান অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করার মানসিকতা পরামর্শ গ্রহীতার মধ্যে দেখা যায়। অতীতের গোপন ও সংবেদনশীল অনুভূতিগুলি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আর কোন দ্বিধা থাকে না। তবে এই স্তরে পরামর্শগ্রহীতা পরামর্শদাতাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনা।

পঞ্চমস্তর: এই স্তরে পরামর্শগ্রহীতা স্বাধীনভাবে তার অনুভূতিগুলি প্রকাশ করে থাকে। সে নিজের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয় ও তা সমাধান করতে উদ্যোগী হয়। এই ব্যাপারে সে পরামর্শদাতার সাহায্য চায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরামর্শদাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে উদ্যোগী হয়। পরামর্শদাতা ও অত্যন্ত কৌশলপূর্বক কীভাবে তার সমস্যাগুলি সমাধান করা যেতে পারে সে ব্যাপারে আলাপ- আলোচনা শুরু করেন।

ষষ্ঠস্তর: এই স্তরে পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পরামর্শগ্রহীতা যে অভিজ্ঞতাগুলি লাভ করেছে সেগুলি নিজের উপর প্রয়োগ করতে শুরু করে।

সপ্তমস্তর: সর্বশেষ স্তরে এসে পরামর্শগ্রহীতার সমস্যাটি যদি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হয় তবে বিভিন্ন উপায়ে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে সেগুলি সে নিজের উপর প্রয়োগ করে। এই ভাবে ধীরে ধীরে পরামর্শগ্রহীতা তার সমস্যাগুলি সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠেন এবং পরামর্শদাতা পরামর্শদান প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিম্নে অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়াটিকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

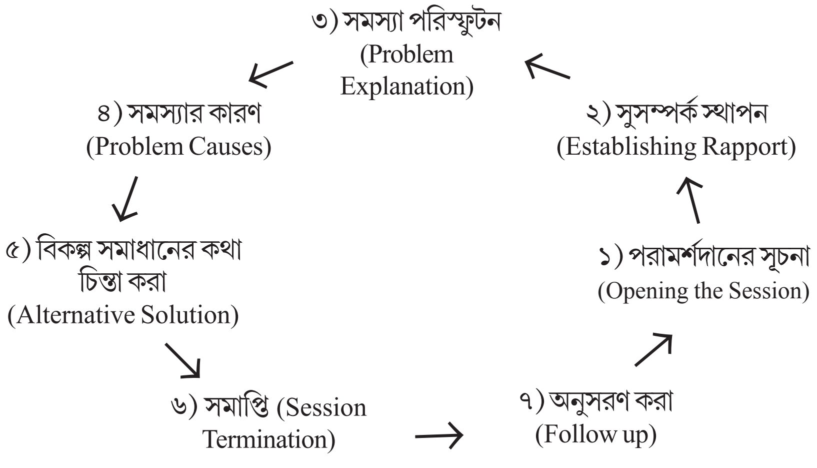

চিত্র : অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়া

অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Non-directive counselling):

(১) অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতিতে ব্যক্তির সমস্যা অপেক্ষা ব্যক্তির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতাকে তার বক্তব্য প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। অত্যন্ত খোলামেলাভাবে বক্তব্য প্রকাশ করার কারণে পরামর্শগ্রহীতা তার মানসিক জট থেকে বহুলাংশে মুক্ত হন।

(৩) এখানে পরামর্শগ্রহীতা নিজেই নিজের সমস্যা বুঝতে পারেন এবং সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন।

(৪) এই পদ্ধতিতে পরামর্শদাতার কাজ হল উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা যাতে পরামর্শগ্রহীতা নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে এবং নিজ ইচ্ছায় কাজ করতে পারে।

(৫) পরামর্শদাতা এখানে পরামর্শগ্রহীতাকে এমন ভাবে উৎসাহিত করেন যাতে ব্যক্তি সব কথা নিজ উদ্যোগে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেন।

(৬) এই প্রকার পরামর্শদানে পরামর্শগ্রহীতার বক্তব্যের মধ্যে যে আবেগের সঞ্চার হয় তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৭) পরামর্শগ্রহীতা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শদাতার সাহায্য নিলেও চরম সিদ্ধান্ত পরামর্শগ্রহীতা নিজেই নিয়ে থাকেন। বলা যেতে পারে, এই পদ্ধতি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কারণ প্রত্যেক পরামর্শগ্রহীতা তার নিজের ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে আবেগ ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাছাড়া মনস্তত্বের গভীর জ্ঞান না থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

অ-প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Non-directive Counselling):

(১) অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা তার আবেগ ও অনুভূতিকে জাগ্রত করা হয় প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে পরামর্শদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য পরামর্শদাতার মনস্তত্ত্বের উপর গভীর জ্ঞান না থাকলে এই পদ্ধতিকে বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

(৩) এই পদ্ধতিতে পরামর্শদান প্রক্রিয়া চলার সময় পরামর্শদাতার ব্যক্তিগত প্রভাব এড়ানো যায় না।

(গ) ঐচ্ছিক পরামর্শদান (Eclectic Counselling):

Eclectic কথাটির অর্থ হল দুই তার বেশি পদ্ধতির সমন্বয়, যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজ সহজতর হয়। Eclectic Counselling এর আক্ষরিক অর্থ হল বিভিন্ন ধরনের পরামর্শদান পদ্ধতির সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা। মনস্তাত্ত্বিক বোর্ডিন (Bordin) মনে করেন যে, ব্যক্তির সমস্যা কার্যকরীভাবে সমাধান করতে হলে পূর্বের দুটো পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। যখন কোনো পরামর্শদাতা ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত প্রত্যক্ষ এবং অ-প্রত্যক্ষ দুটি কৌশলই প্রয়োগ করেন তখনই তা ঐচ্ছিক পরামর্শ দান।

ঐচ্ছিক পরামর্শদানের অন্যতম প্রবক্তা থর্ণ (Thorne) মনে করেন যে, পরামর্শদাতা একই সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষ এবং কৌশলগুলিকে একটির পর একটি প্রয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে পরামর্শগ্রহীতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি নিজেই তার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরামর্শদাতাকে উৎসাহিত করেন। ঐচ্ছিক পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা প্রথম ব্যক্তির চাহিদা এবং ব্যক্তির অনুশীলন করেন। পরামর্শগ্রহীতার সর্বাত্মক বিবরণী পত্র (Cumulative Record Card) এবং তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য উপায়গুলি পর্যালোচনা করার পর পরামর্শদাতা স্থির করেন যে, পরামর্শদানের ক্ষেত্রে তিনি কি কৌশল অবলম্বন করবেন। তিনি প্রত্যক্ষকৌশল দিয়ে শুরু করতে পারেন কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শদাতা অপ্রত্যক্ষ কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। তবে কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে, তার চেয়ে অধিক গুরত্বপূর্ণ হল কতখানি দক্ষতার সঙ্গে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হল।

ঐচ্ছিক পরামর্শদানের পর্যায় (Stages of Eclectic Counselling): ঐচ্ছিক পরামর্শদান নিম্নলিখিত পর্যায়গুলি অতিক্রম করে -

(১) পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(২) প্রথমদিকে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতার সংগঠিত সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকেন। কখনও কখনও শিক্ষার্থীর পূর্ব সংগ্রহ করে সমস্যার সম্ভাব্য প্রকৃতি নির্ণয় করা হয় এবং পরামর্শদানের পরিকল্পনা রচনা করা হয়।

(৩) পরামর্শগ্রহীতার উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তার সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি তার সামনে তুলে ধরা হয়।

(৪) পরামর্শদাতা প্রয়োজনমত পরামর্শগ্রহীতার শিক্ষা সম্পর্কিত, বৃত্তি সম্পর্কিত এবং সামাজিক তথ্য সরবরাহ করে থাকেন।

(৫) ঐ সমস্ত তথ্য অনুধাবন করার পর পরামর্শগ্রহীতা আবেগ মুক্তি হয়, তার নিজের সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়।

(৬) শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরামর্শ গ্রহীতার আচরণধারায় পরিবর্তন এনে তার সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।

সবশেষে বলা যায় যে, ঐচ্ছিক পরামর্শদান প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতিতে ব্যক্তির সমস্যা দূর হল তা বিবেচ্য নয়। ঐচ্ছিক বা Eclectic পদ্ধতি একটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি।

ঐচ্ছিক পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Eclectic Counselling): ঐচ্ছিক পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল -

(১) ঐচ্ছিক পরামর্শদানের ক্ষেত্রে যে কৌশলের ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে পরামর্শদাতা এবং পরামর্শগ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কৌশলের ন্যায্যতা যাচাই করা হয়।

(২) ঐচ্ছিক পরামর্শদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর নমনীয়তা। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এক্ষেত্রে এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে যাওয়া সম্ভব হয়।

(৩) ঐচ্ছিক পরামর্শদানের পরামর্শদাতা এবং পরামর্শগ্রহীতা উভয়ের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে এবং পছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে।

(৪) এখানে পরামর্শগ্রহীতার সুবিধা বা অসুবিধার ভিত্তিতে পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানো হয়।

(৫) স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, বোঝাপড়া, সুস্থ সম্পর্কই হল পরামর্শদানের মূল ভিত্তি।

(৬) ঐচ্ছিক পরামর্শদানের ক্ষেত্রে যেহেতু পরামর্শগ্রহীতা নিজের সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানতে পারে, সে জন্য ব্যক্তি বৌদ্ধিক এবং প্রাক্ষোভিক সংগঠনের মধ্যে সঞ্জাতিবিধান করতে সক্ষম হয়।

ঐচ্ছিক পরামর্শদানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Eclectic Counselling):

১) ঐচ্ছিক পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শগ্রহীতা নিজেই যখন নিজের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমস্যা সমাধান করতে সচেতন হয় সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ নাও সৃষ্টি হতে পারে। কারণ নিজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা অনেক সময় দেখা যায় না।

২) ঐচ্ছিক পরামর্শদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরামর্শগ্রহীতা নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সমস্যা সমাদানের সঠিক পথ বেছে নিতে পারেন না।

৩) পরামর্শগ্রহীতার সুবিধা ও অসুবিধার ভিত্তিতে পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে সঠিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া সর্বদা সহজসাধ্য হয় না।

৪) পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের সময় পরামর্শগ্রহীতা পুরোপুরি আবেগ মুক্ত নাও হতে পারে।

এছাড়া প্রক্রিয়াগত পার্থক্যের ভিত্তিতে পরামর্শদানকে আরোও দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে -

(অ) ব্যক্তিগত পরামর্শদান (Individual Counselling).

(আ) দলগত পরামর্শদান (Group Counselling).

(অ) ব্যক্তিগত পরামর্শদান (Individual Counselling):

কোনো ব্যক্তিকে যখন একক ভাবে পরামর্শ দেওয়া হয় তখন তাকে বলে ব্যক্তিগত পরামর্শদান। অনেক সময় সমস্যার কারণ ও পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তার প্রতিফলন হয় বিভিন্নভাবে। তাই সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সমাধান হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তিগত পরামর্শদান কাজটি সম্পন্ন হয় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। সাক্ষাৎকারে প্রধানত আলোচনা, মতবিনিময়, চিন্তাভাবনা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি চলে। ব্যক্তিগত পরামর্শদানের প্রয়োজনে সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সাধারণত: ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যা, ব্যক্তিগত পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- শিক্ষাগত, শৃঙ্খলামূলক, অর্থনৈতিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার সমন্বিত পরামর্শদানের শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন-

(১) পরিচিতিমূলক সাক্ষাৎকার (Introductory Interview) : শিক্ষার্থী বা সমস্যা পীড়িত ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম সাক্ষৎকারটি সাধারণত: উভয়ের সঙ্গে উভয়ের পরিচিতির জন্য এবং সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়। পরিচিতিমূলক সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য হল পরামর্শদাতা এবং পরামর্শগ্রহীতার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা, মতবিনিময় করা, পরামর্শগ্রহীতার আস্থা অর্জন করা। এই ধরনের সাক্ষাৎকার সাধারণত 10-15 মিনিট কাল স্থায়ী হয়। এই সাক্ষাৎকারের ফলে পরামর্শগ্রহীতা অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, পরামর্শদাতার জ্ঞান, দক্ষতা, আগ্রহের প্রতি বিশ্বাস জন্মায় এবং পরামর্শগ্রহীতা তার বিভিন্ন সমস্যা এবং আবেগের বহি:প্রকাশ ঘটানোর স্বাধীনতা লাভ করে।

(২) তথ্য নির্ণয়মূলক সাক্ষাৎকার (Fact Finding Interview) : এই ধরণের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পরিস্থিতির প্রতি পরামর্শগ্রহীতার মনোভাবের তীব্রতা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তির অপ্রকাশিত আগ্রহও প্রকাশ পায়। সঙ্গে পরামর্শদাতা ঐ সমস্ত আগ্রহের উৎস এবং ক্ষমতাও জানতে পারে।

(৩) তথ্যমূলক সাক্ষাৎকার (Informative Interview) : এই ধরনের সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি পরামর্শগ্রহীতাকে জানানো এবং তার সম্পর্কে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাও ব্যক্তিকে জানানো হয়।

(৪) চিকিৎসামূলক সাক্ষাৎকার (Treatment Interview) : এই ধরনের সাক্ষাৎকারে পরামর্শগ্রহীতার কাছ থেকে তার অতীত, তার ইচ্ছা, ভয়, তার আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে এই ধরনের খোলামেলা আলোচনার ফলে ব্যক্তির চিন্তায় স্বচ্ছতা আসে এবং চাপা উত্তেজনা থেকেও মুক্ত হয়। এক্ষেত্রে পরামর্শগ্রহীতাকে স্বাধীনভাবে বক্তব্য রাখার এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। যখন সমস্যাপীড়িত ব্যক্তিকে অন্য একজন ধৈর্যবান শ্রোতার কাছে ইচ্ছামত নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয় তখন ব্যক্তির সমস্যা সম্পর্কে অনেক তথ্যই প্রকাশ পায়।

(আ) দলগত পরামর্শ দান (Group Counselling):

বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজবিদগণ মনে করেন যে, দলের একটি নিজস্বসত্তা আছে এবং মানব জীবনে এমন অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান দলগত ভাবেই সম্ভব। যখন পরিস্থিতি এমন দেখা যায় যে, কোনো একটি দল যেমন শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে বা কোনো খেলোয়াড় দল একত্রে সামগ্রিকভাবে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পরামর্শদাতার সাহায্য গ্রহণ করছেন তখন তাকে দলগত পরামর্শদানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কী ধরনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চল গঠন হবে তা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। কারও মতে বয়সের ভিত্তিতে, কারও মতে লিঙ্গাভেদে, আবার কারও মতে সমস্যার ভিত্তিতে দল গঠন হওয়া প্রায়োজন। তবে বলা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্যার ভিত্তিতে দল গঠন হলে দলগত পরামর্শদান অধিক কার্যকরী হয়। শিক্ষার্থী দলগত পরামর্শদানের কাজকর্মে যোগ দেওয়ার পরও কোনো বিষয়ে জানতে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে

পারে। শিক্ষার্থীকে কিভাবে সাহায্য প্রদান করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শদাতাকে সাহায্য করতে অথবা দলগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কাদের সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারবে ইত্যাদি বিষয় জানতে, দলগত পরামর্শদানে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি বিষয়ে জানতে অনেক সময় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, দলগত পরামর্শদানের মূল বৈশিষ্ট্য হল অভিজ্ঞতা।

শিক্ষায় পরামর্শদানের গুরুত্ব (Importance of Counselling in Education) :

পরামর্শদান প্রক্রিয়া হল একটি সৃজনাত্মক প্রক্রিয়া। পরামর্শদান হল আলাপ-আলোচনা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার মধ্যে একটি সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে সাহায্য দানের প্রক্রিয়া। প্রকৃত পক্ষে পরামর্শদাতা, পরামর্শগ্রহীতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন এবং পরামর্শগ্রহীতার সামনে উপস্থিত করে। পরামর্শগ্রহীতা ঐ সব তথ্যের ভিত্তিতে নিজেকে ভালোভাবে জানতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে শিক্ষা হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষা, শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে, শিক্ষায় পরামর্শদানের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

(১) শিক্ষণ (Teaching) এবং শিক্ষাদান (Instruction) এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এই দুই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হল শিখন। শিক্ষাদান ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হলেও তা শিক্ষর্থীর কাছে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। কিন্তু পরামর্শদানের বিষয়টি তা নয়।

পরামর্শগ্রহীতা পরামর্শদাতার পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্যাবলি চূড়ান্ত লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গিন বিকাশ সাধন হলেও মূল লক্ষ্য থাকে বিষয় কেন্দ্রিক। তাই শিক্ষাদান কর্মসূচীর সাথে পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচিও থাকে। কিন্তু পরামর্শদান প্রক্রিয়া হল পরামর্শগ্রহীতার ধারাবাহিক আত্মমূল্যায়ন এবং পরামর্শদাতা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই বিষয়ে তাকে সাহায্য করেন।

(২) শিক্ষাদান কর্মসূচি সংগঠিত হয়ে থাকে অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচিত তথ্য, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষের দলগত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শগ্রহীতার চাহিদা এবং সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাই শিক্ষাদান কৌশলকে কাজে লাগিয়ে পরামর্শদান প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করা হয়।

(৩) শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং পরামর্শদান প্রক্রিয়া এই দুইয়ের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষাদান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যখন শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র কিছু জ্ঞান, দক্ষতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় - শিক্ষা প্রক্রিয়া তখন অনেক বেশি সামগ্রিক প্রকৃতির হয়। শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে। এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে পরামর্শদান কর্মসূচি হল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(৪) শিক্ষাপ্রক্রিয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় পরামর্শদান কর্মসূচির উপর নির্ভর করতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সম্পর্কে বাস্তব সম্মত ধারণা তৈরি করতে পারে এবং তাদের সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, সেই লক্ষ্যেই পরামর্শদান কাজ করে। কাজেই বলা যায় পরামর্শদানের দর্শন হল

শিক্ষাদানের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ এবং পরামর্শদান কর্মসূচি হল শিক্ষামূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র।

(৫) পরামর্শদান কর্মসূচি শিক্ষার্থীকে তার নিজের সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে। এই সাহায্যদানের কাজ মূলত ব্যক্তিগতভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে চলে।

(৬) শিক্ষার আধুনিক ধারার কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রেও পরামর্শদান মূলক কর্মসূচি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। যেমন- জ্ঞানের মানবিকীকরণ (Humanization of Knowledge), তত্ত্বমূলক গবেষণার ব্যবহারিক প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। পরামর্শদানের ক্ষেত্রে মূলত মানব প্রকৃতি, মানব আচরণের গতিশীলতা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

(৭) ব্যাপক অর্থে পরামর্শদান প্রক্রিয়া হল বিশেষ ধরনের শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, ধ্যান-ধারণা, আদর্শকে যত্ন সহকারে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যক্তির পরামর্শদানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা হয়। তাই সব ধরনের পরামর্শদান কোনো না কোনো ভাবে শিক্ষা।

(৮) শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা পরামর্শদানের শিক্ষাগত দিক। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় থেকে সঠিক বিষয় নির্বাচন করা, পাঠদান পদ্ধতি নিরূপন করা, বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীরা কিভাবে সঙ্গতিবিধানে সক্ষম হবে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরামর্শদান প্রক্রিয়া সহায়তা করে থাকে।

(৯) শিক্ষার্থীর পেশাগত ক্ষেত্রে তার চাহিদা, আগ্রহ, ক্ষমতা অনুযায়ী পেশানির্বাচনে ও সাহায্য করা পেশাগত পরামর্শদান প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

(১০) পরামর্শদান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থী প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু ভুল আচরণ করে যা একবার সংশোধন করলেও আবার সংগঠিত হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীর আচরণ সংশোধনের জন্য পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারূপে গণ্য করা হয়।

উপসংহার (Conclusion):

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে পরামর্শদানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত, বৃত্তিসংক্রান্ত সমস্যাবলির ওপর আলোকপাত করা হয় তেমনি শিক্ষার্থীর সামাজিক, ব্যক্তিগত ও প্রাক্ষোভিক সমস্যাবলির ওপর জোড় দেওয়া হয় অর্থাৎ যেখানেই শিক্ষার্থীর পরিচর্যা ও সাহায্যের প্রয়োজন, নিজেকে ভালোভাবে বোঝার জন্য, আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য এবং বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আনার জন্য পরামর্শদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। পরামর্শদান প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া পরামর্শদান শিক্ষার্থীর আত্মোপলব্ধি এবং আত্মপরিচালনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। শিক্ষার্থী যাতে পরিবেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তারজন্য শিক্ষার্থী অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো হয় পরামর্শদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এককথায় পরামর্শদান প্রক্রিয়াকে সংগঠিত শিখন পরিস্থিতি বলা যেতে পারে।

চতুর্থ একক

অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ: অর্থ, কারণসমূহ, প্রকারভেদ (শ্রেণী থেকে পালানো, মিথ্যে ভাষণ, ভীরুতা, চুরি করা, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা) -এর প্রতিরোধের উপায়সমূহ

(Maladjusted Behaviour: Meaning, Causes, Types-Truancy, Lying, Timidity, Anxiety, Depression and Their Remedial Measures)

ভূমিকা (Introduction):

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের চাহিদা থাকে। জন্মাবস্থায় প্রত্যেক শিশু বেশ কিছু চাহিদা নিয়েই জন্মায়। খাদ্যের চাহিদা এর মধ্যে একটি। চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি না ঘটলে শিশুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তবে আরোও কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, এগুলি হল মানসিক চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদা। মানসিক চাহিদাগুলি শিশুর নিজস্ব; যেমন- নিরাপত্তার চাহিদা, ভালোবাসার চাহিদা, কৌতূহলের চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তি সত্তার সুষ্ঠ বিকাশ নির্ভর করে। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক চাহিদা; যেমন- আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, দলভুক্ত হওয়ার চাহিদা প্রভৃতি। এই সব চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তি ঘটলে তবেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথাযথ হবে। সে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গাতি সাধনে সমর্থ হবে।

তাই বলা যায়, ব্যক্তির সঙ্গাতি সাধনের মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চাহিদার পরিতৃপ্তি। কোনো কারণে যদি ব্যক্তি এইসব চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন না করতে পারে তাহলে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি নানা ধরনের আচরণ সম্পাদন করে। একে বলে অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ (Maladjusted Behaviour)। সুতরাং বলা যায় ব্যক্তির কোনো না কোনো চাহিদার অপরিতৃপ্তির ফলেই অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা যায়।

অর্থ (Meaning):

অপসঙ্গাতি হল ব্যক্তির মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তির কারণ। চাহিদা যথাযথ ভাবে পরিপূরণ না হলে ব্যক্তি মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তারই বহি:প্রকাশ হল অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ। এই ধরনের আচরণ কেবল মাত্র অন্যের কাজে, বাধা সৃষ্টি করেনা, নিজের অগ্রগতিতেও বাধার সৃষ্টি করে। কাজেই বলা যায়, অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ হল এমন এক ধরনের আচরণ যেখানে ব্যক্তির চাহিদাগুলি চরিতার্থ হয়নি, ফলস্বরূপ ব্যক্তি নিজের সাথে, পরিবেশের সাথে, পরিবেশের সাথে অভিযোজনে সক্ষম হয়নি অর্থাৎ পরিবেশের চাহিদার সঙ্গে সঠিক প্রতিক্রিয়া করতে না পারলে অপসংঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা দেয়। আবার, যখন কোনো শিশুর আচরণ সমাজের নির্ধারিত আচরণ থেকে আলাদা হয় তখন সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে সেই আচরণ গ্রহণযোগ্য হয় না। সেগুলিকে বলা হয় অপসঙ্গাতিকে বলা হয়, অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ। অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের ধারণা

আরও স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী যারা এই বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের প্রদত্ত কিছু সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) এইচ. ডব্লিউ বার্নাড (H. W. Bernard) -এর মতে, অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ নির্ভর করে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের উপায় এবং কীভাবে তা পূরণ হচ্ছে তার উপর।

(২) উইলসন এবং মিলার (Willson and Miller) -এর মতে, অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ হল এমন এক আচরণ বিধি যা ব্যক্তিকে সমাজের বিরুদ্ধাচারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই আচরণের মূলে আছে ব্যক্তির চাহিদা তৃপ্তির অভাব।

(৩) ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) -এর মতে, যে আচরণের দ্বারা ব্যক্তির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং চাহিদার অতৃপ্তি ঘটতে দেখা যায় তাই হল অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ।

কারণসমূহ ঃ (Causes):

সাধারনত চাহিদার অতৃপ্তিতে মানসিক অপসঙ্গাতি এলেও মনোবিদরা আচরণমূলক অপসঙ্গাতির জন্য বিশেষ কতগুলি কারণ নির্দেশ করেছেন। এই সমস্ত কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি হল :

(ক) অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict):

সব ধরনের অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের মূলে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করে। ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধী মানসিক ইচ্ছার সঙ্গো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংঘাত তৈরি হয়। এই সংঘাত এবং সামাজিক নিয়মকানুনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ব্যক্তি এমন অনেক আচরণ করে যা সম্পূর্ণভাবে অসামাজিকও নয় আবার তাকে সামাজিক আচরণও বলা যায় না। এই মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা যদি সুষ্ঠভাবে ব্যক্তি করতে না পারে, তাহলে তার মধ্যে নানারকম অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

ব্যক্তি জীবনে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ভাবেই আসে। দ্বন্দ্ব মাত্রই অস্বাভাবিক নয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গো দ্বন্দ্ব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ব্যক্তি যখন সকলের সঙ্গো মেলামেশার সুযোগ পায় এবং অন্যের সান্নিধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য, পরিবেশ এবং অন্যসত্তা (Other Selves) সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব ভেদ করা বা সমাধানের উপর ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো সমস্যার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর দ্বন্দ্ব নির্ভর করে। যৌবনাগমে (Adolesence) শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক স্তরে যে বিপুল পরিবর্তন আসে তার সঙ্গো শৈশবের মিল নেই। যৌবনাগমে যে বিচিত্র মানসিক সংঘাত ও চাহিদার বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীর জীবনে চলে তার সংগতি সাধন সহজ নয়। শিক্ষার্থীদের এই ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব অবদমিত হলে তার আচরণকে অপসংগতিপূর্ণ করে এবং অস্বাস্থ্যকর মনোভাব সৃষ্টি করে।

(খ) নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব (Sense of Insecurity):

শিক্ষার্থীর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব একবার জাগ্রত হলে তাকে অপসঙ্গাতিশীল করে তোলে, এবং শিক্ষার্থী নানা অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ করে থাকে। কোনো কারণে শৈশব অবস্থায় শিশু যদি মনে করে

যে, সে অবহেলিত বা অবাঞ্ছিত তাহলে তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার ভাব জন্মায়। এর ফলে সে দুর্বল, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একটি অহেতুক ভয় কাজ করে। সবক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সকল কাজকর্ম ঘটছে বলে মনে করে। গৃহে, বিদ্যালয়ে, সামাজিক পরিবেশে এই ধরনের মানসিকতা দ্বারা পীড়িত শিশু নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে থাকে। কোনো উদ্যম, নতুন প্রচেষ্টা বা সমালোচনার ভয়ে শিশু নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়। সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। সবসময় উৎকণ্ঠা বোধ থাকে যে পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা দিতে পারছেনা। ফলস্বরূপ শিশু নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে।

অতি শৈশবে এই নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি স্বাভাবিক। মাতাপিতা শিশুকে তাদের স্নেহ, মমতা, চাহিদা, আবদার প্রভৃতি দ্বারা নিরাপত্তা জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু যেখানে মাতাপিতা এবং অন্যান্য পরিজন দ্বারা শিশু অবহেলিত হয়, তার মৌলিক চাহিদাগুলি অপরিতৃপ্ত থাকে সেখানে শিশু নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করবেই।

(গ) আক্রমণাত্মক মনোভাব (Sense of Hostility):

অপসঙ্গতিমূলক আচরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল আক্রমণাত্মক মনোভাব। এই মনোভাব ব্যক্তির চেতন বা অবচেতন মনে সৃষ্টি হতে পারে। নানা ধরনের মনোবিকার থেকে আক্রমণমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা যায়, মাতাপিতার পক্ষপাতমূলক আচরণ, অতিরিক্ত শাসন, অবহেলা শিশুকে আক্রমণধর্মী করে তোলে। আবার সমাজের নানা ধরনের বিরূপ অভিজ্ঞতার ফলে শিশুর মধ্যে কখনও কখনও আক্রমণাত্মক মনোভাবের বিকাশ হতে পারে। এই মনোভাবের ফলে কি কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে শিশু সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। ফলে তার ভেতর উদ্ভূত অসামাজিক আচরণগুলিকে অবদমন করার চেষ্টা করে। এর ফলে শিশু বা ব্যক্তির মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এইরূপ দ্বন্দ্ব ব্যক্তির মধ্যে নানা ধরনের অপসঙ্গতি মূলক আচরণের জন্ম দেয়।

শৈশবে শিশুর আচরণে উদ্দামতা, তার মনে স্পর্শকাতরতা কিছুটা নিরাপত্তাহীনতা বোধ থাকা স্বাভাবিক। এমন অনেক মাতাপিতা থেকে থাকেন যারা সংযম ও শৃঙ্খলার নামে শিশুসুলভ আচরণে বাধা সৃষ্টি করেন। তারা খেলাধুলা, কাজকর্মকে অহেতুক সমালোচনা ও তিরস্কারের দ্বারা সীমিত রাখার চেষ্টা করেন। এইসব স্নেহপ্রার্থী স্পর্শকাতর শিশুদের কাজের বিরূপ সমালোচনা, তাদের আবদার, চাহিদার উপেক্ষা করলে শিশু মনে আক্রমণধর্মিতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(ঘ) অপরাধবোধ (Sense of Guilt):

অপসঙ্গতিমূলক আচরণের আরেকটি কারণ হল অপরাধবোধ। অনেক সময় শিশু তার নিজের অজান্তে এমন কিছু অসামাজিক আচরণ সম্পাদন করে ফেলে যে যার ফলে তার মধ্যে অপরাধবোধ জন্ম নেয়। এই অনুভূতির জন্য সে সবসময় সংকুচিত থাকে এবং কোনো কাজই আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পাদন করতে পারে না। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসাবে শিশু মিথ্যা কথা বলে। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়। সেগুলি অপসংগতিমূলক আচরণ হিসাবে পরিগণিত হয়।

অপরাধবোধ থেকে অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জন্মায়। নিজের ব্যক্তিত্বকে নিম্নস্তরের ভেবে ব্যক্তি নিজেকে দোষী মনে করে। ফলে আত্মগ্লানি, অহেতুক আত্মনিন্দার প্রবণতা দেখা দেয়। ব্যক্তি

নিজেকে অনেক সময় এতটাই অপরাধী মনে করে যে, সে আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতি পেতে চায়। আধুনিক মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, যৌনতাবোধকে ঘিরে অপরাধবোধ ব্যক্তি চরিত্রে দেখা দেয়। অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে শিশুর যৌন কৌতূহলকে প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যৌন কৌতূহল সমাজ অনুমোদিতভাবে পরিতৃপ্ত না হয়ে গোপনে প্রকাশিত হতে থাকে। সংস্কার, সামাজিক অনুশাসনে, যৌনশিক্ষা পাঠ্যক্রমে স্থান না পাওয়ার ফলে এই যৌন বিষয়ক কোনো ব্যক্তির ভুল শিশুর মধ্যে অপরাধবোধকে বাড়িয়ে তোলে।

(ঙ) হতাশা (Frustration):

অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের আর একটি কারণ হল হতাশা। সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা গুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ব্যক্তি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ লক্ষ্য পূরণের পথে যখন বাধা আসে তখন মনের যে নিরাশা দেখা দেয় তাকেই হতাশা বলা হয়। চাহিদাপূরণ বাধাপ্রাপ্ত হলেই হতাশার আবির্ভাব ঘটে। এটি এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা যার ফলে আত্মমর্যাদা বোধ এবং আত্মপ্রত্যয় এর অভাব ঘটে। এই হতাশার কারণে ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যা অস্বাভাবিক আচরণ নির্দেশ করে। হীনমন্যতা বোধের ফলে এরা নিজেদের দোষ-ত্রুটিকেই বড় করে দেখে এবং সমালোচনার ভয় পায়।

ব্যক্তির মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হলে এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বাস্তবকে মেনে নিয়ে কোনো লক্ষ্য পূরণে বাধা এলে সহজ লক্ষ্য স্থির করতে হবে। জীবনের প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর নিজের পারদর্শিতার মধ্যে প্রতিযোগিতা আনলে সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব।

(চ) মানসিক চাপ (Stress):

মানসিক চাপ অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের অন্যতম কারণ। ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলে যে মানসিক দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় তাকে মানসিক চাপ বলা হয়। অতিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ভারসাম্যের অভাব দেখা দেয় ফলে ব্যক্তি বিভিন্ন অপসঙ্গাতিমূলক আচরণে লিপ্ত হয়। মানসিক চাপ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা মানসকি চাপ সৃষ্টি করে, এছাড়া হতাশা থেকেও মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

এই ধরনের কারণগুলি ছাড়াও আরোও কিছু কারণ রয়েছে যার ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণের সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা দেওয়ার কারণগুলি হল ঃ

(১) গৃহের পরিবেশ সঠিক না হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা দেয়। পরিবারে পিতা মাতার বিরূপ আচরণ শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে।

(২) বিদ্যালয়ের বৈচিত্র্যহীন পাঠ্যক্রম অনেক সময় শিশুদের সবরকম চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে পারে না। ফলে তারা তাদের চাহিদা তৃপ্তির জন্য অপসঙ্গাতিমূলক আচরণে লিপ্ত হয়।

(৩) শিক্ষকের শাসনের ফলে অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে ভয়ের সঞ্চার হয়। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণির কোনো কাজে যোগদান করতে চায় না। এই ধরনের নিরপেক্ষতার অভাবের ফলে অবাঞ্ছিত আচরণ করে থাকে।

(৪) অনেক মনোবিদ্‌গণ বলে থাকেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করে। কোনো বিশেষ শিক্ষার্থী যদি কোনো বিশেষ দল থেকে সহপাঠী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় তাহলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

(৫) বিদ্যালয়ে কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে বিশেষ অপরাধপ্রবণ (Delinquent) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ঐ ধরনের শিক্ষার্থীর প্রতি সঠিক আচরণ করেন না। এই ধরনের বিরূপ আচরণ শিক্ষার্থদের অপরাধপ্রবণ করে তোলে এবং অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৬) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থা না থাকলেও অনেক সময় অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

(৭) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠদানের সময় যে সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেন, সেই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনা, ফলে ফলাফল আশানুরূপ হয় না। তাদের মধ্যে ব্যর্থতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় এবং অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৮) বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা না থাকলে এবং বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে উৎসাহ না পেলেও সমস্যামূলক আচরণ দেখা দিতে পারে।

বিদ্যালয়ে অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের কারণ সম্পর্কে এটুকু ধারণা দিলেই শেষ হয়না। এছাড়াও নানা রকম কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। তা পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো তালিকার সঙ্গো মিলিয়ে অপসঙ্গাতির কারণ খুঁজে বের করা যায় না। এর কারণ বিদ্যালয় পরিস্থিতি এবং গৃহ পরিবেশের মধ্যেই থাকে। তাই বিশেষ আচরণের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হলে, শিক্ষার্থীর আচরণমূলক পরিস্থিতিকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

প্রকারভেদ (Types):

অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে, কয়েকটি প্রচলিত সাধারণ অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) শ্রেণি থেকে পালানো (Truancy): পূর্ব অনুমতি ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিদ্যালয় ত্যাগ করাকে শ্রেণি থেকে পালানো বলে। এর নানা রকম কারণ আছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পর্কীয় চাহিদার অভাব ঘটলে এই ধরণের প্রবণতা দেখা দেয়। এই রকম প্রবণতার অনকে উৎস থাকতে পারে। শ্রেণী কক্ষে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন এবং ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন উভয় ধরনের শিক্ষার্থীদের এক সঙ্গো শিক্ষাদান করলে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্নদের কাছে পাঠ্য বিষয় খুবই সাধারণ মনে হয়। সে কারণে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের প্রতি আগ্রহ বোধ করে না। আবার অনেক সময় বিদ্যালয়ের কঠোর শৃঙ্খলা, কোনো কোনো শিক্ষকের নির্মম আচরণ ও শাস্তি দান ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার করে, যা তাকে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যেতে প্রারোচিত করে। কোনো শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি থাকলে অন্য সহপাঠীদের উপহাসের পাত্রী হয়, এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ কাজ করে, ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণি থেকে পালায়।

শ্রেণি থেকে পালানো প্রতিরোধ করতে হলে এই ধরনের আচরণ অতি দ্রুত প্রতিকার করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলি হল-

(১) পাঠ্যবিষয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ অতি সহজেই আনয়ন করা যাবে।

(২) মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা পদ্ধতি এই ব্যাপারে সহায়তা করে। শ্রেণি শিক্ষণ যাতে প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় হয় সে ব্যাপারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। সরলীকৃত বক্তব্য উপস্থাপন, শিক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার শ্রেণি পালানো প্রতিরোধ করতে পারে।

(৩) শাসনের কঠোরতা হ্রাস করে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হলে শ্রেণি পালানো থেকে শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধ করা যাবে।

(৪) দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনমনের কারণেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্লাস পালানোর মত পরিস্থিতি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য শিশুপরিচালনাগার স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

(৫) শিক্ষার্থীরা কোনো কারণে কু সঙ্গে পড়ে শ্রেণি থেকে পালানো অভ্যাস করলে সেটা যাতে শিক্ষার্থী ত্যাগ করে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

মিথ্যা ভাষণ (Lying):

কোনো চাহিদার অপরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষার্থী যখন ইচ্ছে করে সাজানো কথা বলে তখন তাকে মিথ্যে ভাষণ বলে। শিক্ষার্থীদের মিথ্যা কথা বলা অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের একটিরূপ, আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলা বা অতি উৎসাহে মিথ্যা বলা অপসঙ্গাতিমূলক আচরণের অন্তর্ভূক্ত নয়। অহেতুক বা অতিরিক্ত মিথ্যা বলা যা শ্রেণিকক্ষে সহপাঠী এবং অন্যান্যদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে, তা সমস্যামূলক আচরণের মধ্যে পড়ে। অনেক সময় চাহিদার অতৃপ্তির জন্য শিক্ষার্থী মিথ্যা কথা বলে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি না পেলে সহপাঠীদের কাছে আত্মস্বীকৃতি পাবার জন্য মিথ্যা কাল্পনিক কাহিনি বর্ণনা করে থাকে। এই ধরনের মিথ্যাভাষণ কোনো শিক্ষার্থীর ব্যর্থতা ও হতাশার ফল এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণও হতে পারে। এই ধরনের মিথ্যা ভাষণে শিক্ষার্থীর চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে না এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ও কোনো সমাধান হয় না বরং মিথ্যার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ অপরাধবোধ কোনো শিক্ষার্থীর মনকে আচ্ছন্ন করে এবং সে দুর্বল হয়ে পড়ে। বাইরের জগতে মিথ্যাবাদীরূপে পরিচিত হয়। স্বভাবতই শিক্ষার্থী তার কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনা এবং অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ আরও বাড়তে থাকে।

মিথ্যা ভাষণ প্রতিকারের উপায় ঃ

(১) শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বাবা-মা প্রত্যেকে যেন মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকে, বিশেষ করে এই ধরনের সমস্যা মূলক শিক্ষার্থীদের সামনে।

(২) শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা পূরণ করতে হবে।

(৩) ব্যক্তিগত পরামর্শদানের ব্যবস্থা করলে এক্ষেত্রে অতি দ্রুত সুফল পাওয়া যায়।

(৪) শিক্ষার্থীর যে চাহিদার অপরিতৃপ্তির জন্য এই মিথ্যা ভাষণ, সেটি যথাসম্ভব পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) পরিবেশের পরিবর্তন এবং মনোচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মিথ্যাভাষণ প্রতিরোধ করা যায়।

ভীরুতা (Timidity):

আত্মবিশ্বাসহীন অবস্থায় শিক্ষার্থী যখন পরিবেশের সঙ্গে সংগতি সাধনে অক্ষম হয় তখন তাকে ভীরুতা বলে। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া না করে কোনো কোনো শিক্ষার্থী শান্তশিষ্ট ও চুপচাপ বসে থাকে। সাধারণভাবে এদের ভাল শিক্ষার্থী মনে হলেও মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এ জাতীয় আচরণ অপসঙ্গতিমূলক আচরণ। যে সব শিক্ষার্থী বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সংগতি সাধনে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে তাকে ভীরুতা বলে। এইসব শিক্ষার্থীরা চাহিদার অতৃপ্তির জন্যও এ ধরনের আচরণ করে থাকে। ইচ্ছা পূরণের অতৃপ্তির ফলে তাদের মধ্যে দুঃখ, বেদনা ও হতাশা বোধ সৃষ্টি করে- যার জন্য তারা বাস্তব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। মনঃসমীকক্ষদের মতে এরা হল অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। এর ফলে এদের বিকাশ ব্যাহত হয়। আবার অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কঠোর শাসনের স্বীকার হলে এই ধরনের আচরণ দেখা দেয়। একটি ভীরু শিশুর লক্ষণগুলি হল– এদের মধ্যে আবেগের অস্থিরতা দেখা যায়। সবকিছু অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে এবং অবিন্যস্ত এলোমেলো চলাফেরা করে থাকে। সামান্য গণ্ডগোলে জনসমক্ষে তীক্ষ্ণ আলোতে ভীত চকিত হয়ে পড়ে। এরা স্থির হয়ে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসতে পারে না, শান্ত স্থির পরিবেশেও অস্থির ভাব দেখা যায়।

ভীরুতা প্রতিকারের উপায়:

(১) শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে ভীরুতা দূর করতে হলে এদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। মনের মধ্যে থেকে হতাশার গ্লানি, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য বোধ দূর করে এদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে হবে।

(২) বাস্তবকে এড়িয়ে না গিয়ে যাতে সাহস করে বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে।

(৩) প্রক্ষোভমূলক কারণে ভীরুতার সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত কারণটি নির্ণয় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীর মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনা যায়।

(৪) শিশুর মধ্যে যতটা সম্ভব সাফল্যের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

(৫) পারিবারিক পরিবেশ খোলামেলা হবে। অহেতুক ভয় উদ্রেগকারী ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

উদ্বেগ (Anxiety):

শ্রেণিকক্ষে অকারণে বিরূপ আচরণ করা এবং সহপাঠীদের মারধর করার মত আচরণ কে উদ্বেগ বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সহপাঠী, ভাইবোন সকলকেই নিপীড়িত করে, এই ধরনের সমস্যামূলক শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায়। মনোবিদ্‌দের মতে, নিরাপত্তাবোধের অভাবই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই উদ্বেগ মনোভাব সৃষ্টি করে। নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটার কারণে শিক্ষার্থী নিজেকে অবহেলিত মনে করে এবং নিজের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অকারণে অন্যকে উৎপীড়ন করে। স্বাভাবিক উপায়ে আত্মস্বীকৃতি লাভে বিফল হয়েই শিক্ষার্থীরা এই ধরনের আচরণে লিপ্ত হয়।

অসন্তোষমূলক জীবন পরিস্থিতি হল উদ্বেগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাল্যকালে নিরাপত্তার অভাববোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতার অনুভূতি গড়ে তোলে এবং তার ফলে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভয় দেখা যায়। আবার শৈশবের নিরাপত্তাহীনতাজনিত উদ্বেগ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কারণ।

উদ্বেগ প্রতিকারের উপায় ঃ

এই ধরনের আচরণ অতি দ্রুত প্রতিকার করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলি হল -

(১) স্নেহ ভালবাসার দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে নিরাপত্তার অভাব বোধ এবং অবহেলার যে বেদনা তাকে দূর করতে হবে।

(২) শিক্ষার্থীর আত্মস্বীকৃতি এবং আত্মবিশ্বাস যাতে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্বেগকে অবদমিত করে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

(৩) গঠনধর্মী কোনো কাজে শিক্ষার্থীকে যুক্ত করা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে এই ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ প্রতিরোধ করা যায়।

(৪) উদ্বেগ প্রতিকারের জন্য যে সব চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ বা পরিস্থিতি এই দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করছে সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া।

(৫) শিক্ষার্থীর উদ্বেগ দূর করার জন্য এবং তার সংগতিবিধান প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলার জন্য ব্যক্তিকে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

বিষন্নতা (Depression): অকারণ দুঃখের ভাবকে কেন্দ্র ব্যক্তির করে যে মনোবিকার দেখা দেয় তাকেই বলা হয় বিষন্নতা। এটি আবেগজনিতএকটি মনোভাব। আবেগ হচ্ছে আমাদের সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূল উৎস। স্বাভাবিক অবস্থা যখন থাকে তখন এই প্রেরণা বাস্তব অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মানুষের সৃজনশীলতা বিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু এই আবেগ যদি বিচার শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে জীবনে নানা ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তি কখনও কখনও নিজেকে অসীম শক্তির অধিকারী মনে করে আবার কখনও কখনও অতিশয় নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নিজেকে অসহায় মনে করে। নৈরাশ্যবাদী অবস্থাই হল বিষন্নতা। বিষন্নতায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা কোনো কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারেনা। পড়াশোনায়ও মনোযোগ দিতে পারেনা। সেই সঙ্গে তাদের মনে হয় যে, সে কিছুই মনে রাখতে পারছেনা।

বিষন্নতা প্রতিকারের উপায় ঃ বিষন্নতা প্রতিরোধ করতে হলে-

(১) নিজের প্রতি আস্থা বাড়াতে হবে। আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত করতে পারলে বিষন্নতা প্রতিরোধ করা যায়।

(২) অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিষন্নতার কারণ তাই নিজের সামর্থ্যের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বজায় রাখতে হবে।

(৩) শরীরে জড়তা, আলস্য, ক্লান্তির ভাব ইত্যাদি দূর করে কাজ কর্মের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে হবে।

(৪) উৎকণ্ঠা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মন থেকে দূর করতে হবে।

(৫) শিক্ষার্থীদের সফলতার বিষয়গুলি মনে করিয়ে সাধারন পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীরা বিষন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারে।

উপসংহার (Conclusion):

সবশেষে বলা যায়, দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অতি নিবিড়। শরীর সুস্থ না থাকলে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে না, ফলে নানা ধরনের অপসঙ্গতিমূলক কাজে তারা লিপ্ত হয়। অপসঙ্গতিমূলক আচরণের ক্ষেত্রে সবসময়ই প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভালো। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা এবং শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারলে শিক্ষার্থীরা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ থেকে দূরে থাকতে পারে। বয়:সন্ধিকালে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। এছাড়া গৃহ পরিবেশের উন্নতি ঘটানো, বিদ্যালয় পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজের নৈতিক আদর্শের মান বৃদ্ধি, পারস্পরিক আদান প্রদান, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সব মিলিয়ে সামগ্রিক ভাবে সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দূর হবে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক

ব্যক্তিত্ব ঃ অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ

ব্যক্তিত্ব (Personality) এর ধারণা মূলত হল একটি বিমূর্ত (Abstract) ধারণা। এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত ধারণা প্রকাশ করা সহজ সাধ্য নয়। ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত ব্যক্তির সেইসব অসাধারণ ও আকর্ষণীয় গুণাবলিকে মনে করা হয় যা ব্যক্তিকে বিশিষ্টতা দেয় অর্থাৎ অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে। যার চালচলন কথাবার্তা ব্যক্তির মনে সম্ভ্রম জাগায় না, তাকে আমরা 'ব্যক্তিত্বহীন' বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনোবিদ্যায় 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটি এই রকম লৌকিক অর্থে ব্যবহার করা হয় না। মনোবিদ্যায় বলা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব আছে। যার চালচলন কথাবার্তা সম্ভ্রমজনক তার যেমন ব্যক্তিত্ব আছে তেমনি যার কথাবার্তা সাধারণ তারও ব্যক্তিত্ব আছে। ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত বোঝানো হয় ব্যক্তির সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সমূহের সুসমাঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য। অনেক সময় ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারাকে বোঝানো হয়। আবার অনেক সময় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এই শব্দ দুটিকে সমার্থক বলে মনে করা হয়। যদিও এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিত্বকে চরিত্রের সঙ্গে দেখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব চরিত্র থেকে ব্যাপকতর এবং চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান মনে করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বের সব উপাদানের নৈতিকমূল্য নির্ধারণ করা হয় না। আবার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিকে অভিন্ন বলেও মনে করা হয়। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে, সেই কারণে তাদের অভিন্ন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তিত্ব শব্দটির প্রয়োগগত পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজী পারসোনালিটি (Personality) কথাটি গ্রীক প্রতিশব্দ 'পার্সোনা' (Persona) থেকে এসেছে। পার্সোনা শব্দটির অর্থ হল মুখোশ। প্রাচীনকালে রোমে অভিনেতারা মুখোশ পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং পারসোনালিটি শব্দটির উৎপত্তি যে শব্দটির থেকে, সেটি আসলে একটি ছদ্ম, মিথ্যা বা ব্যক্তি যেভাবে অপরের কাছে প্রকাশিত হয় তাকেই বোঝাত। পরবর্তীকালে পার্সোনা শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থ হয়ে দাঁড়ায় নাটকের অভিনেতা। মনোবিদ সিসারো (Cicero) 'Persona' শব্দের চারটি অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। তাহল : ক) কোনো ব্যক্তি যেভাবে অপরের কাছে প্রকাশিত হয়। (As one appears to others.), খ) ব্যক্তি জীবনে যে ভূমিকায় অভিনয় করে। (The part someone plays in life.), গ) কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সমবায় যা ব্যক্তিকে তার কাজের উপযোগী করে তোলে। (An assembling of personal qualities that fit a man for his work.), ঘ) স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা (Distinction and dignity) ।

দ্বিতীয় একক

নির্দেশনা: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় নির্দেশনার গুরুত্ব

একটি সুশৃঙ্খল পেশামূলক কাজহিসাবে 'নির্দেশনা'র ধারণা প্রথম প্রকাশিত হয় 1905 সালে। আমেরিকার বস্টন (Boston) শহরের অধিবাসী ফ্রাঙ্ক পারসনস (Frank Parsons) নির্দেশনার ধারণা প্রথম প্রবর্তন করেন। যে সমস্ত মানুষ নিজেদের চাকুরী যোগাড় করতে পরিশ্রম করেছিল তাদের জন্য তিনি বস্টন শহরে একটি নির্দেশনা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। 'Choosing a Vocation' নামে তিনি একটি পুস্তক ও রচনা করেছিলনে। ফ্রাঙ্ক পারসনের পর জেসি. বি. ডেভিস (Jessie. B. Davious) অ্যানিরিড (Anne Reed) প্রমুখ সমাজ সংস্কারক এই একই উদ্দেশ্যে কিছু কাজকর্ম করে গেছেন। 1910 সালের পর আমেরিকার বেশ কিছু পেশামূলক সংগঠন নির্দেশনা আন্দোলনের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতবর্ষে নির্দেশনা আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) এর সুপারিশের ভিত্তিতে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন অষ্টম শ্রেণীর পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সাতটি প্রবাহ প্রথা (Seven Stream System) প্রবর্তন করেন। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের রুচি, চাহিদা এবং গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনো একটি প্রবাহ নির্বাচন করে সেইমত পড়াশুনা করবে। যেহেতু এইসময় শিক্ষার্থীদের বয়স অত্যন্ত কম থাকে তাই বিষয় নির্বাচনের জন্য তাদের নির্দেশনাদান প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা এখন স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা কম থাকাতে বহু শিক্ষার্থী সঠিক বিষয় বেছে নিতে পারে না। অনেক সময় অভিভাবকরাও তাদের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে তাদের সন্তানদের সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেন না। বিষয় নির্বাচনে কোনো ভুল থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই সব কারণে নির্দেশনা শিক্ষার আবশ্যিক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তৃতীয় একক

পরামর্শদান: অর্থ, প্রকারভেদ, শিক্ষায় পরামর্শদানের গুরুত্ব

পরামর্শদান বিষয়টি অতি প্রাচীন। প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন স্তরে সবসময়ই পরামর্শদান চলছে। পরিবারে পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের পরামর্শ দিচ্ছেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁর শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে পরামর্শদান হল নির্দেশনা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরামর্শদান মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতির উপর পরামর্শদান নির্ভরশীল। বর্তমান সমাজের সঙ্গে সংগতিবিধান করতে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই সমস্যার সমাধান করাই হল পরামর্শদানের প্রধান কাজ। 'Counselling' শব্দটি ইংরেজি 'to counsel' ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভুত হয়েছে যার অর্থ হল

পরামর্শ দেওয়া। পরামর্শদান এবং পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মানুষের একপ্রকারের মৌলিক চাহিদা। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরীর যুগে পরামর্শদানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষের চাহিদা চিহ্নিত করনের জন্য এবং সেগুলি পরিতৃপ্তির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে মানুষকে সাহায্য করার বিভিন্ন পদ্ধতি স্থির করার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চতুর্থ একক

অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ: অর্থ, কারণসমূহ, প্রকারভেদ (শ্রেণী থেকে পালানো, মিথ্যে ভাষণ, ভীরূতা, চুরি করা, উদ্বেগ, বিষণ্নতা) -এর প্রতিরোধের উপায়সমূহ

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের চাহিদা থাকে। জন্মাবস্থায় প্রত্যেক শিশু বেশ কিছু চাহিদা নিয়েই জন্মায়। খাদ্যের চাহিদা এর মধ্যে একটি। চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি না ঘটলে শিশুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তবে আরোও কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, এগুলি হল মানসিক চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদা। মানসিক চাহিদাগুলি শিশুর নিজস্ব; যেমন- নিরাপত্তার চাহিদা, ভালোবাসার চাহিদা, কৌতূহলের চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তি সত্তার সুষ্ঠ বিকাশ নির্ভর করে। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক চাহিদা; যেমন- আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, দলভুক্ত হওয়ার চাহিদা প্রভৃতি। এই সব চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তি ঘটলে তবেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যথাযথ হবে। সে পরিবেশের সঙ্গো সঙ্গাতি সাধনে সমর্থ হবে।

তাই বলা যায়, ব্যক্তির সঙ্গাতি সাধনের মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চাহিদার পরিতৃপ্তি। কোনো কারণে যদি ব্যক্তি এইসব চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন না করতে পারে তাহলে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি নানা ধরনের আচরণ সম্পাদন করে। একে বলে অপসঙ্গাতিমূলক আচরণ (Maladjusted Behaviour)।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ ১ মানের প্রশ্ন

১) 'Persona' শব্দটির অর্থ হল—
(ক) আকার (খ) অবয়ব (গ) মুখোশ (ঘ) কোনটিই নয়

২) এনডোমর্ফি দৈহিক আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উদাহরণ হল—
(ক) স্নায়ুবহুল ও চর্মসার (খ) গোলাকার ও কোমল দেহ বিশিষ্ট
(গ) অস্থিপেশী বহুল (ঘ) সংযত ও সাবধানী

৩) নির্দেশনার ধারণা প্রথম প্রকাশিত হয়—
(ক) 1911 সালে (খ) 1905 সালে (গ) 1909 সালে (ঘ) 1907 সালে

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন দুটি শক্তির উপর নির্ভর করে?
২) পায়ুকামী ব্যক্তিত্বের লোকেদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩) নির্দেশনা বলতে কি বোঝ?

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) উদ্বেগ প্রতিকারের দুটি উপায় লিখ।
২) ঐচ্ছিক পরামর্শদানের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩) হিপোক্রোটিস ব্যক্তিত্বকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন এবং সেগুলি কি কি?

৪ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১০০টি শব্দ

১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ সৃষ্টির কারণগুলি উল্লেখ কর।
২) প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ।
৩) শিক্ষায় নির্দেশনার গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

- প্রথম একক : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা : অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, উপাদানসমূহ, বাধাসমূহ
- দ্বিতীয় একক : ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণ পদ্ধতি
- তৃতীয় একক : ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণপদ্ধতি
- চতুর্থ একক : শিখনমূলক অক্ষমতা: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষকের ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education)

উদ্দেশ্য (Objectives):

- শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষার অর্থ, উদ্দেশ্য সমূহ, উপাদান, বাধাসমূহ সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষন পদ্ধতি সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা শিখনমূলক অক্ষমতা: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face):

বর্তমানে শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act 2009) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে যে কোনোভাবে অসমর্থ শিশু সমাজে ব্রাত্য ছিল। সমাজে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে পূর্বজন্মের পাপের ফলে তাদের এরকম অবস্থা হয়েছে, সেজন্য সে সমস্ত শিশুদের পরিহার, নিষ্ঠুর আচরণ, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হত, তাদেরকে বিভিন্ন নিম্নকাজ, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদিতে বাধ্য করা হত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হল। প্রতিবন্ধকতার ধরণ অনুযায়ী সমাজের মধ্যে আলাদাভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার আয়োজন করা হল এবং সময়ের সাথে সাথে সমাজের ব্যক্তিদের মানসিকতারও পরিবর্তন হল, এই ধারণা অনুভূত হল যে রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তির শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে আর এটিই হল শিক্ষায় মানবতার দিক। আর এর ফলেই শিক্ষার সাথে যুক্ত হয়েছে অন্তর্ভুক্তির ধারণাটি।

অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায় একটি বিশেষ দর্শন যা বিশ্বাস করে সমস্ত মানুষ সম্মানীয় ও মূল্যবান। এর বিস্তার বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনের দিকে, যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমান অংশীদার। সুতরাং, শিক্ষায়তনে শিশু তার জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, লিঙ্গ অথবা প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে একসঙ্গে পড়তে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী থাকবে বিশেষ সরঞ্জাম, বিশেষ নির্দেশনা। এই ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাহায্যও পেতে পারবে। অন্তর্ভুক্তি হল এমন একটি বিষয় যা সমস্ত শিশুকে তার সর্বাধিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বিদ্যালয়ে পঠনকে নির্দেশ করে এবং দ্বারা সকলের কাছে শিশুর গ্রহণযোগ্যতা ও পরস্পরের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) সাধারণ ও কোনো কারণে অসমর্থ সকল শিশুদের একই প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ সুনিশ্চিত করে। এই শিক্ষা, শিক্ষায় বৈষম্যহীনতা, ঐক্যকরণ, সংযুক্তিকরণ, প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় ও পরোক্ষভাবে সমাজের সার্বজনীন গঠনকে সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করে। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা মূলত হল এমন একটি দর্শন বা নীতি যার মূল লক্ষ্য হল যারা শিক্ষার বৃত্তের বাইরে আছে তাদের সবাইকে একত্রিত করে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা।

চোখ বা দর্শনেন্দ্রিয় পরিবেশের সঙ্গে শিশুর/ব্যক্তির সংযোগস্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দর্শনগত কোনো ত্রুটি বাধা বা অনুপযুক্ততার কারণে একজন শিশু/ব্যক্তি ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা জীবনে একটি গুরুতর সমস্যা। যদিও ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সঠিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে পূর্বের চেয়ে সমাজের মূলস্রোতে এদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মানব সমাজে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা রাষ্ট্রেরই করা একান্ত প্রয়োজন এবং এর জন্য প্রয়োজন হল উপযুক্ত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি। উপযুক্ত শ্রবণ ছাড়া একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। বর্তমানে বেশিরভাগ শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত; সুতরাং ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা কোন মতেই উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। অন্যান্য ব্যাহত শারীরিক ক্ষমতা বাইরে থেকে পরিলক্ষিত হলেও শ্রবণক্ষমতা নষ্ট হলে তা বাইরে থেকে পরিলক্ষিত সহজে করা যায়না যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাষার আদান প্রদান হচ্ছে। তাই ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতা অনেক সময় এক বা একাধিক ক্ষেত্র বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতার মধ্যে শিখন অক্ষমতা হল একধরনের জ্ঞানমূলক অক্ষমতা, এটি মূলত চিন্তা করা এবং যুক্তিদানের অক্ষমতা। শিখনে অক্ষম শিশুরা নিজের বয়সি অন্য শিশু ও সহপাঠীদের মতো প্রায় একইরকম আচরণ করে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অন্য স্বাভাবিক শিশুদের মতো একইভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না, আবার কোন ক্ষেত্রে সমান তালে চলতে পারে না এবং এই অপারগতার কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ার সমস্যা। শিখন প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হতে পারে অর্থাৎ একজন ব্যক্তির যে সমস্ত দিকে শিখন অক্ষমতা রয়েছে, অন্য একজন ব্যক্তির সেই সমস্ত দিকে শিখনের অক্ষমতা নাও থাকতে পারে। যেমন– একজন শিক্ষার্থীর হয়তো শিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা থাকতে পারে। একজন শিক্ষার্থী হয়তো অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকতে পারে অবার একজন শিক্ষার্থীর হয়তো উভয় ক্ষেত্রেই শিখন প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতা থাকতে পারে। শিখন অক্ষমতা বুঝাতে বুঝানো হয় মনোযোগ দিয়ে শুনা, কথা বলা, পাঠ করা, লেখা, যুক্তি প্রয়োগ এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে বহিঃপ্রকাশিত শিখন সংক্রান্ত অক্ষমতা; যদিও শিখন অক্ষমতা কখনোই এই মূল প্রতিবন্ধকতার (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফল নয়।

প্রথম একক

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা : অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, উপাদানসমূহ, বাধাসমূহ
(Inclusive Education : Objectives, Factors, Barriers)

ভূমিকা (Introduction) :

প্রতিটি শিশুর শিখন চাহিদা একজনের থেকে অপরজনের পৃথক। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও সব শিশুর একই রকম হয়না। শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন হয়। শিক্ষায় এইসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার অনেক প্রয়াস করা হয়েছে যার মধ্যে 1994 সালে স্পেনের অন্তর্গত সালামানসা (Salamanca) তে অনুষ্ঠিত বিশেষ চাহিদাযুক্তদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার কথা মূলত বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। UNICEF অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) কে শিক্ষার মূলস্রোত সংক্রান্ত জাতীয় শিক্ষানীতির অঙ্গা হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলেছে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে সমস্ত শিশুর জন্য তাদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, ভাষাগত ও অন্যান্য চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। 2000 সালের February মাসে অনুষ্ঠিত E-9 গোষ্ঠীর দেশগুলোর সম্মেলন এ 'সবার জন্য শিক্ষা' এর প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এই প্রসঙ্গো ইহা বলে রাখা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ ও এই দেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল। অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা হল সেই ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে তাদের নিজস্ব চাহিদা, সামাজিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সমাজের অন্য শিশুদের সঙ্গো মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল কোনো শিশু যেন মূলধারার শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, তাদের যেন অলাদা করে দেওয়া না হয়, তাদের যেন বাদ দেওয়া না হয়।

সমাজের বিপুল অংশের শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রতিকূলতায় বহুসংখ্যক শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং এই বঞ্চিতদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায় মূলত রাষ্ট্রের। সুতরাং রাষ্ট্র প্রত্যেকের শিক্ষার ব্যাপার সুনিশ্চিত করবে। অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা কখনোই বিশেষ কোনো শিক্ষা কর্মসূচি নয়, এটি একটি আদর্শমাত্র এবং এটি এমন একটি ধারণা যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকবে যাতে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল এমন একটা পথ যাতে শিক্ষাব্যবস্থায় অবহেলিত বা সমাজের মূল বৃত্তের বাইরে আছে এমন সব শিশুকে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা। এটি মূলত সাধারণ শিক্ষা গ্রহনের জন্য উপযুক্ত

পরিসরে একসাথে সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা সমস্ত শিশুদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, অঙ্গাসঞ্চালনমূলক উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের পৃথকীকরণ বন্ধ করতে সহায়তা করে। অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষায় সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সবরকম সহায়তা প্রদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর রূপান্তর করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা কখনও নিজেদের অসম্পূর্ণ বা অক্ষম বলে মনে না করে।

Norwich বলেছেন, যে কোনোভাবে শিশুদের কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে, অথচ অন্যান্য দিক থেকে তারা অন্য সব স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের মতোই তাদের সমাজিক স্বীকৃতি দেওয়া ও তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে শিখনের সুযোগ দেওয়া হল অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা।

NCERT অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে বলেছে, Inclusive Education means all learners, young people with or without disabilities being able to learn together in regular pre-school provisions, school and community, educational settings with appropriate network of services.

বিনায়ক দামোদর বলেছেন, অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা হল এমন একটি ধারণা যা অবহেলিত এবং শিক্ষার মূলস্রোতের বাইরে অবস্থিত সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করে।

(Vinayak Damoder- Inclusive education is a concept which secures education of all those students who are ignored, out of main stream education.)

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সমস্ত ধরণের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা নিষ্ক্রিয় শিক্ষা গ্রহণকারী হিসেবে বিদ্যালয়ে থাকবে, বিদ্যালয়ের সমস্ত রকমের কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা এবং নিশ্চিত করা হলেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সকল হতে পারবে।

এটি হল এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যার দ্বারা শিক্ষার বৃত্তের বাইরে যারা আছে তাদের সকলকে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করাই হল মূল লক্ষ্য। এটি হল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যার মূল লক্ষ্য হল, শিক্ষার বৃত্তের বাইরে যেসকল শিশুরা রয়েছে তাদের সকলকে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা। শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত কিংবা অন্য যে কোনো শিক্ষার্থীর সমস্যা যা থাকুক না কেন তাকে বিদ্যালয়ের প্রবেশের অধিকার দেওয়াই হল অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা।

সুতরাং বলা যায় যে কোনো পরিস্থিতিতেই শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়াই হল অর্ন্তভুক্তিমূলকশিক্ষা এবং এই শিক্ষায় ব্যাহত ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু, উন্নত মেধাসম্পন্ন শিশু, পথশিশু, উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশু, ভাষাগত বা সংস্কৃতির দিক থেকে সংখ্যালঘু এমন সম্প্রদায়ের শিশু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশু ইত্যাদি প্রত্যেকের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Inclusive Education):

- এই শিক্ষা বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কথা বলে যাতে শিশুরা কার্যকরীভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে।
- বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণ মেনে নেন যে যেহেতু প্রতিটি শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থী থেকে পৃথক তাই বিদ্যালয়কে নমনীয় হতে হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদা পূরণের জন্য।
- এই শিক্ষা প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় প্রতিটি শিশু একইসঙ্গে বিনা বাধায় শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।
- এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, চাহিদা, পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নমনীয় হয়ে থাকে।
- এই শিক্ষা সমস্ত রকম মানসিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বাধার অপসারণে সহায়তা করে থাকে।
- এই শিক্ষা সামাজিক বৈষম্যের বিলোপসাধনে সহায়তা করে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অনুকম্পা, সহায়তা, বিশেষ সুবিধা ইত্যাদির পরিবর্তে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরতার উপর নির্ভরশীল।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব (Importance of Inclusive Education):

একজন অক্ষমতাযুক্ত শিশু, আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত পরিবারের শিশু, শারীরিক অথবা মানসিকভাবে ব্যাহত ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরেও নানারকম সংকোচ, বাধা, মানসিক ও সামাজিক অন্তরায় তাকে বিদ্যালয়ের সক্রিয় শিক্ষার্থী হয়ে ওঠতে বাঁধা দেয় কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সেই সমস্ত বাঁধা দূর করে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে শিক্ষাকে মূলত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রস্তুত করার তৈরি করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ইহা হল এমন শিক্ষা যার দ্বারা একই শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিত করা যায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যতীত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গা, সামর্থ্য, অসামর্থ্য নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর শিক্ষার মৌলিক চাহিদা এবং অধিকারকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় ফলে প্রতিটি শিশু তার জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থিত সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে তার সমবয়সী সমস্ত শিশুদের সঙ্গো একই গুণগতমানের বয়সোপযোগী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, কোনো কারণেই-কোনো শিশুই সমবয়সিদের সঙ্গো বয়সোপযোগী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল :

- সকল শিক্ষার্থীদের একসাথে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে এই বোধকে বিকশিত করে।
- বৈষম্যের মাঝে ও প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে।
- শিক্ষা সম্পদের ব্যবহার অধিক কার্যকর করতে সহায়তা করে।

- প্রতিটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয় কমিয়ে বন্ধুত্ব তৈরিতে সহায়তা করে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোঝাপড়া ও ভালোবাসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা সমাজের মূলস্রোতে যাওয়ার জন্য উপযোগী।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈষম্যের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে।

Education For All বা সবার জন্য শিক্ষা— এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা একটি জরুরি পদক্ষেপ এবং শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা-এর সাফল্য কোনটাই শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করবে না বরং রাষ্ট্র, প্রশাসন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থীর পরিবার, সমাজ ইত্যাদি সবার সমান দায়িত্ব বর্তায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে।

উদ্দেশ্যসমূহ (Objective) :

শিক্ষা দার্শনিক A.N. Whitehead তাঁর জাগতিক দর্শনে জাগতিক সত্য সম্পর্কে নতুন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা 'Process Quality' নামে পরিচিত। তিনি তাঁর দার্শনিক যুক্তির মূল কথা হল যে তিনি মন ও শরীরের দ্বৈত অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেননি। মন ও দেহের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এক প্রকৃতপক্ষে জগতে কোনো বিচ্ছিন্ন বা একাকী নয়, প্রত্যেকটি জাগতিক বিষয় একে অপরের উপর নির্ভরশীল; আর সবকিছুর মিলিতভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্বই জাগতিক সত্য।

ঠিক তেমনি মানুষের শিক্ষাও একটি ঐক্যবদ্ধ বিশ্বব্যাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা এবং কেউই এই ব্যবস্থার বাইরে নয়। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষার একটি বৃত্তে আনার মূল উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করে আসছে। এই শিক্ষায় দরিদ্র পিতামাতার শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু ইত্যাদি সমস্ত শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করাই হল মূল লক্ষ্য। যদি এই সমস্ত শিশুদের একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের মধ্যে রেখে শিক্ষা দেওয়া হয় ফলে সেই সমস্ত শিশুরা একটি একমাত্রিক দ্বীপের বসবাসকারী ব্যক্তি হিসাবে বিকশিত হবে। ফলে সমাজের বৃহত্তর মূলস্রোত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন সমাজস্থ ব্যক্তি এইসমস্ত শিশুদের কৃপা বা করুণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ফলে সমাজের মূলবৃত্তের বাইরে এই সমস্ত শিশুরা সর্বদা থেকে যাবে।

কিন্তু শিক্ষা যেমন ব্যাক্তিগতভাবে উল্লম্ব সামাজিক সচলতা (Vertical Social Mobility) ঘটায় তেমনি সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সমাজের কৃষ্টিগত পরিবর্তন, সংস্কার, কুসংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি সমস্তকিছুই শিক্ষার ফলে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কিছু শিশু যদি সমাজবিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পায় তবে সমাজের বিভিন্ন সংস্কার, কুসংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদির সাথে একাত্ম হবার কোনো সুযোগ পাবে না এবং সমাজ পরিবর্তনের পথে এরা সক্রিয় অংশীদার হতে পারবে না। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাই প্রকৃত সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ হল নিম্নরূপ :

একটি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ ছাড়াও তার মধ্যে যতটা সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে তার যতটা সম্ভব বিকাশ ঘটানো যায় সেই চেষ্টা করে থাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা।

- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল যাতে প্রতিটি শিশুকে যতটা সম্ভব আত্মনির্ভর করে তোলা যায় তা করা যাতে সে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে এবং এই আত্ম-নির্ভরতা দ্বারা আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা তোলাই হল এই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য।
- এই শিক্ষার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে নিজের, সামাজিক, পারিবারিক ও অন্যান্য দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই এই শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল যাতে প্রতিটি শিশু ভবিষ্যতে অন্যান্যদের মতই সমাজের স্বীকৃতি ও সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে এবং নিজস্ব পরিবার প্রতিপালনের মাধ্যমে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য হল দারিদ্র, অবহেলা ও নিষ্পেষণের চক্র ভাঙ্গাতে সহায়ত করা। এই প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ের পরিবেশে সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করা।
- সমাজের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হতে সহায়তা করা হল এর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।
- সমাজের মধ্যে শিক্ষায় যে পৃথকীকরণ বিদ্যমান তাকে হ্রাস করতে সহায়তা করা।
- প্রতিটি শিশুর শারীরিক, সমাজিক, অঙ্গ সঞ্চালনমূলক বৌদ্ধিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করা।
- প্রতিটি শিশুকে সমাজের মূলস্রোতে বহমান হতে সহায়তা করা।
- শিশুরে মধ্যে আত্মবিকাশ জাগিয়ে তোলা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করা।

উপাদানসমূহ (Factors) :

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান অযথা জীবনে হস্তক্ষেপ না করা সহনশীলতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সহমর্মিতা, পরস্পর নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহায়তা এবং যৌথ সামাজিক দায়িত্বপালন করার মনোভাব, আর এই সবকিছুর সমষ্টিই হল মানবিকগুন। পরের জন্য আত্মত্যাগ, চাহিদার বিসর্জন একতরফাভাবে হয় না। সমাজে একদল মানুষ শুধুই দাতা অন্যরা গ্রহীতা, এরকম পরিস্থিতি হলে তাকে মানবিক সমাজ বলা যায় না। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরাও সমাজেরই অংশ এবং তারাও সমাজে দাতা ও গ্রহীতার ভূমিকায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে- এ লক্ষ্যেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাও বিশ্বাস করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল একটি প্রক্রিয়া যা ক্রমশই পরিবর্তনশীল ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে পরিমার্জনশীল। প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদা যতক্ষন না পর্যন্ত পূর্ণ

হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা এই প্রকারের শিক্ষা চালিয়ে যায়। অন্তর্ভুক্তিমূলকশিক্ষার পথে নানারকম বাধা বিদ্যমান এবং এই শিক্ষা সেইসমস্ত বাধা ও প্রতিকূলতা দূর করার প্রচেষ্টা করে থাকে। সমস্ত শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, অংশগ্রহণ ও প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করার মাধ্যম হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা।

এই শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অনেক উপাদানসমূহ রয়েছে যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ হল নিম্নরূপ:

- পিতামাতার মনোভাব তাদের শিশুর প্রতি কীরূপ তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদি শিশুর পিতামাতা শিশুদের শিক্ষিত করাতে চান, তবে তাদের সদার্থক মনোভাব শিশুদের শিক্ষিত করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আবার অপরদিকে, পিতামাতার অবহেলাপূর্ণ মনোভাব তাদের শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি অনিশ্চিত করে তুলে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ। আর্থ-সামাজিক পরিবেশ যদি উন্নত হয় তবে তা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে।
- বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুতরাং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে হলে বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প, শ্রেণিকক্ষের গঠন যাতে প্রবেশের জন্য সুবিধাজনক হয়, জল, বিদ্যুৎ, আলো-বাতাস, পয়ঃপ্রণালী, টয়লেট ইত্যাদি যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য সুবিধাজনক হতে হবে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিশুর বাসস্থানের সন্নিকটবর্তী স্থানের জনবসতির আন্তঃ পারস্পরিক অংশগ্রহণ করার বিষয়। যদি জনবসতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয় তবে সেই জনবসতির অন্তর্গত সকল শিশুই শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।
- নীতির গঠন এবং তার বাস্তবায়ন (Policy making and its implementation) হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য অত্যন্ত সঠিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ, নীতির গঠন ও তার সঠিক বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করে থাকে এই শিক্ষা।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার এক বিশেষ প্রভাবকারী উপাদান হল শিশুর বসবাসকারী ভৌগোলিক পরিবেশ, পাহাড়ি অঞ্চল, অত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চল, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি এই শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবকারী উপাদানরূপে কাজ করে থাকে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সাফল্য বা ব্যার্থতা নির্ভর করে এর উপাদানগুলির পারস্পরিক সংপৃক্ততা বা অসংপৃক্ততার উপর। যদি উপাদানগুলো পারস্পরিক সংপৃক্ত বা একে অপরের সাথে সন্নিবিষ্টভাবে বাড়িয়ে থাকে তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। যদিও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বর্ণিত উপাদানগুলিই কেবলমাত্র দায়ী নয় বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে অন্যান্য উপাদানও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রভাবিত করে থাকে।

বাধাসমূহ (Barriers) :

প্রতিটি শিশুই হল এক একটি পৃথক সত্তা। প্রতিটি শিশুকে শাস্তির ভয় না দেখিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের প্রকৃত শিক্ষাদানের জন্য যে কোনো রকম উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ফলে সমস্ত শিশু একই সঙ্গে নানাহ বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে ফলে, প্রতিটি শিশু জীবনশৈলীর শিক্ষা পায় এবং পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর সমাজে নিজেকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বাধা রয়েছে এবং এই সমস্ত বাধাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হল :

- **মনোভাব :** পিতামাতা অভিভাবকদের মনোভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। যদি এদের মনোভাব সদার্থক না হয় তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সফল হতে পারেনা।
- **পাঠ্যক্রম :** সকল সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে থাকে তার পরিবর্তন ও পরিমার্জন-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায়। যদি পাঠ্যক্রম যথার্থ না হয় তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারেনা।
- **পরিকাঠামো :** প্রয়োজনীয় প্রবেশপথ, সিঁড়ি, টয়লেট, শ্রেণিকক্ষ, রিসোর্স কক্ষ, র‍্যাম্প, লিফ্‌ট ইত্যাদি যদি সঠিকভাবে না থাকে তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে না।
- **অর্থসংক্রান্ত বাধা :** পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থানের অভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সফলতার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন কারণ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার্থী এখানে একইসাথে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। ফলে নানা ধরণের শিক্ষামূলক উপকরণ, শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ইত্যাদির প্রকৃত পরিমাণে প্রয়োজন হয়ে থাকে, যার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ।
- **আর্থ-সামাজিক কারণ :** আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য যা প্রয়োজন তার অনেককিছুই শিশুরা সংস্থান করতে পারেনা ফলে শিখন বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকে। তাই এই সমস্ত শিশু তাদের ব্যাহত আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেনা।
- **ভাষা ও যোগাযোগ :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা ও এর মাধ্যমে যোগাযোগ। তাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে না হয় তবে তা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা কুক্ষিগত অবস্থায় থাকলে কোনো সিদ্ধান্ত উপরের স্তর থেকে আসে যা সবসময় আঞ্চলিক বা তৃণমূল স্তরের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে না সেই স্তরের পরামর্শ অনুযায়ী।

- **নীতি প্রনয়নে বাঁধা :** অনেক শিক্ষাবিদ এবং নীতি প্রণেতাগণ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিতে বিশ্বাসী নন। তাঁরা বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে সরিয়ে রাখতে চান এবং এর দ্বারা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- **শিক্ষক :** ভিন্ন ভিন্নভাবে সমর্থ শিশুদের (Differently abled children) বিভিন্ন শিখনমূলক চাহিদা রয়েছে যা উপলব্ধি করতে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। শিক্ষক যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয় তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সাফল্যলাভ করতে পারে না।
- **সংখ্যার অসামঞ্জস্যতা :** যেহেতু ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং যার মধ্যে 3 থেকে 18 বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশী এবং তাদের সবাইকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে।
- **ভৌগোলিক বাধা :** ভারতবর্ষের বিরাট ভৌগোলিক বিস্তার, এর বৈচিত্র্য, বিভিন্ন অঞ্চলের দুর্গমতার কারণে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন কারণ শহরাঞ্চলের বাইরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম।
- **প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় বিভিন্ন ধরণের শিশু ভর্তি হয় তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য অন্তত দু-তিনজন বিশেষ শিক্ষন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকলে তাদের সাহায্যে অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষায় সহায়তা করতে পারেন। কিন্তু এখনও বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে একজন করেও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই তাই প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যাহত হয়ে থাকে।
- **সরঞ্জাম বিষয়ক বাধা :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত পরিমাণে শিক্ষন ও শিখন সহায়ক সরঞ্জাম, প্রয়োজন বিভিন্ন রকমের তথ্যগত ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম। কিন্তু বেশীরভাগ বিদ্যালয়েই সরঞ্জামমূলক উপাদনের অভাব পরিলক্ষিত হয় যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাঁধা হিসাবে কাজ করে থাকে।
- **বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা :** ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে শিশু নিরক্ষর তা সত্ত্বেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত অস্বাভাবিক বেশী। ফলে আরও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষক নিয়োগ না হলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বড় বাধা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।
- **সামাজিক বাধা :** ভারতবর্ষের সমাজ শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। সামাজিক শ্রেণি বিভাজন এতই প্রকট যে এই সমাজ সকলকে একসাথে করার চাইতে তাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত করতে ভালবাসে এবং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, বাধানিষেধ যা সব মিলিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা।
- **পাঠ্যক্রমের পুনর্গঠন :** শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর জন্য পাঠ্যক্রমের উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে গেলে পাঠ্যক্রমের যথাযথ বাঞ্ছিত পরিবর্তন, পুনর্গঠন দরকার যাতে পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় সমস্ত শিশুর জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং পাঠ্যক্রমের যথাযথ পুনর্গঠন এর অভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাধা হিসাবে কাজ করে।

- **শিক্ষন পদ্ধতি :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষন পদ্ধতি হবে নমনীয় কারণ প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষন পদ্ধতি একইরকম হতে পারে না এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় পদ্ধতির নমনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে উপযুক্ত শিক্ষন পদ্ধতির অভাব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধারূপে পরিগণিত হয়।
- **শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যতা :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীদের বৈচিত্রতা, বিভিন্ন ধরণের গৃহ পরিবেশের শিশুর আচরণ, আগ্রহ, মনোভাব, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি, সৃজনক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিশুর ক্ষমতাও ভিন্ন, ফলে শিক্ষার্থীদের এই অসম বৈচিত্রতা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।
- **মূল্যায়ন ব্যবস্থা :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হল মূল্যায়ন ব্যবস্থা। মূলায়ন ব্যবস্থা হতে হবে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বৈচিত্রতার উপর ভিত্তি করেই মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন পদ্ধতি যদি অনমনীয় হয় তবে তা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- **সময়ের ব্যবস্থাপনা :** শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন মূল্যায়ন, পরীক্ষা নেওয়া, অন্যান্য কাজ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর পর প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে সময় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাই উপযুক্ত সময়ের ব্যবস্থাপনা না থাকলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার (Conclusion):

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় অক্ষমতাযুক্ত শিশু এবং অন্যান্য অবহেলিত শিশু যারা সাধারণ শ্রেণিকক্ষের সদস্য। তাদের শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়তাভিত্তিক কাজে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাপনার দ্বারা উপযুক্ত পাঠ্যক্রম, উপকরণ এবং নির্দেশনার উপযুক্ত কৌশলের সাহায্যে শিশুদের চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণ করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়া অন্যান্য কর্মীদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়ক করে তোলা যেতে পারে। এখানে দক্ষ পরামর্শদাতার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিকে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন এই ভেবে যে সকল শিক্ষার্থী যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে, কোনো পরিস্থিতিতে অক্ষমতা যেন বাধা হয়ে না দাড়াঁয় এবং সেই কাঙ্খিত পরিস্থিতিতেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সার্থক করে তোলা যায়।

দ্বিতীয় একক

ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণ পদ্ধতি
(Visually Impaired Children: Meaning, Identification, Types, Methods of Teaching)

ভূমিকা (Introduction):

পূর্ণ দৃষ্টিহীন বা অন্ধ মানুষ বলতে বুঝায় যাদের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নেই এবং আলোকরশ্মির উৎস অনুধাবন করতে পারেনা। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা শিশুর/ব্যক্তির জ্ঞানমূলক বিকাশ, সঞ্চালনমূলক বিকাশ এবং সামাজিক বিকাশ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে থাকে। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে তাকে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বলা হয়। এই ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়।

অর্থ (Meaning):

ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতাকে দুভাগে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যথা:

ক) চিকিৎসা বিজ্ঞানগত বা আইনগত সংজ্ঞা (Medical or Legal Definition)

খ) শিক্ষাগত সংজ্ঞা (Educational Definition)

ক) চিকিৎসা বিজ্ঞানগত বা আইনগত সংজ্ঞা অনুযায়ী (Medical or Legal Definition):

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন যে ব্যক্তির সবচেয়ে ভালো চোখে বা লেন্স ব্যবহরের পরও দর্শনীয় প্রধান অঞ্চলের স্পষ্ট দৃষ্টি ২০/২০০ বা তারও কম অথবা ব্যক্তির ভিশুয়াল অ্যাকুইটি ২০/২০০ -এর বেশি ব্যক্তির ভালো চোখের দৃষ্টির ক্ষেত্রে ২০ -এর বেশি নয়, তাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হবে। (American Medical Association - Blindness in visual acuity for distance of 20/200 or less in the better eye with correction or if greater than 20/200 a field of vision not greater than 20 degrees at the widest diameter.)

এখানে ২০/২০০ বলতে বুঝায় একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ২০০ ফুট দূরত্ব থেকে যে ব্যক্তিকে স্পষ্ট দেখতে পান, একজন ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু/ব্যক্তি তা সর্বাধিক মাত্র ২০ ফুট দূরত্ব থেকে ওইরূপ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। মিটার এককে এই অনুপাত হল 6/60.

খ) শিক্ষাগত সংজ্ঞা (Education Definition):

মানুষের চোখে দু-রকম দৃষ্টি থাকে যথা,—

১) দূরদৃষ্টি (Hyper Metropia) এবং

২) হ্রস্বদৃষ্টি (Miopia)।

যেমন চলাফেরা করা, সামাজিক জীবনযাপনের জন্য যেমন দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তেমন লেখাপড়া, অঙ্কন, হাতের কাজ প্রভৃতি কাজের জন্য নিকট দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। সুতরাং শিক্ষাগতভাবে পূর্ণব্যাহত

দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা বা অন্ধত্বের) কাকে বলে তা ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং তা হল —

সেই শিশু/ব্যক্তিকেই অন্ধ বলা হয় যার দৃষ্টি এমন ত্রুটিপূর্ণ যে চক্ষু দিয়ে সংবেদন (Sensation) এবং প্রত্যক্ষণ (Perception) করা যায় এমন কোন পদ্ধতিতে তাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। (A blind child/ person is one whose vision is so defective that he/she can not be educated through any method neither by sensation nor by perception.)

হ্যালাহান এবং কাফম্যান বলেছেন যে— শিক্ষাগত উদ্দেশ্যের দিক থেকে দৃষ্টিহীন তারাই, যাদের দৃষ্টিশক্তি এত ত্রুটিপূর্ণ যে তাদের ব্রেইল -এর মাধ্যমে শিখনের ব্যবস্থা করতে হয়। অপরদিকে ক্ষীণদৃষ্টি তারা যারা বিবর্ধক কাচের সাহায্যে সাধারণ অক্ষর ছাপা পুস্তক অথবা বড়ো অক্ষরে রচিত পুস্তক পড়তে পারে। (Hallahan and Kauffman - For eductional purposes, the blind are those who are severely impaired that they must be taught to read by Braille while the partially sighted can read print even though they need to use magnifying devices or books with large print.)

চিহ্নিতকরণ (Identification):

ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ অনান্য সকল ব্যাহত ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের থেকে অনেকটাই সহজ। নিম্নলিখিত আচরণগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ করা সম্ভব:

- শিশু ঘন ঘন চোখ রগড়ালে।
- শিশু যদি এক চোখ বন্ধ করে কিংবা এক চোখে হাত দিয়ে ঢেকে অন্য চোখে তাকায়।
- শিশু যদি পড়ার সময় বই, খাতা চোখের খুব কাছে আনে অথবা বইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
- শিশুর চোখ ঘন ঘন লাল হওয়া, চোখ দিয়ে জলপড়া, চোখ চুলকানি ইত্যাদি।
- ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়া বা দূরের জিনিস স্পষ্ট না দেখা।
- দৃশ্যবস্তুর কথা অন্যকে জিজ্ঞেস করে জানার চেষ্টা করা।
- উজ্জ্বল দিনের আলোতেও স্পষ্ট না দেখা, বা ঝাপসা দেখা।
- উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি।
- চলাফেরায় পদে পদে বাধা পাওয়া এবং স্পর্শ করে চলার পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করা।
- হাত দিয়ে স্পর্শ করে কোন কিছুর আকৃতি, প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করা।
- সামাজিক প্রক্রিয়া ও আচরণের অক্ষমতা।
- প্রায়শই চোখ ফুলে উঠা।
- একই বস্তুকে দুই বা ততোধিক দেখা।
- বিভিন্ন রং চিনতে না পারা।
- রাতে কম দেখা।
- কিছুক্ষণ পড়ার পর মাথা ধরা।
- আলোতে তাকাতে অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি।

প্রকারভেদ (Types):

ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের প্রকারভেদ ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে করা হয়েছে বিভিন্নভাবে; নিম্নে তা বর্নিত হল:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) কর্তৃক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতার শ্রেণিবিভাগ:

স্তর	কর্মদক্ষতা
১) মধ্যম মাত্রার ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা বা স্বল্প দৃষ্টিমান	সাধারণ শ্রেণিকক্ষে বা রিসোর্স কক্ষে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ ধরনের সরঞ্জাম, উপকরণ ইত্যাদি আলোকিত ব্যবস্থার সহায়তায় প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিমানদের মতো কাজ করতে সক্ষম। এরা 14 point -এর লেখা পড়তে পারে।
২) গুরুতর মাত্রার ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা বা আংশিক দৃষ্টিমান	দৃষ্টির প্রয়োজন এইরূপ কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে এদের অধিক সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয় এবং দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উন্নয়নের পরও এরা নির্ভুল কাজ করতে পারে না। এরা 18 point -এর লেখা পড়তে পারে।
৩) গভীর মাত্রার ব্যাহত দৃষ্টিশক্তির সম্পন্নতা বা প্রায় দৃষ্টিহীন	দৃষ্টির প্রয়োজন এরূপ কাজকর্ম করা এদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। এরা শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের দৃষ্টিকে ব্যবহার করতে পারেনা।

ব্যারেজ (Barrage) এবং এরিন (Erin) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন:

ক) দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা (Visually Handicapped): সেইসব শিশুদের/ব্যক্তিদের যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

খ) অন্ধ (Blind): যাদের কোন রকমভাবে আলোর অনুভূতি হয় না বা যারা আলো অন্ধকারের তফাৎ করতে পারে না। এদের শিক্ষাক জন্য ব্রেইল (Braille) বা অদৃষ্টিজনিত শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হয়।

গ) ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন (Low Vision): এদের কিছুটা স্বল্প দৃষ্টিশক্তি আছে। সেটা স্বল্প দূরত্ব হতে পারে, বড়ো অক্ষর হতে পারে, ঝাপসা দর্শন (Blurred Vision) হতে পারে ইত্যাদি। তাই এরা পুরোপুরি ব্রেইল

নির্ভর না হয়ে লেখাপড়া করতে পারে না।

আবার বার্থোল্ড লোয়েনফেল্ড (Berthhold Lowenfeld) শিশুর/ব্যক্তির দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাকে নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন তা হল নিম্নরূপ:

১) সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা যা জন্মগত বা জন্মের পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে অর্জিত।

২) সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা যা জন্মের অন্তত পাঁচ বছর পরে অর্জিত।

৩) জন্মগত আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা।

৪) অর্জিত আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা।

৫) জন্মগত আংশিক দৃষ্টিশক্তি।

৬) অর্জিত আংশিক দৃষ্টিশক্তি।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Methods of Teaching):

ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের মূল দুটি শ্রেণিতে (পুনর্ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু এবং স্বল্প বা আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু) বিন্যস্ত করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষণ পদ্ধতিও সেইরূপ হতে পারে; কারণ এদের শিক্ষণ পদ্ধতিও কখনো এক হতে পারে না। সুতরাং শিক্ষণপদ্ধতির ক্ষেত্রে এই উভয়প্রকার শিশুর জন্য পদ্ধতি আলাদা এবং নিম্নে তা আলোচনা করা হল—

পুনর্ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের বা দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষণ পদ্ধতি:

স্বাভাবিক শিশুদের যেভাবে পড়ানো হয়, দৃষ্টিহীন শিশুদের ঠিক সেইভাবে পড়ানো যায় না। তাদের পাঠদানের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হল:-

১) ব্রেইল পদ্ধতি: দৃষ্টিহীন শিশুদের পাঠদানের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। লুইস ব্রেইল 1829 সালে এই বিশেষ স্পর্শ পদ্ধতি আবিস্কার করেন। এই পদ্ধতিতে কার্ডবোর্ড বা কাগজের উপর যে শক্ত জিনিস দিয়ে উচুঁ উচুঁ ডট বা বিন্দু দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় 'স্টাইলাস'। উচুঁ উচুঁ ছয়টি বিন্দুতে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে বা দিক থেকে ডানদিকে ব্রেইল লেখা হয়। এই পদ্ধতিতে হাতের স্পর্শের মাধ্যমে লেখা পড়তে হয়।

২) ব্যক্তিকেন্দ্রিক পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে প্রতিটি শিশুর আলাদাভাবে যত্ন নেওয়া হয়। প্রতিটি শিশুর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষন পদ্ধতি আলাদাভাবে নির্বাচিত হয়।

৩) শব্দ নির্ভর পদ্ধতি: অন্ধশিশুদের শিক্ষাদানের জন্য টেপরেকর্ডার, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি বিশেষকরে পাঠ্যসূচির বিভিন্ন অংশের উপর অডিয়ো ক্যাসেট (Audio Cassette) প্রভৃতির ব্যবহার করা হয় এবং তা ওদের শুনানো হয়।

৪) সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি: দৃষ্টিহীনদের সক্রিয়ভাবে বিভিন্নভাবে কাজে অংশগ্রহণ করানো হয় এই

পদ্ধতিতে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে তাদের পরিচয় ঘটিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

৫) **স্পর্শ ও শ্রবণভিত্তিক পদ্ধতি:** দৃষ্টিহীন শিশুদের বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ ও এদের নাম বলার সাথে সাথে বিভিন্ন বস্তুর সাথে পরিচিতি ঘটানো সম্ভবপর হয়ে থাকে।

৬) **হুভার পদ্ধতি (Hoover Method):** এই পদ্ধতিতে দৃষ্টিহীন শিশুরা নিজেদের সামনে লাঠিটি ধরে এবং জমিকে স্পর্শ করে লাঠিটিকে পাশাপাশি আন্দোলিত বা নাড়াতে থাকে। এর মাধ্যমে সে পুরোমাত্রায় বুঝতে পারে তার কাছাকাছি কোন বাধা আছে কিনা; যদিও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীচে ও উপরের দিকে ঝুলন্ত বস্তুর উপস্থিতি সহজে বুঝতে পারে না।

৭) **দৃষ্টিমান সহযাত্রী পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে একজন দৃষ্টিমান একজন দৃষ্টিহীনকে তার যেকোন একটি হাতের কনুইয়ের ঠিক উপরে ধরে চলতে সাহায্য করে থাকেন। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি অনুসরণকারী দৃষ্টিহীন ব্যক্তি থেকে এত্রক পদক্ষেপ সামনে থাকবেন। ভিড় ও অন্যান্য জটিল পরিস্থিতিতে দৃষ্টিমানের এক কাঁধে দৃষ্টিহীন হাত রাখবেন ও তাঁর ঠিক পিছনেই থাকবেন।

স্বল্প বা আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষণ পদ্ধতি:

যেসব শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় কম এবং শক্তিশালী লেন্সের বা চশমার সাহায্যে ও যারা স্বাভাবিকভাবে দেখতে পায়না তাদের স্বল্প বা আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু বলে। স্বল্প বা আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা জন্মগত কারণে হতে পারে আবার জন্মের পরও নানাবিধ কারণেও হতে পারে। এদের জন্য শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল নিম্নরূপ:—

১) **বড়ো হরফ ব্যবহারের পদ্ধতি:** আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের সময় বড় হরফ অর্থাৎ 18 থেকে 24 পয়েন্ট বিশিষ্ট অক্ষরে ছাপা বই ব্যবহার করা হয় যেখানে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত ছাপানো অক্ষর 10 পয়েন্টের হয়ে থাকে।

২) **দর্শন সহায়ক যন্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি:** আংশিক ব্যবহৃত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের জন্য উন্নত মানের লেন্স ও বৃহদীকরণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে।

৩) **শ্রুতি সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের পদ্ধতি:** টেপরেকর্ডার, কথা বলার যন্ত্র (Talking Machine), অডিয়ো ক্যাসেট (Audio Cassette) প্রভৃতি শ্রুতি সহায়ক উপকরণের সাহায্যে আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ শিশুদের শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে।

৪) **সমন্বিত পরিকল্পনা পদ্ধতি:** আংশিক ব্যবহৃত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে নিকট ও স্বল্পদৃষ্টির প্রয়োজন হয়, সেই সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের একত্রে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতিগুলো ছাড়াও আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের সময় শিক্ষককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই শিশুরা শ্রেণিকক্ষের সামনের সারিতে বসতে পারে এবং শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় উচ্চারণ করে ও বড়ো হরফে লিখবেন।

উপসংহার (Conclusion):

শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাহত ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি অন্যতম। এই ধরনের শিশুদের সনাক্ত করা তুলনামূলক সহজসাধ্য হলেও প্রয়োজন আংশিক ব্যাহত দৃষ্টিক্ষমতা শিশুদের সনাক্তকরণ যাতে তারা পূর্ণ অন্ধ শিশু/ব্যক্তিতে পরিণত না হয়। প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার ঘটানো যার দ্বারা শিশুদের পূর্ণ অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। প্রতিটি শিশুকে জীবন ও সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ব্যাহত ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুকে শিক্ষা প্রদানের যাতে তারা মানসিক, শারীরিক, সামাজিকভাবে পিছিয়ে না থাকে এবং নিজের সাথে সাথে ও পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে জীবন কাটাতে পারে।

তৃতীয় একক

ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণপদ্ধতি

(Hearing Impaired Children: Meaning, Identification, Types, Methods of Teaching)

ভূমিকা (Introduction):

ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুরাও মূলত ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটির স্বীকার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় তথা কানের কোন অংশে ত্রুটি দেখা দিলে শ্রবণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। কানের ঠিক কোন অংশে কী জাতীয় ত্রুটি হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে শ্রবণজনিত ত্রুটি বিভিন্ন প্রকারের হয়। কানের ত্রুটি বহিঃকর্ণ থেকে শুরু করে মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় স্বাভাবিক শিশু বিভিন্ন রোগব্যাধির কারণে বা দুর্ঘটনার ফলে শ্রবণক্ষমতা হারায়। কোন শিশু বধির কি না তা নির্ণয় করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

অর্থ (Meaning):

মূলত শ্রবণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ব্যাহত শ্রবণ ক্ষমতাকে প্রধানত বধির বা কানে খাটো বলা হয়।

বধির :

যাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কোন কার্যকারিতা থাকেনা অর্থাৎ জন্ম থেকেই এরা শ্রবণে অক্ষম, তাদের বধির বলা হয়। এদের শ্রবণ ক্ষমতা এতটাই নষ্ট হয়েছে যে, শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ে বা সাহায্য ছাড়া অন্যের শব্দ শুনতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মনোবিদ্ অ্যালিস স্ট্রেঞ্জ বলেছেন— জন্ম থেকে যে শিশু শ্রবণ শক্তিহীন হয়ে জন্মায় অথবা যে শিশু এই ক্ষমতা হারিয়েছে প্রাক্-শৈশবে বাচনিক ভঙ্গি অর্জন করা এবং ভাষার বিকাশের আগে তাকে বলা হয় বধির।

মূলত যে শিশু জন্মাবার পর প্রথম দুই বা তিন বছরের মধ্যে শ্রবণশক্তিহীনতায় ভোগে এবং স্বাভাবিক কারণেই এই সময়ের মধ্যে যারা ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে পারেনা তাদের বধির বলে বিবেচনা করা হয়। বধিরতা মূলত হল এমন ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা যার ফলে শিশু/ব্যক্তি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে কোনভাবেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সমর্থ হয় না এবং এর ফলে শিশুর শ্রবণক্ষমতা ব্যাহত হয়ে থাকে।

কানে খাটো :

যারা একটা নির্দিষ্ট উচ্চমাত্রার শব্দ সরাসরি শুনতে পায় অথবা শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে শুনতে পায় তাদের কানে খাটো বলা হয়। এরা শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে অন্যের শব্দ অতি কষ্টে শুনতে সক্ষম।

চিহ্নিতকরণ (Idetification):

নিম্নলিখিত আচরণ বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা শিশুদের চিহ্নিত করা যায়—

১) প্রায়শই পেছন থেকে ডাকলে সাড়া দেয় না।
২) মৌখিক ভাষণের সময় শিশুরা অমনোযোগী থাকে।
৩) ভাষা শিখতে এদের বিলম্ব হয়।
৪) নির্দিষ্ট মুষ্টিমেয় শব্দাবলি ব্যবহার করে।
৫) মৌখিক শব্দের উপস্থাপনা শিশুর নিকট অসুবিধাজনক বলে মনে হয়।
৬) শব্দের উৎস বা বক্তার দিকে মাথা ঘোরায় বা ঝুঁকিয়ে রাখে।
৭) রেডিও, টেলিভিশন, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি অতিরিক্ত উচ্চ শব্দে বাজায়।
৮) কানে সংক্রমণ দেখা যায় এবং পুঁজ নির্গত হয়।
৯) কানের বাহ্যিক গঠনে অসংগতি দেখা যায়।
১০) শ্রেণিকক্ষে কোন বিষয় শিক্ষককে বারবার বলার জন্য অনুরোধ করা।
১১) এই সমস্ত শিশুদের শব্দ উচ্চারণে ব্যাপক অসংগতি লক্ষ্য করা যায়।
১২) এই সমস্ত শিশুরা সাধারণত চঞ্চল প্রকৃতির, কম মনোযোগ সম্পন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে।
১৩) লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে এই সমস্ত শিশুদের লিঙ্গা, বিশেষ্য, ক্রিয়া, কাল, বাক্যাংশ ইত্যাদির ব্যবহারজনিত ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়।
১৪) স্বভাবের দিক থেকে এই সমস্ত শিশুরা সাধারণত অন্তর্মুখী ও বদমেজাজী হয়ে থাকে।
১৫) শব্দার্থ, বিমূর্ত চিন্তন, বাক্যের জঠিল গঠন প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অসুবিধা পরিলক্ষিত করা যায় ইত্যাদি।

প্রকারভেদ (Types):

যে শিশু/ব্যক্তি 25 ডেসিবেল তীব্রতা সম্পন্ন শব্দ শুনতে পায় তাকে স্বাভাবিক শ্রবণ যুক্ত ব্যক্তি বলে। মূলত কত ডেসিবেল প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায়, তার উপর নির্ভর করে ব্যাহত শ্রবন ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের কয়েকটি প্রকারে বিভক্ত করা যায় এবং সেগুলো হল নিম্নরূপ:—

ক) অতি সামান্য মাত্রা : এই সমস্ত শিশু 26 ডেসিবেল (dB) থেকে 40 ডেসিবেল (dB) পর্যন্ত প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায়। এদের ক্ষীণ বা ফিশফিশ শব্দ শুনতে অসুবিধা হয়, এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণক্ষমতার শতকরা হার হল প্রায় 40%।

খ) মৃদু মাত্রা : এই সমস্ত শিশু 41 ডেসিবেল (dB) থেকে 55 ডেসিবেল (dB) পর্যন্ত প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায়। এরা মুখোমুখি কথা শুনতে পারে। অন্তত 3 থেকে 5 ফুট দূরে থেকে বাক্যালাপ করতে পারে। এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণক্ষমতার শতকরা হার হল প্রায় 40% থেকে 50%।

গ) মধ্যম মাত্রা : এই সমস্ত শিশু 56 ডেসিবেল (dB) থেকে 70 ডেসিবেল (dB) পর্যন্ত প্রাবল্যের

শব্দ শুনতে পায়। সাধারণ বাক্যলাপে এই সমস্ত শিশুদের বাক্যালাপে অসুবিধা হয়। এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণক্ষমতার শতকরা হার হল প্রায় 50% থেকে 75%।

ঘ) গুরুতর মাত্রা : এই সমস্ত শিশু 71 ডেসিবেল (dB) থেকে 90 ডেসিবেল (dB) পর্যন্ত প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায়। এরা প্রচণ্ড চিৎকার ও জোরে কথা শুনতে পারে। এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণক্ষমতার শতকরা হার হল প্রায় 75% থেকে 90%।

ঙ) চূড়ান্ত মাত্রা : এই সমস্ত শিশু 91 ডেসিবেল (dB) বা এর বেশি প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায়। এরা প্রবল উচ্চ স্বরে শব্দও ঠিকভাবে শুনতে পায় না। এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণক্ষমতার শতকরা হার হল 90% থেকে 100%।

চ) বধির : এই ধরনের শিশু কোন প্রকার শব্দই শুনতে পায় না। এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণ ক্ষমতার শতকরা হার হল সম্পূর্ণ 100%।

আবার, বয়স অনুযায়ী ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা:—

ক) জন্মগত বধিরতা : জন্মগতভাবে যারা কোনকিছুই শুনতে পায়না, তারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

খ) সংগঠিত বধিরতা : যে সমস্ত শিশু জন্মের পর ভালভাবে শুনতে পেলেও পরবর্তীকালে কোন রোগব্যাধি যা অন্য কোন কারণে শুনতে পায়না, তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আবার, শিক্ষাগত দিক থেকেও ব্যাহত শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা:—

অ) যে সমস্ত শিশু 41 ডেসিবেল (dB) থেকে 55 ডেসিবেল (dB) পর্যন্ত প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায় তাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আ) যে সমস্ত শিশু 56 ডেসিবেল (dB) থেকে 70 ডেসিবেল (dB) পর্যন্ত প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায় তাদের মাঝে মাঝে বিশেষ বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ই) যে সমস্ত শিশু 71 ডেসিবেল (dB) থেকে 90 ডেসিবেল (dB) পর্যন্ত প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পায় তাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং এই সমস্ত শিশুদের শ্রুতি, ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

ঈ) যে সমস্ত শিশু 91 ডেসিবেল (dB) বা তার প্রাবল্যের অধিক শব্দ শুনতে পায় তাদের বিশেষ বিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যাস্থার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

আবার, কোন অঙ্গের বৈকল্যের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসকগণ ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের আরোও দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা:-

১) পরিবহণগত (Conductive): এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণ ক্ষমতার কারণ হল এদের বহিঃ কর্ণ বা মধ্যকর্ণের মধ্যে কোন সমস্যা রয়েছে। তবে মূলত এদের ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা মারাত্মক নয় এবং চিকিৎসা ও শ্রবণযন্ত্রের মাধ্যমে এদের কিছুটা উন্নতি করা সম্ভব হয়।

২) **জ্ঞানেন্দ্রিয় বা স্নায়ুগত (Sensorineural):** এই ধরনের শিশুদের ব্যাহত শ্রবণ ক্ষমতার কারণ হল এদের অন্তঃকর্ণের, শ্রুতি স্নায়ু বা মস্তিস্কের কোন সমস্যা। এদের ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা অত্যন্ত মারাত্মক এবং চিকিৎসা ও শ্রবণযন্ত্রের মাধ্যমে এদের উন্নতি খুব বেশী একটা করা সম্ভবপর নয়।

- এছাড়াও যে শিশু জন্মকাল থেকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী তাকে 'Congenitally Deaf' বা জন্মগত বধির বলা হয়। ভাষা বিকাশের পূর্বেই তারা যেহেতু শ্রবণ প্রতিবন্ধি হয় ফলে তাদের 'Prelingual Deaf' ও বলা হয়।
- আবার, যে শিশু স্বাভাবিক শ্রবণ সক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে কোন কারণে শ্রবণ প্রতিবন্ধি হয় তাদের আকস্মিক বধির বা 'Adventiously Deaf' বলা হয় এবং ভাষার বিকাশের নিরিক্ষে এই শ্রেণীর শিশুদের 'Postlingual Deaf' ও বলা হয়।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method):

ষোড়শ শতাব্দীতে গিরিলামো কার্ডানো (Girolamo Cardano) নামক একজন ইটালীয় গণিতবিদ্ ও চিকিৎসক মূলত ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে বলেন এবং উনার হাত ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের প্রচেস্টা শুরু হয়। মূলত পেড্রো পন্‌সে ডে লিয়ন (Pedro Ponce de Leon) নামক অপর এক স্পেনীয় ব্যক্তি। যিনি স্পেনের ভাল্লাডলিড (Valladolid) শহরে বধিরদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এরপর জুয়ান পাব্‌লো বনেট (Juan Pablo Bonet) নামক অপর এক স্পেনীয় ব্যক্তি ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের জন্য অগ্রসর হন। তিনি প্রথম আঙুলের সাহায্যে বানান করে এবং শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে লেখা ও পড়ার কৌশল আবিস্কার করেন। এরপর ধীরে ধীরে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রচেস্টা শুরু হয়। ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু হয়।

মূলত ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জনক বা পথিকৃত লিয়ন (Leon) -এর ব্যবহৃত শিক্ষাদান কৌশল নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের সর্বপ্রথম ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পূর্ণ শিশুদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের অনন্য নজির সৃষ্টি করে 'De l' Epee'। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর বাড়ি প্যারিসে 1775 সালে যমজ শ্রবণ প্রতিবন্ধী দুই ভাইকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের সময় ইহা লক্ষ্য করেন যে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর চিহ্ন পদ্ধতির ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে তাদের মানসিকভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে। তিনি চিহ্ন ব্যবহার এবং শিক্ষণশৈলী রপ্ত করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যদিকে জার্মান বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল হেইরিক (Samuel Heiricke) 1778 সালে ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি এবং তাঁর অনুগামী গ্রেসার (Graser) এবং হিল (Hill)- এর পদ্ধতির কথ্যভাষার পরিবর্তে লিখিত ভাষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের বিরোধিতা করেন। Heiricke -এর মতে কথা হল চিন্তন প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম, তাই কথা বলার ক্ষমতাকে সংহত করতে হবে এবং চিহ্ন মাধ্যমকে ব্যবহারের প্রবনতাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

পদ্ধতিগত বিতর্কের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়– যখন থমাস থপকিনস্ গলদে (Thomas Hopkins Gallaudet) এর পুত্র এডওর্য়াড মিলার গলদে (Edward Miller Gallaudet) কায়িক ও মৌখিক পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের কথা বলেন। অন্যদিকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল (Alexandar Graham Bell) অভিমত প্রকাশ করেন যে চিহ্ন পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা রপ্ত করার আগ্রহ ও ক্ষমতা বিনষ্ট করে তাদের ক্ষতি করছে, তাই তিনি এই চিহ্ন পদ্ধতি বন্ধের সুপারিশ করেন।

পদ্ধতি সংক্রান্ত বিতর্কের অবসানে এবং ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 1880 সালে ইতালিতে এক আন্তর্জাতিক অধিবেশনের সূচনা হয়। সেই অধিবেশনের সির্দ্ধান্ত অনুযায়ী একমাত্র মৌখিক পদ্ধতি সারা ইউরোপে ব্যবহার হতে শুরু করে। কিন্তু অনেক দেশ মৌখিক - কায়িক মিশ্র পদ্ধতি চালু রাখে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রাদি ক্রমে সহজলভ্য হওয়া শুরু করে। ফলে যন্ত্র ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই ব্যাহত শ্রবণক্ষমতার মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং সকল শিশুকে শিক্ষার মূলস্রোতে আনয়ন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে থাকে। এই শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রাদিসমূহ, ব্যাহত শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষণ পদ্ধতির বহুল প্রচলিত কিছু হল নিম্নরূপ:—

১) মৌখিক- শ্রবণ এবং ওষ্ঠ পাঠ : মৌখিক পদ্ধতিতে শ্রবণ ও ওষ্ঠপাঠকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু চিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার করা হয় না। এই শ্রবণ পদ্ধতিকে মূলত অনুসরণ করলেও স্পর্শ ও দর্শন ইন্দ্রিয়দ্বয়কে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়।

২) মৌখিক শ্রবণ এবং শব্দের কায়িক উপস্থাপনা পদ্ধতি : এই পদ্ধতি ওষ্ঠ পাঠ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কথা বলার সময় উচ্চারিত শব্দ বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয় এই পদ্ধতিতে।

৩) মৌখিক শ্রবণ ও অঙ্গুলী বানান পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে বক্তব্য পেশের সাথে সাথে শিক্ষক আঙ্গুল ব্যবহার করে ব্যবহৃত শব্দের বানান প্রদর্শণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের বক্তব্যকে আঙ্গুল ব্যবহারের মাধ্যমে অনুকরণ করতে বলা হয়। শিক্ষার্থীদের বানান নিজেদের প্রদর্শণ করা এবং লিখনের সমতুল্য বলে গন্য করা হয়।

৪) এক ভাষা ও দুই পদ্ধতির যোগাযোগ পদ্ধতি : যে ভাষা বহুল প্রচলিত সেই ভাষাতেই শিক্ষক কথন ও চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন।

৫) শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রভিত্তিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতি মূলত আংশিকভাবে ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান অনেকাংশে সার্থক বলে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে অত্যন্ত সংবেদনশীল সূক্ষ্ম শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র (Sensitive Hearing Aid) তৈরি হয়েছে। যার সাহায্যে শিক্ষাদান সহজ হয়।

৬) দর্শনভিত্তিক পদ্ধতি : ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের দর্শনভিত্তিক পদ্ধতিতেও মনের ভাব প্রকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে বর্ণ সংকেত ব্যবহার করে এবং এইসব প্রতীকের ব্যবহার দেখিয়ে দেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উচ্চারণের সময় মুখের আকৃতি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে এবং পরে শিশুরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শিক্ষকের মতো মুখভঙ্গি করে শব্দ উচ্চারণ করার চেষ্টা করে এবং ধীরে ধীরে তা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

৭) সঞ্চালন পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে হাতের অঙুল নাড়াচড়ার মাধ্যমে আঙুলের সাহায্যে বিভিন্ন আকৃতি দেখিয়ে মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হয় এবং শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করতে পারে। এই পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন শিক্ষাবিদ পিরিয়ার (Pereire)।

৮) কম্পন ও স্পর্শ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের শব্দ উচ্চারণ করার সময় শিক্ষকের গালে হাত রেখে বা কণ্ঠনালির উপর হাত রেখে শব্দ কম্পনের স্পর্শানুভূতি উপলব্ধি করতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনুরূপ শব্দকম্পন সৃষ্টি করে বাচনিক বিকাশ ঘটায়। এই পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন দুই বিখ্যাত শিক্ষাবিদ– কেইট অলকর্ন (Kate Alcorn) এবং সোফিয়া অলকর্ন (Sophia Alcorn)।

উপসংহার (Conclusion):

ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে এই ধরনের শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতি সর্বদাই নমনীয় হতে হবে এবং এই প্রসঙ্গে এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে, স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকগণই হলেন শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষক। সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতিগুলোকে সার্থক করে তোলা যায়।

চতুর্থ একক

শিখনমূলক অক্ষমতা: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষকের ভূমিকা

(Learning Disability: Meaning, Identification, Types, Role of Teacher)

ভূমিকা (Introduction):

বিদ্যালয়ে সর্বত্রই কিছু কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক, কিন্তু শিখনের দিক থেকে পিছনের সারিতে কারণ এদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় না। বার বার একই শ্রেণিতে থাকতে থাকতে অনেক শিক্ষার্থীয় পড়া ছেড়ে দেয়। বিভিন্ন সময়ে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে যেমন, কখনও বলা হয়েছে মস্তিস্ক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত, কখনও বলা হয়েছে মস্তিস্ক সামান্য নিস্ক্রিয়তা দোষযুক্ত, কখনও বলা হয়েছে মন্থর শিক্ষার্থী, আবার কখনও বলা হয়েছে প্রত্যক্ষণজনিত প্রতিবন্ধী, আবার কখনও বা পঠন অক্ষম শিক্ষার্থী ইত্যাদি।

কিন্তু 1963 সালে নিউ ইয়র্ক শহরে অভিভাবকদের এক সভায় স্যামুয়েল অ্যালেকজাণ্ডার কার্ক (Samuel Alexander Kirk) এইসব নামের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের এই সমস্যাকে শিখন অক্ষম (Learning Disabled) নামে চিহ্নিত করার প্রস্তাব দেন। সেই সময় শিখন অক্ষম শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা শিখন অক্ষম শিশুদের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন এবং এর নাম দেওয়া হয় 'Association for Children With Learning Disability'। পরে এই সমিতিকে পেশাদার সংগঠনগুলো স্বীকৃতি দেয় এবং শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) নামটি বিশেষ শিক্ষায় (Special Education) স্থায়ীভাবে গৃহীত হয়।

অর্থ (Meaning):

শিখন অক্ষমতা শিক্ষার্থীর মৌলিক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলার ফল যা মূলত ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ কারণে ঘটে থাকে যেমন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে কাজ করার অক্ষমতা, তথ্য প্রক্রিয়াকরণে অক্ষমতা প্রভৃতি। অনান্য দৈহিক, মানসিক, স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে অনেক সময় শিখন প্রতিবন্ধকতা ঘটে থাকলেও এটি কোন প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতার ফল নয়। শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের মূলত বুদ্ধ্যাঙ্ক (I.Q.) স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকলেও তারা শিখনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে একটু বেশি সময় নিয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণি ও বয়সের অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিখনের বিকাশে এরা একটু পিছিয়ে থাকে। শিখন অক্ষমতা মূলত একটি বা দুটি জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে যেমন– ভাষা সংযোগে অক্ষমতা, গণিত বা সামাজিক কোন দক্ষতা সাধনে অক্ষমতা প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্যভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে শিখনে সাময়িক বা স্বল্প কোন কারণে অসমর্থ হলেই কোন শিক্ষার্থীকে শিখন অক্ষম বলে চিহ্নিত করা যায় না এবং যাদের তীব্র ও স্থায়ীভাবে শিখনে অক্ষমতা রয়েছে তারাই শিখন অক্ষম (Leanning Disable) বলে পরিচিত।

আমেরিকাতে অবস্থিত Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)- এ শিখন অক্ষমতার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছিল তা বিশ্বের সর্বত্র গৃহীত হয়েছে এবং তা হল নিম্নরূপ —

বিশেষ শিখন অক্ষমতা এক বা একাধিক মানসিক প্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা যার প্রয়োজন হয় মৌখিক, লিখিত ভাষার বোধ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং যার প্রকাশ ঘটে কথা শোনার, চিন্তা করার, কথা বলার, পড়া, লেখা, বানান করা, অঙ্ক কষার অনিপুণ সক্ষমতার মাধ্যমে। এর মধ্যে আছে প্রত্যক্ষণের অক্ষমতা, মস্তিস্কের আঘাত, ন্যূনতম মস্তিষ্কের সক্রিয়তার অভাব, পঠন অক্ষমতা ও বিকাশমূলক মূক অবস্থা ইত্যাদি। আবার, শিখন অক্ষমতার মধ্যে যে সমস্ত শিখনের সমস্যার প্রধান কারণ, দৃষ্টি, শ্রবণ ও সঞ্চালনমূলক অক্ষমতা, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, প্রক্ষোজনিত বিশৃঙ্খলা অথবা পরিবেশ, কৃষ্টি ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতা সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(IDEA - Special Learning Disability is a disorder is on or more of the basic psychological process involved in understanding or in using language, spoken or written, that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or do mathematical operations, iucluding condition such as perceptual disabilities, brain injury, minimal, brain dysfunction, dyslexia and developmental aphasia. However SLDs do not include learning problems that are primarily the result of visual, hearing or motor disabilities or mental retardation, of emotional disabilities or of environmental, cultural or economic disadvantages.)

1980 সালে গিয়ারহার্ট এবং উইসহ্যান (Gearheart and Weishan) বলেছিলেন– শিখন অক্ষম শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পড়ায়, লেখায়, বানান করায়, অঙ্ক কষায়, কথা বলায়, চিন্তা ভাবনায় বা মনোযোগ সহকারে শোনায় ইতস্তত বিশৃঙ্খলভাব প্রকট হয়ে উঠে। এই ক্ষমতা আবার প্রয়োগের (কথ্য বা লিখিত) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। কাউকে শিখনে অক্ষম বলতে গেলে তার মধ্যেকার সুপ্ত ক্ষমতা অনুযায়ী তার যতটা সাফল্য লাভ করার কথা বলে মনে হয়েছিল এবং বাস্তবে যা করতে পারলো তার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

নিকোলাস হবস্ (Nicholas Hobbs) এর মতে– শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশু হল তারাই যারা বয়স অনুযায়ী শিক্ষার এক বা একাধিক দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে থাকে কারণ এদের প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যক্ষণ-সঞ্চালন সমন্বয়ে প্রতিবন্ধকতা আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ, সংবেদন, সঞ্চালন প্রভৃতি মানসিক তথা শারিরীক-মানসিক ত্রুটির জন্য এদের সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেনা, শিখনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে।

Individuals with Disabilities Edcation Act কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল– Specific learning disability refers to a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding, or in using larguage, spoken or written that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, spell or do mathematical operations.

(শিখন অক্ষমতা হল– ভিত্তিমূলক এক বা একাধিক মানসিক প্রক্রিয়ার সমস্যা, যেমন — বুঝবার ক্ষেত্রে, কথা ও লিখিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইত্যাদি। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিক্ষার্থীর শ্রবণ, চিন্তন, কথন, পঠন, লিখন্, বানান করা, গাণিতিক সমাধান করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে।)

USA -এর Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) Amendment 1997 সালে যে সংজ্ঞা দিয়েছিল তা হল—

সাধারণভাবে শিখন অক্ষমতা হল একধরনের অক্ষমতা যা শিক্ষার্থীর মৌখিক ও লিখিত, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং অনুধাবণ সংক্রান্ত এক বা একাধিক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গো যুক্ত এবং এই ক্ষমতা কোন বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনা, চিন্তা করা, কথা বলা, পাঠ করা, লেখা, বানান করা এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। (IDEA Amendment: In general the term specific learning disabilities means a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using language, spoken or written, the disorder may manifest itself imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or do methematical calculation.)

সুতরাং, শিখন অক্ষমতা হল শিক্ষার্থীর শিখন ও বোধের অক্ষমতাকে বুঝায় যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিটি শিশুর জন্য অন্তর্নিহিত ও মৌলিক। এই শিখন অক্ষমতা একান্তভাবে নির্দিষ্ট কোন শিখন ও সমস্যা সমাধানে অসাফল্যকে বোঝায়। এই শিখন অক্ষমতা অন্যান্য দৈহিক, মানসিক আচরণগত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গো একযোগে দেখা দিতে পারে। তবে এই শিখন অক্ষমতা এই সমস্ত মূল প্রতিবন্ধকতা (যেমন— মানসিক পশ্চাদপদতা, আচরণগত সমস্যা, প্রাথমিক সংবেদনগত অক্ষমতা ইত্যাদি)-এর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফল নয়।

চিহ্নিতকরণ (Idintification):

শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) যাদের আছে এমন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করণ করা সম্ভবপর হয়ে থাকে বিভিন্ন শিখনমূলক আচরণ সংক্রান্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এবং এর মধ্যে কিছু হল নিম্নরূপ:

১) থেমে থেমে বানান করে পড়া বা পড়ার অনীহা।

২) একটি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ ক্রমপর্যায়ে না পড়া অর্থাৎ আগের শব্দ পড়ে বা পড়ের শব্দ অগে পড়া।

৩) অস্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়া।

৪) অস্পষ্ট হাতের লেখা বা লেখার তীব্র অনীহা।

৫) ভাঙ্গা ভাঙ্গা মাত্রাহীন অক্ষর লেখা।

৬) আগের অক্ষর পরে বা পরের অক্ষর আগে লিখে ভুল শব্দ লেখা।

৭) অসম্পূর্ণ অঙ্ক কষা।

৮) সংখ্যা লিখতে লিখতে হয় বাদ দেওয়া বা অন্য সংখ্যা লেখা।

৯) সংখ্যার সারণি ভুল করা।

১০) কথ্য ভাষা বা লিখিত ভাষার ব্যবহারের সময় যুক্তি বুঝতে না পারা ও প্রয়োগ করতে না পারা।

১১) মনোযোগের বারবার বিক্ষিপ্ততা দেখানো।

১২) শ্রেণিকক্ষে অস্থিরতা ও অতিসক্রিয়তা দেখানো।

১৩) নিয়মিত পাঠে অনাগ্রহ প্রকাশ করা বা পঠন চলাকালীন সময়ে অন্যমনস্ক থাকা।

১৪) কোন বিষয়ে বারবার ভুল বা অনুপযুক্ত ধারণা গঠন করা।

১৫) কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সংব্যাখ্যান করতে অসুবিধাবোধ করা।

১৬) কোন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ রাখতে না পারা।

১৭) মূলত গাণিতিক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সর্বদা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা।

১৮) প্রায়শই অবসাদগ্রস্থ বোধ করা।

১৯) প্রেষণার অভাব, অমনোযোগ, সমস্যা সমাধান, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও চিন্তনের অক্ষমতা।

২০) স্মৃতি, চিন্তন, মনোযোগ প্রত্যক্ষণ, সাধারণ সমন্বয় ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়।

২১) অনেক সময় অতি সক্রিয় আচরণ বা অনেক সময় মনোযোগের বিক্ষিপ্ততা প্রকাশ পায়।

২২) প্রাক্ষোভিক পরিবর্তনশীলতা প্রকাশ পায়।

২৩) যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ভুল করে কারণ যে সংখ্যাটি লেখার কথা তার পরিবর্তে অন্য সংখ্যা লেখে।

২৪) শব্দভান্ডার গঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, বাক্যের গঠন সঠিক হয় না।

২৫) প্রায়শই মনোযোগের স্বল্পতায় ভোগে এবং এদের মধ্যে ব্যাঘাত প্রবণতা (Distractibility) পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ সামান্য কারণেই এদের মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে থাকে।

২৬) প্রত্যক্ষণের সমস্যা থাকার ফলে বস্তুর অবস্থান, ছাপা বা লিখিত অক্ষরের অবস্থান ও আকৃতি সঠিকভাবে দেখতে পায় না এবং অনেক সময় শ্রবণের ক্ষেত্রেও কথপোকথনের প্রতিটি শব্দ শুনলেও বাক্যের সামগ্রিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেনা।

২৭) প্রত্যক্ষণ সঞ্চালন সমন্বয়ের আকার থাকে ফলে লেখা, পড়া, বলা ইত্যাদির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকেনা। তাই প্রায়শই ভুল বানান, ভুল কথা লিখে ফেলে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতেই।

২৮) মৌখিক নির্দেশ দিলে সহজে অনুধাবন করতে না পারা।

২৯) চিন্তনে স্পষ্টতার অভাব।

৩০) শব্দের মধ্যে কোন বর্ণ বাদ দেওয়া বা উল্টো করে পড়া।

৩১) এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সহজে যাওয়ার অক্ষমতা ইত্যাদি।

৩২) শিক্ষক বহু ইন্দ্রিয়ভিত্তিক পদ্ধতি (Multi Sensory Approach) ব্যবহার করবেন এবং এই পদ্ধতির মূল বক্তব্য হল শিক্ষার্থীর যে কোন শিখন একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে অধিক কার্যকারী হয় অর্থাৎ কোন বিষয়ের শিখনের সময় শিক্ষার্থী যদি একসঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে তাহলে তার শিখন যেমন দ্রুত হয়, তেমনি নির্ভুলও হয়। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল VAKT পদ্ধতি যেখানে—

V- Visual
A- Auditory
K- Kinesthetic
T- Tactual

যেমন– একটি গল্প পড়াতে গিয়ে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে গল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দগুলো লিখে দিলেন, যেগুলো শিক্ষার্থীদের শিখতে হবে। ওই শব্দগুলো শিখতে গিয়ে শিক্ষার্থী প্রথমে সেগুলো দেখে (Visual)। শিক্ষক কিভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করছেন তা সে শোনে (Auditory)। শিক্ষার্থী শিক্ষকের মতো করে শব্দগুলো উচ্চারণ করে (Auditory)। চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষার্থী শব্দটি চিহ্নিত করতে পারে (Kinesthetic এবং Tactual)।

শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের সঠিকভাবে শনাক্তকরণের জন্য বহু অভীক্ষা রয়েছে এবং এর মধ্যে অন্যতম হল 'Development Indicators for the Assessment of Learning' (DIAL)। এর দ্বারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পূর্বেই 2½ থেকে 5½ বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিখন অক্ষমতা চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হয়ে থাকে। ইহা ছাড়াও শিক্ষকদের সহায়তা করার জন্য NCERT 'Functional Assessment Guide' নামে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে কারণ সঠিকভাবে শিখন অক্ষমতা চিহ্নিত হয়ে গেলে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনমত প্রশিক্ষণ, সহায়তাদান ও পরিবেশ প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে অক্ষমতা দূর করার বা কম করার ব্যবস্থা করতে হয়। তবে যারা তীব্রমাত্রার শিখন অক্ষমতাযুক্ত তাজের জন্য রিসোর্স কক্ষ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ ও সহায়তা করা একান্ত প্রয়োজন। শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশুদেরকে সনাক্তকরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা সেই সনাক্তকরণ এর উপর অত্যন্ত ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল কারণ উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া এই সমস্ত শিশুদেরকে সমাজের মূল স্রোতে কখনোই ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর নয়।

প্রকারভেদ (Types):

শিখন অক্ষমতা কেবলমাত্র শিখনের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়। অন্যান্য প্রকার অক্ষমতা যেমন — দৃষ্টিগত, শ্রবণগত, পেশিগত, আবেগের প্রকাশমূলক অক্ষমতা, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ইত্যাদি শিখন অক্ষমতার সাথে সমার্থক নয়। শিখনের অক্ষমতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদ হল নিম্নরূপ:—

১) পঠন অক্ষমতা : এই অক্ষমতায় আক্রান্ত শিশু শুদ্ধভাবে সরব পাঠ করতে পারে না। তার পাঠ বারবার ব্যাহত হয়। এই পাঠ অক্ষমতাটি ডিস্‌লেক্সিয়া (Dyslexia) নামেও পরিচিত।

২) লিখন অক্ষমতা : লেখার ক্ষেত্রে বারবার যদি অক্ষরের গোলমাল, অসম্পূর্ণ বাক্যের প্রয়োগ বা চরম অনাগ্রহ দেখা যায় তবে বুঝতে হবে তার লিখনে সমস্যা আছে। সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার, ব্যাকরণের জ্ঞান, চোখ ও হাতের সমন্বয়ে একজন লিখতে পারে কিন্তু শিখন অক্ষম শিশুর এইসব ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়।

এই লিখন অক্ষমতাটি ডিস্‌গ্রাফিয়া (Dysgraphia) নামেও পরিচিত।

৩) গাণিতিক অক্ষমতা : গণিতের ক্ষেত্রে যে বিমূর্ত ধারণা প্রয়োগ, চিহ্ন ও সংকেতের ব্যবহার প্রয়োজন হয় তা অনেক শিশুই করতে পারে না। ফলে এই সমস্ত শিশুরা সংখ্যা ও চিহ্নের পুনরুদ্রেক, স্মরণ করা, সংখ্যা বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে অক্ষম হয়। এই গাণিতিক অক্ষমতাটি ডিস্‌ক্যালকুলিয়া (Dyscalculia) নামেও পরিচিত।

৪) বাচনিক ও ভাষাগত প্রকাশমূলক অক্ষমতা : কোন শিক্ষার্থীর বাক্য গঠনে বা শব্দনির্বাচনে সমস্যা হয় যা ডিস্‌নোমিয়া (Dysnomia) নামেও পরিচিত।

আবার, কোন উচ্চারণগত অক্ষমতা দেখা যায়, কথার অস্পষ্টতা থাকে বা এই জাতীয় সমস্যা থাকে যা ডিস্‌আর্থিয়া (Dysarthia) নামেও পরিচিত।

৫) কোন কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাষা বোঝার, মস্তিস্ক প্রেরিত তথ্যের সংযুক্তিকরণে বা সঞ্চালনায় যদি সমস্যা দেখা যায় তাকে বলা হয় ডিস্‌প্র্যাক্‌শিয়া (Dyspraxia)।

এছাড়াও মনোযোগের সমস্যা Attention Deficit Disorder বা ADD বা মনোযোগহীনতা ও অতিসঞ্চলতার সমস্যা (Attention Deficiency and Hyper Activity Disorder বা ADHD) ও শিখন অক্ষমতা রূপেও বর্তমানে গণ্য করা হয়ে থাকে।

শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher):

শিখন অক্ষমতা একটি শিখন সংক্রান্ত সমস্যা এবং এই সমস্যা শিশুর পঠন, লিখন, বানান করা, অঙ্ক কষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বিভিন্ন কারণে প্রায়শই সহজলভ্য হয় না। সুতরাং বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকদেরই শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করতে হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল নিম্নরূপ —

১) ছোট ছোট সহজ এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২) শিক্ষার্থী যতটুকু শিখল তা বারবার প্রয়োগ ও অভ্যাস করানো দরকার কারণ এর মাধ্যমে শিখনের সামান্যিকরণ (Generalisation) সম্ভবপর হবে অর্থাৎ শিখনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা যায়।

৩) কোন বিষয় পাঠ বা আলোচনা করার জন্য এবং উত্তর দানের জন্য শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

৪) যেকোন বিষয়ের প্রধান প্রধান দিকগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫) সঠিকভাবে মৌখিক বা লিখিত আকারে শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশ দিতে হবে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে।

৬) বিভিন্ন শিক্ষণ-প্রদীপন ব্যবহার করতে হবে এবং সেগুলো যথেষ্ট সময় নিয়ে ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপন করতে হবে।

৭) শিখন বিষয়বস্তু খুব ধীরে ধীরে উপস্থাপন করতে হবে।

৮) কোন বিষয় সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য সে বিষয়টিকে শিক্ষক যথাযথ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

৯) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত বা সমধর্মী বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার অভ্যাস শিক্ষক তৈরি করবেন।

১০) প্রতিটি শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীর প্রতিটি সামান্য সাফল্যের জন্য শিক্ষক প্রশংসা করবেন যাতে এই ধরনের শিক্ষার্থীরা শিখনে উৎসাহ পায়।

১১) শিক্ষক বিষয়বস্তু ও নির্দেশকে সর্বদা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে রাখবেন যাতে শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশুরা তা ধীরে ধীরে পড়তে পারে এবং তা অনুধাবন করতে পারে।

১২) শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রম উন্নতি (Progress) পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন।

১৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন।

১৪) শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। এতে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সহজ এবং ত্বরান্বিত হয়ে থাকে।

১৫) পঠন সংক্রান্ত বিষয় কমাতে পেনড্রাইভে রেকডকৃত বই ব্যবহার করবেন।

১৬) যে সমস্ত শিক্ষার্থীর মনোযোগ সহজেই নষ্ট হয়, তাদের হয় সামনে নয়তো শ্রেণিকক্ষের মাঝখানে বসাতে হবে।

১৭) শিক্ষক যে সবসময় পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাদানে অগ্রসর হতে পারবেন তা নয়; সুতরাং প্রয়োজনবোধে পরিকল্পনা দ্রুত পরিবর্তিত করার মত মানসিকতা ও ক্ষমতাও তাঁর থাকা চাই।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে Applied Behaviour Analysis (ABA) -এর ধাপ বা স্তরগুলো এবং এই ধাপ বা স্তরগুলো হল নিম্নরূপ —

পরিবর্তনীয় আচরণ নির্দিষ্টকরণ

↓

আচরণটির পরিমাপ

↓

তথ্য সংগ্রহ

↓

আচরনের মূল্যায়ন

↓

লব্ধ ফলের সংরক্ষণ

↓

পুনরায় চেষ্টা

↓

সাফল্যের জন্য পুরস্কার বা প্রশংসা

↓

কৌশলগুলোর উন্নতি

↓

সাফল্যের হার সুনির্দিষ্ট ও সহজভাবে চার্ট বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন।

যেহেতু শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের দ্বায়িত্বই প্রধান তাই শিক্ষককে অবশ্যই তার ভূমিকা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ও যত্নবান থাকতে হবে যাতে প্রতিটি শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশু সার্থকভাবে শিক্ষা পেতে পারে।

উপসংহার (Conclusion):

শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। যেখানে মৃদু সম্যব্যস্ত বা স্বল্প মাত্রায় শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের দ্বারা সাধারণ শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে আনা যায় সেখানে তীব্র মাত্রায় শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শ্রেণীকক্ষ ও দক্ষ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। যেহেতু সমাজকে অগ্রসর হতে হলে প্রয়োজন সমাজস্থ সকল ব্যক্তির অগ্রগতি; সমাজের মূলস্রোতের বাইরে শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের রাখলে সমাজের মূল চালিকাশক্তিই ব্যাহত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ, এদের প্রকারভেদ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ নির্মাণ ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সুনিশ্চিত করা।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা : অর্থ, উদ্দেশ্যসমূহ, উপাদানসমূহ, বাধাসমূহ

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সমস্ত ধরণের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা নিষ্ক্রিয় শিক্ষা গ্রহণকারী হিসেবে বিদ্যালয়ে থাকবে, বিদ্যালয়ের সমস্ত রকমের কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা এবং নিশ্চিত করা হলেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সকল হতে পারবে।

এটি হল এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যার দ্বারা শিক্ষার বৃত্তের বাইরে যারা আছে তাদের সকলকে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করাই হল মূল লক্ষ্য। এটি হল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যার মূল লক্ষ্য হল, শিক্ষার বৃত্তের বাইরে যেসকল শিশুরা রয়েছে তাদের সকলকে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা। শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত কিংবা অন্য যে কোনো শিক্ষার্থীর সমস্যা যা থাকুক না কেন তাকে বিদ্যালয়ের প্রবেশের অধিকার দেওয়াই হল অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা।

সুতরাং বলা যায় যে কোনো পরিস্থিতিতেই শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়াই হল অর্ন্তভুক্তিমূলকশিক্ষা এবং এই শিক্ষায় ব্যাহত ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু, উন্নত মেধাসম্পন্ন শিশু, পথশিশু, উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশু, ভাষাগত বা সংস্কৃতির দিক থেকে সংখ্যালঘু এমন সম্প্রদায়ের শিশু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশু ইত্যাদি প্রত্যেকের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় একক

ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণ পদ্ধতি

পূর্ণ দৃষ্টিহীন বা অন্ধ মানুষ বলতে বুঝায় যাদের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নেই এবং আলোকরশ্মির উৎস অনুধাবন করতে পারেনা। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা শিশুর/ব্যক্তির জ্ঞানমূলক বিকাশ, সঞ্চালনমূলক বিকাশ এবং সামাজিক বিকাশ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে থাকে। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে তাকে ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বলা হয়। এই ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়।

তৃতীয় একক

ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশু: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষণপদ্ধতি

ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুরাও মূলত ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটির স্বীকার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় তথা কানের কোন অংশে ত্রুটি দেখা দিলে শ্রবণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। কানের ঠিক কোন অংশে কী জাতীয় ত্রুটি হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে শ্রবণজনিত ত্রুটি বিভিন্ন প্রকারের হয়। কানের ত্রুটি বহিঃকর্ণ থেকে শুরু করে মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় স্বাভাবিক শিশু বিভিন্ন রোগব্যাধির কারণে বা দুর্ঘটনার ফলে শ্রবণক্ষমতা হারায়। কোন শিশু বধির কি না তা নির্ণয় করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

চতুর্থ একক

শিখনমূলক অক্ষমতা: অর্থ, চিহ্নিতকরণ, প্রকারভেদ, শিক্ষকের ভূমিকা

বিদ্যালয়ে সর্বত্রই কিছু কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক, কিন্তু শিখনের দিক থেকে পিছনের সারিতে কারণ এদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় না। বার বার একই শ্রেণিতে থাকতে থাকতে অনেক শিক্ষার্থীয় পড়া ছেড়ে দেয়। বিভিন্ন সময়ে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে যেমন, কখনও বলা হয়েছে মস্তিস্ক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত, কখনও বলা হয়েছে মস্তিস্ক সামান্য নিস্ক্রিয়তা দোষযুক্ত, কখনও বলা হয়েছে মন্থর শিক্ষার্থী, আবার কখনও বলা হয়েছে প্রত্যক্ষণজনিত প্রতিবন্ধী, আবার কখনও বা পঠন অক্ষম শিক্ষার্থী ইত্যাদি।

কিন্তু 1963 সালে নিউ ইয়র্ক শহরে অভিভাবকদের এক সভায় স্যামুয়েল অ্যালেকজাণ্ডার কার্ক (Samuel Alexander Kirk) এই সব নামের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের এই সমস্যাকে শিখন অক্ষম (Learning Disabled) নামে চিহ্নিত করার প্রস্তাব দেন। সেই সময় শিখন অক্ষম শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা শিখন অক্ষম শিশুদের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন এবং এর নাম দেওয়া হয় 'Association for Children With Learning Disability'। পরে এই সমিতিকে পেশাদার সংগঠনগুলো স্বীকৃতি দেয় এবং শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) নামটি বিশেষ শিক্ষায় (Special Education) স্থায়ীভাবে গৃহীত হয়।

অনুশীলনী

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) ব্রেইল পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?
২) ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সঞ্চালন পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?
৩) E-9 গোষ্ঠীর সম্মেলন কবে হয়েছিল?

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) ডিস্‌লেক্সিয়া কাকে বলে?
২) ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের জন্য কম্পন ও স্পর্শ পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?
৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কি?

৩ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৬০টি শব্দ

১) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য লিখ।
২) ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের কয়েকটি আচরণগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কয়েকটি বাধা উল্লেখ কর।

৪ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১০০টি শব্দ

১) ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের প্রকারভেদ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
২) ব্যাহত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
৩) শিখনমূলক অক্ষমতার প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখ।

সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান

প্রথম একক	:	রাশিবিজ্ঞান : অর্থ, শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, পরিসংখ্যা বিভাজন
দ্বিতীয় একক	:	লেখচিত্রে তথ্য পরিবেশন : অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র, পরিসংখ্যা বহুভুজ
তৃতীয় একক	:	কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ : গড়, মধ্যমমান, ভুয়িষ্টক
চতুর্থ একক	:	বিষমতার পরিমাপ : সম্যক বিচ্যুতি

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান

(Statistics in Education)

উদ্দেশ্য (Ovjectives):

- শিক্ষার্থীরা রাশিবিজ্ঞান-এর অর্থ, শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিসংখ্যা বিভাজন সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা লেখচিত্রে তথ্য পরিবেশন (অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র, পরিসংখ্যা বহুভুজ) সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ (গড়, মধ্যমমান, ভুযিষ্টক) সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা বিষমতার পরিমাপ (সম্যক বিচ্যুতি) সম্পর্কে অবগত হবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face) :

আধুনিক যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলো তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে এবং এই সুপরিকল্পিত তথ্যভিত্তিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের উন্নয়ন সাধন করছে। বর্তমানে বিশ্ব, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজ্য প্রতিটি স্তরের তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে সমাজের নানা দিকে রাশিবিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার ঘটেছে। যেমন— অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, স্বাস্থ্য, গবেষণা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

রাশিবিজ্ঞান হল এমন এক বিজ্ঞান, যার সহায়তায় কোনও বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা, তাকে বিন্যস্ত করা, পরিসংখ্যা বিভাজনে সাজিয়ে গাণিতিক পদ্ধতিতে তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। কার্যের প্রকৃতিভেদে কোনও কোনও ক্ষেত্রে লেখচিত্রের মাধ্যমেও তথ্যাদি পরিবেশন করা হয় এবং তাৎপর্য নির্ণীত হয়। যেমন— পরিসংখ্যা বহুভুজ বা ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন, হিস্টোগ্রাম ইত্যাদি। আবার পরীক্ষানিরীক্ষা, সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে রাশিবিজ্ঞান পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়। রাশিবিজ্ঞানের কয়েকটি পরিমাপের পদ্ধতি এই বিন্যস্ত তথ্যাবলীর তাৎপর্য নির্ণয়ে বিশেষভাবে সহযোগীতা করে। এই পরিমাপকে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ। সাধারণত রাশিবিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার তিনরকম পরিমাপ আছে। সেগুলো হল গড় (Mean), মধ্যমমান (Median) এবং ভুযিষ্টক (Mode)। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের মাধ্যমে কেন্দ্রে থাকা এককের বৈশিষ্ট্যকে সমষ্টিগত ফলাফলের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার মান শিক্ষামূলক তথ্য বিশ্লেষণ, তার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশন, শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মান নির্ণয়, শিক্ষার্থীর সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয়, ব্যাপক তাৎপর্য নির্ণয় এবং সামগ্রিক শিক্ষামূলক মূল্যায়নে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলোর দ্বারা সমষ্টিগতভাবে কতকগুলো স্কোরকে একক মান দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যদি স্কোরগুলোর কোনও একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ ওই শ্রেণির পারদর্শিতার প্রতিনিধি স্থানীয় মান প্রকাশ করে। কিন্তু ওই শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষার্থী কি ধরনের পারদর্শিতার মান অর্জন করছে তা ওই কেন্দ্রীয়মান দ্বারা বোঝানো যায় না। তাই কেন্দ্রীয়মানের দুদিকে অর্থাৎ ওপরে এবং নীচে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মান বোঝানোর জন্য বা একটি স্কোর বণ্টনে, স্কোরগুলো কেন্দ্রীয়মানের দুদিকে কিভাবে আছে তা বোঝানোর জন্য এক ধরনের পরিমাপ ব্যবহার করা হয়। এই পরিমাপকে বলা হয় বিষমতার পরিমাপ। সম্যক পার্থক্যও এক ধরনের বিষমতার পরিমাপ। আধুনিককালে সম্যক পার্থক্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়।

প্রথম একক

রাশিবিজ্ঞান : অর্থ, শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, পরিসংখ্যা বিভাজন

(Statistics : Meaning, Need of Statistics in Education, Frequency Distribution)

ভূমিকা (Introduction) :

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাকে পরিমাপের উদ্দেশ্যে মানুষ নানারকম প্রচেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে প্রমাণ হয়েছে যে গতানুগতিক ঐ পদ্ধতি গুলি ছিল ত্রুটি পূর্ণ। আধুনিককালে নির্ভুল পরিমাপের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গণিতের যে শাখার দ্বারস্থ হয়েছে তা হল রাশিবিজ্ঞান বা Statistics.

অর্থ (Meaning) :

ইংরেজী 'Statistics' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Status' ইতালীয় শব্দ 'Statista' বা জার্মান শব্দ Statistik থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'Status' এবং 'Statistik' শব্দের অর্থ 'রাষ্ট্র'। আর 'Statista' শব্দের অর্থ 'রাষ্ট্রের কার্যাবলী'।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করে তাই বলা যায় যে রাষ্ট্রে কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত ধারনা থেকেই রাশিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন তথ্য, যেমন— লোকসংখ্যা, রাজস্বের পরিমান, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি হিসাবের জন্য এটি ব্যবহৃত হত। তবে প্রচীনকালে রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনার মধ্যে সীমিত থাকলেও বর্তমানে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, মানব কল্যানে, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বিস্তৃত।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জার্মান স্কলার গোটিফ্রিয়েড অচেনওয়েল (Gotifried Achenwell) 'Statistics' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। 'Statistics' এই ইংরেজী প্রতিশব্দটি রাশিবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তবুও রাশিবিজ্ঞান পরিসংখ্যান সমার্থক শব্দ নয়। পরিসংখ্যানের পরিমানগত তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হল রাশিবিজ্ঞানের কাজ। রাশিবিজ্ঞানের সঙ্গায় বলা যায়–

যে বিজ্ঞানের সাহায্যে কোন বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বিশেষ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা রাশিতথ্যের সংকলন করে তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় তাই হল রাশিবিজ্ঞান।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে রাশিবিজ্ঞান বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– মনোবিজ্ঞানে এর নাম হল Psychometry। অর্থবিজ্ঞানে Econometry, নৃতত্ব বিদ্যায় Authropometry, সমাজবিদ্যা Sociometry, প্রানীবিদ্যায় Biometry ইত্যাদি। 'metry' কথাটির অর্থ 'মাপ'।

শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (Need of Statistics in Education) :

আধুনিক কালে কোন বিজ্ঞানই রাশিবিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া চলতে পারে না। তাই মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, প্রানীবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের মতো শিক্ষাবিজ্ঞানেও রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষার যে যে প্রয়োজনগুলো মেটাতে সহায়তা করে তা হল —

প্রথমত: শিক্ষামূলক বিভিন্ন তথ্যকে রাশিবিজ্ঞান সহজ সরলভাবে ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে সহায়তা করে। শিক্ষামূলক তথ্যগুলোকে সহজভাবে প্রকাশ করার জন্য রাশিবিজ্ঞানের দু,ধরনের মান ব্যবহার করা হয় —

১) কেন্দ্রীয় প্রবনতার পরিমাপ (Measures of Central Tendency)

২) বিষমতার পরিমাপ (Measures of Varialeility)

দ্বিতীয়ত: রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত অবিন্যস্ত নম্বর বা স্কোরকে বিন্যস্ত ও সারিবদ্ধ করে অর্থপূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত: শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের তুলনামূলক বিচারকরণে সহায়তা করে।

চতুর্থত: পরীক্ষামূলকভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যকে লেখচিত্রের মাধ্যমে সকলের বোধগম্য করে প্রকাশ করতে সহায়তা করে।

পঞ্চমত: রাশিবিজ্ঞান গণিতের একটি শাখা হওয়ার কারণে এটি তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ও যুক্তিসম্মত হয়। তাই স্বাভাবিক কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

ষষ্ঠত: রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত নির্ভুলভাবে শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলোকে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

সপ্তমত: রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নির্ণয় করা বা তাদের অকৃতকার্যতার কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

অষ্টমত: রাশিবিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যবলী সংগ্রহ ও তাৎপর্য নির্ণয় করে ভবিষ্যতের জন্য পরামর্শ ও নির্দেশনা দান করা সম্ভব হয়।

পরিসংখ্যা বিভাজন (Frequency Distribution) :

রাশিবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হচ্ছে সংগৃহীত ঘটনা বা তথ্যকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা। এই তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হতে পারে। যেমন— ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবরনী, সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিবরনী, ব্যক্তিগত গবেষনার ফলাফল বা গবেষনায় প্রকাশিত ফলাফল ইত্যাদি। তবে সংগৃহীত এই তথ্য প্রাথমিক অবস্থায় এলোমেলো বা অবিন্যস্ত প্রকৃতির থাকে। এগুলোকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবন্ধ আকার না দিলে তা সাধারণের বোঝার উপযুক্ত হয় না। সেই কারণে সংগৃহীত তথ্যকে শ্রেণী বিভক্ত ও ছকবিন্যস্ত (Classification and Taleulation) করে উপস্থিত করা হয় ও লেখচিত্রে (Graph) প্রকাশ করা হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তা বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়। নিচে রাশিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

১) স্কেল (Scale): স্কোরগুলো যখন একের পর এক সমান ইউনিট হিসাবে ব্যক্ত করা হয় তখন সেগুলো একটি স্কেলে পরিণত হয়। স্কেল হল একটি পরিমাপক। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে স্কোরগুলো গুন বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে। এই কারণে স্কেলের শুরু '0' থেকে হয় না।

২) স্কোর (Score): ব্যক্তি বা বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্যকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করলে তাকে স্কোর বলে। যেমন — শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গণিতের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য শিক্ষক কোন পরীক্ষা নিলেন অথবা একদল শিক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপের জন্য কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করা হল। এক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব বা সফল্যকে নম্বর বা সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। পরিসংখ্যানের ভাষায় তাকে বলে স্কোর।

৩) চল (Varialele): ব্যক্তির যেসব বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল তাকেই স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। আর যেসব বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনশীল তাকে স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। তাই বলা যায় পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য পরিমাপের দরুন যে স্কোর পাওয়া যায় তাকেই চল বলে। চল দুই প্রকারের হয়– পরিমাপগত ও গুনগত। ওজন, উচ্চতা ইত্যাদি হল পরিমাপগত চল এবং বুদ্ধি হল গুনগত চলের উদাহরণ।

৪) অবিন্যস্ত ও বিন্যস্ত স্কোর (Ungrouped and Grouped Score): পারদর্শিতার অভীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত নম্বর বা স্কোর গুলো সাধারণত এলোমেলো অবস্থায় থাকে। তাই এগুলো থেকে অর্থপূর্ণ ধারনা গঠন করা যায় না। স্কোরগুচ্ছের তাৎপর্য সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে হলে তাদের সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো বা শ্রেণীবিন্যাস করার দরকার হয়। কোরগুচ্ছ যখন শ্রেণীবিন্যাস করা হয় না অর্থাৎ এলোমেলো অবস্থায় থাকে তখন এগুলোকে বলা হয় অবিন্যস্ত স্কোর বা কাঁচা তথ্য (Raw Score)। আর শ্রেণীবিন্যাস করার পর স্কোরগুচ্ছকে বলা হয় বিন্যস্ত স্কোর (Grouped Score)।

৫) অবিচ্ছিন্ন সারি ও বিচ্ছিন্ন সারি (Discrete Series and Continuous Series): একই ধরনের তথ্য সমষ্টিকে পর পর সাজানো হলে তাকে সারি বা (Series) বলে। এই সারি দুই ধরনের হয় — অবিচ্ছিন্ন সারি ও বিচ্ছিন্ন সারি।

একই ধরনের তথ্য, স্কোর বা বস্তু ইত্যাদি পর পর সাজালে মাঝখানে যদি কোন ছেদ বা বিরতি না থাকে তাকে অবিচ্ছিন্ন সারি বলে। এই ধরনের সারির ক্ষেত্রে দুই স্কোরের মধ্যে বিরাম ছেদটিকে প্রয়োজন হলে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায়। যেমন– কোন বস্তুর দৈর্ঘ্যের পরিমাপ। এক্ষেত্রে গজ, ফুট, ইঞ্চি ধাপে ধাপে নেমে এসেছে অর্থাৎ গজকে ফুট অনুযায়ী, অথবা ফুটকে ইঞ্চি অনুযায়ী ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। অথবা নিচের চিত্রে একটি সরলরেখা দেখা যাচ্ছে যা পর পর কতগুলি বিন্দু একত্রিত হয়ে তৈরী হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন ছেদ বা বিরতি থাকে না। দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশকে সূক্ষতর ভাগ করা সম্ভব।

চিত্র : AB একটি সরল রেখা (বিন্দুর সাহায্যে)

বিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোর বা বস্তুর মধ্যে ব্যবধান থাকে এবং এই ব্যবধানকে ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় না। যেমন– কোন বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর A, B, C, D এই চারটি বিভাগের (Section) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যথাক্রমে 40, 41, 42, 43। এটিকে এভাবেই প্রকাশ করতে হবে। 40.1, 41.2 .... এভাবে ধরা যাবে না অথবা নিচের চিত্রে বিন্দুগুলো সরলরেখার আকারে থাকলেও তাদের মধ্যে ছেদ আছে অর্থাৎ একটি বিন্দু অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন।

A.......................B

চিত্র : AB একটি সরল রেখা (বিন্দুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন)

৬) পরিসংখ্যা ও পরিসংখ্যা বন্টন (Frequency and Frequency Distribution): স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোন স্কোর কতবার এসেছে তাকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাকে পরিসংখ্যা বা Frequency বলে। একে সংক্ষেপে f অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর স্কোরগুলো যে পদ্ধতিতে সাজানো থাকে তাকে রাশিবিজ্ঞানে পরিসংখ্যাবন্টন বা Frequency Distribution বলে।

৭) পরিসংখ্যা বিভাজনের নিয়ম: সাধারণত কোন বিষয়ে প্রথম অবস্থায় তথ্য সংগ্রহ করার পর রাশিগুলো থাকে অবিন্যস্ত অবস্থায়। একে বলে কাঁচা তথ্য বা Raw Data. এই জাতীয় স্কোর থেকে একক ভাবে কোন একটি স্কোর সম্পর্কে বা সামগ্রিকভাবে স্কোর সম্পর্কে কোন ধারনা করা যায় না। নিচে অষ্টম শ্রেণীর 50 জন ছাত্রের গণিতের পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে। এর থেকে ঐ শ্রেণীর ছাত্রদের গণিতের পারদর্শিতা সম্পর্কে যেমন ধারণা করা সম্ভব নয় তেমনি কোন ছাত্রের পারদর্শিতা কেমন তাও জানা সম্ভব হবে না। তা জানার জন্য স্কোরগুলোকে আগে সুবিন্যস্ত করে নির্দিষ্ট ক্রমে তালিকাবন্ধ করা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন —

40	51	69	72	82	90	96	69	59	72
78	69	67	55	45	73	82	85	70	70
75	74	80	65	49	53	84	92	96	89
85	74	74	83	78	76	75	72	81	89
90	75	76	74	71	54	59	79	60	63

পর্যায় - ১:

স্কোরের প্রসার (Range) নির্ণয় করতে হবে। সর্বোচ্চ স্কোর ও সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে যখন সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বলে প্রসার। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্কোরটি হল 98 এবং সর্বনিম্ন স্কোরটি হল 40, তাই প্রসার বের করার সূত্রটি হল —

প্রসার = সর্বোচ্চ স্কোর - সর্বনিম্ন স্কোর + 1

= (98-40) + 1

= 58 + 1

= 59

(সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন যে কোন প্রান্তের স্কোরের সঙ্গে 1 যোগ করতে হবে)

পর্যায় - ২:

স্কোরগুলোকে সাজানোর জন্য সেগুলোকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট দলে বা শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে। এগুলোকে **শ্রেণী ব্যবধান** বা Class Interval বলে। প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানের দৈর্ঘ্য কত হবে এবং মোট কতগুলো শ্রেণী ব্যবধান হবে তা আগে থেকেই নিরূপন করে নিতে হবে। শ্রেণী ব্যবধানের দৈর্ঘ্য এবং সাধারণত নির্ভর করে স্কোরগুলোর প্রসারের উপর এবং কিছু পরিমাপে স্কোরগুলোর প্রকৃতির উপর। সাধারণত শ্রেণী ব্যবধান 3, 5 এবং 10 এর হয়ে থাকে এবং শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা 8 - 15 এর মধ্যে থাকে। কারণ খুব কম বা খুব বেশী সংখ্যাক শ্রেণী ব্যবধান নিয়ে কাজ করতে গেলে গননার সময় নানা ধরনের ভুল হতে পারে। শ্রেণী ব্যবধানের আকার ও সংখ্যা যেভাবে নির্ধারণ করতে হবে তা হল–

59 (প্রসার) ÷ 3 (শ্রেণী ব্যবধানের আকার) = 20 (শ্রেণী ব্যবধানের মোট সংখ্যা)

59 (প্রসার) ÷ 5 (শ্রেণী ব্যবধানের আকার) = 12 (শ্রেণী ব্যবধানের মোট সংখ্যা)

59 (প্রসার) ÷ 10 (শ্রেণী ব্যবধানের আকার) = 5.9 (শ্রেণী ব্যবধানের মোট সংখ্যা)

উপরোক্ত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রেণী ব্যবধানের আকার 3 হলে মোট শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা হবে 20টি। এক্ষেত্রে শ্রেণী ব্যবধানের মোট সংখ্যা 15 র বেশী। শ্রেণী ব্যবধান 5 হলে মোট শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা হবে 12 এবং 10 হলে তা হবে 6।

শ্রেণী ব্যবধান 3 এর অর্থ এই শ্রেণী বিভাজনের প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানে তিনটি স্কোর আছে। যেমন প্রথম সারিতে আছে 40,41,42 এই তিনটি স্কোর। এইভাবে যে কোন শ্রেণী ব্যবধানে যে কয়েকটি স্কোর থাকে যেটাই সেই শ্রেণীর প্রসার। নিচে 5 শ্রেণী ব্যবধানের একটি শ্রেণী বিন্যাস দেখানো হল —

ci (Class Interval/শ্রেণী ব্যবধান)
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
95 - 99

(এই ধরনের শ্রেণী বিন্যাস ছোট (40 - 44) থেকে বড় (95 - 99) অথবা বড় থেকে ছোট যে কোন ভাবেই সাজানো যেতে পারে।)

পর্যায় - ৩ :

প্রতিটি শ্রেণী ব্যবধানের পাশে ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত Raw Score গুলো কতবার এসেছে তা ট্যালি (Tally) '/' চিহ্নের সাহায্যে দাগ দিতে হবে। ট্যালি চিহ্নগুলো কোনাকুনিভাবে ওপর থেকে নিচের দিকে ডান দিকে একটু বাঁকিয়ে টানা হয়। এইভাবে স্কোর অনুযায়ী পর পর চারটি দাগ কাটা হয়ে গেলে পঞ্চম Tally চিহ্নটির ক্ষেত্রে আড়াআড়িভাবে টানতে হয়। ষষ্ঠ ট্যালি চিহ্নের ক্ষেত্রে আগের আঁকা ট্যালি চিহ্নগুলো পাশে একই পন্থায় নতুন করে ট্যালি চিহ্ন আঁকতে হয়।

Class Interval (Ci)	Tallies (/)
40 - 44	/
45 - 49	//
50 - 54	///
55 - 59	///
60 - 64	//
65 - 69	~~////~~
70 - 74	~~////~~ ~~////~~ /
75 - 79	~~////~~ ///
80 - 84	~~////~~ /
85 - 89	////
90 - 94	///
95 - 99	//

পর্যায় - ৪ :

সবগুলো Raw Score কে টালি চিহ্নের সাহায্যে নির্দিষ্ট করার পর প্রতিটি শ্রেণী ব্যবধানের পাশে চিহ্নিত টালিগুলো গুনে পাশের স্তম্ভে মোট সংখ্যাটি লিখতে হবে। একে ঐ শ্রেণী ব্যবধানের পরিসংখ্যা (Frequency) বলা হয়। এই পরিসংখ্যা থেকে বোঝা যায় ঐ নির্দিষ্ট শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যে মোট কতগুলো স্কোর রয়েছে। আবার সবগুলোর পরিসংখ্যা যোগ করে মোট পরিসংখ্যা বা Nunber of Total Frequency (N) লিখতে হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল —

Class Interval (Ci)	Tallies (/)	f (frequency)
40 - 44	/	1
45 - 49	//	2
50 - 54	///	3
55 - 59	///	3
60 - 64	//	2
65 - 69	~~////~~	5
70 - 74	~~////~~ ~~////~~ /	11
75 - 79	~~////~~ ///	8
80 - 84	~~////~~ /	6
85 - 89	////	4
90 - 94	///	3
95 - 99	//	2
		N = 50

নিচে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যা বিভাজনের উদাহরণ দেওয়া হল —

75	71	41	51	56	62	67	69	61	73
37	46	58	77	71	48	61	83	70	69
63	38	48	77	69	62	55	57	78	74
87	68	66	32	46	62	52	60	63	68
65	56	74	35	43	81	62	54	63	64

প্রসার = সর্বোচ্চ স্কোর - সর্বনিম্ন স্কোর + 1

= 87 - 32 + 1

= 55 + 1

= 56

Class Interval (Ci)	Tallies (/)	f (frequency)
32 - 36	//	2
37 - 41	///	3
42 - 46	///	3
47 - 51	///	3
52 - 56	~~////~~	5
57 - 61	~~////~~	5
62 - 66	~~////~~ ~~////~~	10
67 - 71	~~////~~ ////	9
72 - 76	////	4
77 - 81	////	4
82 - 86	/	1
87 - 91	/	1
		N=50

এখানে,

Ci = Class interval (শ্রেণী ব্যবধান)
f = Frequency (পরিসংখ্যা)
N = Total Number of Frequency (মোট পরিসংখ্যা)।

উপসংহার (Conclusion):

পরিসংখ্যা বিভাজনের অলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়টির উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন তা হল — যেকোন স্কেল যেমন অবিচ্ছিন্ন হয় তেমনি রাশিবিজ্ঞানের স্কোরগুলোকেও অবিচ্ছিন্ন কল্পনা ধরে নিতে হয়। যেমন — 40 -44 এই শ্রেণী ব্যবধানটির নিম্নতম সীমা 39.5 থেকে শুরু হবে এবং উর্ধ্বসীমা 44.5 পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। পরের শ্রেণী ব্যবধানটি একই রকম ভাবে 44.5 থেকে শুরু হবে এবং 49.5 পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এক্ষেত্রে 40 বা 44 কে শুধুমাত্র একটি বিন্দু হিসাবে না ধরে 39.5 থেকে শুরু করে 44.5 পর্যন্ত বিস্তৃত এই হিসাবে কল্পনা করা হয় তাহলে আমাদের অবিচ্ছিন্ন রাশিমালার কল্পনা করার মধ্যে কিছু ভুল থাকে না। রাশিবিজ্ঞানে প্রত্যেক রাশির মানকে এভাবেই ধরা হয়।

দ্বিতীয় একক

লেখচিত্রে তথ্য পরিবেশন : অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র, পরিসংখ্যা বহুভুজ
(Graphical Representation of Data : Histogram, Frequency Polygon)

আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি কিভাবে raw score বা কাঁচা তথ্যগুলোকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করার জন্য শ্রেণিবিন্যাস করে তালিকাভুক্ত করা হয়। তেমনি লেখচিত্রের মাধ্যমেও একই সঙ্গে বহু তথ্যকে সহজভাবে, দ্রুত ও অর্থপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়। যার ফলে তা সহজেই বোধগম্য হয়। তাছাড়া বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সহজেই তুলনা করা সম্ভব হয়।

সুইস গণিতশাস্ত্রবিদ লিওনহার্ড ইউলার (Leonhard Euler) লেখচিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনার প্রবর্তন করেন। লেখচিত্র এক ধরনের তথ্য পরিবেশনের কৌশল। এটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো লেখচিত্রের উদ্দেশ্য হল তথ্য পরিবেশন করা। একে বলে তথ্য পরিবেশক লেখচিত্র। আবার কোনো কোনো লেখচিত্র তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি তাদের তাৎপর্যও নির্ণয় করে। এই ধরনের লেখচিত্রকে বলে তাৎপর্য নির্ণায়ক লেখচিত্র।

আমরা এই অধ্যায়ে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র (Histogram) এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon) নিয়ে আলোচনা করবো। এই দুটিই এক ধরনের তথ্য পরিবেশক লেখচিত্র।

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র (Histogram) :

1891 সালে 'Historical diagram' এই শব্দ দুটিকে একত্রিত করে কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson) প্রথম 'Histogram' শব্দটির প্রবর্তন করেন। কতগুলি স্কোরকে শ্রেণিবদ্ধভাবে সাজিয়ে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভের আকারে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র বা Histogram বলে। এটি কোনো তথ্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করে।

হিস্টোগ্রাম বা অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র অঙ্কনের নিয়ম :

শ্রেণি ব্যবধান (ci)	পরিসংখ্যা (f)
20 – 29	3
30 – 39	5
40 – 49	5
50 – 59	7
60 – 69	8
70 – 79	6
80 – 89	3
90 – 99	3
	N = 40

পর্যায়-১

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র আঁকার জন্য শ্রেণিবিভাগের বা শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নসীমাকে (Lower limit) স্কোর মান হিসাবে ধরা হয়। তাই প্রতিটি শ্রেণিবিভাগের নিম্নসীমা নির্ণয় করতে হবে। যেমন 20-29 এই শ্রেণিবিভাগের নিম্নসীমা হল 19.5। সর্বোচ্চ শ্রেণিবিভাগের নিম্নসীমা ছাড়াও এর পরবর্তী আরেকটি অতিরিক্ত কাল্পনিক শ্রেণিবিভাগ গঠন করে আরও নিম্নসীমা বের করতে হবে। এর পরিসংখ্যা ধরতে হবে '0'

শ্রেণি ব্যবধান	পরিসংখ্যা	নিম্নসীমা
20 – 29	3	19.5
30 – 39	5	29.5
40 – 49	5	39.5
50 – 59	7	49.5
60 – 69	8	59.5
70 – 79	6	69.5
80 – 89	3	79.5
90 – 99	3	89.5
(অতিরিক্ত শ্রেণি) 100 – 109	0	99.5
		N = 40

পর্যায়-২

ছক কাগজে বাঁ দিক থেকে ডানদিক বরাবর একটি সরলরেখা টেনে 0X অক্ষ এবং 0X অক্ষের বাঁ দিকের শেষ প্রান্ত থেকে লম্বভাবে অপর একটি সরলরেখা টেনে 0Y অক্ষ অঙ্কন করতে হবে যার ছেদ বিন্দু হবে '0'

পর্যায়-৩

0X অক্ষে শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নসীমাগুলো বসাতে হবে। যেহেতু শ্রেণি ব্যবধানটি '0' থেকে শুরু হয়নি তাই প্রথম শ্রেণি ব্যবধানটির আগে 0X অক্ষের উপর 11 চিহ্ন দিয়ে একটি ব্যবধান এঁকে দেখাতে হবে। প্রতিটি নিম্নসীমার পরস্পরের মধ্যে সমান দূরত্ব রয়েছে তাই 0X অক্ষে নিম্নসীমাগুলো তেমনভাবেই সমান দূরত্ব বজায় রেখেই বসাতে হবে। নিম্নসীমাগুলো ছক কাগজে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে পর পর বসাতে গেলে মোট কতগুলো ক্ষুদ্র বর্গ এককের প্রয়োজন তা আগে থেকে নির্ণয় করে নিতে হবে। এটি যেভাবে জানা যায় তা হল—

মোট নিম্নসীমার সংখ্যা × শ্রেণি ব্যবধান = X অক্ষে মোট যে পরিমাণ ক্ষুত্র বর্গ এককের প্রয়োজন।

প্রদত্ত শ্রেণি ব্যবধান অনুযায়ী

9 (মোট নিম্নসীমার সংখ্যা) × 10 শ্রেণি ব্যবধান = 90 ক্ষুদ্র বর্গ একক (X অক্ষে মোট যে পরিমাণ ক্ষুত্র বর্গ এককের প্রয়োজন)

পর্যায়-৪

0Y অক্ষে পরিসংখ্যাগুলো উপযুক্ত একক নির্বাচন করে ক্রমান্বয়ে বসাতে হবে। একটি আদর্শ অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র বা হিস্টোগ্রাম আঁকার জন্য 75% নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাই 0X অক্ষে মোট যত বর্গ একক নেওয়া হয়েছে তার 75% বর্গ একক 0Y অক্ষে নিলে ভাল। তবে গণনার সুবিধার্থে তা 70-80 শতাংশ পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। বর্তমান পরিসংখ্যা বণ্টন অনুযায়ী—

$$90 \div \frac{3}{4}$$
$$= \frac{270}{4}$$
$$= 67.5 \text{ বর্গ একক}$$

অর্থাৎ 75% নীতি অনুযায়ী বর্তমান পরিসংখ্যা বিভাজনে 0Y অক্ষে 67.5 টি বর্গ একক ব্যবহার করা যাবে।

পর্যায়-৫

75% নীতি অনুযায়ী 0Y অক্ষের জন্য যতগুলো বর্গ একক নির্দিষ্ট হয়েছে তাকে সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি 1টি পরিসংখ্যা পিছু কত বর্গ একক নির্দিষ্ট করা হবে তা বের করা যাবে। এবার সেই সংখ্যার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যাগুলো পর পর গুণ করে যত বর্গ একক হবে তা 0Y অক্ষের সোজাসুজি নিম্নসীমা বরাবর সেই পরিসংখ্যাগুলো বসাতে হবে। বর্তমান পরিসংখ্যা বিভাজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিসংখ্যাটি হল 8

$$\therefore \; 67.5 \div 8 = 8.44 \text{ বর্গ একক}$$

দশমিকের অসুবিধা দূর করার জন্য 0Y অক্ষে 8 বর্গ একক = 1 পরিসংখ্যা এভাবে নেওয়া যেতে পারে।

পর্যায়-৬

প্রতিটি নিম্নসীমার বিপরীতে 0Y অক্ষ বরাবর পরিসংখ্যাগুলো ক্রমান্বয়ে বসাতে হবে। তারপর ছক কাগজে প্রতিটি পরিসংখ্যা বিন্দু থেকে 0X অক্ষের উপর এক একটি করে লম্ব রেখা টানতে হবে। অতিরিক্ত পরিসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত নিম্নসীমার উপর 0Y অক্ষের বিপরীতে লম্ব অঙ্কন করতে হবে।

পর্যায়-৭

প্রত্যেকটি লম্বের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে পরবর্তী লম্ব রেখা পর্যন্ত একটি অনুভূমিক রেখা অঙ্কন করে এক একটি আয়তক্ষেত্র আকারের চিত্র অঙ্কন করতে হবে। অতিরিক্ত নিম্নসীমার ক্ষেত্রেও অনুভূমিক রেখাটিকে পূর্ববর্তী নিম্নসীমার উপর অঙ্কিত লম্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করতে হবে।

উল্লেখিত পর্যায়গুলো অনুসরণ করে ছক কাগজে একটি অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করে দেখানো হল—

উদাহরণ : ১

শ্রেণি ব্যবধান	পরিসংখ্যা	নিম্নসীমা
20 – 29	3	19.5
30 – 39	5	29.5
40 – 49	5	39.5
50 – 59	7	49.5
60 – 69	8	59.5
70 – 79	6	69.5
80 – 89	3	79.5
90 – 99	3	89.5
100 – 109	0	99.5 (অতিরিক্ত নিম্নসীমা)

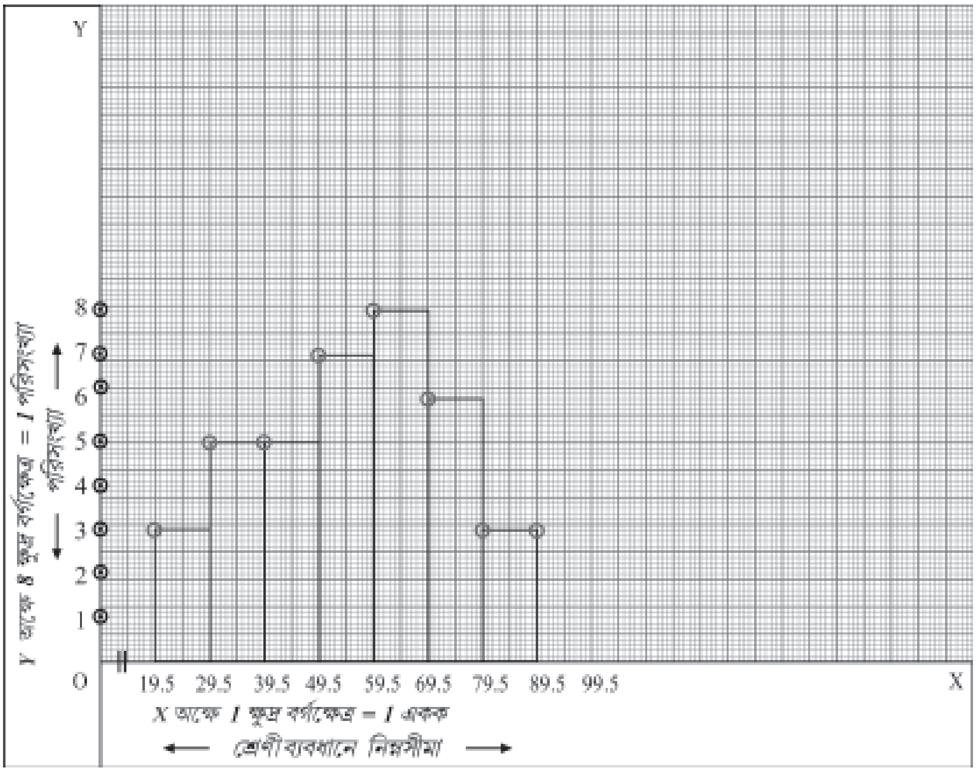

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র - ১

উদাহরণ : ২

শ্রেণি ব্যবধান (Ci)	পরিসংখ্যা (f)	নিম্নসীমা (L_L)
95 - 99	1	94.5 - 99.5
90 - 94	2	89.5 - 94.5
85 - 89	4	84.5 - 89.5
80 - 84	5	79.5 - 84.5
75 - 79	8	74.5 - 79.5
70 - 74	10	69.5 - 74.5
65 - 69	6	64.5 - 69.5
60 - 64	4	59.5 - 64.5
55 - 59	4	54.5 - 59.5
50 - 54	2	49.5 - 54.5
45 - 49	3	44.5 - 49.5
40 - 44	1	39.5 - 44.5
	N = 50	

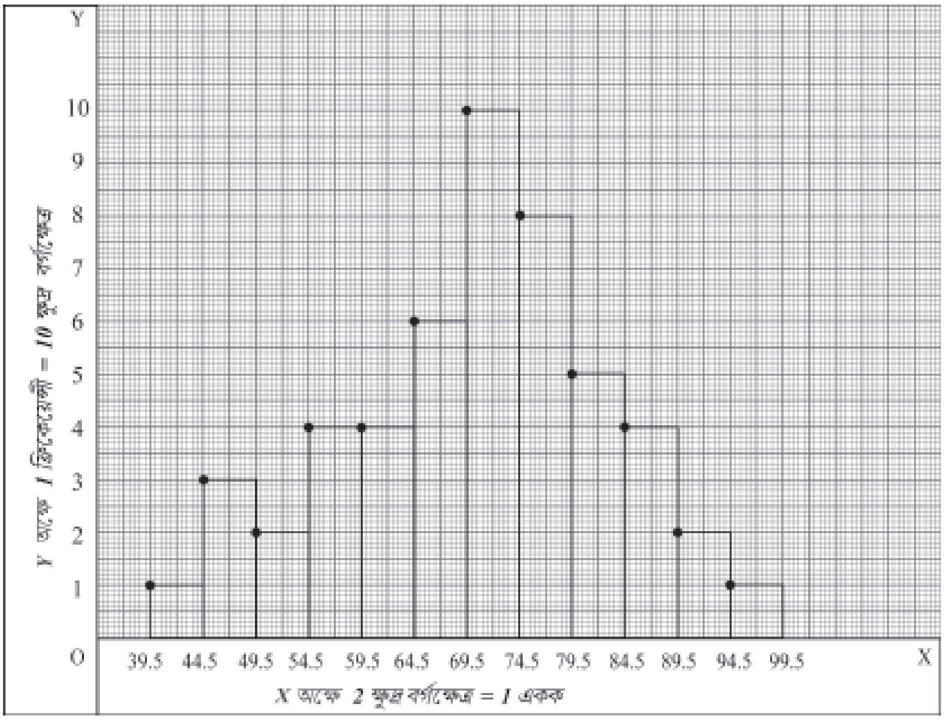

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র - ২

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র ব্যবহারের সুবিধা :

- এর মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন তথ্যশ্রেণিকে সহজে পরিবেশন করা যায়।
- এর এক একটি স্তম্ভ একটি স্কোর শ্রেণিকে পৃথক পৃথকভাবে পরিবেশন করে। ফলে তাদের মধ্যে তুলনা করা সহজ হয়।
- এর ক্ষেত্রফল থেকে বিশেষ শ্রেণির পরিসংখ্যা পাওয়া যায়। সমস্ত আয়তক্ষেত্রগুলোর যোগফল থেকে সম্পূর্ণ পরিসংখ্যা জানা যায়।
- পরিসংখ্যা পরিবেশনের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র তুলনামূলকভাবে পরিসংখ্যা বহুভুজের তুলনায় বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পরিসংখ্যা বহুভুজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের পরিসংখ্যাকে স্বতন্ত্রভাবে বোঝাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেইদিক দিয়ে সমস্ত পরিসংখ্যার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণি ব্যবধানের পরিসংখ্যার অনুপাতের একটি নিখুঁত ধারণা অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র থেকেই পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)

পরিসংখ্যা বহুভুজ হল এক ধরনের রৈখিক লেখচিত্র। ছক কাগজে, প্রাপ্ত শ্রেণী পরিসংখ্যার মধ্যমানগুলোকে পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করে যে আবদ্ধ ক্ষেত্র পরিবেশন করা হয়, তাকেই পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon) বলে।

পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের নিয়ম

নীচে একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর 50 জন ছাত্রের গণিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের পরিসংখ্যা বিভাজন দেওয়া হল। এই তথ্যটিকে পরিসংখ্যা বহুভুজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

শ্রেণীসীমা	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
পরিসংখ্যা	2	5	5	8	10	7	6	4	3

পর্যায়-১

প্রতিটি শ্রেণীসীমার মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তরে দুটি অতিরিক্ত শ্রেণীসীমা গঠন করে তাদেরও মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হবে। যাদের পরিসংখ্যা হবে ‘0’। মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্রটি হল—

$$\text{মধ্যবিন্দু (Mid point)} = \frac{\text{ঊর্ধ্বপ্রান্ত} + \text{নিম্নপ্রান্ত}}{2}$$

শ্রেণী ব্যবধান	পরিসংখ্যা	মধ্যবিন্দু
35 – 39	0	37
40 – 44	2	42
45 – 49	5	47
50 – 54	5	52
55 – 59	8	57
60 – 64	10	62
65 – 69	7	67
70 – 74	6	72
75 – 79	4	77
80 – 84	3	82
85 – 89	0	87
	N = 50	

পর্যায়-২

ছক কাগজে 0X এবং 0Y অক্ষ টানতে হবে, যার ছেদবিন্দু হবে '0'।

পর্যায়-৩

0X অক্ষে শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুগুলো নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসাতে হবে। যেহেতু প্রথম শ্রেণিটি '0' থেকে প্রথম মধ্যবিন্দুর মধ্যস্থ ব্যবধান অঞ্চলে // এই চিহ্নটি ব্যবহার করে ব্যবধানকে নির্দেশ করা যেতে পারে। 0X অক্ষে মধ্যবিন্দুগুলো নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসাতে গেলে কত বর্গ একক প্রয়োজন তা নিম্নলিখিতভাবে জানা যেতে পারে—

মোট মধ্যবিন্দুর সংখ্যা × শ্রেণী ব্যবধান = X অক্ষে মোট কত বর্গ এককের প্রয়োজন।

11 (মোট মধ্যবিন্দুর সংখ্যা) × 5 (শ্রেণী ব্যবধান) = 55 (X অক্ষে মোট যত বর্গ এককের প্রয়োজন)

(লেখচিত্রটিকে আকারে বড় দেখাবার জন্য 55 বর্গ এককের দ্বিগুণ সংখ্যক বর্গ একক অর্থাৎ 110 বর্গ একক নেওয়া হল।)

পর্যায়-৪

75% নীতি অনুযায়ী 0Y অক্ষে কতগুলো বর্গ একক নিতে হবে তা নির্ণয় করতে হবে—

$$110 \times \frac{3}{4}$$

$$= \frac{330}{4}$$

= 82.5 বর্গ একক।

পর্যায়-৫

লেখচিত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য 75% নীতি অনুযায়ী 0Y অক্ষে 82.5 (সর্বনিম্ন 78 থেকে সর্বোচ্চ 87 বর্গ একক) ব্যবহার করলে ভাল। দশমিকের অসুবিধাকে দূর করার জন্য 0Y অক্ষে 80 বর্গ একক নেওয়া হল। সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে—

$80 \div 10 = 8$ ক্ষুদ্র বর্গ একক

অর্থাৎ, 8 ক্ষুদ্র বর্গ একক = 1 পরিসংখ্যা ধরা হল।

পর্যায়-৬

0X অক্ষে স্থাপিত প্রতিটি মধ্যবিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে 8 ক্ষুদ্র বর্গ একক = 1 পরিসংখ্যা হিসাবে পরিসংখ্যা অনুযায়ী ছক কাগজে বিন্দুগুলো স্থাপন করতে হবে।

পর্যায়-৭

প্রতিটি বিন্দু ক্রমান্বয়ে রেখা দ্বারা যুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত লেখচিত্রটির দুই প্রান্ত অতিরিক্ত দুটি বিন্দুর (সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ) সঙ্গে যুক্ত করে দিলে একটি পরিসংখ্যা বহুভুজ পাওয়া যাবে।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন নিয়মগুলো অনুসরণ করে ছক কাগজে কিভাবে পরিসংখ্যা বহুভুজটি আঁকা যায় তা দেখানো হল—

উদাহরণ : ১

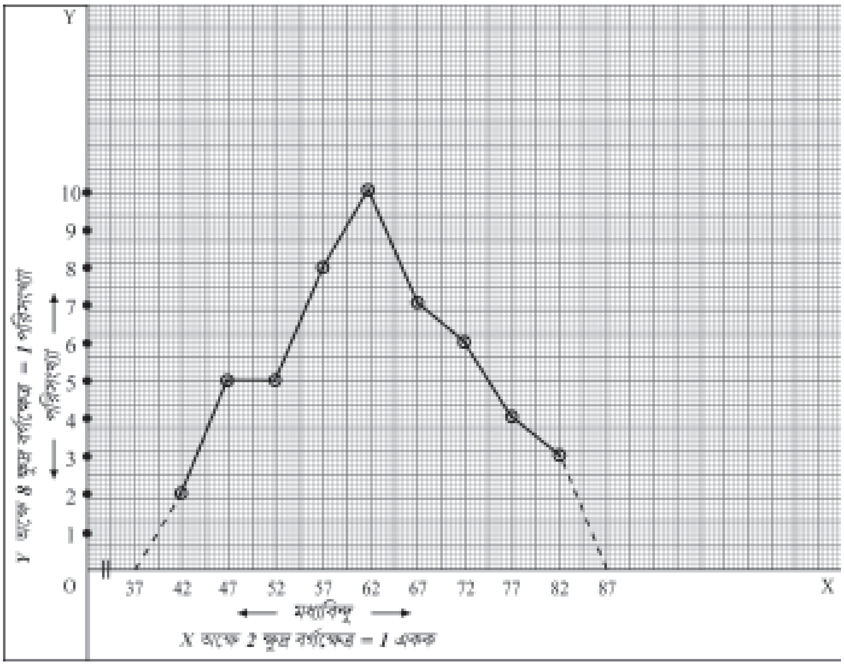

পরিসংখ্যা বহুভুজ-১

উদাহরণ : ২

শ্রেণি ব্যবধান (Ci)	পরিসংখ্যা (f)	মধ্যবিন্দু (Midpoint)
95 - 99	1	97
90 - 94	2	92
85 - 89	4	87
80 - 84	5	82
75 - 79	8	77
70 - 74	10	72
65 - 69	6	67
60 - 64	4	62
55 - 59	4	57
50 - 54	2	52
45 - 49	3	47
40 - 44	1	42
	N = 50	

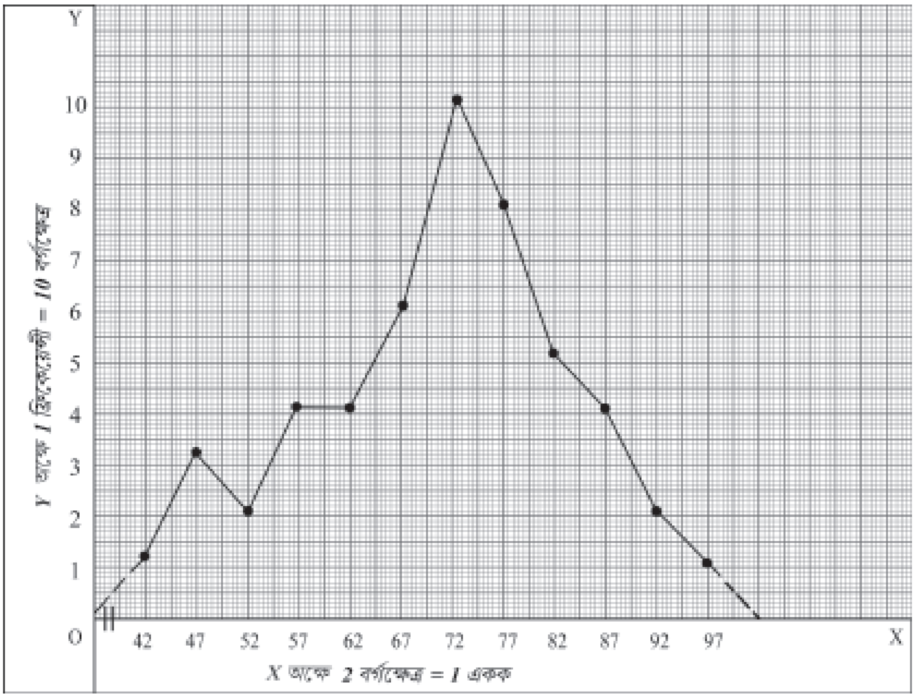

পরিসংখ্যা বহুভুজ-১

পরিসংখ্যা বহুভুজ ব্যবহারের সুবিধা

- দুই বা ততোধিক পরিসংখ্যা বিভাজনের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যা বহুভুজ, অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্রের তুলনায় অঅনেক বেশি সুবিধাজনক। কারণ একই অক্ষে একের বেশি অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেখানে একই অক্ষের উপর একের বেশি বহুভুজ অঙ্কন করলে তথ্য পরিবেশন সহজবোধ্য হয়।
- পরিসংখ্যা বহুভুজের সাহায্যে পরিসংখ্যা বিভাজনের আকৃতিটি বোঝা যায় এবং এটি একটি স্বাভাবিক বণ্টন (Normal distribution) কিনা সে সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়।

একই অক্ষের উপর অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র ও পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন

একই অক্ষের উপর অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র বা পরিসংখ্যা বহুভুজ আঁকতে হলে যে কোনো একটি আঁকার পর অন্যটি সহজেই আঁকা যায়। যেমন— ছক কাগজে পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করার পর পরিসংখ্যা বিন্দুর দুদিকে শ্রেণীসীমা বরাবর রেখা টেনে 0X অক্ষ বরাবর লম্ব টানলে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্রের এক একটি স্তম্ভ পাওয়া যাবে। এভাবে পরিসংখ্যা বহুভুজের উপর অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র আঁকা যায়।

অন্যদিকে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র আঁকার পর প্রত্যেক আঘাত ক্ষেত্রের উপরের অনুভূমিক রেখার মধ্যবিন্দুই ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্দেশ করে। সুতরাং ঐ বিন্দুগুলোই পর পর যোগ করলে পরিসংখ্যা বহুভুজ পাওয়া যায়।

নীচে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বণ্টনটির সাহায্যে একই অক্ষের উপর অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করে দেখানো হল।

শ্রেণী ব্যবধান	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 84	90 – 99
পরিসংখ্যা	5	7	8	10	6	5	5	4

পর্যায়-১

প্রতিটি শ্রেণীর নিম্নসীমাগুলো (সর্বোচ্চ স্তরে অতিরিক্ত একটি নিম্নসীমা সহ) এবং প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুগুলো (সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চস্তরে অতিরিক্ত দুটি মধ্যবিন্দু সহ) নির্ণয় করে নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ করতে হবে।

শ্রেণি ব্যবধান	পরিসংখ্যা	নিম্নসীমা	মধ্যবিন্দু
10 – 19	0	—	14.5
20 – 29	5	19.5	24.5
30 – 39	7	29.5	34.5
40 – 49	8	39.5	44.5
50 – 59	10	49.5	54.5
60 – 69	6	59.5	64.5
70 – 79	5	69.5	74.5
80 – 89	5	79.5	84.5
90 – 99	4	89.5	94.5
100 – 109	0	99.5	104.5

পর্যায়-২

ছক কাগজে 0X এবং 0Y অক্ষ অঙ্কন করতে হবে।

পর্যায়-৩

0X অক্ষে সমদূরত্ব বজায় রেখে নিম্নসীমাগুলো এবং পর পর বসানো দুটি নিম্নসীমার মাঝখানে মধ্যবিন্দুগুলো বসাতে হবে। যেহেতু প্রথম শ্রেণিটি '0' থেকে শুরু হয়নি তাই 0X অক্ষে '0' এবং প্রথম মধ্যবিন্দু দুটির মাঝে '//' এই চিহ্নটি দিয়ে ব্যবধানকে নির্দেশ করতে হবে।

পর্যায়-৪

একই অক্ষে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র ও পরিসংখ্যা বহুভুজ আঁকতে গেলে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ মধ্যবিন্দু পর্যন্ত বসানোর জন্য যতগুলো ক্ষুদ্র বর্গ একক নেওয়া হয় 0Y অক্ষে তার 75% বা 70% - 80% ক্ষুদ্র বর্গ একক নিলে ভাল। এবার 0Y অক্ষের জন্য উপযুক্ত একক নির্বাচন করে, 0Y অক্ষ বরাবর 0X অক্ষের নিম্নসীমার বিপরীতে পরিসংখ্যা বিন্দুগুলি ক্রমান্বয়ে স্থাপন করতে হবে। তারপর প্রতিটি পরিসংখ্যা বিন্দু থেকে 0X অক্ষের উপর একটি করে লম্ব রেখা টানতে হবে।

পর্যায়-৫

লম্বের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে পরবর্তী লম্ব রেখা পর্যন্ত একটি অনুভূমিক রেখা টেনে এক একটি আয়তক্ষেত্র আকারের চিত্র অঙ্কন করতে হবে। অতিরিক্ত নিম্নসীমার ক্ষেত্রেও অনুভূমিক রেখাটিকে পূর্ববর্তী নিম্নসীমার উপর অঙ্কিত লম্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এভাবে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করতে হবে।

পর্যায়-৬

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্রের প্রত্যেক আয়তক্ষেত্রের উপরের অনুভূমিক রেখাটির মাঝামাঝি অঞ্চলকে মধ্যবিন্দুর অবস্থান হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। এভাবে পর পর চিহ্নিত করার পর সরলরেখা দ্বারা প্রতিটি মধ্যবিন্দুকে পর পর যুক্ত করতে হবে (দুই প্রান্তের অতিরিক্ত দুটি মধ্যবিন্দুসহ)। প্রভাবে একই অক্ষে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্রের উপর পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করতে হবে।

নীচে ছক কাগজে একই অক্ষের উপর অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করে দেখানো হল—

উদাহরণ : ১

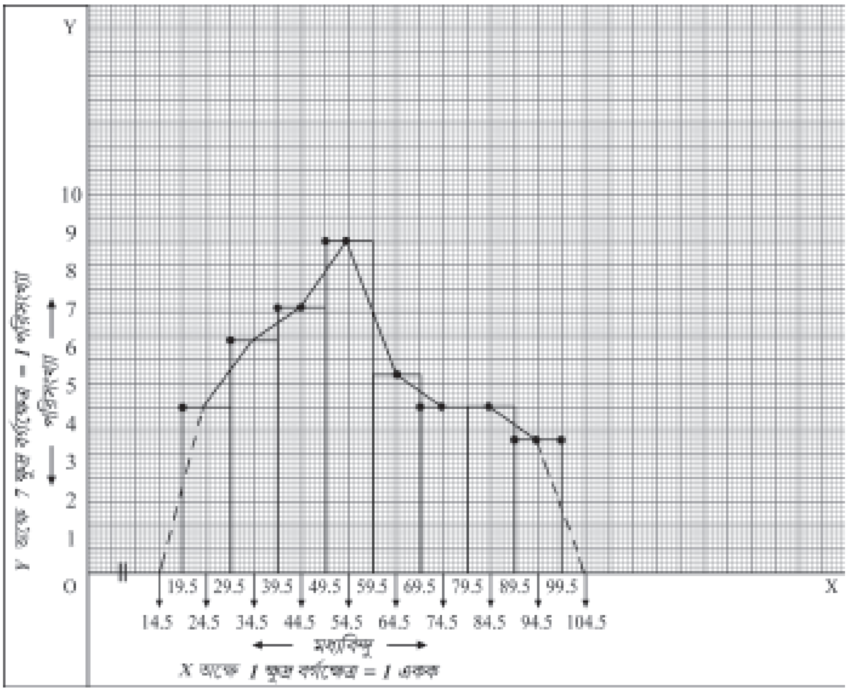

একই অক্ষে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র ও পরিসংখ্যা বহুভুজ-১

উদাহরণ : ২

শ্রেণী ব্যবধান (Ci)	পরিসংখ্যা (f)	নিম্ন সীমা	মধ্যবিন্দু (Midpoint)
95 - 99	1	94.5 - 99.5	97
90 - 94	2	89.5 - 94.5	92
85 - 89	4	84.5 - 89.5	87
80 - 84	5	79.5 - 84.5	82
75 - 79	8	74.5 - 79.5	77
70 - 74	10	69.5 - 74.5	72
65 - 69	6	64.5 - 69.5	67
60 - 64	4	59.5 - 64.5	62
55 - 59	4	54.5 - 59.5	57
50 - 54	2	49.5 - 54.5	52
45 - 49	3	44.5 - 49.5	47
40 - 44	1	39.5 - 44.5	42
	N = 50		

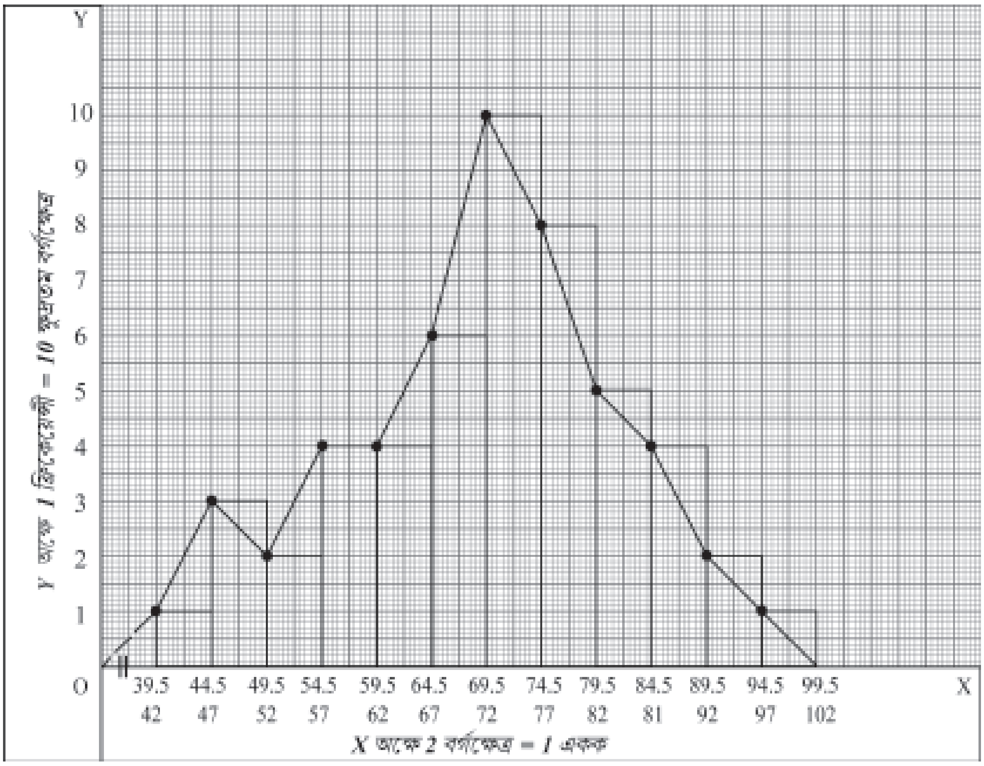

একই অক্ষে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র ও পরিসংখ্যা বহুভুজ-২

উপসংহার (Conclusion) :

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র ও পরিসংখ্যা বহুভুজ এই দুই ধরনের লেখচিত্রের সাহায্যে একই ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই ধরনের লেখচিত্রের দ্বারা সামগ্রিকভাবে তথ্যের পরিমাণকে বোঝানো যায়। তাছাড়া দুটি বিভিন্ন পরিসংখ্যা বণ্টনের মধ্যে তুলনার সময় একটির পরিসংখ্যা বহুভুজ ও অপরটির অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র একই অক্ষরেখার উপর এঁকে সে দুটির মধ্যে মিল ও অমিল পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এর প্রভাবে দুটি বণ্টনের একটি সুন্দর তুলনামূলক সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়।

তৃতীয় একক

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ: গড়, মধ্যমমান, ভূষিষ্ঠক
(Measures of Central Tendency: Mean, Median, Mode)

ভূমিকা (Introduction) :

সামাজিক বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণলব্ধ যে কোনও তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় ও সুসংবদ্ধভাবে পরিবেশনের জন্য রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এইসব তথ্যের সংরক্ষণ ও তাৎপর্য নির্ণয়ের উপর শিক্ষামূলক সিদ্ধান্তগুলোকে নির্ভর করতে হয়। যখন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সাংখ্যমান হিসাবে পাওয়া যায়, তখন রাশিবিজ্ঞানের গাণিতিক কৌশলে, তাদের সংঘবদ্ধ করা যায় এবং তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। এই উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে পরিসংখ্যা বিভাজনে স্থাপন করলে, স্কোরমানগুলো নির্দিষ্টক্রমে সজ্জিত হয় এবং কার্যকরী সাংখ্যমানের সংখ্যাও কমে যায়। অর্থাৎ কোনও শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে, পরিসংখ্যা বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি শ্রেণির মাধ্যমে প্রকাশ করলে তা অনেক বেশি সহজ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা ঃ

এই কাজকে আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রাশিবিজ্ঞানে আর এক ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হয়। কতগুলো স্কোরের বিকল্প হিসাবে একটি স্কোরমানকে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ একটি মাত্র সাংখ্যমান দ্বারা কতকগুলো স্কোরকে প্রকাশ করা হয়। এইভাবে, যে একক সাংখ্যমান দ্বারা, কতকগুলো স্কোরকে প্রকাশ করা হয়। তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হল এমন এক প্রতিনিধি স্থানীয় সাংখ্যমান যা একগুচ্ছ স্কোরের প্রকৃতি বোঝায় অর্থাৎ প্রকৃত স্কোরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এই সাংখ্যমান, স্কোরমানগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। তাই একে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ। সাধারণত তিন ধরনের সাংখ্যমান দ্বারা এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপকে প্রকাশ হয়। এগুলো হল– (১) গাণিতিক গড় বা Mean, (২) মধ্যমমান বা (Midian), (৩) ভূষিষ্ঠক বা (Mode)।

গড় হল স্কোরগুলোর প্রকৃত ভরকেন্দ্র। মধ্যমমান হল পরিমাপক স্কেলের মধ্যবিন্দু। আর ভূষিষ্ঠক বল, সেই সাংখ্যমান যা সবচেয়ে বেশিবার দেখা যায়। এই প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ নির্ণয় করার পৃথক পৃথক পদ্ধতি রয়েছে এবং তাদের তাৎপর্যও বিভিন্ন।

কোনও পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের ফল হিসাবে প্রাপ্ত অবিন্যস্ত স্কোরগুলোকে পরিসংখ্যা বন্টনে সাজানোর পর দেখা যায় বেশীর ভাগ স্কোর বন্টনের মাঝামাঝি শ্রেণীগুলোতে ঘণীভূত থাকে এবং উপরের ও নীচে শ্রেণীগুলোতে খুব কম সংখ্যক স্কোর থাকে অর্থাৎ খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী খুব কম নম্বর পায়। অন্য দিকে

খুব বেশী নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও খুব বেশী হয় না। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মাঝামাঝি ধরনের ফল করে। কোন বন্টনের এই ধরনের কেন্দ্রের দিকে ঘণীভূত হওয়ার প্রবণতাকে বলে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বা Central Tendency. এই বিষয়টি যে কোন স্বাভাবিক বন্টনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার গুরুত্ব :

শিক্ষাগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যায় —

- কেন্দ্রীয় প্রবণতার মান শিক্ষামূলক তথ্যগুলোকে অর্থবহ করে তোলে এবং এর ব্যাপক তাৎপর্য নির্ণয়ে সাহায্য করে।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বা গড় বন্টনের সেই মানকে তুলে ধরে যা সমগ্র বন্টনের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে।
- দুই বা ততোধিক বন্টনের তুলনা করতে প্রতিনিধিত্বমূলক মানকে নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাহায্যে এই প্রতিনিধিত্বমূলক মানকে পাওয়া যেতে পারে।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার মানকে আগেকার কোনো তুল্যাঙ্ক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে শ্রেণির সাফল্যের হার নির্ণয় করা যায়।
- বিষমতার পরিমাপ, তির্যকতার পরিমাপ, সহগতির পরিমাপ এবং সূচক নম্বর ইত্যাদির মতো বিভিন্ন রাশিবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কৌশল কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে।
- সংগৃহীত বা শ্রেণিবদ্ধ সংখ্যার প্রতীকগুলো (Figure) বিস্তৃত হয়। এগুলোকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য গড় (Mean) কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মিন বা গড় সমস্ত বিষয়টিকে একটি মাত্র সংখ্যা প্রতীকে (Figure) পরিবর্তিত করে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ :

যে একক সংখ্যামানকে আমরা একগুচ্ছ সাংখ্যমানের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার করি রাশিবিজ্ঞানে তাকেই কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বলে। শিক্ষামূলক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিন ধরনের কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ ব্যবহার করা হয়। তা হল— (১) পাটিগাণিতিক গড় (Arithmatic Mean), (২) মধ্যমমমান (Mediam), (৩) ভূষিষ্ঠক (Mode)।

১। পাটিগাণিতিক গড় বা Mean :

সাধারণভাবে বলা যায় গড় হলো কোনো এক জাতীয় রাশির সংখ্যাতালিকা বা রাশির সকল মানকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি একক মান। এক জাতীয় সমস্ত রাশির যোগফলকে সেই রাশির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফলটি পাওয়া যায় তাকেই পাটিগাণিতিক গড় বা Mean বলে।

গড়ের বা মিনের ধর্ম :

গড়ের যে সাধারণ ধর্মগুলো লক্ষ্য করা যায় তা হল—

- চূড়ান্ত স্কোর দ্বারা অর্থাৎ খুব কম বা খুব বেশি স্কোর দ্বারা গড় প্রভাবিত হয়। কারণ গড় নির্ণয় করতে

গেলে সবগুলো স্কোরকে যোগ করতে হয়। তাই খুব কম বা বেশি স্কোর হলে গড়ও পরিবর্তিত হয়।

- কোনো অসমাপ্ত বণ্টনের গড় নির্ণয় করা যায় না।
- গড় রাশিমালার যে কোনো একটি রাশির মান দ্বারা প্রভাবিত হয় অর্থাৎ যে কোনো একটি স্কোরের পরিবর্তনের ফলে রাশিমালার গড়ের পরিবর্তন হয়।
- কোন রাশিমালার প্রতিটি রাশির সঙ্গে নির্দিষ্ট মান যোগ করলে বা প্রতিটি থেকে নির্দিষ্ট মান বিয়োগ করলে অথবা ওই সংখ্যার দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে রাশিমালার গড়ও অনুরূপভাবে ওই সংখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হবে।
- গড় হল রাশিমালার প্রকৃত সাম্য বিন্দু (Balance point) অর্থাৎ রাশিমালার প্রত্যেকটা রাশি থেকে গড় বিয়োগ করে বিয়োগফলগুলোর চিহ্ন (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চিহ্ন) অনুযায়ী যোগ করলে যোগফল শূন্য হবে অর্থাৎ $\Sigma\,(X - M) = 0$

গড়ের সুবিধা :

গড়ের সুবিধাগুলো হল—

- সবচেয়ে নির্ভুল, ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ পেতে গেলে গড়ই সবচেয়ে কার্যকর।
- প্রকৃত কেন্দ্রীয় প্রবণতার মান নির্ণয়ের জন্য গড় প্রয়োজন হয়।
- যখন বণ্টনটি স্বাভাবিক হয়ে থাকে তখন গড় ব্যবহার করাই সমীচিন।
- কেন্দ্রীয় মানের উপর নির্ভর করে অন্যান্য পরিমাপের যেমন সম্যক্ বিচ্যুতি বা SD, সহপরিবর্তনের মান ইত্যাদি নির্ণয়ের দরকার হয় তখন আগেই গড় বার করার প্রয়োজন হয়।
- যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার ব্যাপক তাৎপর্য নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়।
- এটি এমন একটি পরিমাপ যা খুব সহজে গণনা করা যায়।
- গড় নির্ণয়ের সময় স্কোরগুলোকে তাদের ক্রম অনুযায়ী সাজানোর প্রয়োজন হয় না।
- এটি গণনার সময় সমস্ত স্কোরকে ব্যবহার করে।

গড়ের অসুবিধা :

গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলো দেখা যায় তা হল—

- এটি চূড়ান্ত স্কোর দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই বিশেষভাবে যখন কোনো সজ্জিত স্কোরের এক প্রান্তে চূড়ান্ত স্কোর থাকে তখন তার গড় বার করলে তা নির্ভরযোগ্য হয় না। যেমন— 1 3 7 9 200 এর গড় 44 এর থেকে কোনো স্কোর সম্পর্কেই ধারণা করা যায় না।
- কোনো সংখ্যাগত মান পরিবর্তিত না করা পর্যন্ত বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ইত্যাদির মতো গুণগত বৈশিষ্ট্যের গড় বের করা যায় না। যেমন বুদ্ধির ক্ষেত্রে IQ বের করা।

- একগুচ্ছ তথ্যের মধ্যে একটি মাত্র তথ্য অনুপস্থিত থাকলে তার গড় নির্ণয় করা যায় না।
- এটি নির্ণয় করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

গড় নির্ণয় পদ্ধতি :

অবিন্যস্ত রাশিমালার গড় নির্ণয়

অবিন্যস্ত বা অশ্রেণিবদ্ধ রাশিমালার গড় নির্ণয় করার জন্য রাশিমালার অন্তর্ভুক্ত রাশিগুলোর সমষ্টিকে রাশির সংখ্যার দ্বারা ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে রাশিগুলোর গড় নির্ণয় করা হচ্ছে তার যে একক আছে নির্ণিত গড়ের এককও তাই হবে অর্থাৎ রাশিগুলোর একক গ্রাম, লিটার কিংবা মিটার ইত্যাদি যাই হোক না কেন নির্ণিত গড়ের একক ও তাই হবে।

নীচে অশ্রেণিবদ্ধ স্কোর থেকে গড় নির্ণয় করে দেখানো হল— একটি বিদ্যালয়ে 7 জন শিক্ষার্থী গণিত বিষয়ের পরীক্ষায় যে নম্বরগুলো পেয়েছে তা দেওয়া আছে। এর গড় বের করতে হবে—

50, 52, 69, 70, 64, 55, 60

অবিন্যস্ত রাশিমালার ক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের সূত্র হল—

সূত্র : $M = \frac{\Sigma x}{N}$

(এক্ষেত্রে, M = গড় (Mean), x' = এক একটি রাশি বা নম্বর, Σx = সমস্ত রাশিগুলোর যোগফল, N = রাশিগুলোর মোট সংখ্যা)

$$M = \frac{50+52+69+70+64+55+60}{7}$$

$$= \frac{420}{7}$$

$$= 60$$

সুতরাং 7 জন শিক্ষার্থী গণিত বিষয়ে গড়ে 60 নম্বর করে পেয়েছে।

অবিন্যস্ত বা অশ্রেণিবদ্ধ স্কোর থেকে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় :

গড় নির্ণয় করার অপর একটি পদ্ধতি আছে যা কল্পিত গড় পদ্ধতি (Assumed mean method) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়।

$$\text{Mean} = A + \frac{\Sigma x}{N}$$

(এক্ষেত্রে, M=Mean বা গড়, A= কল্পিত গড়, N= মোট পরিসংখ্যা, x'= প্রতিটি স্কোর x' থেকে কল্পিত গড় (A)-এর চ্যুতি বা পার্থক্য, $\Sigma x'$= ওই পার্থক্য বা চ্যুতিগুলোর সমষ্টি।

উদাহরণ : নবম শ্রেণির বাংলা পরীক্ষায় 10 জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরগুলো হল 50, 28, 46, 32, 35, 39, 54, 42, 25, 30। কল্পিত গড় পদ্ধতিতে এদের নম্বরের গড় নির্ণয় করতে হবে।

প্রাপ্ত নম্বর	পার্থক্য বা চ্যুতি
x	$(x' = x - A)$
25	–14
28	–11
30	–9
32	–7
35	–4
39	0
42	3
46	7
50	11
54	15
	$\Sigma x' = -9$

সুতরাং গড় (Mean) $= A + \frac{\Sigma x'}{N}$

$$= 39 + \left(\frac{-9}{10}\right)$$

$$\begin{bmatrix} A = 39 \text{(ধরা যাক)} \\ \Sigma x' = -9 \\ N = 10 \end{bmatrix}$$

$$= 39 - 0.9$$

$$= 38.1$$

অতএব শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের নির্ণেয় গড় হল— 38.1

বিন্যস্ত রাশিমালার গড় নির্ণয় :

বিন্যস্ত রাশিমালা থেকে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে— (১) দীর্ঘ পদ্ধতি (Long Method), (২) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি (Short Method) বা কল্পিত গড় পদ্ধতি (Assumed Mean Method)।
(১) দীর্ঘ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়–

উদাহরণ (এক)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা f	মধ্যমান x	মধ্যমান × পরিসংখ্যা fx'
40 – 44	3	42	126
45 – 49	3	47	141
50 – 55	5	52	260
55 – 59	7	57	399
60 – 65	10	62	620
65 – 69	8	67	536
70 – 75	6	72	432
75 – 79	5	77	385
80 – 85	2	82	164
85 – 89	1	87	87
	N = 50		**Σfx = 3150**

দীর্ঘ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$\text{গড় (Mean)} = \frac{\Sigma fx'}{N}$$

সূত্র অনুযায়ী মান বসিয়ে পাই—

$$\text{Mean} = \frac{\Sigma fx'}{N}$$

$$= \frac{3150}{50} \qquad \begin{bmatrix} N = 50 \\ \Sigma fx' = 3150 \end{bmatrix}$$

$$= 63$$

(এক্ষেত্রে, M = গড় (Mean), f = পরিসংখ্যা, x = মধ্যবিন্দু, fx = পরিসংখ্যা ও মধ্যবিন্দুর গুণফল, $\Sigma fx'$ = সমস্ত fx' এর যোগফল)

পর্যায়-১

প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যবিন্দু $\left(\frac{\text{সর্বোচ্চ স্কোর + সর্বনিম্ন স্কোর}}{2}\right)$ এই সূত্রানুযায়ী নির্ণয় করে x সারিতে বসাতে হবে।

পর্যায়-২

প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যবিন্দুর সঙ্গে ওই শ্রেণির পরিসংখ্যাকে গুণ করে fx সারিতে বসাতে হবে।

পর্যায়-৩

fx সারির সমস্ত গুণফলকে যোগ করতে হবে এবং এই যোগফলকে Σfx এর পাশে লিখতে হবে।

পর্যায়-৪

সূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন মানকে বসিয়ে গড় নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ (দুই)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা f	মধ্যমান x	মধ্যমান × পরিসংখ্যা fx'
90 – 92	1	91	91
93 – 95	2	94	188
96 – 98	4	97	388
99 – 101	3	100	300
102 – 104	6	103	618
105 – 107	9	106	954
108 – 110	5	109	545
111 – 113	4	112	448
114 – 116	2	115	230
117 – 119	2	118	236
120 – 122	2	121	242
	N = 40		**Σfx = 4240**

$$\text{গড় (Mean)} = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{4240}{40} = 106$$

$$\left[\begin{array}{l} N = 40 \\ \Sigma fx' = 4240 \end{array}\right]$$

(২) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি (Short Method) বা কল্পিত গড় পদ্ধতিতে (Assumed Mean) গড় নির্ণয় :

উদাহরণ (এক)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা f	মধ্যবিন্দু x	বিচ্যুতি $x' = \frac{x-M}{i}$	পরিসংখ্যা বিচ্যুতি fx'
98 – 102	1	100	–5	–5
103 – 107	3	105	–4	–12
108 – 112	9	110	–3	–27
113 – 117	11	115	–2	–22
118 – 122	18	120	–1	–18
123 – 127	26	125	0	0
128 – 132	17	130	+1	+17
133 – 137	10	135	+2	+20
138 – 142	3	140	+3	+9
143 – 147	2	145	+4	+8
	N = 100			**$\Sigma fx' = -30$**

$$M = A.M + \frac{\Sigma fx'}{N} \times i$$

$$= 125 + \frac{-30}{100} \times 5$$

$$= 125 + \frac{-150}{100}$$

$$= 125 - 1.5$$

$$= 123.5$$

[এখানে, $A.M = 125$, $\Sigma fx' = -30$, $N = 100$, $i = 5$]

(এক্ষেত্রে, f = পরিসংখ্যা, x = মধ্যবিন্দু, x' = কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুর দূরত্ব, A.M = কল্পিত গড়, N = মোট পরিসংখ্যা, i = শ্রেণি প্রসার, fx' = প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের f ও x' এর গুণফল, Σfx = সমস্ত fx' এর যোগফল)

পর্যায়-১

প্রতিটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু $\left(\frac{\text{সর্বোচ্চ স্কোর + সর্বনিম্ন স্কোর}}{2}\right)$ এই সূত্রানুযায়ী নির্ণয় করে x স্তম্ভে বসাতে হবে।

পর্যায়-২

x সারির মধ্যবিন্দুগুলোর মধ্যে যে কোনো একটিকে কল্পিত গড় হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। কল্পিত গড় নির্বাচনের জন্য কোনো নীতি নেই। তবে বণ্টনের কেন্দ্রে যেখানে শ্রেণি ব্যবধানের সর্বোচ্চ পরিসংখ্যাটি রয়েছে সেখানে কল্পিত গড় নির্বাচন করলে ভাল। প্রদত্ত বণ্টনে সর্বোচ্চ পরিসংখ্যাটি রয়েছে 123-127 এই শ্রেণিটিতে। তাই এই শ্রেণিটির মধ্যবিন্দু 125 কে কল্পিত গড় হিসাবে নির্বাচন করা হল।

পর্যায়-৩

কল্পিত গড়ের পাশে ডানদিকের x' স্তম্ভে '0' বসাতে হবে। '0' এর উপরে বা নীচে যে দিকে ক্রমোচ্চ শ্রেণি ব্যবধানগুলো রয়েছে তাদের বিপরীতে x' স্তম্ভে উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী +1, +2, +3 এবং যেদিকে ক্রম নিম্ন শ্রেণি ব্যবধানগুলো রয়েছে সেখানেও উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী –1, –2, ... এভাবে সবগুলো শ্রেণি ব্যবধানের বিপরীতে সংখ্যাগুলো বসানো সম্পূর্ণ করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে সংখ্যাগুলো যান্ত্রিকভাবে বসানো হলেও প্রকৃতপক্ষে সে সূত্র অনুসরণ করে সংখ্যাগুলো বসানো হয়েছে তা হলো $\frac{x - \text{A.M}}{i}$ অর্থাৎ কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দু বিয়োগ করে সেই বিয়োগফলকে শ্রেণি প্রসার দ্বারা ভাগ করলেই এই সংখ্যাগুলো পাওয়া যাবে। প্রতিবার বিয়োগ করে ভাগ করার সময়কে বাঁচানোর জন্য এই পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে।

পর্যায়-৪

প্রতিটি শ্রেণির f সঙ্গে ওই শ্রেণির x' কে গুণ করে তা fx' স্তম্ভে বসাতে হবে। এক্ষেত্রে মানগুলো বসানোর সময় x' স্তম্ভের '+' ও '–' চিহ্নগুলোকেও না এড়িয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্থানে বসাতে হবে।

পর্যায়-৫

x' স্তম্ভের '+' চিহ্ন যুক্ত মানগুলোকে একত্রে যোগ করতে হবে এবং '–' চিহ্ন যুক্ত মানগুলোকে আলাদা যোগ করে যোগফল থেকে বিয়োগফল বাদ দিতে হবে। আর এই মানটি fx' স্তম্ভের শেষে $\Sigma fx'$ এর মান হিসাবে বসবে।

পর্যায়-৬

সূত্র অনুযায়ী মানগুলো পর পর বসাতে হবে। যেমন– প্রদত্ত বণ্টন অনুযায়ী $\text{A.M} = 125, \Sigma fx'' = -30,$ $N = 100, i = 5.$ এভাবে গড় নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ (দুই)

শ্রেণিব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা f	মধ্যবিন্দু x	বিচ্যুতি $x' = \frac{x - M}{i}$	পরিসংখ্যা বিচ্যুতি fx′
55 – 59	2	57	+4	+8
50 – 54	4	52	+3	+12
45 – 49	7	47	+2	+14
40 – 44	6	42	+1	+6
35 – 39	11	37	0	0
30 – 34	7	32	–1	–7
25 – 29	5	27	–2	–10
20 – 24	4	22	–3	–12
15 – 19	3	17	–4	–12
10 – 14	1	12	–5	–5
	N = 50			**Σfx′ = –6**

গড় (Mean) $= A.M + \frac{\Sigma fx'}{N} \times i$

$= 37 + \frac{-6}{50} \times 5$

$= 37 - 0.12 \times 5$

$= 37 - 0.6$

$= 36.4$

[এখানে, $A.M = 37$, $\Sigma fx' = -6$, $N = 50$, $i = 5$]

২। মধ্যমমান (Median) :

মধ্যমমান হল কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপের মধ্যে একটি। এটি একটি বিন্দু, কোনো তথ্য নয়। যখন রাশিগুলো মানের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত থাকে, তখন মধ্যমমান হল পরিমাপক স্কেলের এমন একটি বিন্দু যা পরিমাপক স্কেলকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে। ফলে স্কেলের উপরে ও নীচে সমান সংখ্যক রাশি থাকে। যারমধ্যে একটি অংশের রাশিগুলোর প্রত্যেকটি মধ্যমমান থেকে ছোট হয় এবং অন্য অংশের প্রত্যেকটি রাশির মান মধ্যমমান থেকে বড় হয়। এটিকে সংক্ষেপে Mdn দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

মধ্যমমানের ধর্ম :

ক) রাশিমালার মোট সংখ্যা এবং মধ্যমমানের সাপেক্ষে রাশির স্থান (মধ্যমার উপরে বা নীচে) অপরিবর্তিত রেখে রাশির মান পরিবর্তন করলে মধ্যমমান অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু গড়ের ক্ষেত্রে গড়ের মান পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। তাই মধ্যমমান গড় অপেক্ষা অনেক স্থিতিশীল।

খ) মধ্যমমান পরিমাপক স্কেলের একটি বিন্দু মাত্র, যে বিন্দুর উপরে ও নীচে কয়টি স্কোর আছে তা বলা যায়।

গ) অসমাপ্ত বন্টনের মধ্যমমান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু গড় নির্ণয় করা যায় না।

ঘ) মধ্যমমান গড়ের মতো প্রতিটি রাশির সঙ্গে একই সংখ্যা যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করলে অনুরূপভাবে ওই সংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ঙ) মধ্যমমান এবং রাশিমালার কয়টি রাশি আছে জানা থাকলে মধ্যমমানের উপরে ও নীচে কয়টি স্কোর আছে বলা যায়। এক্ষেত্রে রাশিগুলোর নিজস্ব মান জানার দরকার হয় না। কিন্তু গড়ের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

মধ্যমমানের সুবিধা : যেসব ক্ষেত্রে মধ্যমমান ব্যবহার করা সুবিধাজনক তা হল—

- যখন কেবলমাত্র প্রকৃত মধ্যবিন্দুটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় উপরে ও নীচে শতকরা তার 50 ভাগ স্কোর রয়েছে।
- গড়ের তুলনায় মধ্যমমান কম সময়ে দ্রুত নির্ণয় করা যায়।
- প্রান্তে খুব বড় বা খুব ছোট অর্থাৎ চরম প্রকৃতির স্কোর থাকে সেক্ষেত্রে গড় সহজেই প্রভাবিত হয়ে খুব ছোট বা বড় হয়ে উঠতে পারে। যার ফলে গড়ের পক্ষে কোনো স্কোরকে প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এ ধরনের ক্ষেত্রে মধ্যমমান প্রভাবিত হয় না। ফলে মধ্যমমান থেকে অধিকাংশ স্কোর সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়।
- যখন বণ্টনটি অসম্পূর্ণ থাকার জন্য গড় নির্ণয় করা যায় না তখনও মধ্যমমান নির্ণয় করা যায়।
- যখন গৃহীত এককটি যে সর্বত্র সমান সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই, তখন মধ্যমমান ব্যবহৃত হয়।

অসুবিধা :

- মধ্যমমান নির্ণয়ের সময় প্রতিটি স্কোরকে ব্যবহৃত করা হয় না।
- রাশিগুলোর মধ্যে কোনো রাশির পরিবর্তন হলে মধ্যমমান তার দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত হয় না।
- মধ্যমমানের সাহায্যে নিখুঁত মান বার করা যায় না, মানটি হয় আনুমানিক।
- স্কোরগুলোকে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন মান অনুযায়ী না সাজালে মধ্যমমান নির্ণয় করা যায় না। তাছাড়া স্কোরের সংখ্যা বেশি হলে তা সাজাতে দীর্ঘ সময় লাগে।
- এটি গড়ের তুলনায় কম স্থিতিশীল (Stable)।

- প্রান্তে চরম স্কোর থাকলে মধ্যমমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব থাকে না।
- গড়কে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক গণনা নিশ্চিত হয়। কিন্তু মধ্যমমানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

মধ্যমমান নির্ণয় পদ্ধতি :

অবিন্যস্ত (Ungrouped) রাশিমালার মধ্যমমান নির্ণয় :

অবিন্যস্ত রাশিমালা দুই ধরনের হয়— (i) বিজোড় সংখ্যক, (ii) জোড় সংখ্যক।

বিজোর সংখ্যক রাশিমালার মধ্যমমান নির্ণয়—

স্কোর : 8, 3, 5, 9, 10, 11, 7

প্রদত্ত স্কোরগুলোকে তাদের মানের ক্রমে সজ্জিত করলে রাশিমালাটি নিম্নরূপ হয়— 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11

এখানে N = 7, অর্থাৎ রাশিমালায় বিজোড় সংখ্যক স্কোর আছে। এক্ষেত্রে মধ্যমমান নির্ণয়ের সূত্র

হল— মধ্যমমান (Median) $= \frac{N+1}{2}$ তম পদ

$= \frac{7+1}{2} = \frac{8}{2} = 4$ তম পদ

এখন রাশিমালার নিম্নমান থেকে গণনা করলে দেখা যায় 8 হল 4 তম পদ

সুতরাং Mdn = 4 তম পদ বা 8

এক্ষেত্রে N = 7 (মোট রাশির সংখ্যা)

পর্যায়-১

সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় অনুযায়ী সাজাতে হবে।

পর্যায়-২

সূত্র অনুযায়ী মানটি বসাতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে N = 7 বসানো হল।

পর্যায়-৩

সূত্রানুযায়ী যত তম পদে Mdn টি পড়েছে সজ্জিত রাশিমালা থেকে তা বের করতে হবে। সেটাই হবে ওই রাশিমালার মধ্যমমান। বর্তমান বণ্টনে 4 তম পদে Mdn টি রয়েছে। অর্থাৎ মধ্যমমান হবে 4 তম পদ বা ৪।

জোড় সংখ্যক রাশিমালার মধ্যমমান নির্ণয়—

স্কোর : 10, 8, 9, 4, 12, 16

প্রদত্ত স্কোরগুলোকে তাদের মানের ক্রমে সজ্জিত করলে রাশিমালাটি নিম্নরূপ হয়।

4, 8, 9, 10, 12, 16

এখানে N = 6, অর্থাৎ রাশিমালায় জোড় সংখ্যক স্কোর আছে।

এক্ষেত্রে মধ্যমমান নির্ণয়ের সূত্র হল– মধ্যমমান (Median) $= \frac{n_1 + n_2}{2}$

যেখানে $n_1 = \frac{N}{2}$ তম পদ এবং $n_2 = \left(\frac{N}{2} + 1\right)$ তম পদ

অর্থাৎ $n_1 = \frac{N}{2} = \frac{6}{2} = 3$ তম পদ অর্থাৎ 9

$n_2 = \left(\frac{N}{2} + 1\right) = \frac{6}{2} + 1 = 3 + 1 = 4$ তম পদ, অর্থাৎ 10

সুতরাং Median $= \frac{n_1 + n_2}{2} = \frac{9 + 10}{2} = \frac{19}{2} = 9.5$

পর্যায়-১

সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট অনুযায়ী সাজাতে হবে।

পর্যায়-২

সূত্র অনুযায়ী মানটি বসাতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে N = 6 বসানো হল।

পর্যায়-৩

সূত্রানুযায়ী যত তম পদে Mdn টি পড়েছে সজ্জিত রাশিমালা থেকে তা বের করতে হবে। সেটাই হবে ওই রাশিমালার মধ্যমমান। বর্তমান বণ্টনে 3 তম পদে 4 তম পদের মাঝামাঝি Mdn টি রয়েছে। এক্ষেত্রে 3 তম পদটি হল 9 এবং 4 তম পদটি হল 10। এই দুটি পদকে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করলে মধ্যমানটি পাওয়া যায় তা হল 9.5.

বিন্যস্ত (Grouped) রাশিমালার মধ্যমমান নির্ণয় :

উদাহরণ (এক)

স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা (f)	শ্রেণিসীমানা (L)	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (Cf)
20 – 29	5	19.5 – 29.5	5
30 – 39	7	29.5 – 39.5	12
40 – 49	8	39.5 – 49.5	20
50 – 59	10	49.5 – 59.5	30
60 – 69	12	59.5 – 69.5	42
70 – 79	4	69.5 – 79.5	46
80 – 89	3	79.5 – 89.5	49
90 – 99	1	89.5 – 99.5	50
	N = 50		

বিন্যস্ত রাশিমালার মধ্যমমান নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$\text{মধ্যমমান (Median)} = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{fm} \right) \times i$$

এখানে, L = যে শ্রেণিতে মধ্যমমান অবস্থিত তার নিম্নসীমা

$\frac{N}{2}$ = মোট পরিসংখ্যার অর্ধেক

F = L এর পূর্ববর্তী অথবা নীচের শ্রেণি পর্যন্ত সবগুলো শ্রেণির পরিসংখ্যার যোগফল (প্রথম সমাধানটির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্রমপুঞ্জিত পরিসংখ্যা নেওয়া হয়েছে)

fm = যে শ্রেণিতে মধ্যমমান অবস্থিত তার পরিসংখ্যা

i = শ্রেণির প্রসার

$$\text{সূত্র : Mdn} = L + \frac{\frac{N}{2} - F}{fm} \times i$$

$$= 49.5 + \frac{25 - 20}{10} \times 10$$

$$= 49.5 + \frac{5}{10} \times 10$$

$$= 49.5 + 5$$

$$= 54.5$$

[এখানে, L = 49.5
F = 20
fm = 10
N = 50
i = 10]

কিভাবে মধ্যমমান নির্ণয় করতে হবে—

পর্যায়-১

মোট পরিসংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করে $\frac{N}{2}$ নির্ণয় করতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে $\frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$

পর্যায়-২

সর্বনিম্ন শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত পরিসংখ্যাগুলো পর পর যোগ করে ক্রমবর্ধমান পরিসংখ্যা (Cumulative Frequency) নির্ণয় করে প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধান অনুযায়ী Cf স্তম্ভে বসাতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে সর্বনিম্ন শ্রেণি ব্যবধানটি হল 20-29। এর পরিসংখ্যা হল 5। সুতরাং Cf স্তম্ভে 5 বসাতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণি ব্যবধানটি হল 30-39। এর পরিসংখ্যা হল 7। এক্ষেত্রে এই সারির Cf টি হবে পূর্বের শ্রেণি ব্যবধানের Cf + 7 = 12। তৃতীয়টি হবে পূর্বের Cf বা 12 + 8 (ওই শ্রেণির পরিসংখ্যা) প্রভাবে সর্বোচ্চ শ্রেণির পরিসংখ্যা পর্যন্ত যোগ করে এগিয়ে যেতে হবে এবং তা Cf স্তম্ভে পর পর বসাতে হবে।

পর্যায়-৩

N/2 সংখ্যক স্কোর যে শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে 50-59 শ্রেণিটির Cf হল 30। অর্থাৎ এই শ্রেণি পর্যন্ত $\frac{N}{2}$ সংখ্যক বা 25টি স্কোর রয়েছে।

পর্যায়-৪

সূত্র অনুযায়ী L বা নিম্ন সীমাটি (Lower limit) নির্ণয় করে মানটি বসাতে হবে। এজন্য যে শ্রেণি ব্যবধানটিতে N/2 সংখ্যক স্কোর বা মধ্যমমানটি রয়েছে সেই শ্রেণিসীমাটি চিহ্নিত করে তার সর্বনিম্ন সীমা নির্ণয় করতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে মধ্যমমানটি যে শ্রেণিতে রয়েছে তার নিম্নসীমা বা 'L' হবে 49.5। (এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে কোনো শ্রেণির উর্ধ্বসীমা নির্ণয় করতে গেলে যেমন ওই শ্রেণির সর্বোচ্চ স্কোরের সঙ্গে .5 যোগ করতে হবে। অন্যদিকে নিম্নসীমা নির্ণয় করতে গেলে নির্দিষ্ট শ্রেণিটির সর্বনিম্ন স্কোরটির থেকে .5 বিয়োগ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে প্রদত্ত বণ্টনের 50-59 এই শ্রেণিটির নিম্নসীমা হবে 50 –.5 = 49.5 , আর উর্ধ্বসীমা হবে 59 +.5 = 59.5)

পর্যায়-৫

F এর মান নির্ণয় করে তা বসাতে হবে। এক্ষেত্রে F হচ্ছে যে শ্রেণিটিতে মধ্যমমানটি রয়েছে তার নীচের সমস্ত শ্রেণিগুলোর মোট পরিসংখ্যা বা Cf। প্রদত্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে F = 20

পর্যায়-৬

fm এর মান নির্ণয় করে তা বসাতে হবে। এক্ষেত্রে fm হবে যে শ্রেণিটিতে মধ্যমানটি রয়েছে তার পরিসংখ্যা। প্রদত্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে fm = 20

পর্যায়-৭

শ্রেণি প্রসার নির্ণয় করে বসাতে হবে। বর্তমান বণ্টনের শ্রেণি প্রসার 10

পর্যায়-৮

সূত্রানুযায়ী বিভিন্ন মানগুলো বসিয়ে মধ্যমমান নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ (দুই)

স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা (f)	শ্রেণিসীমানা (L)	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (Cf)
45 – 49	1	44.5 – 49.5	30
40 – 44	2	39.5 – 44.5	29
35 – 39	2	34.5 – 39.5	27
30 – 34	4	29.5 – 34.5	25
25 – 29	9	24.5 – 29.5	21
20 – 24	8	19.5 – 24.5	12
15 – 19	3	14.5 – 19.5	4
10 – 14	0	9.5 – 14.5	1
5 – 9	1	4.5 – 9.5	1
	N = 30		

মধ্যমমান (Median) $= L + \left(\dfrac{\frac{N}{2} - F}{fm}\right) \times i$

$= 24.5 + \left(\dfrac{15-12}{9}\right) \times 5$

$= 24.5 + \dfrac{3}{9} \times 5$

$= 24.5 + 1.665$

$= 24.5 + 1.67$

$= 26.17$

[এখানে, $L = 24.5$
$F = 12$
$fm = 9$
$N = 30$
$i = 5$]

৩। ভূযিষ্ঠক (Mode) :

ভূযিষ্ঠক এক ধরনের গড় (Average)। যখন খুব দ্রুত কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় তখন ভূযিষ্ঠক ব্যবহার করা হয়। যখন স্কোরগুলো অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে, তখন যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশিবার থাকে তাকে ভূযিষ্ঠক বা Mode বলে। কোনো রাশিমালায় যদি প্রত্যেকটি রাশি মাত্র একবার করে থাকে তাহলে এই রাশিমালার নির্দিষ্ট কোনো ভূযিষ্ঠক নির্ণয় করা যায় না।

ভূযিষ্ঠকের ধর্ম :

- রাশিগুলোর মধ্যে একটি মাত্র মানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- অন্যান্য রাশিবিজ্ঞানের গণনার ক্ষেত্রে এর কোনো গুরুত্ব নেই।
- রাশিমালার সাধারণ প্রবণতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপক।
- বণ্টনে এই মানটি সবচেয়ে বেশি বার আসে বা এই বিন্দু সবচেয়ে বেশি স্কোরের ভিড় দেখা যায়।
- কোনো বণ্টনে একাধিক ভূযিষ্ঠক থাকতে পারে।

ভূযিষ্ঠকের সুবিধা :

- কেন্দ্রীয় প্রবণতার অন্যান্য পরিমাপের তুলনায় সবচেয়ে দ্রুত ও সহজে নির্ণয় করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারাই এটি নির্ণয় করা যায়।
- মধ্যমমানের মতো এটিও চূড়ান্ত স্কোর দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- যখন প্রদত্ত বণ্টনের মধ্যে কোনো স্কোরটি বেশি বার ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় তখন ব্যবহার করা সুবিধাজনক।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার দুটি পরিমাপের তুলনায় এর ব্যবহার বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- স্কোরগুলোর বিস্তৃতির উপর এর মান নির্ভর করে না।
- গুণগত বা পরিমাণগত দিক থেকে কোনো চল (Variable) বেশি বার ঘটে তা জানার জন্য দরকার হয়। যেমন— আধুনিক ছেলে মেয়েরা কোন্ ধরনের পেশা বেশি ব্যবহার করে তা ভূযিষ্ঠকের মাধ্যমে জানা যায়।
- মুক্ত-সমাপ্ত বণ্টনের (Open Ended Distribution) ক্ষেত্রে শ্রেণিসীমা নির্ণয় না করেই এর মান নির্ণয় করা যায়।

ভূযিষ্ঠকের অসুবিধা :

- এর সাহায্যে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা কঠিন, তাই কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হিসাবে এটি কম নির্ভরযোগ্য।
- এটিকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।
- বণ্টনের সমস্ত স্কোরকে গুরুত্ব দেয় না।
- কোনো কোনো বণ্টনে কোনো ভূযিষ্ঠক নাও থাকতে পারে।
- এর নির্ভরযোগ্যতা গড় ও মধ্যমমানের তুলনায় কম।
- একাধিক ভূযিষ্ঠক বিশিষ্ট বণ্টনের ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন।
- বীজগাণিতিক গণনার ক্ষেত্রে ভূযিষ্ঠক উপযুক্ত নয়।
- রাশিবিজ্ঞানের অন্যান্য পরিমাপে এটি সহায়ক নয়।

ভূষিষ্ঠক নির্ণয় পদ্ধতি :

ভূষিষ্ঠককে দু'ভাবে নির্ণয় করা যায়— (১) স্থূল ভূষিষ্ঠক (Crude Mode) বা অভিজ্ঞতা নির্ভর ভূষিষ্ঠক (Impirical Mode), (২) প্রকৃত ভূষিষ্ঠক (True Mode)।

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের স্থূল ভূষিষ্ঠক নির্ণয় :

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের স্থূল ভূষিষ্ঠক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। যেমন–10, 5, 8, 12, 10, 9, 6, 10, 6, 5, 10 –এই স্কোরগুলো সাজিয়ে লিখলে যা দাঁড়ায় তা হল–

5, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 12

উপরোক্ত সারিটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় 10 এই স্কোরটি চারবার বা সবচেয়ে বেশি বার এসেছে। তাই 10 হল এই সারির স্থূল ভূষিষ্টক বা ক্রুড মোড। এ বিষয়ে যা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে তা হল, কোনো বণ্টনে যদি একইভাবে দুটি সংখ্যা পর পর আসে তবে ওই বণ্টনটিকে বলা হবে দ্বি-ভূষিষ্ঠক যুক্ত বণ্টন বা Bio-modal Distribution.

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের সাহায্যে স্থূল ভূষিষ্ঠক নির্ণয় :

বিন্যস্ত বা পরিসংখ্যা বণ্টনে সাজানো স্কোরগুচ্ছের স্থূল ভূষিষ্ঠক বার করার নিয়ম হল, যে শ্রেণিব্যবধানটির পরিসংখ্যা সবচেয়ে বেশি সেই শ্রেণি ব্যবধানটির মধ্যবিন্দুকে নিতে হবে। যেমন—

শ্রেণি ব্যবধান	f	Mid Point
10 – 14	5	12
15 – 19	7	17
20 – 24	9	22
25 – 29	10	27
30 – 34	12	32
35 – 39	8	37
40 – 44	6	42
45 – 49	2	47
50 – 54	1	52
	N=60	

প্রদত্ত বণ্টনটিতে 30 – 34 এই শ্রেণি ব্যবধানটির পরিসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাই বণ্টনটির স্থূল ভূষিষ্ঠক হল 30 – 34 এই শ্রেণি ব্যবধানটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 32 (কোনো বণ্টন যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে স্থূল ভূষিষ্ঠক ও প্রকৃত ভূষিষ্ঠক একই হয়। কিন্তু বণ্টনটি যদি Skewed বা তির্যক হয় তাহলে স্থূল ও প্রকৃত ভূষিষ্ঠক ভিন্ন ভিন্ন হবে)।

প্রকৃত ভূযিষ্টক :

কোনো পরিসংখ্যা বণ্টনের প্রকৃত (True) ভূযিষ্ঠক বলতে বোঝায় সেই বিন্দুটিকে যে বিন্দুতে স্কোরের বণ্টনের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্কোর কেন্দ্রীভূত রয়েছে। একে স্কোরের কেন্দ্রীভবনের শীর্ষবিন্দু বলে। স্থূল ভূযিষ্ঠক হল এই শীর্ষবিন্দু সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা। আর প্রকৃত ভূযিষ্ঠক হল যথাযথ গণনা করে পাওয়া বণ্টনের এই শীর্ষবিন্দুটির পরিমাপ।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের সাহায্যে প্রকৃত ভূযিষ্ঠক নির্ণয় :

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের সাহায্যে দুইভাবে প্রকৃত ভূযিষ্ঠক বা True Mode বের করা যায়— (১) গড় ও মধ্যমমানের সাহায্যে, (২) সরাসরি।

(১) গড় ও মধ্যমমানের সাহায্যে প্রকৃত ভূযিষ্ঠক নির্ণয় :

উদাহরণ (এক)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা f	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা Cf	মধ্যবিন্দু x	চ্যুতি $x' = \frac{x - A.M}{i}$	পরিসংখ্যা বিচ্যুতি fx'
40 – 44	1	1	42	–6	–6
45 – 49	2	3	47	–5	–10
50 – 54	3	6	52	–4	–12
55 – 59	3	9	57	–3	–9
60 – 64	2	11	62	–2	–4
65 – 69	5	16	67	–1	–5
70 – 74	11	27	72	0	0
75 – 79	8	35	77	1	8
80 – 84	6	41	82	2	12
85 – 89	4	45	87	3	12
90 – 94	3	48	92	4	12
95 – 99	2	50	97	5	10
	N = 50				**$\Sigma fx' = 8$**

$$\text{Mean} = A.M + \frac{\Sigma fx'}{N} \times i$$

$$= 72 + \frac{8}{50} \times 5$$

$$= 72 + .8$$

$$= 72.8$$

$$\begin{bmatrix} A.M = 72 \\ \Sigma fx' = 8 \\ N = 50 \\ i = 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{Mdn} = L + \frac{\frac{N}{2} - F}{fm} \times i$$

$$= 69.5 + \frac{25-16}{11} \times 5$$

$$= 69.5 + \frac{9}{11} \times 5$$

$$= 69.5 + 4.09$$

$$= 73.59$$

$$\begin{bmatrix} L & = 69.5 \\ \frac{N}{2} & = 25 \\ F & = 16 \\ Fm & = 11 \\ i & = 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Mode} &= 3 \times \text{Mdn} - 2 \times \text{Mean} \\ &= 3 \times 73.59 - 2 \times 72.8 \\ &= 220.77 - 145.6 \\ &= 75.17 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \text{Mdn} & = 73.59 \\ \text{Mean} & = 72.8 \end{bmatrix}$$

উদাহরণ (দুই)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা f	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা Cf	মধ্যবিন্দু x	চ্যুতি $x' = \frac{x - A.M}{i}$	পরিসংখ্যা বিচ্যুতি fx′
90 – 94	2	56	92	+5	10
85 – 89	2	54	87	+4	8
80 – 84	4	52	82	+3	12
75 – 79	8	48	77	+2	16
70 – 74	6	40	72	+1	6
65 – 69	11	34	67	0	0
60 – 64	9	23	62	–1	–9
55 – 59	7	14	57	–2	–14
50 – 54	5	7	52	–3	–15
45 – 49	0	2	47	–4	0
40 – 44	2	2	42	–5	–10
	N = 56				**Σfx′ = 4**

$$\text{Mean} = \text{A.M} + \frac{\Sigma fx'}{N} \times i$$
$$= 67 + \frac{4}{56} \times 5$$
$$= 67 + 0.071 \times 5$$
$$= 67 + 0.355$$
$$= 67 + 355$$
$$= 67.36$$

$$\left[\begin{array}{lcr} \text{A.M} & = & 67 \\ \Sigma fx & = & 4 \\ i & = & 5 \\ N & = & 56 \end{array}\right]$$

$$\text{Mdn} = L + \frac{\frac{N}{2} - F}{fm} \times i$$
$$= 64.5 + \frac{\frac{56}{2} - 23}{11} \times 5$$
$$= 64.5 + \frac{28 - 23}{11} \times 5$$
$$= 64.5 + \frac{5}{11} \times 5$$
$$= 64.5 + 0.45 \times 5$$
$$= 64.5 + 2.25$$
$$= 66.75$$

$$\left[\begin{array}{lcr} L & = & 64.5 \\ \frac{N}{2} & = & 28 \\ F & = & 23 \\ Fm & = & 11 \\ i & = & 5 \end{array}\right]$$

$$\text{Mode} = 3 \times \text{Mdn} - 2 \times \text{Mean}$$
$$= 3 \times 66.75 - 2 \times 67.36$$
$$= 220.25 - 134.72$$
$$= 65.53$$

[এখানে, Mdn = 66.75
Mean = 67.36]

(২) পরিসংখ্যা বণ্টন থেকে সরাসরি প্রকৃত ভূষিষ্ঠক নির্ণয় :

শ্রেণি ব্যবধান	f
40 – 44	1
45 – 49	2
50 – 54	3
55 – 59	3
60 – 64	2
65 – 69	5
70 – 74	11
75 – 79	8
80 – 84	6
85 – 89	4
90 – 94	3
95 – 9 9	2
	N = 50

$$\text{Mode} = L + \left(\frac{fa}{fa + fb}\right) xi$$

$$= 69.5 + \left(\frac{8}{8+5}\right) \times 5$$

$$= 69.5 + \frac{40}{13}$$

$$= 69.5 + 3.08$$

$$= 72.58$$

পর্যায়-১

প্রকৃত ভূষিষ্ঠকটি সর্বোচ্চ পরিসংখ্যাযুক্ত যে শ্রেণি ব্যবধানে রয়েছে তার নিম্নসীমা নির্ণয় করে সূত্রানুযায়ী বসাতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে সর্বোচ্চ পরিসীমান 11টি রয়েছে 70–74 এই শ্রেণি ব্যবধানে। সুতরাং এই শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নসীমাটি হবে 69.5.

পর্যায়-২

ভূষিষ্ঠকটি যে শ্রেণি ব্যবধানে পড়েছে সেই শ্রেণির ঠিক পরবর্তী ক্রমোচ্চ শ্রেণি ব্যবধানের পরিসংখ্যাটিকে faর মান হিসাবে সত্রানুযায়ী বসাতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে fa = 8.

পর্যায়-৩

যে শ্রেণিব্যবধানে ভূষিষ্ঠকটি রয়েছে সেই শ্রেণির ঠিক পরবর্তী ক্রমনিম্ন শ্রেণি ব্যবধানের পরিসংখ্যাটিকে fbর মান হিসাবে সূত্রানুযায়ী বসাতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে $fb = 5$.

পর্যায়-৪

শ্রেণি অন্তর বা ব্যবধানটি নির্ণয় করে i এর মান হিসাবে বসাতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে $i = 5$.

পর্যায়-৫

সূত্রানুযায়ী মানগুলো বসিয়ে প্রকৃত মোড বার করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion) :

সুতরাং, কেন্দ্রীয় প্রবণতা কেন্দ্রীয় অবস্থানের সূচক। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হিসাবে গড় (Mean), মধ্যমমান (Mediam) ও ভূষিষ্ঠক (Mode) এই তিনটিকে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ের বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় প্রবণতার সবচেয়ে নিখুঁত পরিমাপ হল গড়। কিন্তু প্রান্তে যখন চূড়ান্ত স্কোর থাকে কিংবা একগুচ্ছ রাশির মধ্যে কোনো রাশি অনুপস্থিত থাকলে অথবা খুব দ্রুত যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার মান বের করার প্রয়োজন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গড় কেন্দ্রীয় প্রবণতার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার অন্য পরিমাপগুলোর সাহায্য গ্রহণ করার দরকার হয়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপকে ব্যবহার করা যায়। সেই দিক বিচার করে বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

চতুর্থ একক

বিষমতার পরিমাপ : সম্যক বিচ্যুতি
(Measures of variability : Standard Deviation)

ভূমিকা (Introduction) :

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ থেকে কোনো বন্টন সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা যথার্থ হয় যদি স্কোরগুলো কেন্দ্রীয় প্রবণতার কাছাকাছি থাকে। কিন্তু স্কোরগুলো যদি কেন্দ্রীয় প্রবণতার থেকে দূরে ছড়িয়ে থাকে তখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ থেকে সমগ্র বন্টনটি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা গঠন করা যায় না। স্কোরগুলোর স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য জানতে হলে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ জানলেই চলবে না। এগুলোর মধ্যে কতটা বৈষম্য আছে তাও জানতে হবে। পরিসংখ্যানের ভাষায় একেই বিষমতার পরিমাপ বলে। এই অধ্যায়ে বিষমতার পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলোর মধ্যে সম্যক বিচ্যুতি বা আদর্শ বিচ্যুতিই (Standard Deviation) হবে এই এককের আলোচ্য বিষয়।

বিষমতার পরিমাপ :

বিষমতার পরিমাপের বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করা যাক। যদি বলা হয় দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মাসিক রোজগারের গড় একই অর্থাৎ 500 টাকা। কিন্তু দেখা গেল যে একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের রোজগারের প্রসার হল সর্বনিম্ন 50 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 1000 টাকা। অন্যদিকে অন্য অঞ্চলটির অধিবাসীদের আয়ের প্রসার হল সর্বনিম্ন 300 টাকা থেকে 800 টাকা। দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের রোজগারের গড় একই হলেও প্রসারের দিক থেকে ভিন্ন। সেই কারণে দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা একই প্রকার বলতে পারা যায় না। সুতরাং বলা যায় দুটি দলের গড় এক হলেও এদের মধ্যে গঠনগত প্রকৃতির দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। স্কোরগুলোকে পুরোপুরি বর্ণনা করা বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গেলে গড়ের সঙ্গে রাশিবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যটি জানা প্রয়োজন তা হল কেন্দ্রীয় মানের সাপেক্ষে বিভিন্ন সংখ্যার বিস্তৃতি কতখানি বা স্কোরগুলোর মধ্যে কতটা বৈষম্য বা পার্থক্য আছে। রাশিবিজ্ঞানের ভাষায় একে বিস্তৃতি বা বিষমতার পরিমাপ বলে (Measures of Variability)। রাশিবিজ্ঞানে চার ধরণের বিষমতার পরিমাপ ব্যবহৃত হয়—

১. প্রসার (Range)

২. চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation)

৩. গড় বিচ্যুতি (Average Deviation)

৪. সম্যক বিচ্যুতি (Standard Deviation)

স্কোরগুচ্ছের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম স্কোরের অন্তরকে স্কোরগুচ্ছের বিস্তৃতি বলে। বণ্টনের মধ্যবর্তী শতকতরা 50 ভাগ স্কোরের অর্ধেককে বলে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি। বণ্টনের গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের বিচ্যুতির গড়কে গড় বিচ্যুতি বলে। বিষমতার সর্বশেষ পরিমাপটি হল সম্যক বিচ্যুতি।

সম্যক চ্যুতি (Standard Deviation) :

বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলোর মধ্যে সম্যক চ্যুতি হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ। এটি গ্রীক চিহ্ন σ (সিগমা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সম্যক চ্যুতি বলতে বোঝায়— কোনো রাশিমালার প্রত্যেক রাশি আর গড়ের অন্তরের বর্গ করে, সেই গড়ের বর্গমূল নির্ণয় করলে যে মান পাওয়া যায় তাকেই সম্যক চ্যুতি বলে।

সম্যক চ্যুতির ধর্ম :

- সম্যক চ্যুতি রাশিমালার প্রত্যেকটি স্কোরের গড় থেকে বিচ্যুতির উপর নির্ভরশীল। তাই কোনো কারণে একটি বা দুটি স্কোরের বিচ্যুতি অন্য স্কোরের তুলনায় অনেক বেশি হয় তাহলে সম্যক বিচ্যুতির মান অনেক বেশি হবে এবং সেক্ষেত্রে সম্যক বিচ্যুতি সমগ্র রাশিমালার প্রকৃত বিষমতার পরিচায়ক হবে না।
- রাশিমালার প্রত্যেক রাশির সঙ্গে একই সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করলে সম্যক বিচ্যুতির মান পরিবর্তন হয় না।
- রাশিমালার প্রত্যেক রাশির সঙ্গে একই সংখ্যা গুণ বা ভাগ করলে সম্যক বিচ্যুতির মানেরও সেই হারে পরিবর্তন ঘটে।
- রাশিমালার মধ্যে কোনো চূড়ান্ত স্কোর থাকলে সেক্ষেত্রে সম্যক পার্থক্যের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। তাই অস্বাভাবিক স্কোর বণ্টনের ক্ষেত্রে সম্যক পার্থক্য প্রকৃত বিস্তৃতির পরিমাপ নাও দিতে পারে।

সম্যক চ্যুতির সুবিধা :

- বিষমতার আদর্শ বা নির্ভরযোগ্য মান হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়।
- বণ্টনের প্রতিটি স্কোরের উপর সমান গুরুত্ব দান করে।
- গাণিতিক গড়ের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে জানতে এটি বিশেষ সাহায্য করে। সম্যক চ্যুতি যত কম হবে গড়ের যথার্থতা তত বেশি হবে।
- কোনো একটি বণ্টনে নির্দিষ্ট মানের স্থান নির্ণয় করা যায় সম্যক পার্থক্যের দ্বারাই।
- সম্যক পার্থক্যের সবচেয়ে বেশি মূল্য হল, স্বাভাবিক Curve এর সাথে এর সম্পর্ক খুবই নিকট।
- দুটি বণ্টনের মধ্যে মিল বা পার্থক্যের মাত্রা জানতে এটি সহায়তা করে। দুটি বণ্টনের সম্যক পার্থক্যের মান যত কম হবে বণ্টনগুলোর মধ্যে সমতা তত বেশি বলে ধরতে হবে। আর যদি সম্যক পার্থক্যের মান বেশি হয় তাহলে বণ্টন দুটির মধ্যে অসমতা বা পার্থক্য বেশি বলে ধরতে হবে।
- রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন গণনার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক। Correlation এর ব্যাখ্যায় ও Sampling এর ক্ষেত্রেও সম্যক পার্থক্য অপরিহার্য।

সম্যক চ্যুতির অসুবিধা :

- এটি সহজবোধ্য নয়। ব্যক্তির পক্ষে রাশিবিজ্ঞানের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে এটিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।
- চূড়ান্ত স্কোর দ্বারা এটি প্রভাবিত হয়।
- এর মান নির্ধারণে তুলনামূলকভাবে বেশি সময় ব্যয় হয়।

সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় পদ্ধতি :

অবিন্যস্ত রাশিমালার সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয়— অবিন্যস্ত রাশিমালার সম্যক বিচ্যুতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। তবে বর্তমান আলোচনায় দুটি পদ্ধতি নিয়েই কেবলমাত্র আলোচনা করা হবে। পদ্ধতি দুটি হলো— (1) প্রকৃত চ্যুতি নির্ণয়ের মাধ্যমে, (2) প্রত্যক্ষভাবে রাশির মান বা স্কোরের সাহায্যে।

(1) প্রকৃত চ্যুতি নির্ণয়ের মাধ্যমে : নিম্নলিখিত স্কোরগুলোর সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে—

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

উদাহরণ (এক)

স্কোর (x) (Score)	চ্যুতি x' (x–M)	চ্যুতির বর্গ x'^2
1	– 4.5	20.25
2	– 3.5	12.25
3	– 2.5	6.25
4	– 1.5	2.25
5	.5	.25
6	1.5	2.25
7	2.5	6.25
8	3.5	12.25
9	4.5	20.25
10	5.5	30.25
$\Sigma x = 55$		$\Sigma x'^2 = 112.50$

অবিন্যস্ত রাশিমালার ক্ষেত্রে সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$M = \frac{\Sigma x}{N} = \frac{55}{10} = 5.5$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x'^2}{N}} = \sqrt{\frac{112.50}{10}} = \sqrt{11.25} = 3.35$$

$$\left[\begin{array}{l} \Sigma x'^2 = 112.5 \\ N = 10 \end{array}\right]$$

এক্ষেত্রে,

x = স্কোর, N = মোট স্কোর সংখ্যা M = গড় (Mean), x' = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি, x'^2 = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতির বর্গ, $\Sigma x'^2$ = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতির বর্গের সমষ্টি।

নির্ণয় পদ্ধতি :

পর্যায়-১

স্কোরগুলোকে x স্তম্ভে পর পর বসাতে হবে এবং সবগুলো স্কোর একত্রে যোগ করে Σx নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-২

$\frac{\Sigma x}{N}$ এই সূত্র অনুযায়ী সবগুলো স্কোরের যোগফলকে (Σx) মোট স্কোর সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করে গড় (M) নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-৩

গড় থেকে প্রতিটি স্কোর বিয়োগ করে, গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি নির্ণয় করে x' স্তম্ভে বসাতে হবে।

পর্যায়-৪

গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতিকে (x') বর্গ করে x'^2 স্তম্ভে বসাতে হবে। তারপর সবগুলো x'^2 যোগ করে $\Sigma x'^2$ নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-৫

এখন $\sqrt{\frac{\Sigma x'^2}{N}}$ এই সূত্রের সাহায্যে সম্যক বিচ্যুতি (σ) নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ (দুই)

স্কোর (x) (Score)	চ্যুতি x' (x–M)	চ্যুতির বর্গ x'^2
8	– 9	81
10	– 7	49
12	– 5	25
14	– 3	9
16	– 1	1
18	1	1
20	3	9
22	5	25
24	7	49
26	9	81
		$\Sigma x'^2 = 330$

এক্ষেত্রে সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হলে প্রথমে গড় নির্ণয় করতে হবে।

গড় (Mean) $= \frac{\Sigma x}{N}$

$= \frac{170}{10}$

$= 17$

[এখানে রাশিমালার সমষ্টি (Σx)=8+10+12+14+16+18+20+22+24+26=170 রাশিমালার মোট সংখ্যা (N)=10]

সম্যক বিচ্যুতি (SD) $= \sqrt{\frac{\Sigma x'^2}{N}}$

$= \frac{330}{10}$

$= \sqrt{33}$

$= 5.744$

[এখানে, $\Sigma x^2 = 330$, $N = 10$]

(2) প্রত্যক্ষভাবে স্কোরের সাহায্যে সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় : যখন রাশিমালায় খুব কম সংখ্যক রাশি থাকে, তখন সেই রাশিমালাকে পরিসংখ্য বিভাজনে বিভাগ না করে সোজাসুজি রাশিগুলো থেকে সম্যকচ্যুতি বের করা হয়। এই নিয়মে সম্যকচ্যুতি নির্ণয় করার সূত্র হল— $\sigma = \frac{1}{N}\sqrt{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$

উদাহরণ (এক)

স্কোর (x)	x'^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
Σx=55	$\Sigma x'^2$=385

$$\sigma = \frac{1}{N}\sqrt{N\Sigma x'^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{1}{10}\sqrt{10 \times 385 - (55)^2}$$

$$= 10\sqrt{3850 - 3025}$$

$$= \frac{1}{10}\sqrt{825}$$

$$= \frac{1}{10} \times 28.72$$

$$= 2.872$$

[এখানে, $\Sigma x = 55$, $\Sigma x^2 = 385$, $N = 10$]

এক্ষেত্রে $x =$ স্কোর, $x'^2 =$ স্কোরের বর্গ, $N =$ মোট স্কোর সংখ্যা, $\Sigma x =$ সমস্ত স্কোরগুলোর যোগফল, $\Sigma x'^2 =$ সমস্ত স্কোরের বর্গের যোগফল।

নির্ণয় পদ্ধতি

পর্যায়-১

স্কোরগুলোকে x স্তম্ভে পর পর বসাতে হবে এবং সবগুলো স্কোর একত্রে যোগ করে Σx নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-২

প্রতিটি স্কোরের বর্গ নির্ণয় করে x^2 স্তম্ভে বসাতে হবে এবং স্কোরের সবগুলো বর্গকে যোগ করে Σx^2 নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-৩

$\sigma = \frac{1}{N}\sqrt{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$ এই সূত্রের সাহায্যে সম্যক বিচ্যুতি বা সিগমা (σ) নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ (দুই)

9, 7, 15, 11, 17, 19, 13 হল একটি রাশিমালা।

স্কোর (x)	স্কোরের বর্গ x'^2
7	49
9	81
11	121
13	169
15	225
17	289
19	361
Σx=91	**$\Sigma x'^2$=1295**

সম্যক বিচ্যুতি (SD) $= \frac{1}{N}\sqrt{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$

$$= \frac{1}{7}\sqrt{7 \times 1295 - (91)^2}$$

$$= \frac{1}{7}\sqrt{9065 - 8281}$$

$$= \frac{1}{7}\sqrt{784}$$

$$= \frac{1}{7} \times 28$$

$$= 0.142 \times 28$$

$$= 3.976$$

[এখানে, $N = 7$, $\Sigma x^2 = 1295$, $\Sigma x = 91$]

বিন্যস্ত রাশিমালার সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় :

বিন্যস্ত রাশিমালার ক্ষেত্রেও রাশিমালার সম্যক বিচ্যুতি দু'ভাবে নির্ণয় করা যায়। তা হল— (১) কল্পিত গড় পদ্ধতি, (২) দীর্ঘ পদ্ধতি।

(১) কল্পিত গড় পদ্ধতিতে সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় :

উদাহরণ (এক)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	মধ্যমান (x_1)	পরিসংখ্যা f	বিচ্যুতি x' (x_1 – A.M)	fx'	fx'^2
21 – 30	25.5	2	–4	–8	32
31 – 40	35.5	5	–3	–15	45
41 – 50	45.5	5	–2	–10	20
51 – 60	55.5	8	–1	–8	8
61 – 70	65.5	10	0	0	0
71 – 80	75.5	12	+ 1	12	12
81 – 90	85.5	5	+ 2	10	20
91 – 100	95.5	3	+ 3	9	27
		Σx=50		$\Sigma fx'$= –10	$\Sigma fx'^2$=164

সূত্র : σ (সিগ্‌মা) $= i\sqrt{\frac{\Sigma fx'}{N} - \left(\frac{\Sigma fx'}{N}\right)^2}$

$$= 10\sqrt{\frac{164}{50} - \left(\frac{-10}{50}\right)^2}$$

$$= 10\sqrt{3.28 - .04}$$

$$= 10\sqrt{3.24}$$

$$= 10 \times 1.8$$

$$= 18$$

[এখানে, $i = 10$
$\Sigma fx = -10$
$\Sigma fx^2 = 164$
$N = 50$]

এক্ষেত্রে, x_1 = মধ্যমান, f = পরিসংখ্যা, x' = কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুর দূরত্ব, i = শ্রেণি ব্যবধান, fx' = পরিসংখ্যার সঙ্গে কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুর দূরত্বের গুণফল, fx'^2 = প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধান অনুযায়ী x' স্তম্ভের সঙ্গে fx' স্তম্ভের গুণফল। $\Sigma fx'$ = সমস্ত ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত fx এর যোগফল থেকে সমস্ত ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত fx এর যোগফলকে বিয়োগ, $\Sigma fx'^2$ = সমস্ত fx^2 এর যোগফল।

নির্ণয় পদ্ধতি

পর্যায়-১

সর্বোচ্চ শ্রেণি-সর্বনিম্ন শ্রেণি— এই সূত্রানুযায়ী প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে এবং x_1

স্তম্ভে বসাতে হবে। যে কোনো একটি মধ্যবিন্দুতে গড় কল্পনা (Assumed Mean) করতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনে 65.5 কে কল্পিত গড় হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

পর্যায়-২

কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করে x' স্তম্ভে বসাতে হবে। এজন্য কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুর দূরত্বকে বিয়োগ করে সেই বিয়োগফলকে শ্রেণি ব্যবধান (i) দিয়ে ভাগ করতে হবে।

পর্যায়-৩

কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুর দূরত্বের ফলের সঙ্গে ওই শ্রেণি ব্যবধানের পরিসংখ্যা গুণ করে fx' স্তম্ভে বসাতে হবে।

পর্যায়-৪

সমস্ত ধণাত্মক চিহ্নযুক্ত fx' এর যোগফল থেকে সমস্ত ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত fx' এর যোগফলকে বিয়োগ করে $\Sigma fx'$ নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-৫

প্রতিটি শ্রেণির fx' এর সঙ্গে পূর্ববর্তী স্তম্ভের x' কে গুণ করে fx' স্তম্ভে বসাতে হবে এবং তারপর সমস্ত fx'^2 কে যোগ করে $\Sigma fx'$ নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-৬

সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি মান বসিয়ে সম্যক বিচ্যুতি বা σ (সিগমা) নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ (দুই)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	মধ্যমান (x_1)	পরিসংখ্যা (f)	বিচ্যুতি	পরিসংখ্যা বিচ্যুতি (fx')	পরিসংখ্যা ও বিচ্যুতির বর্গ (fx'^2)
95 – 99	97	8	+5	+40	200
90 – 94	92	3	+4	+12	48
85 – 89	87	2	+3	+6	18
80 – 84	82	4	+2	+8	16
75 – 79	77	5	+1	+5	5
70 – 74	72	7	0	0	0
65 – 69	67	3	–1	–3	3
60 – 64	62	5	–2	–10	20
55 – 59	57	6	–3	–18	54
50 – 54	52	4	–4	–16	64
45 – 49	47	2	–5	–10	50
40 – 44	42	1	–6	–6	36
		N=50		**$\Sigma fx=8$**	**$\Sigma fx^2=514$**

সম্যক বিচ্যুতি (SD) $= i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fx'}{N}\right)^2}$

$= 5\sqrt{\frac{514}{50} - \left(\frac{8}{50}\right)^2}$

$= 5\sqrt{\frac{514}{50} - \frac{64}{2500}}$

$= 5\sqrt{10.28 - 0.025}$

$= 5\sqrt{10.255}$

$= 5 \times 3.202$

$= 16.01$

[এখানে, $i = 5$
$\Sigma fx' = 8$
$\Sigma fx^2 = 514$
$N = 50$]

(২) দীর্ঘ পদ্ধতিতে সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয়

উদাহরণ (এক)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা (f)	(মধ্যমান) (x_1)	চ্যুতি $x' = \frac{x' - A.M}{i}$	পরিসংখ্যা × চ্যুতি fx′	বিচ্যুতি d (x_1 – M)	পরিসংখ্যা বিচ্যুতি (fd)	পরিসংখ্যা বিচ্যুতির বর্গ (fd²)
90 – 94	1	92	5	5	22.6	22.6	510.76
85 – 89	3	87	4	12	17.6	52.8	929.28
80 – 84	6	82	3	18	12.6	75.6	952.56
75 – 79	7	77	2	14	7.6	53.2	404.32
70 – 74	8	72	1	8	2.6	20.8	54.08
65 – 69	10	67	0	0	–2.4	–24.0	57.60
60 – 64	6	62	–1	–6	–7.4	–44.4	328.56
55 – 59	4	57	–2	–8	–12.4	–49.6	615.04
50 – 54	2	52	–3	–6	–17.4	–34.8	605.52
45 – 49	2	47	–4	–8	–22.4	–44.8	1003.52
40 – 44	1	42	–5	–5	–27.4	–27.4	750.76
	N=50			**Σfx′=24**			**Σfd²= 6212**

দীর্ঘপদ্ধতিতে সম্যক্ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হলে প্রথমে গড় (Mean) নির্ণয় করতে হবে।

$$M = A.M + \frac{\Sigma fx'}{N} xi$$
$$= 67 + \frac{24}{50} \times 5$$
$$= 67 + 2.4$$
$$= 69.4$$

[এখানে, A.M = 67, $\Sigma fx' = 24$, N = 50, i = 5]

দীর্ঘপদ্ধতিতে সম্যক্ বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্র হল— $SD = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}$

সূত্র অনুযায়ী মান বসিয়ে পাই—

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}$$
$$= \sqrt{\frac{6212}{50}}$$
$$= \sqrt{124.24}$$
$$= 11.146$$
$$= 11.15$$

[এখানে, $\Sigma fd^2 = 6212$, N = 50]

এখানে,

f = পরিসংখ্যা, x_1 = মধ্যমান, x' = কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যমানের দূরত্ব। fx' = পরিসংখ্যার সঙ্গে x' এর গুণফল, d = গড় (Mean) থেকে প্রতিটি মধ্যমানের দূরত্ব, fd = পরিসংখ্যার সঙ্গে d এর গুণফল, fd^2 = প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের fd -র সঙ্গে পূর্ববর্তী স্তম্ভের d এর গুণফল, Σfx = সমস্ত fx'এর যোগফল, Σfd^2 = সমস্ত fd^2 এর যোগফল।

নির্ণয় পদ্ধতি

পর্যায়-১

প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে এবং x_1 স্তম্ভে বসাতে হবে এবং যে কোনো একটি মধ্যবিন্দুকে গড় হিসাবে কল্পনা (Assuned Mean) করতে হবে প্রদত্ত বণ্টনে 67কে কল্পিত গড় হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

পর্যায়-২

কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুর দূরত্বকে নির্ণয় করে x' স্তম্ভে বসাতে হবে। এজন্য কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি মধ্যবিন্দুকে বিয়োগ করে শ্রেণি ব্যবধান দিয়ে সেই বিয়োগফলকে ভাগ করে x' নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-৩

প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের x' সঙ্গে সেই শ্রেণির পরিসংখ্যাকে গুণ করে fx' স্তম্ভে বসাতে হবে।

পর্যায়-৪

সমস্ত ধনাত্মক fx' গুলোকে একত্রে যোগ করতে হবে এবং সমস্ত ধনাত্মক fx' গুলোকে একত্রে যোগ করে ধনাত্মক fx' থেকে ঋণাত্মক fx' বিয়োগ করে $\Sigma fx'$ নির্ণয় করতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনের $fx' = 24$

পর্যায়-৫

প্রতিটি মধ্যবিন্দুকে গড় (Mean) থেকে বিয়োগ করে d নির্ণয় করতে হবে।

পর্যায়-৬

d স্তম্ভের প্রতিটি বিয়োগ ফলের সঙ্গে নির্দিষ্ট শ্রেণিটির পরিসংখ্যাকে গুণ করে fd স্তম্ভে বসাতে হবে।

পর্যায়-৭

প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের fd -র সঙ্গে পূর্ববর্তী স্তম্ভের dকে গুণ করে তা fd^2 স্তম্ভে বসাতে হবে এবং পরে সমস্ত fd^2 কে একত্রে যোগ করে Σfd^2 নির্ণয় করতে হবে। প্রদত্ত বণ্টনের $\Sigma fd^2 = 6212$

পর্যায়-৮

সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি মান বসিয়ে সম্যক বিচ্যুতি বা সিগ্‌মা (σ) নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ (দুই)

শ্রেণি ব্যবধান বা স্কোর (Score)	পরিসংখ্যা f	মধ্যমান x_i	চ্যুতি $x' = \frac{x - A.M}{i}$	পরিসংখ্যা × চ্যুতি fx'	বিচ্যুতি $d(x_i - M)$	পরিসংখ্যা বিচ্যুতি (fd)	পরিসংখ্যা বিচ্যুতির বর্গ (fd^2)
21 – 30	1	25.5	–4	–4	–37.7	–37.7	1421.29
31 – 40	2	35.5	–3	–6	–27.7	–55.4	1534.58
41 – 50	3	45.5	–2	–6	–17.7	–53.1	939.87
51 – 60	4	55.5	–1	–4	–7.7	–30.8	237.16
61 – 70	7	65.5	0	0	2.3	16.1	37.03
71 – 80	5	75.5	+1	+5	12.3	61.5	756.45
81 – 90	3	85.5	+2	+6	22.3	66.9	1491.87
91 – 100	1	95.5	+3	+3	32.3	32.3	1043.29
	N = 26			**$\Sigma fx' = -6$**			**$\Sigma fd' = 7461.54$**

দীর্ঘ পদ্ধতিতে সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হলে প্রথমে গড় (Mean) নির্ণয় করতে হবে।

$$\text{গড় (Mean)} = A.M + \frac{\Sigma fx'}{N} \times i$$

$$= 65.5 + \left(\frac{-6}{26}\right) \times 10$$

$$= 65.5 + (-0.23) \times 10$$

$$= 65.5 - 2.3$$

$$= 63.2$$

[এখানে, $A.M = 65.5$
$\Sigma fx' = -6$
$N = 26$
$i = 10$]

$$\text{সম্যক বিচ্যুতি (SD)} = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{7461.54}{26}}$$

$$= \sqrt{286.9823}$$

$$= 16.94$$

[এখানে, $\Sigma fd^2 = 7461.54$
$N = 26$]

উপসংহার (Conclusion) :

আলোচনার উপসংহারে বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিষমতার পরিমাপের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শ্রেণির শিক্ষার্থীগণ যদি মেধা ও পারদর্শিতার দিক থেকে সমপর্যায়ের হয় তাহলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান করা যথেষ্ট সহজ হয় তেমনি পঠন-পাঠনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিই বিশেষ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে অসম মেধা এবং পারদর্শিতার শিক্ষার্থী থাকলে তা তেমন সহজ হয় না। শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি আলাদাভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। এতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা দিনে দিনে আরও পিছিয়ে পড়ে আবার উচ্চ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। এই কারণে বিষমতা নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিষমতার পরিমাপের উপর ভিত্তি করে সুষম দল গঠন করলে শ্রেণির পঠন-পাঠনকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক
রাশিবিজ্ঞান : অর্থ, শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, পরিসংখ্যা বিভাজন

অর্থ (Meaning) :

ইংরেজী 'Statistics' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Status' ইতালীয় শব্দ 'Statista' বা জার্মান শব্দ Statistik থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'Status' এবং 'Statistik' শব্দের অর্থ 'রাষ্ট্র'। আর 'Statista' শব্দের অর্থ 'রাষ্ট্রের কার্যাবলী'।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জার্মান স্কলার গোটিফ্রিয়েড অচেনওয়েল (Gotifried Achenwell) 'Statistics' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। 'Statistics' এই ইংরেজী প্রতিশব্দটি রাশিবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তবুও রাশিবিজ্ঞান পরিসংখ্যান সমার্থক শব্দ নয়। পরিসংখ্যানের পরিমানগত তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হল রাশিবিজ্ঞানের কাজ। রাশিবিজ্ঞানের সঙ্গায় বলা যায়—

যে বিজ্ঞানের সাহায্যে কোন বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বিশেষ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা রাশিতথ্যের সংকলন করে তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয় তাই হল রাশিবিজ্ঞান।

পরিসংখ্যা বিভাজন (Frequency Distribution) :

রাশিবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হচ্ছে সংগৃহীত ঘটনা বা তথ্যকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা। এই তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হতে পারে। যেমন— ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবরনী, সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিবরনী, ব্যক্তিগত গবেষনার ফলাফল বা গবেষনায় প্রকাশিত ফলাফল ইত্যাদি। তবে সংগৃহীত এই তথ্য প্রাথমিক অবস্থায় এলোমেলো বা অবিন্যস্ত প্রকৃতির থাকে। এগুলোকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ আকার না দিলে তা সাধারণের বোঝার উপযুক্ত হয় না। সেই কারণে সংগৃহীত তথ্যকে শ্রেণী বিভক্ত ও ছকবিন্যস্ত (Classification and Taleulation) করে উপস্থিত করা হয় ও লেখচিত্রে (Graph) প্রকাশ করা হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তা বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়।

দ্বিতীয় একক
লেখচিত্রে তথ্য পরিবেশন : অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র, পরিসংখ্যা বহুভুজ

অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র (Histogram) :

1891 সালে 'Historical diagram' এই শব্দ দুটিকে একত্রিত করে কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson) প্রথম 'Histogram' শব্দটির প্রবর্তন করেন। কতগুলি স্কোরকে শ্রেণিবদ্ধভাবে সাজিয়ে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভের আকারে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভচিত্র বা Histogram বলে।

পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)

পরিসংখ্যা বহুভুজ হল এক ধরনের রৈখিক লেখচিত্র। ছক কাগজে, প্রাপ্ত শ্রেণী পরিসংখ্যার মধ্যমানগুলোকে পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করে যে আবদ্ধ ক্ষেত্র পরিবেশন করা হয়, তাকেই পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon) বলে।

তৃতীয় একক
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ: গড়, মধ্যমমান, ভূষিষ্ঠক

কেন্দ্রীয় প্রবণতা ঃ

এই কাজকে আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রাশিবিজ্ঞানে আর এক ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হয়। কতগুলো স্কোরের বিকল্প হিসাবে একটি স্কোরমানকে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ একটি মাত্র সাংখ্যমান দ্বারা কতকগুলো স্কোরকে প্রকাশ করা হয়। এইভাবে, যে একক সাংখ্যমান দ্বারা, কতকগুলো স্কোরকে প্রকাশ করা হয়। তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হল এমন এক প্রতিনিধি স্থানীয় সাংখ্যমান যা একগুচ্ছ স্কোরের প্রকৃতি বোঝায় অর্থাৎ প্রকৃত স্কোরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এই সাংখ্যমান, স্কোরমানগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। তাই একে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ। সাধারণত তিন ধরনের সাংখ্যমান দ্বারা এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপকে প্রকাশ হয়। এগুলো হল– (১) গাণিতিক গড় বা Mean, (২) মধ্যমমান বা (Midian), (৩) ভূষিষ্ঠক বা (Mode)।

১। পাটিগাণিতিক গড় বা Mean :

সাধারণভাবে বলা যায় গড় হলো কোনো এক জাতীয় রাশির সংখ্যাতালিকা বা রাশির সকল মানকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি একক মান। এক জাতীয় সমস্ত রাশির যোগফলকে সেই রাশির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফলটি পাওয়া যায় তাকেই পাটিগাণিতিক গড় বা Mean বলে।

২। মধ্যমমান (Median) :

মধ্যমমান হল কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপের মধ্যে একটি। এটি একটি বিন্দু, কোনো তথ্য নয়। যখন রাশিগুলো মানের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত থাকে, তখন মধ্যমমান হল পরিমাপক স্কেলের এমন একটি বিন্দু যা পরিমাপক স্কেলকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে। ফলে স্কেলের উপরে ও নীচে সমান সংখ্যক রাশি থাকে। যারমধ্যে একটি অংশের রাশিগুলোর প্রত্যেকটি মধ্যমমান থেকে ছোট হয় এবং অন্য অংশের প্রত্যেকটি রাশির মান মধ্যমমান থেকে বড় হয়। এটিকে সংক্ষেপে Mdn দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

৩। ভূষিষ্ঠক (Mode) :

ভূষিষ্ঠক এক ধরনের গড় (Average)। যখন খুব দ্রুত কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় তখন ভূষিষ্ঠক ব্যবহার করা হয়। যখন স্কোরগুলো অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে, তখন যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশিবার থাকে তাকে ভূষিষ্ঠক বা Mode বলে। কোনো রাশিমালায় যদি প্রত্যেকটি রাশি মাত্র একবার করে থাকে তাহলে এই রাশিমালার নির্দিষ্ট কোনো ভূষিষ্ঠক নির্ণয় করা যায় না।

চতুর্থ একক
বিষমতার পরিমাপ : সম্যক বিচ্যুতি

বিষমতার পরিমাপ :

বিষমতার পরিমাপের বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করা যাক। যদি বলা হয় দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মাসিক রোজগারের গড় একই অর্থাৎ 500 টাকা। কিন্তু দেখা গেল যে একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের রোজগারের প্রসার হল সর্বনিম্ন 50 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 1000 টাকা। অন্যদিকে অন্য অঞ্চলটির অধিবাসীদের আয়ের প্রসার হল সর্বনিম্ন 300 টাকা থেকে 800 টাকা। দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের রোজগারের গড় একই হলেও প্রসারের দিক থেকে ভিন্ন। সেই কারণে দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা একই প্রকার বলতে পারা যায় না। সুতরাং বলা যায় দুটি দলের গড় এক হলেও এদের মধ্যে গঠনগত প্রকৃতির দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। স্কোরগুলোকে পুরোপুরি বর্ণনা করা বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গেলে গড়ের সঙ্গে রাশিবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যটি জানা প্রয়োজন তা হল কেন্দ্রীয় মানের সাপেক্ষে বিভিন্ন সংখ্যার বিস্তৃতি কতখানি বা স্কোরগুলোর মধ্যে কতটা বৈষম্য বা পার্থক্য আছে। রাশিবিজ্ঞানের ভাষায় একে বিস্তৃতি বা বিষমতার পরিমাপ বলে (Measures of Variability)। রাশিবিজ্ঞানে চার ধরণের বিষমতার পরিমাপ ব্যবহৃত হয়—

১. প্রসার (Range)
২. চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation)
৩. গড় বিচ্যুতি (Average Deviation)
৪. সম্যক বিচ্যুতি (Standard Deviation)

সম্যক চ্যুতি (Standard Deviation) :

বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলোর মধ্যে সম্যক চ্যুতি হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ। এটি গ্রীক চিহ্ন σ (সিগমা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সম্যক চ্যুতি বলতে বোঝায়— কোনো রাশিমালার প্রত্যেক রাশি আর গড়ের অন্তরের বর্গ করে, সেই গড়ের বর্গমূল নির্ণয় করলে যে মান পাওয়া যায় তাকেই সম্যক চ্যুতি বলে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ ১ মানের প্রশ্ন

১) 9, 11, 10, 15, 11, 17, 71, 19, 11, 15, 17 স্কোরগুলির ভূষিষ্ঠক হল—
(ক) 9 (খ) 17 (গ) 11 (ঘ) 12

২) কে প্রথম 'Histogram' শব্দটি প্রবর্তন করেন?
(ক) কার্ল পিয়ারসন (খ) জন গ্রান্ট (গ) লেনোর্ড অয়লার (ঘ) রোনাল্ড.এ.ফিশার

৩) (28-32) শ্রেণিটির নিম্নসীমা হল—
(ক) 28.5 (খ) 27.5 (গ) 31.5 (ঘ) 45.5

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) সম্যক বিচ্যুতি কাকে বলে?
২) রাশিবিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়?
৩) পরিসংখ্যা কি?

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) গড়ের দুটি সুবিধা লিখ।
২) মধ্যমমানের দুটি অসুবিধা লিখ।
৩) কেন্দ্রীয় প্রবণতার দুটি গুরুত্ব লিখ।

৬ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১৫০টি শব্দ

১) নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনগুলির গড় (Mean), মধ্যমমান (Median) নির্ণয় কর।

স্কোর	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
পরিসংখ্যা	10	7	3	2	1	7	6	4	5	5

২) নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনগুলির সম্যক বিচ্যুতি (Standard Deviation) নির্ণয় কর।

স্কোর	20-29	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79
পরিসংখ্যা	2	3	7	1	5	6	2	4	1	8	4	7

৩) নিম্নলিখিত বণ্টনটি থেকে পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon) ও হিস্টোগ্রাম (Histogram) অঙ্কন কর।

স্কোর	70-79	60-69	50-59	40-49	30-39	20-29	10-19	0-9
পরিসংখ্যা	1	1	5	12	15	11	4	1

অষ্টম অধ্যায় : শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা

প্রথম একক : প্রযুক্তিবিদ্যা: অর্থ, ধারণা, শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা।

দ্বিতীয় একক : শিক্ষণ প্রদীপন— প্রক্ষেপণমূলক এবং অপ্রক্ষেপণমূলক শিক্ষণ প্রদীপন।

তৃতীয় একক : শিক্ষায় প্রযুক্তি: এডুস্যাট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেট ।

চতুর্থ একক : যোগাযোগ : অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা

(Educational Technology)

উদ্দেশ্য (Objectives):

- শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিবিদ্যার অর্থ, ধারণা, শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা প্রক্ষেপণমূলক এবং অপ্রক্ষেপণমূলক শিক্ষণ প্রদীপন সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার, এডুস্যাট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেট -এর ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হবে।
- শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ-এর অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, যোগাযোগ -এর ক্ষেত্রে বাধাসমূহ সম্পর্কে জানবে।

প্রাক্-কথন (Pre-face):

আদিম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যেত তা মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি এবং জীবনযাপনের কৌশল আয়ত্ত করাও ছিল অত্যন্ত সহজমানের। এরপর প্রাচীনকালের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনোপযোগী প্রত্যেকটা কাজই সম্পন্ন করতে হয় যা ছিল বাস্তব জীবনভিত্তিক। মধ্যযুগে সাধারণ শিক্ষায় উদারধর্মী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এগুলো পঠনপাঠনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল ও উদার প্রকৃতির ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি হত। পরবর্তীকালে ইংরেজদের আগমনে শিক্ষাক্ষেত্রে ধারণা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক ভারতবাসীকে উচ্চশিক্ষিত করার জন্য উচ্চশিক্ষাবিস্তারে উৎসাহিত ছিল এবং শিক্ষাবিস্তারে কিছু কমিটি ও কমিশন গঠন করে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করতে বহুলাংশে সহায়তা করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ব্যক্তির জীবনের সমস্ত দিকের উপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষণযন্ত্র, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, কম্পিউটার ইন্টারনেট ইত্যাদি বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহার করা হচ্ছে। এইসব যন্ত্রগুলোকে শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানের সংরক্ষণ, সঞ্চালন এবং প্রসারণের কাজে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিগত দুই দশকের মধ্যে শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত বিকাশ হয়েছে এবং বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যা, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষাগত মূল্যায়ন ইত্যাদির মতই শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য। শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন একটি

শাখা, যেখানে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়, এই যান্ত্রিকীকরণ শিক্ষার সংরক্ষণে সহায়তা করে। পূর্বে তা কোনো শিক্ষকের দ্বারা সংরক্ষিত হত; পরে ছাপাখানার উদ্ভবের ফলে তা পাঠ্যপুস্তকে সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণকে সংরক্ষণ করা যায়। এখন এডুস্যাট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষকের গলার স্বর, তার কার্যাবলি বর্তমানে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রদীপন ব্যবহার করে একজন শিক্ষক বহু শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সঞ্চালন করতে পারেন। কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপনের কাজেও শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে সহায়তা করছে। জ্ঞান বা তথ্য সঞ্চালনের মাধ্যমই হল যোগাযোগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতো বটেই; অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগাযোগ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বর্তমানে সংযোগ স্থাপনে বহু আধুনিক মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। শিখন যন্ত্রাদির এই সমস্ত আধুনিক মাধ্যম সঠিকভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মন ঠিকমত তৈরি করা সম্ভব বা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করা সম্ভব। বর্তমানে দূর সংযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপগ্রহের (Sattelite) মাধ্যমে অত্যন্ত অল্প সময়ে সমগ্র বিশ্বের যে-কোনো স্থানে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির নতুন নতুন দরজা দিয়ে নব নব জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটছে অর্থাৎ বলা যায় প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু উপকরণ, পদ্ধতি, পরিবেশ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষার সর্বাঙ্গে পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে এসেছে।

প্রথম একক

প্রযুক্তিবিদ্যা : অর্থ, ধারণা, শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা
(Technology: Meaning, Concept, Role of Technology in Education)

ভূমিকা (Introduction):

1947 সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার দেশের শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতিকল্পে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি ও কমিশন গঠন করেন এবং এই সমস্ত কমিটি ও কমিশনের মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনের একজন স্বনির্ভর ও দায়িত্ববান আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। তারা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের যথার্থ উন্নয়নের স্বার্থে দেশের প্রতিটি নাগরিককেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যাতে দেশের উন্নতিকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার প্রযুক্তিকরণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে এমন সব সমস্যা সমাধান করা যায় যা প্রথাগত শিক্ষণ-শিখন কৌশলের দ্বারা সমাধান করা যায়না। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রযুক্তি কাকে বলে ?— শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রযুক্তি বলতে কি বোঝায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নিয়মনীতিগুলো মানুষের জীবনকে সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আরামদায়ক করে তুলে তাকে বলা হয় প্রযুক্তি। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে, স্বল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফল লাভ করার উপায়কে বলা হয় প্রযুক্তি। 'প্রযুক্তি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Technology'। 'Technology' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হল 'Technic' -যার অর্থ হল শিল্প বা দক্ষতা। আর অপর শব্দটি হল 'Logia' -যার অর্থ হল বিজ্ঞান বা অধ্যয়ন। অর্থাৎ প্রযুক্তি বলতে বোঝায় 'কোনো শিল্প বা দক্ষতার অধ্যয়নের বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের তত্ত্বগত জ্ঞানের প্রয়োগগত বৃহত্তর ক্ষেত্র হল প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল পরিসরে আছে কৃষি, শিল্প, মহাকাশ গবেষণা, এয়ারলাইন্স প্রভৃতি। প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের উপর দেশের অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল।

প্রযুক্তির সংজ্ঞা :

১) এ. হিরা (A. Hierra-1973) - র মতে, প্রযুক্তি হল একগুচ্ছ যন্ত্র এবং দক্ষতা যা জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়। (Herra A (1973) -Technology is the set of instruments and skills which are used to satisfy of the community.)

২) আই. সাচ -এর মতে, প্রযুক্তি হল উৎপাদনের জন্য জ্ঞান। (Sachs. I (1973) - Technology is knowledge organised for production.)

৩) টি. পেইজ (1978) -এর মতে প্রযুক্তি হল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করা। (Page. T (1978) -Technology is the application of scientific knowledge to practical purpose.)

অর্থ (Meaning):

বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার লক্ষ্যে, জীবনকে উন্নয়নমুখী করার উদ্দেশ্যে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করতে, শিক্ষাকে লক্ষ্যাভিমুখী করা হয়েছে। আজ শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। তার মধ্যে একটি হল প্রযুক্তিবিদ্যার্জন। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার অন্যতম কারিগর হল প্রযুক্তিবিদ্যা। আবার প্রযুক্তিবিদ্যাই শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে তাকে কর্মক্ষম করে তোলে। প্রযুক্তিবিদ্যাই যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতমানের মানবসম্পদ উপহার দিয়ে থাকে। বর্তমানে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার এত বিস্তৃতি লাভ করেছে যে শিক্ষা প্রযুক্তি পৃথকভাবে অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান হল 5টি ‘M’ এর সমন্বয়। এগুলো হল Man (মানুষ), Machine (মেশিন), Materials (বস্তুসামগ্রী), Media (মাধ্যম) এবং Methods (পদ্ধতি)। এই পাঁচটি একত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্যপূরণে সহায়তা করে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে পরিচালনা করা যায়। শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী তাই প্রযুক্তিবিদ্যাও উদ্দেশ্যমুখী। শিক্ষা প্রযুক্তি শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, মূল্যায়ন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি প্রয়োগ করে।

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে প্রাথমিকভাবে দুটি ব্যাখ্যার সমন্বয় বলে মনে করা হয়—

(১) শিক্ষার প্রযুক্তিবিজ্ঞান (Technology of Education)

(২) শিক্ষায় প্রযুক্তিবিজ্ঞান (Technology in Education)

শিক্ষার প্রযুক্তিবিজ্ঞান (Technology of Education):

শিক্ষার প্রযুক্তিবিজ্ঞান বলতে বোঝায় শিক্ষায় প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিক বা প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ব্যবহৃত নীতি ও কৌশলগুলো শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত করার দিক। এটি শিক্ষামূলক তত্ত্বে মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আচরণের বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়। মানুষের সামর্থকে বৃদ্ধি করে তার কর্মদক্ষতার উন্নতি সাধন করে। এখানে শিখন প্রক্রিয়াকে একটি তন্ত্র (System) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার প্রযুক্তিবিজ্ঞান হল এক সম্ভাব্য উপাদান যার সাহায্যে আউটপুট লাভ করা যায় উপযুক্ত হার্ডওয়ার ও সফ্‌টওয়ার নির্বাচিত করে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এখানে শিক্ষার বিকাশ বা উদ্ভাবনী আবিষ্কারগুলোকে নিয়মানুগ ক্রমবিন্যাস করে বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যাকে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গীও বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষায় প্রযুক্তিবিজ্ঞান (Technology in Education):

শিক্ষায় প্রযুক্তি হল শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রযুক্তির ব্যবহার। এখানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে শিক্ষনীয় বিষয়কে উপস্থাপন করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে শিখন এবং শিক্ষণকে সহজতর, দ্রুততর এবং আরও কার্যকরী করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার বহুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ যেমন বই, খাতা, কাগজ, কলম প্রভৃতি তৈরির পেছনে রয়েছে প্রযুক্তির অবদান। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের যথার্থ বিকাশ সাধনের জন্য, বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য, চিন্তনশক্তি ও বিচারশক্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। বেতার টেলিভিশন, বিভিন্ন প্রজেক্ট করার যন্ত্রপাতি, শ্রবণদর্শনভিত্তিক উপকরণ যেমন ওভারহেড প্রোজেক্টার, টেপরেকর্ডার, ভিডিও ক্যাসেট, টি. ভি, অনুকম্পিউটার, চার্ট, মডেল ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা :

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনোবিদ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করা হল —

১) এস. এস. কুলকার্নি (1968) -শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নীতি এবং সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোকে প্রয়োগ করাকেই শিক্ষাপ্রযুক্তি বলে। (S. S. Kulkarni, 1968- Educational technology may be defined as the application of the laws as well as recent discovers of science and technology to the process of education.)

২) জে. ব্লুমার (1973) -শিক্ষা প্রযুক্তি হল শিক্ষা সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান, যা বাস্তব শিখন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়। (J. Blomer, 1973- Educational technology is an application of scientific knowledge about learning to practical learning situation.)

৩) ই. এইচ. হ্যাডেন - শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন এক শাখা যাতে মূলত শিখন সহায়ক কৌশলগুলোর নক্‌শা উদ্ভাবন করা ও সেই বার্তাগুলো ব্যবহার করে শিখন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। (E. H. Hadden - Educational technology is that branch of educational theory and practice where it is concerned primarily with the design and use of message which control the learning process.)

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ধারণা (Concept of Educational technology -ET):

ET_1 - প্রথম ধারণাকে বলা হয় শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান -1

প্রথম ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা প্রযুক্তি হল ভৌতবিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগ যেখানে যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপদ্ধতির সাহায্যে পাঠদান বা নির্দেশদানে সহায়তা করা হয়। এগুলোকে হার্ডওয়্যার বলা হয়। ফিনের (James O. Finn) ও অন্যান্যরা শ্রবণদর্শনভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রথম এই বিষয়টি উল্লিখিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে সকল বস্তু সামগ্রী নির্দেশদান বা শিক্ষনে সাহায্য করে

সেগুলো হল স্থির ও গতিশীল চিত্র, প্রোজেক্টর, ভাষা পরীক্ষাগারের অন্তর্গত টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন, শিক্ষণ যন্ত্র ও কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষণ।

ET_2 - দ্বিতীয় ধারণাকে বলা হয় শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান -2

এই ধারণায় আচরণগত বিজ্ঞান বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলোকে নির্দেশদানের কাজে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এখানে স্কিনার, গ্যানে ও অন্যান্য মনোবিদদের শিক্ষণ সংক্রান্ত তত্ত্বাবলির প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয়টি তুলে ধরার পূর্বে শক্তিদায়ক উদ্দীপক হিসাবে পূর্বের সহযোগী তথ্যাদি তুলে ধরলে শিক্ষার্থীরা উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং তাদের উজ্জীবনে নতুন ইঙ্গিত আচরণ সৃষ্টি হয়। শক্তিদায়ক উদ্দীপক এখানে ফিড্‌ব্যাকের কাজ করে যা শিখনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোকে সফটওয়্যার দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়।

ET_3 -তৃতীয় ধারণাকে বলা হয় শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান -3

তৃতীয় ধারণাটি হল প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বিতরূপ। শিক্ষাপ্রযুক্তির এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তা হলেন ডেভিস এবং হার্টলে (Davis and Hartley)। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষা হল একটি তন্ত্র বা সিস্টেম। এই অনুযায়ী শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অর্থ হল শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সিস্টেমের পরিকল্পনা করা, যথাযথ প্রয়োগ করা ও তার মূল্যায়ন করা।

ET_4 -চতুর্থ ধারণাকে বলা হয় শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান -4

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের চতুর্থ ধারণাটি শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার বিভিন্ন কোর্স, পাঠ্যক্রমের নীতি নির্ধারণ, সম্পদ কেন্দ্র ইত্যাদি কাজগুলো এই ধারণার অন্তর্গত। Erich Ashley (1967) এই ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ধারণাতে শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে পিতামাতা ও গৃহ থেকে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মুদ্রিত পুস্তক, পুস্তকের সহজলভ্যতা, এবং অন্যানা শিক্ষামূলক উপাদানকে শিক্ষা প্রযুক্তির আওতার মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে।

ET_5 -শিক্ষাপ্রযুক্তি সম্পর্কিত পঞ্চম ধারণাটিকে বলা হয় শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান -5

এই ধারণাটি অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা প্রযুক্তি একটি ব্যায় সাপেক্ষ ব্যাপার। কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে কত খরচ হতে পারে, সেই টাকা কোথা থেকে আসতে পারে, ব্যয় অনুযায়ী কতটা লাভ হবে– এই সমস্ত দিক বিবেচনা করা হয়। এর ফলে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা যেমন মুক্ত শিক্ষা, দূরবর্তী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীর গুণগত মান বজায় রেখে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা (Role of Technology in Education):

শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান হল শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ। এর সাহায্যে শিক্ষাকে সহজ, সম্পূর্ণ, স্থায়ী ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশ্বের সর্বদাই স্বীকৃত। নিম্নে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচনা করা হল।

১) এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলোর জনসংখ্যা খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সাক্ষরতা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক বেশি। এই কারণ হল এত বিশাল সংখ্যক জনগণকে প্রথাগত শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে জীবনব্যাপী শিক্ষার কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, গৃহবধূ ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের তাদের সময় সুযোগ অনুযায়ী সারা জীবনব্যাপী প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই কর্মসূচিতে গণমাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন, সংবাদপত্র, রেডিও, কম্পিউটার এবং অন্যান্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি যেমন ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২) বর্তমানে জ্ঞানমূলক বিস্ফোরণের ফলে খুব দ্রুতহারে নতুন জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে। কলা, বিজ্ঞান ও সমস্ত বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে যা পুরানোগুলোকে অপসারিত করে নিজস্ব স্থান করে নিচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীকে সবসময় সর্বাধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়। আবার ব্যাপক হারে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদেরও যথেষ্ট কঠিন পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ শিক্ষকের যদি সর্বাধুনিক জ্ঞান না থাকে তবে তিনি শিক্ষার্থীদের নবতম বা সর্বাধুনিক জ্ঞান দিতে পারবেন না। বর্তমানে বেশ কিছু শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অনেক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্যে শিক্ষকের সক্রিয় সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন শ্রবণদর্শনভিত্তিক উপকরণ যেমন স্লাইড, সি. ডি, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা স্ব-শিখনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

৩) শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও সার্থক করে তুলেছে। অনুশিক্ষণ (Micro Teaching) হল শিখন-শিক্ষণ ক্ষেত্রে একটি আধুনিক বিশ্লেষনাত্মক পদ্ধতি। এই শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। Intelligent Tutoring System বা ITS হল প্রযুক্তিবিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল। এই ব্যবস্থায় কম্পিউটার শিক্ষকের বিকল্প হিসাবে কাজ করে। ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণে আবিষ্কৃত বিভিন্ন কৌশল যেমন প্রোগ্রামভিত্তিক শিখন, শিখন যন্ত্র, নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ইত্যাদি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৪) শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করে তোলে। প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে তার চাহিদাভিত্তিক বিভাগ নির্বাচনের সুযোগ দিয়ে তার বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে আত্মসক্রিয় করে গড়ে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষণ অভিমুখী প্রেষণা সঞ্চারে সহায়তা করে।

৫) শিক্ষাক্ষেত্রে বহুধা মাধ্যমের ব্যবহার (Multimedia), তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ (Information Technology), ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারছে। তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে পৃথিবীর বিশাল জ্ঞানভান্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে এবং এর দ্বারা শিক্ষার গুণগতমানের বৃদ্ধি হচ্ছে। এককথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একটি সুসংগঠিত সংযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

৬) মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রযুক্তি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৭) ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে শিক্ষা প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে কম্পিউটার সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার CAl, CMI, CML, CBI, CAE ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করছে আবার উপযুক্ত পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রযুক্তি সাহায্য করে। যেমন ট্যাবুলার মডেল (Tabular Model), লাউটন মডেল (Lawtan Model) ইত্যাদি শিক্ষা প্রযুক্তির অবদান।

৮) প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষধর্মী জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যতম ভূমিকা হল বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ্ তৈরি করে ব্যক্তি কল্যাণের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ করা।

৯) বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মসূচি যেমন নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিস্তার, ভর্ত্তির আবেদন পত্র, ভর্তির যোগ্যতা অর্জনকারীদের তালিকা ইত্যাদি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

১০) শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষার সুযোগ সকলের নিকট সমভাবে বন্টন করে দিতে সক্ষম।

১১) বর্তমানে শিক্ষামনস্তত্ববিদগণ শিক্ষণের একাধিক মডেল উদ্ভাবন করেছেন যেমন, এনকোয়ারী মডেল, কনসেপ্ট অ্যাটেনমেন্ট মডেল ইত্যাদি। এই ধরনের মডেলের সাহায্যে পাঠদান আরও বিজ্ঞান সম্মত এবং কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১২) শিক্ষা প্রযুক্তি গণশিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রযুক্তির সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি প্রস্তুত করে কম্পিউটার, দূরদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের একটা বড় অংশের নিকট উপস্থাপন করা যায়।

উপসংহার (Conclusion):

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ভূমিকা কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, ক্রমশ তা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ব্যক্তিজীবনে তথা সমাজজীবনে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা অসীম। প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে উন্নত জাতি গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষা প্রযুক্তির অন্যতম দুটি কৌশল হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোর কার্যকর রূপায়ণে শিক্ষা প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক দশকে উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহারের যে প্রবণতা লক্ষ করা গেছে ভবিষ্যতে সেটা আরও পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণের সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় একক

শিক্ষণ প্রদীপন– প্রক্ষেপণমূলক এবং অপ্রক্ষেপণমূলক শিক্ষণ প্রদীপন

(Teaching Aids–Projected and Non-projected Teaching Aids)

ভূমিকা (Introduction):

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে পুঁথি নির্ভর ও তত্ত্ব সর্বস্ব। এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা হত সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা ইত্যাদি। এই শিক্ষণ কৌশলগুলোতে মূলত মৌখিক ভাষা বা ভাষা সংকেত ব্যবহার করা হত। শিক্ষকের প্রধান কাজ ছিল ভাষার মাধ্যমে বা বক্তৃতার সাহায্যে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। এই ধরনের শিক্ষণ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ ছিল নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণ করা অর্থাৎ এখানে শিক্ষক হলেন প্রেরক, শিক্ষার্থী হল গ্রাহক।

যেহেতু গতানুগতিক শিক্ষণে, ভাষা শুধুমাত্র সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা হত তাই এই কৌশলে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করতে সমর্থ হত। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়কেই ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জন করত। এর ফলে তাদের বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অপূর্ণ থেকে যেত। বস্তুজগতের সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া মৌখিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষকের ভাষা বুঝতে না পারলে বা ভাষার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি ধারণার প্রবর্তন করেছেন। তাঁরা বলেছেন শিক্ষণের সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংযোগের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হলে এবং শিক্ষার্থীদের আরো বেশি সক্রিয় করে তুলতে হলে একই সঙ্গে অনেকগুলো ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তুলতে হবে। অর্থাৎ তথ্য পরিবেশনের সময় বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়ের উপযোগী সংকেত ব্যবহার করতে হবে। এই মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে আধুনিককালে শিক্ষণের ক্ষেত্রে এক নতুন নীতির অবতারণা করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল কথা হল— শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীর যতগুলো সম্ভব ইন্দ্রিয়কেএকত্রে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

শিক্ষণ প্রদীপন (Teaching Aids):

আধুনিককালে শিক্ষণের এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য ভাষামূলক সংকেতের সঙ্গে শ্রেণি শিক্ষণের সময় বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এই কৌশলগুলোকে বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপন (Tesching Aids) বা শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Teaching Appliancc)। অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায়, যে সমস্ত বস্তু বা কৌশলের সাহায্যে পরিপূর্ণ সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলা যায়, তাদের বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপণ। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে সাধারণভাবে পাঠদানের জন্য শিক্ষকের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে কিছু সাধারণ উপকরণের প্রয়োজন হয় যেমন, পাঠ্যপুস্তক (Text Book), বোর্ড (Board), চক্

(Chalk), ঝাড়ন (Duster) ইত্যাদি। এই উপকরণগুলো শিক্ষকের ভাষামূলক সীমিত ক্ষমতা অতিক্রম করতে সহায়তা করে এবং শিক্ষণের গুনগতমান উন্নয়নে সহায়তা করে। এখানে শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষণ উপকরণ শব্দ দুটি প্রায় সম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণ প্রদীপণ শব্দটি শিক্ষণ উপকরণ থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই বৃহত্তর অর্থে উপকরণ প্রদীপনের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষণ প্রদীপনের গুরুত্ব (Importance of Teaching Aids):

আধুনিক শিক্ষার নীতি অনুশীলন করলে দেখা যায় বর্তমানে এই শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গণসংযোগের সমস্ত রকম উপকরণকেই প্রদীপন হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রদীপনগুলো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠতে সহায়তা করে। মন্তেস্বরী তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিশেষভাবে ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষানীতির মূল বক্তব্য ছিল, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে হবে। শিক্ষণ প্রদীপনগুলো এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এইসব প্রদীপনের উপর বর্তমানে শিক্ষাবিদদের আস্থার প্রধান কারণ, এগুলোর ব্যবহার শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়াকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলে। এইসব প্রদীপন ব্যবহারের মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও বহুমুখী। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব শিক্ষণ প্রদীপনের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য করে তুলেছে। শিক্ষণ প্রদীপন নিম্নলিখিত দিক থেকে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে—

প্রথমত : শ্রেণিকক্ষে মৌখিক শিক্ষণের সময় শিক্ষক সবচেয়ে বেশি অসুবিধাবোধ করেন শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আনার ব্যাপারে। আলোচনার সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেস্টা করলেও শিক্ষার্থীরা সেদিকে মনোযোগ নাও দিতে পারে। কিন্তু শিক্ষণ প্রদীপনের সাহায্যে শিক্ষাদান করলে প্রত্যেক বস্তু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে এবং তার মনোযোগকে বিষয়বস্তুর উপর নিবিষ্ট করতে, এই প্রদীপনগুলো সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত : বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিমূর্ত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের আহরণ করতে অসুবিধা হয়। কারণ মনোবিদগণের মতে বিমূর্ত জ্ঞান আহরণের জন্য মনের যে পরিণমনের স্তরে উন্নীত হওয়া দরকার তা হতে অনেক সময় লাগে। শিক্ষণ প্রদীপনগুলো বিমূর্ত জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত : পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে শিক্ষণ প্রদীপনগুলো সাহায্য করে। অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠিত হয়। কোনো বিষয় শুধুমাত্র পাঠ করে এই ধারণা জন্মাতে পারেনা, কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানার পর যদি তার সম্পর্কে একটি যেকোন শিক্ষামূলক প্রদীপন শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ করতে দেওয়া হয়, তবে তাদের ধারণার বিস্তৃতি ঘটে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে তারা সহজে সমন্বয় সাধন করতে পারে।

চতুর্থত : শিক্ষণ প্রদীপন শুধুমাত্র একই বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন একক পাঠের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে তাই নয়, বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথাযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপনেও সহায়তা করে অর্থাৎ শিক্ষণ প্রদীপনের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করা যায়। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপিত হলে, বিষয়বস্তু মনে রাখা সুবিধা হয়।

পঞ্চমত : শিক্ষণ প্রদীপন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগে উৎসাহিত করে। যখন, শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক দিককে বিশ্লেষণ করার জন্য শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহার করা হয়। তখন শিক্ষার্থীরা, আলোচ্য জ্ঞানকে কোথায় প্রয়োগ করা যাবে, সে সম্পর্কে ধারণা পায়। এর ফলে, পরবর্তীকালে তাদের পক্ষে ঐ জ্ঞানকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সহজে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

ষষ্ঠত : শিক্ষণ প্রদীপনের সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রকাশভঙ্গির বিকাশ ঘটানো যায়। বিশেষ করে তাদের ভাষার বিকাশ হয়। যে বস্তুকে তারা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করছে, তার বিবরণ তারা ভাষার সাহায্যে দিতে পারে। অর্থাৎ প্রদীপনগুলো শিক্ষার্থীর বিমূর্ত চিন্তনের বিকাশে সহায়তা করে।

সপ্তমত : শিক্ষণ প্রদীপনগুলোকে বর্তমানে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। পূর্বে পরীক্ষার মধ্যে শুধু ভাষামূলক সমস্যা ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিত্র, চার্ট, লেখচিত্র ইত্যাদি প্রশ্নপত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এগুলো সার্থক মূল্যায়নে সহায়তা করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রদীপন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণকৌশল। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রদীপনের ব্যবহার শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সার্বিক কার্যকারিতায় সহায়তা করে। মৌখিক শিক্ষণকৌশল সমূহের অনুষঙ্গ হিসাবে শিক্ষামূলক প্রদীপনগুলো বর্তমানকালে তাই শিক্ষণের অপরিহার্য অঙ্গ এবং শিক্ষামূলক কারিগরীবিদ্যার গবেষণার বিষয়বস্তু।

শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ :

বর্তমানে এই শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকগণ শ্রেণির বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রদীপনের সাহায্য নিচ্ছেন। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে যে সব প্রদীপন বর্তমানে ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর বেশিরভাগ অবশ্যই দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় নির্ভর। কারণ, মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এই দুটি ইন্দ্রিয়কেই সব থেকে বেশি ব্যবহার করে। কিন্তু আধুনিককালে শিক্ষামূলক কারিগরীবিদ্যায় শিক্ষণ প্রদীপনকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় —

ক) দর্শনভিত্তিক প্রদীপন; খ) শ্রবণভিত্তিক প্রদীপন; গ) দর্শন শ্রুতি ভিত্তিক প্রদীপন; ঘ) সক্রিয়তাভিত্তিক প্রদীপন এবং ঙ) আত্ম-শিক্ষণমূলক প্রদীপন।

ক) দর্শনভিত্তিক প্রদীপন (Visual Aids):

যে সমস্ত প্রদীপন শিক্ষার্থীর দর্শনেন্দ্রিয়কে কার্যকরী করে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় দর্শনভিত্তিক প্রদীপন। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত প্রদীপনগুলোর মধ্যে দর্শনভিত্তিক প্রদীপনের সংখ্যা বেশি। আর এই সব প্রদীপনের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন কৌশল ইত্যাদির ভিত্তিতে এই প্রদীপনকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

প্রথমত : দর্শনধর্মী প্রদীপন হিসাবে শ্রেণিকক্ষে প্রকৃত বস্তুকে ব্যবহার করা হয়। যেমন— জীবন বিজ্ঞান পাঠে কোনো উদ্ভিদ বা নমুনা ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে বলা হয় বাস্তবধর্মী প্রতিবেদন।

দ্বিতীয়ত : আবার অনেক সময় দর্শনভিত্তিক প্রদীপন হিসাবে প্রকৃত বস্তু ব্যবহার না করে সেই বস্তুর একটি

প্রতিরূপ ব্যবহার করা হয়। এদের বলা হয় প্রতিনিধিস্থানীয় দর্শনভিত্তিক প্রদীপন। যেমন— চার্ট, মডেল ইত্যাদি। সাধারণত যেসব ক্ষেত্রে বাস্তব জিনিস শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা যায় না সেক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় প্রদীপনের সাহায্য নেওয়া হয়।

তৃতীয়ত : শ্রেণিকক্ষে যেই বাস্তব বা অবাস্তব প্রদীপন ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলোর আকৃতি এত ক্ষুদ্র যে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না বা শ্রেণিকক্ষে সর্বসমক্ষে উপস্থাপনের অযোগ্য। সেইসব বস্তুকে সাধারণভাবে দর্শনযোগ্য করে তোলার জন্য প্রক্ষেপণ যন্ত্রের (Projector) বা অন্য কোনো যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়। এইভাবে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে যখন বাস্তব বা প্রতিনিধিস্থানীয় দর্শনভিত্তিক প্রদীপন শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা হয়, তখন তাদের বলা হয় প্রক্ষেপণমূলক প্রদীপন। বাস্তব বস্তুর ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত স্লাইডকে (Slide) শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যায় আর প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুটিকে বড় আকারে শ্রেণিতে উপস্থাপন করা যায়।

চতুর্থত : যে সব প্রদীপন সাধারণভাবে মৌখিক শ্রেণি শিক্ষণের সঙ্গে কোনোরকম যান্ত্রিক কৌশল ছাড়াই ব্যবহার করা হয়, তাদের বলা হয় অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপন। যেমন- চার্ট, মডেল, ছবি, ইত্যাদি। অপ্রক্ষেপণ শ্রেণির প্রদীপন দু ধরনের হয়— দ্বি-মাত্রিক ও ত্রি-মাত্রিক। যেমন- চার্ট, ম্যাপ, ছবি ইত্যাদি হল দ্বিমাত্রিক প্রদীপন। আর মডেল হল ত্রিমাত্রিক প্রদীপন।

খ) শ্রবণভিত্তিক প্রদীপন (Audio based aids) :

যে প্রদীপনগুলো শিক্ষার্থীর শ্রবণেন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তুলতে সহায়তা করে যেগুলোকে বলা হয় শ্রবণভিত্তিক প্রদীপণ, যেমন–বেতার, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রদীপন দ্বারা কোন অতীত ঘটনাকে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করা যায়।

গ) দর্শন শ্রুতি ভিত্তিক প্রদীপন (Audio visual aids) :

শ্রেণি শিক্ষণের জন্য বর্তমানে এমন কতকগুলো প্রদীপনের ব্যবহার করা হয় যেগুলোর সাহায্যে একই সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবনেন্দ্রিয় উভয়কে সক্রিয় করে তোলা যায়। এই জাতীয় প্রদীপনকে বলা হয় দর্শন-শ্রুতিভিত্তিক প্রদীপন। যেমন - সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদি।

ঘ) সক্রিয়তাভিত্তিক প্রদীপন (Activity based aids):

শিক্ষার্থীদের সবগুলো ইন্দ্রিয়কে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বর্তমানে আরেক ধরনের প্রদীপন ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলো ঠিক গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের মধ্যে ব্যবহার করা হয়না। তবে এইগুলো যথেষ্টভাবে শিখনের সহায়তা করে। যেমন– পরীক্ষাগারে হাতে কলমে কাজ, অভিনয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি এই জাতীয় প্রদীপনের অন্তর্গত।

ঙ) আত্মশিখনমূলক প্রদীপন (Selflearning based aids):

আধুনিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে আবেক ধরনের প্রদীপন ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোকে বলা হয় আত্মশিখনভিত্তিক প্রদীপন। এই সব প্রদীপন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া শিক্ষালাভ করে। যেমন- শিক্ষণ যন্ত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি এই শ্রেণির প্রদীপন।

শিক্ষামূলক প্রদীপনসমূহের এই শ্রেণিবিভাগ থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রদীপন ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রদীপন বর্তমানে শিক্ষকদের মধ্যে এত জনপ্রিয় যে, এগুলো বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা বর্তমানে উৎপাদিত হয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণরাখার দরকার, এই প্রদীপনগুলো শ্রেণিতে ব্যবহারের জন্য শিক্ষকের যেমন দক্ষতা প্রয়োজন, তেমনি উপযুক্ত প্রদীপন নির্বাচনের ব্যাপারেও শিক্ষকের যথেষ্ট বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রদীপন ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে দর্শনভিত্তিক প্রদীপনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নিম্নে দর্শনভিত্তিক প্রদীপনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্ষেপণমূলক এবং অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

প্রক্ষেপনমূলক প্রদীপন (Projected Teaching Aids):

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের চিত্র এবং প্রকৃত বস্তু বা তার প্রতিরূপ শিক্ষণ প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পাঠ্যবিষয়বস্তুর আলোচনাকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য শিক্ষণকে আরও কার্যকর করার জন্য শিক্ষক এই সব বস্তুর ছবি বা ফটোগ্রাফ প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে দেওয়াল বাপর্দার উপর ফেলে দেখতে পারেন। এ পদ্ধতিতে প্রদীপন আরও অনেক বেশি নিখুঁত ও জীবন্ত হয়ে উঠে। এখানে কয়েকটি প্রক্ষেপণমূলক প্রদীপন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

(১) স্লাইড (Slide) : কোন স্বচ্ছ বস্তুর উপর কোনো কিছুর প্রতিবিম্বকে বলা হয় স্লাইড। শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ পাঠের বিভিন্ন অংশের উপর ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে স্লাইড তৈরি করা হয়। এই স্লাইডগুলো পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্রম অনুসারে তৈরি করা হয়। শ্রেণিতে শিক্ষক যখন যে অংশ আলোচনা করেন, তখন সেই স্লাইডটি প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে শ্রেণির সামনে পর্দা ও দেওয়ালের উপর ফেলেন।

(২) ম্যাজিক লন্ঠন (Magic Lantern) : বহুল প্রচলিত প্রক্ষেপণ যন্ত্রগুলির মধ্যে ম্যাজিক লন্ঠন অন্যতম। যখন বিদ্যুতের প্রচলন হয়নি তখন কারবাইড অথবা কেরোসিন গ্যাসের বাতি এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হত। শ্রেণিকক্ষে ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে পর্দায় ছবি প্রতিফলিত করে সুন্দর শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এই যন্ত্রের অসুবিধা হল,পুস্তকের ছাপা চিত্রাদিকে পর্দায় প্রতিফলিত করা যায় না। এর জন্য পৃথকভাবে বর্গাকৃতি কাচেঁর স্লাইড (Slide) তৈরি করে রাখতে হয়। প্রতিফলিত হলে স্লাইডের ছবিগুলো অনেক বড়ো দেখায়, কোন পাঠ্যবিষয়ের সম্পূর্ণ অংশ সম্পর্কে ধারাবাহিক স্লাইড তৈরি করা থাকলে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিফলিত করে দেখানো যায় ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বোঝানো যায়। বহু শিক্ষার্থী একত্রে এইগুলো দেখবার ও বুঝবার সুযোগ পায়।

(৩) ফিল্মস্ট্রিপস (Filmstrips): ম্যাজিক লন্ঠন-এর আধুনিকতম সংস্করণ হল ফিল্মস্ট্রিপস। এর জন্য কাচের স্লাইড প্রয়োজন হয়না। ফটো ফিলম্-এর সাহায্যে ছবি দেখানো হয়। স্লাইড তৈরি করার চেয়ে ফটো তোলা সহজ এবং কোনো একটি বিষয়ের ধারাবাহিক ফটো তোলা যায়। যন্ত্রটির হাতল ঘুরিয়ে একই সঙ্গে বহু ফটো প্রতিফলিত করে দেখানো যায়। এই ছবিগুলোর সুবিধা হল, যতক্ষণ ইচ্ছা খুশিমত শিক্ষার্থীদের সামনে এগুলোকে দৃশ্যমান রাখা যায়। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীরা ঘটনা পরম্পরায় চিত্রগুলো অনেকক্ষণ মনোযোগ

সহকারে দেখতে পায় ও বিষয়টিকে বার বার দেখে এবং সঙ্গো সঙ্গো শিক্ষক প্রদত্ত ব্যাখ্যা শুনে অনুধাবন করতে পারে। এরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হৃদয়গ্রাহী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বহুকাল শিক্ষার্থীরা স্মরণ রাখতে সমর্থ হয়।

(৪) এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope) : কোনো অস্বচ্ছ সামগ্রীকে পর্দায় প্রতিবিম্বিত করে শিক্ষার্থীদের দেখানোর জন্য এপিডায়াস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে থাকে দুটি জোড়ালো আলো এবং কনভেক্স লেন্স (Convex Lens)। শিক্ষক পাঠ পরিবেশনের সময় প্রকৃত বস্তু, ছবি, অনুচিত্র , গাছের পাতা, ডাল, ছোটখাটো জীব, পোকা-মাকড়, প্রস্তরখণ্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য প্রভৃতি এই যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি পর্দায় প্রতিফলিত করতে পারেন। সেই সঙ্গো শিক্ষক মুখে মুখে প্রতিফলিত বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলে শিক্ষোপকরণটি শ্রুতি ও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে।

(৫) ওভারহেড প্রোজেক্টার (Overhead-Projector) : আধুনিক শিক্ষাকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে প্রোজেক্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। প্রোজেক্টার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ওভারহেড প্রোজেক্টার (Overhead Projector) এক ধরনের প্রোজেক্টার, যেটিকে বর্তমানে শ্রেণি শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ওভারহেড প্রজেক্টার প্রথম আবিষ্কার করেন রজার এপলেডর্ন (Roger Appledorn) 1960 সালে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংস্থায় এই ধরনের প্রজেক্টার ব্যবহার করা হতে থাকে এবং যন্ত্রটির সংগঠনিক রূপেরও পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে এই প্রজেক্টারগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, অপেক্ষাকৃত কম আলোকিত ঘরে এগুলোকে সাধারণ অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। দ্রষ্টব্য বিষয়বস্তুকে স্বচ্ছ মাধ্যমের উপর স্থাপন করে তার প্রতিবিম্বকে প্রক্ষেপণ করার ব্যবস্থা এই প্রজেক্টারে করা হয়। তাছাড়া প্রতিবিম্বটির দিক পরিবর্তন করার জন্য আয়না ব্যবহার করা হয়। বাইরে থেকে দেখতে যন্ত্রটি একটি বাক্সের মতো যার উপরের ঢাকনাটি কাচের। এছাড়া মূল বাক্সটির উপরের ঢাকনায় একটি দণ্ড লাগানো থাকে। এই দন্ডের মাথায় একটি অবজেক্টিভ লেন্স (Objective Lens) থাকে এবং তার 45^0 কোণে থাকে একটি আয়না। বাক্সের মধ্যে এক প্রান্তে থাকে আলোর উৎস এবং অপর প্রান্তে থাকে একটি আয়না। এই আয়নাটিও বাক্সের ভূমির সঙ্গে 45^0 কোণে লাগানো থাকে। আলোকরশ্মি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে অবজেক্টিভ লেন্সে পড়ে এবং অবজেক্টিভ লেন্স থেকে বেরিয়ে দণ্ডের মাথায় অবস্থিত আয়নায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত রশ্মি পর্দায় গিয়ে পড়ে। বাক্সের কাচের ঢাকনায় স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত কোনো বস্তু রাখলে স্বাভাবিকভাবে এই প্রক্রিয়ায় তার প্রতিচ্ছবি পর্দায় গিয়ে পড়ে। এখন শিক্ষক যদি দন্ডটি ঘুরিয়ে প্রতিফলিত রশ্মির দিক পরিবর্তন করেন, তাহলে ছবিটি শিক্ষকের পেছনে গিয়ে পড়বে অর্থাৎ, শ্রেণিকক্ষের যে জায়গায় বোর্ড থাকে, সেই জায়গায় পর্দা রাখলে শিক্ষক ছাত্রদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় প্রদীপনটিকে তাঁর পেছনে ফেলতে পারেন। যেহেতু যন্ত্রটিতে কাজ করার জন্য জোরালো আলোর প্রয়োজন হয়, সেহেতু এটিকে ঠান্ডা রাখার জন্য বাক্সের মধ্যে একটি পাখাও রাখা হয়। এখানে, বিষয়বস্তুকে স্বচ্ছ মাধ্যমে স্থাপন করার জন্য সাধারণ সেলোফেন কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার সাধারণ কিছু উপকরণ যুক্ত করে এই যন্ত্রের সাহায্যে স্লাইড এবং ফিল্ম স্ট্রিপও দেখানো যায়।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার্য বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে এই ওভারহেড প্রোজেক্টার খুবই জনপ্রিয়। তার কারণ এই

যন্ত্রের সাহায্যে শ্রেণীর মুখোমুখী দঁড়িয়ে শিক্ষক তার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন। ফলে শ্রেণি সবসময় শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এমনকি শিক্ষক এই রঙ্গিন কলম ব্যবহার করে, সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিষয়বস্তু লিখে তা প্রোজেক্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন। আলোচ্য বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ আলোচনার সময় শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে মূল সংকেতগুলো উপস্থাপন করতে পারেন।এই ধরনের প্রোজেক্টারের আরেকটি সুবিধা হল এটিকে সাধারণ অবস্থায় শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যায়। শিক্ষকরা উপস্থাপনযোগ্য বিষয়বস্তু এক্ষেত্রে খুব সহজে তৈরি করতে পারে বলে, তাঁদের কাছে এই ধরনের প্রোজেক্টার খুবই জনপ্রিয়।

(৬) মাইক্রো প্রোজেক্টার (Micro Projector): এই ধরনের যান্ত্রিক কৌশলে খুব সুক্ষ্ম বস্তুকে বড় আকারে প্রক্ষেপ করা হয়। সাধারণত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সব বস্তুকে দেখতে হয়, তাদের প্রক্ষেপণের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোনো সুক্ষ্ম বস্তুকে পর্দায় প্রক্ষেপণের পর শিক্ষক তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হন। এই কৌশলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং প্রক্ষেপণ যন্ত্রের কাজ একই সঙ্গে হয়।

(৭) নির্বাক চলচ্চিত্র (Motion Picture): এপিডয়োস্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন ও ফিলমস্ট্রিপস্ দ্বারা পুস্তকাদির চিত্র ও স্লাইড পর্দায় প্রতিফলিত করে শ্রেণিকক্ষে সরাসরি দেখানো যায়। এরূপ সামগ্রী বা চিত্রাদি সাধারণত খন্ড - বিখণ্ড ও সম্পর্কহীন হয়। উপরন্তু এগুলো স্থির চিত্র (Still Projector)। তাই এগুলো শিক্ষার্থীর মনে খুব বেশি উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারেনা। স্থিরচিত্রাদির পরিবর্তে যদি চলমান ধারাবাহিক চিত্রের দ্বারা শিক্ষনীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে ধরা যায়, তাহলে শিক্ষা আরও জীবন্ত, আবেদনশীল ও স্থায়ী হতে পারে। নির্বাক চলচ্চিত্র বা (Motion Picture) হল এইরূপ একটি উপযুক্ত যন্ত্র। সরকারি প্রচার কার্যের জন্য প্রামাণিক চিত্রাদি দেখানো হয়। ব্যবসা- বাণিজ্য, কলকারখানা, শিল্পোৎপাদন, কৃষি, সঞ্চয়, বন্টন, ব্যাঙ্ক, ব্যবসা, ভোট গ্রহণ, সংসদ পরিচালনা, দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের কার্যকলাপ, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রামাণিক চিত্রাদি প্রদর্শিত হয়। এইগুলো সরকারি প্রচার ছাড়াও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুকূল শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে পৃথক ধারাবাহিক ফিলম্ ফটো নিয়ে নির্বাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে বিষয়টা যে শিক্ষার্থীর নিকট হৃদয়গ্রাহী হবে এই বিষয়ে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই।

অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপন (Non Projected Teaching Aids):

অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপন কোনরকম কৌশল ছাড়াই শ্রেণি শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাই এইগুলোর প্রয়োজনীয়তা সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান। প্রত্যেকটি প্রদীপনের নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাদের ব্যবহার বিধিও ভিন্ন ধরনের। এখানে কয়েকটি অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপন সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

(১) ব্ল্যাক্‌বোর্ড :

ব্ল্যাকবোর্ড শ্রেণি শিক্ষার একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। খুব স্বল্প খরচে এই ধরনের শিক্ষণ প্রদীপন তৈরি করা যায় বলে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। সামান্যতম সুযোগ সুবিধা যেখানে আছে, সেখানে শ্রেণিকক্ষে একটি বোর্ড অবশ্যই থাকবে, এটুকু আশা করা যায়। সাধারণত কালো রঙের একটি শক্ত বস্তুর তৈরি এই জিনিসটি শ্রেণিকক্ষে এমন জায়গায় স্থাপন করা হয় যে, তার উপর লিখলে বা ছবি আঁকলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী তা দেখতে পায়। তবে বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বোর্ডের রং কাল হলে তা চোখের পক্ষে

খারাপ। এছাড়া কালো রঙের উপর যে চকচকে ভাব থাকে তা দেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে। তাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বোর্ডের রং গাঢ় সবুজ করা হয় এবং তাতে হলুদ চক দিয়ে লেখা হয়। এই জন্য 'ব্ল্যাকবোর্ড' কথাটির পরিবর্তে বর্তমানে 'চকবোর্ড' কথাটি শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি প্রচলিত।

বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত, সুস্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে ব্ল্যাকবোর্ডের ন্যায় সুলভ ও কার্যকরী উপকরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি পাঠ্যবিষয় শিক্ষণ প্রসঙ্গে প্রয়োজন হয় ছবি, অনুচিত্র, মডেল, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি। পাঠদানকালে দক্ষ শিক্ষক এইগুলো বোর্ডে অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। এর ফলে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তাই আধুনিক যুগেও ব্ল্যাকবোর্ডকে শিক্ষণের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ব্ল্যাকবোর্ডের উপযোগিতা :

১) ব্ল্যাকবোর্ডের খরচ তুলনামূলকভাবে অনেকরকম। এই কারণে, যে কোন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এর সংস্থান করা সম্ভব।

২) ব্ল্যাকবোর্ড শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষক যখন ব্ল্যাকবোর্ডে পাঠ্যবস্তুর সারাংশ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি লেখেন ও ব্যাখ্যা করেন তখন সকল শিক্ষার্থী বোর্ডের দিকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট রেখে শিক্ষকের নির্দেশ পালন করে। এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩) ব্ল্যাকবোর্ডের একটি প্রধান সুবিধা হল — এটিকে একবার ব্যবহার করার পর আবার পরমুহূর্তে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করা যায়। ফলে শ্রেণিকক্ষে এই প্রদীপনের ব্যবহার করা শিক্ষকের পক্ষে অনেক সহজ।

৪) চক্‌বোর্ডের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের অনুশীলনমূলক কাজ সহজে পরিচালনা করা যায়।

৫) বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তুলতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা বোর্ডে কাজ করিয়ে, তাদের মধ্যে সক্রিয়তা আনতে পারেন এতে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

৬) শ্রেণিকক্ষে বোর্ডের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশেও সহায়তা করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, নির্ভুলভাবে তথ্য পরিবেশনের অভ্যাস ইত্যাদির মত অভ্যাসগুলো বোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে গঠন করা সম্ভব।

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের রীতি :

১) বোর্ডে লেখা পরিষ্কার হওয়া দরকার এবং লাইনগুলো সোজা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২) সবসময় বোর্ডের ওপরের অংশ ব্যবহার করা উচিত। বোর্ডের ওপরের অংশে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে শ্রেণিতে সব শিক্ষার্থীর দেখার সুবিধা হয়।

৩) বোর্ডের লেখা বড় বড় হরফে দেওয়া দরকার। লেখা খুব ছোট হলে যেসব শিক্ষার্থীরা পেছনের বেঞ্চে বসে, তারা দেখতে পায়না।

৪) বোর্ডটি শ্রেণিকক্ষে এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে, যাতে তার থেকে আলোর প্রতিফলন কম হয়।

৫) বোর্ডে কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় তার সামঞ্জস্যতা ও বিন্যাসের দিকে নজর রাখা উচিত। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বোর্ডের বিভিন্ন অংশে তথ্য পরিবেশন করা উচিত নয়।

৬) শ্রেণিতে বোর্ড ব্যবহার করার সময় শিক্ষক বোর্ডের একপাশে দাঁড়াবেন। একনাগাড়ে অনেক সময় ধরে বোর্ডে লিখবেন না। তাতে শ্রেণি শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

৭) বোর্ডে লেখার সময় চকটিকে বোর্ডের তলের সঙ্গে ৩০° কোণে ধরতে হবে। তাতে লেখার সময় কোনো শব্দ হবে না। লেখার সময় শব্দ হলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হয়।

৮) জ্যামিতি, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছবি আঁকার জন্য রঙিন চক ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯) শ্রেণিতে বোর্ড ব্যবহার করার পূর্বে সেটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। কোন বিশেষ বিষয়বস্তু আলোচনা শেষ হয়ে গেলে, তাও মুছে ফেলা উচিত।

১০) সবশেষে বলা যায়, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হবে সুন্দর, সুস্পষ্ট, বড় আকারের এবং নির্ভুল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা বোর্ডে লেখা উচিত নয়।

(২) ফ্লানেল বোর্ড :

ব্ল্যাকবোর্ডের মতো ফ্লানেল বোর্ডও শ্রেণি শিক্ষণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। এই শিক্ষণ - প্রদীপন শিক্ষক নিজেই তৈরি করতে পারেন। এটি কাঠের বা ম্যাসোনেটের বোর্ডের ওপর শক্ত করে একটি ফ্লানেল জাতীয় কাপড় লাগালেই ফ্লানেল বোর্ড তৈরি হয়। বোর্ডের ওপর ফ্লানেলের বদলে মোটা খদ্দরের কাপড় লাগালেও কাজ হয়। ফ্লানেল বোর্ড ব্যবহার করার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তৈরি করতে হয়। কোনো লেখা বা ছবি, কাগজের টুকুরোর পেছনে শিরীষ কাগজের টুকরো আটকে দেওয়া হয়। এই খণ্ড খণ্ড অংশগুলো ফ্লানেল বোর্ডের ওপর চাপ দিলে খুব সহজ ভাবে আটকে যায়; আবার টান দিলেই খুলে আসে। ফ্লানেল বোর্ডে ব্যবহৃত উপকরণগুলোকে বলা হয় ফ্লানেল গ্রাফ। এই ধরনের বোর্ডে বার বার লেখা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া বিষয়বস্তুর চলমান অবস্থা প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। পাঠের মধ্যে বিষযবস্তুর পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হলে খণ্ডগুলোর স্থান শুধুমাত্র পরিবর্তন করে তা সম্ভব হয়। এই ধরনের প্রদীপন ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে উঠে।

(৩) বুলেটিন বোর্ড :

শ্রেণিকক্ষে বুলেটিন বোর্ডকেও শিক্ষণ - প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। শ্রেণিকক্ষে চক্‌বোর্ডের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় বুলেটিন বোর্ডটি রাখা উচিত। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষে একটি করে বুলেটিন বোর্ড থাকে। বুলেটিন বোর্ডের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খবর বা তথ্য সরবরাহ করা নয়, এর সাহায্যে শিক্ষক তার পাঠদানের সফলতা আনতে পারেন। বুলেটিন বোর্ড শিক্ষণের কাজে নানাভাবে সহায়তা করে।

প্রথমত : বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন সৃজনাত্মক কাজ সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষণের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের চার্ট, লেখচিত্র, মানচিত্র, ছবি, সংবাদপত্রের অংশ ইত্যাদি সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য শিক্ষক বুলেটিন বোর্ডকে ব্যবহার করতে পারেন।

তৃতীয়ত, বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ নির্দেশ প্রচার করতে পারেন; শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কাজ নির্দেশ করতে পারেন।

চতুর্থত, শ্রেণিকক্ষের বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে সহায়তা করার জন্য, শিক্ষক বুলেটিন বোর্ড ব্যবহার করতে পারেন।

বুলেটিন বোর্ড ব্যবহারের রীতি : বুলেটিন বোর্ড ব্যবহারের সময় শিক্ষক নিম্নলিখিত দিক্‌গুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবেন —

১) বুলেটিন বোর্ডে অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেন না দেওয়া হয়।

২) বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপিত বস্তুগুলো যেন দেখার উপযোগী বড় হয়।

৩) বুলেটিন বোর্ডের বিষয়বস্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিবর্তন করা উচিত।

৪) বুলেটিন বোর্ডে অত্যধিক বিষয়বস্তু একসঙ্গে উপস্থাপন করা উচিত নয়। বিষয়বস্তু এমন ভাবে সাজানো উচিত, যাতে বুলেটিন বোর্ডের সৌন্দর্য বাড়ে এবং শিক্ষার্থীদের সহজেই আকর্ষণ করে।

৫) প্রত্যেক বিষয়বস্তুর একটি করে মূল শিরোনাম থাকা উচিত এবং এই শিরোনাম অনুযায়ী বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস করে সাজানো উচিত।

৬) বুলেটিন বোর্ডের জন্য বিষয়বস্তু সংগ্রহের ভার শিক্ষার্থীদের উপর দিলে ভাল হয়।

(৪) চার্ট :

শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য চার্ট-এর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। চার্টকে গ্রাফিক ও চিত্রসূচক বিষয়ের যুগ্ম প্রতিরূপ বলা চলে। চার্ট এর প্রধান কাজ হল বিষয়বস্তু সাদৃশ্য -বৈসাদৃশ্য, প্রগতি, শ্রেণিবিভাগ, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়কে ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করা। শিক্ষামূলক কোনো প্রদর্শনীর সময় এইরূপ বিভন্ন প্রকার চার্ট দেখানো যায়। চার্ট বিষয়বস্তু ও পরিবেশনের প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

ক) তালিকামূলক চার্ট : এই ধরনের চার্টে দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তু মধ্যের তুলনামূলক বিচার করা হয়। এই চার্টে কতকগুলো স্তম্ভ থাকে এবং প্রত্যেক স্তম্ভে এক একটি তুলনীয় বিষয়বস্তুর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। পরে প্রত্যেক সারিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক বিচার করা হয়। বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে এই চার্ট ব্যবহার করা হয়।

খ) শাখামূলক চার্ট : এই ধরনের চার্টে কোনো বিশেষ ধারণার বিকাশ কিভাবে সংঘটিত হয়েছে, তা দেখানো হয়। এই চার্টে সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে একটি গাছের সংগে তুলনা করা হয় এবং তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেখানো হয়। ভাষার ক্রমবিকাশ, জীববিদ্যায় প্রাণীর ক্রমবিকাশ ইত্যাদি শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা হয়।

গ) ধারাবাহিক চার্ট : বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত সমন্বয়কে পরিস্ফুট করার জন্য এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা হয়। সাধারণ তীর চিহ্নের সাহায্যে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন পৌরনীতির পাঠে 'সরকার কিভাবে পরিচালিত হয়' তা ব্যক্ত করার জন্য এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা হয়।

ঘ) চিত্রযুক্ত চার্ট : চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যা পরিবেশনের এটি একটি আন্তর্জাতিক রীতি। এই ধরনের চার্টে বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য কোনো সংকেতিক বা কখনও প্রকৃত বস্তুর ছবি থেকে এবং ছবির সংখ্যার দ্বারা কোনো বিশেষ বিষয়ের পরিসংখ্যান বোঝানো হয়।

ঙ) বৃত্তীয় চার্ট : এই ধরনের চার্টে একটি বৃত্তকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশে কোনো বিষয়ের পরিমাণগত দিক বোঝানো হয়।

(৫) রেখাচিত্র :

কতগুলো রেখা এবং নিদর্শন দ্বারা রেখা চিত্র অঙ্কন করা হয়। রেখাচিত্র হল সরল, সহজ ও অমূর্ত বিষয়ের অল্পবিস্তর মূর্ত প্রকাশ, বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংক্ষিপ্তসার এবং সামগ্রিক বিষয়ের পুনঃ মূল্যায়নের নিমিত্ত রেখাচিত্র ব্যবহার করা হয়। শিক্ষক পূর্বেই আর্ট পেপারে কোনো বিষয়ের অনুচিত্র অঙ্কন করে রাখতে পারেন; আবার বোর্ডেও তিনি তা অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। তবে রেখাচিত্র প্রদর্শনের পূর্বে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। রেখাচিত্র প্রস্তুত করার সময় শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবেন।

ক) রেখাচিত্র নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।

খ) এর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিষয় লেখা বা কোন চিহ্ন বসানো মোটেই উচিত নয়।

গ) রেখাচিত্র হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুস্পষ্ট, আকর্ষণীয় ও ব্যাখ্যামূলক।

ঘ) রেখাচিত্রের আকৃতি এমন বড় হওয়া দরকার, যেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী তা ভালভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

(৬) লেখচিত্র :

তুলনামূলক হিসাব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিসংখ্যান বিষয়াদি পরিবেশনের সময় সাধারণত লেখচিত্র বা গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা কোনো ভাবগত বা বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলা যায়। লেখচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়বস্তু স্মরণ রাখতে পারে। লেখচিত্র বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন রেখা লেখচিত্র, স্তম্ভ লেখচিত্র, বৃত্তাকার লেখচিত্র, চিত্রসূচক লেখচিত্র ইত্যাদি।

গ্রাফের ব্যবহার মূলত হিসাবশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তাই অঙ্ক এবং পরিসংখ্যান বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠ্যবিষয় শিক্ষণ প্রসঙ্গে লেখচিত্র ব্যবহারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, জাতীয় আয়, দ্রব্যমূল্য, উৎপাদন; ইতিহাস পাঠে ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা; ভূগোলশাস্ত্রে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, জলবায়ু, উচ্চতা, পরিমাপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও প্রকাশের জন্য নানা উপায়ে লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে লেখচিত্রের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ করা যায় যে, শিক্ষার্থীর মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় ফলে, শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সহজে ভুলে যায় না।

লেখচিত্র ব্যবহারের সময় নিম্নরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত —

i) লেখচিত্র হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।

ii) লেখচিত্রের পরিমাপ হবে নির্ভুল ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য।

iii) লেখচিত্র কাগজ অথবা লেখচিত্রের বোর্ড হবে সুন্দর ও সুস্পষ্ট, যেন দূর থেকে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি দেখতে ও বুঝতে পারে।

iv) অঙ্কিত লেখচিত্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা উচিত। ব্যাখ্যার সুবিধার্থে গ্রাফের পাশাপাশি বিষয়টি অল্প কথায় লিখে দেওয়াও বাঞ্ছনীয়।

v) শিক্ষার্থী যাতে লেখচিত্র অঙ্কন কৌশল এবং এর ব্যবহার করা শিখতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

(৭) ছবি :

অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপনগুলোর মধ্যে ছবিও একটি বিশেষ উপযোগী উপকরণ হিসাবে খ্যাত। প্রকৃত বস্তুসমূহের অভাবে শ্রেণিকক্ষে সেই সকল বস্তুর ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান পঠন পাঠনের সময় এই উপকরণের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। শিক্ষক পাঠদানের সময় সেগুলো যথাযথ ব্যবহার করলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষণ-ক্রিয়া প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠবে। তবে স্মরণ রাখা দরকার সেগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে উপযুক্ত ব্যবহারের উপর।

ছবি ব্যবহারের রীতি :

ক) শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ছবি নির্বাচন করা প্রয়োজন। ছবিটি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। ছবি দেখতে সুন্দর হলেই সেটিকে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাওয়া চলবে না। যে ছবি শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যে উপনীত হতে সহায়তা করবে, সে রকম ছবি নির্বাচন করতে হবে।

খ) ছবিতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু যাতে নির্ভুল হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ছবিটি যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, সে দিকটির কথা বিবেচনা করে ছবি নির্বাচন করতে হবে।

গ) ছবিটির আকার এমন হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শ্রেণির যে-কোনো জায়গা থেকে সেটিকে দেখতে পায়। ছবিটিকে শ্রেণিতে এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যাতে কোনো শিক্ষার্থীর দেখার অসুবিধা না হয়। তাছাড়া ছবিটি যদি শিক্ষার্থীদের দেখার অসুবিধা হয় তবে তাদের কাছে এনে দেখার সুযোগ করে দিতে হবে।

ঘ) ছবিটি ঠিক প্রয়োজনের সময়ই শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা হবে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সারাক্ষণ ছবিটি শ্রেণিতে টাঙানো থাকলে শিক্ষার্থীদের মনসংযোগে বাধার সৃষ্টি করবে।

ঙ) ছবি যদি বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য আবশ্যিক হয়, তবে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকতে উৎসাহিত করতে হবে, এর জন্য শ্রেণিতে নির্দিষ্ট সময় ব্যায় করতে হবে। এমনিভাবে সাধারণ কয়েকটি নীতি অনুসরণ করে শ্রেণিতে একটি ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার(Conclusion):

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ সহায়ক প্রদীপনগুলোর উপযোগিতা সম্পর্কে বর্তমানে শিক্ষাবিদদের মনে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই আধুনিক শিক্ষণতত্ত্বে এগুলো ব্যবহারের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে যে-কোনো শিক্ষণ সহায়ক প্রদীপনের কার্যকারিতা তার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তাই শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শ্রেণিকক্ষে প্রদীপনগুলোকে যথাযোগ্য পদ্ধতিতে ব্যবহার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরও এই বিষয়ে সক্রিয় করে তোলা। তবে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের ব্যবহারই কেবলমাত্র শিখনের শর্ত নয়। শিক্ষণের অন্যান্য শর্তগুলো পূরণ হলে তবেই এগুলো শ্রেণিতে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয় একক

শিক্ষায় প্রযুক্তি : এডুস্যাট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেট
(Use of Technology in Education: Edusat, Satellite Television, Internet)

ভূমিকা (Introduction):

পরিবর্তন প্রকৃতির ধর্ম। তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই যুগে যুগে পৃথিবীও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের ফলেই ধীরে ধীরে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে। বর্বর যুগ থেকে প্রথম মানবসভ্যতার সূচনা দীর্ঘ পাঁচ ছয় হাজার বছর পূর্বে। আগুন জ্বালাবার শিক্ষালাভের সঙ্গেই মূলত সভ্যতার প্রদীপ জ্বলছে, ক্রমে মানুষ দেহ আবৃত করতে, ঘর বাঁধতে, অস্ত্র ব্যবহার করতে, কৃষিকার্য করতে শিখেছে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে মানবসভ্যতাও পুষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও অনুসন্ধিৎসা পাথর ও ধাতু হতে অস্ত্র বানিয়েছে, বীজ হতে শস্য উৎপাদন করেছে, লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছে। আর এই সবকিছুর পেছনে কাজ করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবসভ্যতার বহু বিচিত্র উপাদান ও উপকরণ যুগিয়েছে, মুদ্রণযন্ত্র, ট্রেন, জাহাজ, বিমান, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি আবিষ্কার করেছে।

বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভাবনীয় উন্নতির মূলে আছে প্রযুক্তির ব্যবহার। যে-কোনো দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বলতে আর্থিক সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবনযাত্রাকে বোঝায়। এর জন্য কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন। দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং মানুষের কর্মশক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সুচিন্তিত আধুনিক পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন। এই সুচিন্তিত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার অন্যতম উপায় হল শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতিকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারছে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির সহায়তায় সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছতে পারছে। শিক্ষকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে পারছে।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট, এডুসেট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির কার্যকরী ব্যবহার শিক্ষার অগ্রগতিতে সহায়তা করছে। শিক্ষামূলক প্রযুক্তি শুধু সমাজ নয়, দেশে-বিদেশে সকল মানুষকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসে এবং শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন বৃদ্ধি করে। সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসেই উন্নত মানের শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। তাই বলা যায় বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। নিম্নে এডুসেট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেট সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

এডুসেট (Edusat) :

এডুকেশন স্যাটেলাইট বা EDUSAT হল ভারতের প্রথম শিক্ষা উপগ্রহ। এটি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (Indian Space Research Organisation) অধীনস্থ একটি প্রকল্প। এর মাধ্যমে দেশের কিছু বিশেষ নির্বাচিত স্থানে বিভিন্ন স্টেশনকে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আর এই স্টেশনগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংযোগ থাকে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষণ প্রান্তরূপে কাজ করে। এটি কেবল শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে পরিবেশন করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

শিক্ষা সংক্রান্ত উপগ্রহটি বঙ্গোপসাগরের একটি ছোট দ্বীপ শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে 2004 সালের 20 সেপ্টেম্বর প্রথম মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এটি ভারতের তৈরি রকেট GSLV- এর সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উপগ্রহটির ওজন ছিল 1950 কে.জি. এবং এটিকে ভূপৃষ্ট থেকে 180 কিলোমিটার দূরত্বে জিওট্রান্সফার অরবিট - এ স্থাপন করা হয়। এডুসেটটির প্রকল্পিত আয়ুষ্কাল হল 7 থেকে 10 বছর। এটি মূলত শ্রবণ দর্শন মাধ্যম, ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ক্লাস এবং মাল্টিমিডিয়া ও মাল্টিসেন্ট্রিক পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে। এটি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এহং শিক্ষার উচ্চতরস্তরের ক্ষেত্রে প্রথাবর্জিত শিক্ষার জন্য ও বিকাশমূলক সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ঊর্ধ্বসংযোগ (Uplink) স্টেশনে ক্যামেরার সামনে শিক্ষক যখন পাঠদান করেন তখন শ্রবণ ও দর্শন সিগনালগুলো উপগ্রহে রশ্মি আকারে পাঠানো হয়। উপগ্রহ এটি পৃথিবীতে গ্রাহক কেন্দ্রে প্রেরণ করে এবং শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করে। আবার শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন থাকলে তা উপগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছে পৌঁছে যায়, এইভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে দেখতে পারে এবং তার কথা শুনতে পারে। কার্যত সিস্টেমটি একটি অসদ্ (Virtual) শ্রেণিকক্ষ সৃষ্টি করে। এই ধরনের অসদ্ শ্রেণিকক্ষ পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রয়োজন 'শিক্ষক সমর্থক সামগ্রী' যথা, চার্ট, মডেল, পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিপাদন, ওভারহেড প্রোজেকটার (OHP), স্লাইড, কম্পিউটার অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স, ঝলক (Flash), ভিডিও ক্লিপিং ইত্যাদি। তবে অসদ্ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের এইসব উপকরণসমূহ যথাযথ ব্যবহার করার দক্ষতা থাকতে হবে।

এডুকেশন স্যাটেলাইট সেবামূলক কাজে উৎসর্গীকৃত। এতে 74 টি চ্যানেল রয়েছে। এতে 1.2 মিটার Reflector যুক্ত এন্টেনা ব্যবহৃত হয়। এটি ভারতের 18 টি সরকারি ভাষায় এবং 400 টি আঞ্চলিক ভাষায় তথ্যাদি পরিবেশন করে থাকে। এর একটি বিশেষ সুবিধা হল যে, কম মূল্যের একটি রিসিভার এর মাধ্যমে যে-কোনো টেলিভিশনে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যটি দৃস্ট হয়।

শিক্ষায় এডুস্যাটের ভূমিকা :

এডুস্যাট সকল প্রকারের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বা বাইরের সকল শিক্ষার্থী, মহিলা, শিশু, যুবা সকলেই এর অন্তর্গত। শিক্ষকরাও এডুস্যাটকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নতি কল্পে সাহায্য করে। নিম্নে শিক্ষায় এডুস্যাটের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

১) দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে এডুস্যাট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান যথা IGNOU, NIOS, NIEPA, NCERT এগুলো বহু বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে অসদ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

২) এডুস্যাটের মাধমে বহুশিক্ষার্থী উচ্চমানের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছে উন্নতমানের শিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারছে। তাদের সঙ্গে পারস্পারিক আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের শিখনকে সমৃদ্ধতর করতে পারছে।

৩) এডুস্যাটের মাধ্যমে দূরবর্তী এলাকার গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

৪) প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই এডুস্যাটকে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

৫) শিক্ষক যখন ক্যামেরার সামনে পাঠদান করেন উপগ্রহ তা শ্রেণিকক্ষে প্রেরণ করে এবং শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে রেকর্ড করে ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এই ডিজিটাল রেকর্ডিং এর সুবিধার দরুন প্রয়োজনমত এই শিক্ষণকে পুনরায় পরিচালনা করা যার ফলে শিক্ষণের গুণগত মান উন্নত হয়।

৬) টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শেখার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে শিখন তাদের কাছে আনন্দপূর্ণ হচ্ছে।

৭) গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদেরকে একই সঙ্গে একই ধরনের (অভিন্ন) পাঠদান করা যাচ্ছে।

৮) সময়মত পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়গুলোর আলোচনা শেষ করা যাচ্ছে।

স্যাটেলাইট টেলিভিশন (Satellite Telivision):

দূরদর্শন হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক অত্যাশ্চর্য দান। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী, তথ্যবহুল এবং জনপ্রিয় একটি গনমাধ্যম। দূরদর্শন হল এমন একটি মাধ্যম যেখানে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। যার ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসবে এর ব্যবহার ব্যাপকহারে হচ্ছে। এই মাধ্যম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করার কারণ হল যে, এটি একটি দর্শন ও শ্রুতিনির্ভর মাধ্যম। এটি একইসঙ্গে মানুষের দুটি ইন্দ্রিয়কে কার্যকরী করে তোলে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই মাধ্যমের গুরুত্ব তাই অনেক বেশি।

দূরদর্শন সম্প্রচার অনুষ্ঠানে তোলা শব্দ ও দৃশ্যগুলো প্রথমে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসে (Electromagnic Wave) রূপান্তরিত করা হয়। এই চৌম্বকীয় বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলো যা শব্দ ও দৃশ্যকে বহন করে তা টিভি এন্টেনাতে আঘাত করে এবং টিভি সেট তখন এই সংকেতগুলো গ্রহণ করে ও মূল দৃশ্য ও শব্দে রূপান্তরিত করে। তার ফলেই অনুষ্ঠান পর্দায় দেখা যায়।

বর্তমানে টেলিভিশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত নানাহ অনুষ্ঠান বা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের কোনো ঘটনা বা অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা যায় কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থাকে ডাইরেক্ট ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইট বা DBS বলে। এই ব্যবস্থায় উপগ্রহগুলো থেকে আসা সংকেতগুলো টি ভি সেট সরাসরি গ্রহণ করে। এর জন্য এক বিশেষ ধরনের 'স্যাটেলাইট ডিস' প্রয়োজন হয়। এই স্যাটেলাইট ডিস একটি আউটডোর অর্ধবৃত্তাকার রিফ্লেক্টর এন্টেনা এবং একটি লো-নয়েজ ব্লক কনভার্টার (LNB) দ্বারা এই সংকেতগুলো বহন করে। স্যাটেলাইট গ্রাহকযন্ত্র এই সংকেতগুলোর অর্থোদ্ধার করে টেলিভিশন সেটে দর্শনের উপযোগী করে তোলে। স্যাটেলাইট গ্রাহকযন্ত্র বা সেট-টপ-বক্স (Satellite

Receiver or Set-Top-Box) সংকেত বার্তাকে কাঙ্ক্ষিত ফর্মে রূপান্তরিত করে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন একটি বিস্তৃত পরিসরে পরিষেবা প্রদান করে বিশেষ করে সেই সকল ভূ-প্রাকৃতিক এলাকায় যেখানে ট্যারিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন (Terrestrial Television) কিংবা কেবল টেলিভিশন (Cable TV) অনুপস্থিত।

তথ্য প্রেরণ ও তথ্য সংগ্রহের কাজে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক সিস্টেম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূমি স্টেশন থেকে তথ্য সংকেত উপগ্রহে পাঠানোকে আপলিঙ্ক বলে। আপলিঙ্ক স্যাটেলাইট ডিসগুলো আকারে প্রায় 9 থেকে 12 মিটার (30 থেকে 40 ফিট) ব্যাসের বৃহদাকার হয়। এটি একটি সুনির্দিষ্ট স্যাটেলাইটের দিকে তাক করা থাকে এবং আপলিঙ্ক সংকেত প্রেরণ করা হয় একটি সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে। একইভাবে উপগ্রহ থেকে ওই তথ্য সংকেত পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূমি স্টেশনে পুনরায় ফিরে আসার পদ্ধতিকে ডাউনলিঙ্ক বলে। বিভিন্ন কক্ষপক্ষে তিন ধরনের স্যাটেলাইটকে ঘুরতে দেখা যায়। এগুলো হল — (১) GEO (Geostationary Earth Orbit); (২) LEO (Low Earth Orbit); (৩) MEO (Middle Earth Orbit)। এদের মধ্যে GEO -তে স্থাপন করা স্যাটেলাইট থেকে ভারতবর্ষে শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ ও সংগ্রহ করা হয়।

শিক্ষায় স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ভূমিকা :

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে স্যাটেলাইট টেলিভিশনকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং দেশের জনগণের শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে টেলিভিশনকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোর জন্য স্যাটেলাইটকে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, এই স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিভিন্ন দিকে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সহায়তা করছে। নিম্নে শিক্ষায় স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ভূমিকা আলোচনা করা হল—

(১) সমাজে সকল স্তরের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার ব্যাপারে স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(২) ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে যেখানে অনেক দুর্গম এলাকা রয়েছে, জনসংখ্যার আধিক্য প্রচুর সেখানে স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।

(৩) স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কর্মসূচিগুলো শিক্ষার্থীরা সরাসরি দেখার সুযোগ পায়, তাই এগুলো দীর্ঘদিন তাদের স্মৃতিতে থাকে।

(৪) স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ভিডিও সম্প্রচারের ফলে শিক্ষার্থীরা ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কিভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পাদন করতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে।

(৫) শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরিবেশন করার জন্য ঠিক যে জায়গাটিতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করার দরকার, সে জায়গাটি বিস্তৃত করা হয় ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে।

(৬) শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার গুণগত মানোন্নয়নে স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিশেষভাবে সহায়তা করে। যেমন একাধিক বিষয়কে পাশাপাশি দেখিয়ে তুলনা করা হয়, আবার অনেক সময় একাধিক অংশকে আলাদা করে অথবা প্রয়োজনমত মিশিয়ে দেখানো হয়।

ইন্টারনেট (Internet) :

সারা বিশ্বের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়, যার সুফল হিসাবে বাড়িতে কম্পিউটারের পর্দায় পাওয়া যায় বিশ্বের বা মহাবিশ্বের নানান খবরাখবর; আর সেই বিস্ময়কর অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনা ইন্টারনেট। ইন্টারনেট এমন একটি উন্নতমানের ব্যবস্থা যার সাহায্যে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প খরচে বিশ্বের যে-কোনো অংশে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের আদান প্রদান সহজ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাড়িতে কম্পিউটারের পর্দায় ইন্টারনেট সংযোগের সাহায্যে ব্যক্তি চোখের সামনে দেখতে পায় কোনো আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত অথবা লক্ষ মাইল দূরের কোনো হাসপাতালের জটিল অপারেশন অথবা খুঁজে পাওয়া যায় নানান তথ্য, ছবি যা একজন ব্যক্তির পক্ষে দেখা বা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়িতে যদি কম্পিউটারের সঙ্গে একটি ছোট্ট যন্ত্র 'মোডেম' (Modem) থাকে, আর একটি টেলিফোন কানেকশানের সঙ্গে ইন্টারনেট কানেকশান থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে বাড়িতে বসেই বিশ্বকে পাওয়া যায়।

ইন্টারনেট হল বিশ্বের সবথেকে বড় নেটওয়ার্ক। ইন্টারনেট কথাটির অর্থ হল Inter Connected Network. এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করে থাকে এবং সেক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সংযোগ ব্যবস্থা। ইন্টারনেটের সাহায্যে যে-কোনো তথ্য সম্পর্কে খুব দ্রুত ধারণা পাওয়া যায়। প্রত্যেক তথ্যের জন্য যে চিহ্ন বা তালিকা থাকে তাকে 'সাইট' বলে। বিভিন্ন বিষয়ের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন নাম বা নম্বর থাকে। তবে প্রত্যেকটি সাইট শুরু হয় w.w.w দিয়ে। w.w.w কথার অর্থ হল World Wide Web বা বিশ্বব্যাপী বিস্তার। বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা অর্ধেকের বেশি জনগণ (51%) ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এককথায় ইন্টারনেট ব্যক্তির কাছে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করেছে।

1960 এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রথম ইন্টারনেটের ধারণা প্রকাশ করে ARPANET এর মাধ্যমে। ARPANET-এর সম্পূর্ণ নাম হল Advanced Research Project Agency Network। 1969 সালের প্রথমদিকে তাদের বার্তা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রবার্ট ইলিয়ট কান (Robert Elliot Kahn) এবং ভিনটন গ্রে সার্ফ (Vinton Grey Cerf) এই প্রযুক্তির আরও উন্নতি সাধন করে ট্রান্সমিশান কনট্রোল প্রোটোকল (Transmission Control Protocol) এবং ইন্টারনেট প্রোটোকল (Internet Protocol) তৈরি করে। যার মাধ্যমে আরও সহজভাবে ও দ্রুততার সাথে তথ্য পাঠানো সম্ভব হয়। ARPANET এই প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে 1983 সালে। তারপর থেকেই শুরু হয় ইন্টারনেটের আধুনিক সংস্করণ অনলাইন পরিসেবা (Online Services)। যখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো তথ্য পাঠানো হয়, তখন এটিকে Transmission Control Protocol (TCP) বিভিন্ন প্যাকেটে ভেঙে নেয় এবং এই প্যাকেটগুলোকে স্থানীয় নেটওয়ার্কে পাঠায় অনলাইন পরিসেবার জন্য। এখান থেকে সেগুলো বিভিন্ন স্তরের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছায়। উপযুক্ত গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর পর এগুলোকে পুনরায় জোঁড়া লাগিয়ে সঠিক আকারে (Original Form) আনা হয়, যাতে গ্রাহকরা তা দেখতে পায় ও ব্যবহার করতে পারে। আর প্যাকেটগুলো সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে কিনা তা পুরো দায়িত্ব নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে Internet Protocol.

1990 -এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ইন্টারনেট সংস্কৃতি শিক্ষা শিল্প, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিতে মূলত বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলেছে। বৈদ্যুতিক মেইল, তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরণ, ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল (VOIP), ইন্টারেক্টিভ ভিডিও কল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর আলোচনার ফোরাম, ব্লগ, সামাজিক নেটওয়ার্কিং এবং অনলাইন শপিং সাইটগুলো মানুষের জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করছে।

শিক্ষায় ইন্টারনেটের ভূমিকা :

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে তাঁরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাহিত্য, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অভিধান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাবলি অতি সহজে সংগ্রহ করতে পারছে। গবেষক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে। নিম্নে শিক্ষায় ইন্টারনেটের ভূমিকা আলোচনা করা হল—

১) শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে না গিয়েও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন কোর্সের পাঠ শেষ করছে। কোর্সের পঠন ও পরীক্ষা ইন্টারনেটের মাধ্যমে হচ্ছে।

২) ইন্টারনেটের একটি বড়ো সুবিধা হল লাইব্রেরির সুযোগ লাভ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরির প্রয়োজনীয় বই এর কার্ড, ক্যাটালগ প্রভৃতি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

৩) বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য ইন্টারনেটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪) শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ব্যাপারে ইন্টারনেট সহায়তা করে। ভারতবর্ষে এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে অনলাইনে ভর্তির সুযোগও রয়েছে।

৫) ইন্টারনেটের মাধ্যমে একজন শিক্ষক একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষার্থীদের একত্রে শিক্ষা ও তথ্য প্রদান করতে পারে।

৬) ই-মেইল ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প খরচে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটের মূল ভিত্তি হল ই-মেইল। ই-মেইল কথার অর্থ হল ইলেকট্রনিক মেইল। অত্যন্ত কম সময়ে সংবাদ আদান প্রদান অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে করা সম্ভব ই-মেইল এর মাধ্যমে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো সম্ভব।

৭) বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দূরাগত শিক্ষা একটা বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করছে। আর দূরাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েও শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তু প্রেরণ করে থাকে। আবার অনেকসময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্য টেলি ও ভিডিও কনফারেন্সের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শোনানো হয়।

৮) বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পযর্ন্ত পাঠ্যক্রমে প্রকল্প প্রণয়নের কাজকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব সহজে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, ছবি

সংগ্রহ করতে পারছে। সবশেষে বলা যায়, বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য অবদান মানুষের জীবনের যে এক স্থান অধিকার করে নিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উপসংহার (Conclusion):

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি শিক্ষার্থীদের সামনে এক নতুন দ্বারা উন্মোচিত করেছে। শিক্ষাপ্রযুক্তি শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতি প্রয়োগ করে, শিখন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে, নতুন শিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, বিভিন্ন শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষাকে সহজ সম্পূর্ণ, স্থায়ী ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণকে অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার জন্য টেলিভিশন, এডুসেট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং স্তরে বিকাশ প্রক্রিয়াকে অধিকতর সহজ ও দ্রুততর করে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি সাধন করছে, আগামী দিনগুলোতে শিক্ষায় প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ভূমিকা উত্তরোত্তর বিস্তৃততর হবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চতুর্থ একক

যোগাযোগ: অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

(Communication: Meaning, Nature, Types, Barriers in Communication)

ভূমিকা (Introduction):

জীবজন্তু বা প্রাণীকূল কথা বলতে পারেনা। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এমনকি বক্তব্য আদান প্রদানও করে। মানুষও একসময় পশু বা জন্তুদের মতোই কথা বলতে পারত না। কোনও ভাষার ব্যবহার তারা তখনও জানত না। আদিম মানুষেরা কখনও চিৎকার করে, কখনও বা বিশেষ ধরনের শব্দ সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত, বক্তব্যের আদান প্রদান করত। ধীরে ধীরে মানুষ প্রথমে কথা বলতে ও লিখতে শিখে। তারপর একে অন্যের কাছে নিজের কথা, ভাবনা, চিন্তা ও তথ্য আদান প্রদানের জন্য ভাষা ও লেখাকে ব্যবহার করতে শুরু করে।

কাছাকাছি যারা থাকত তারা এভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে লাগল। কিন্তু যারা দূরে থাকে তাদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রাখা হবে? মানুষ তখন পায়রাকে ডাকপিত্তনের কাজে লাগাতে শুরু করে। এমনকি মোঘল যুগেও বার্তা বাহক হিসাবে পায়রাকে ব্যবহার করা হত ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু ডাক ব্যবস্থা চালু হলেও সবজায়গায় ডাকের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদান করা যায়নি। তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ডাক ব্যবস্থার পাশাপাশি চিঠি পাঠানোর জন্য উড়ন্ত প্রাণীকে ব্যবহার করা হত। এরপর 1837 সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য সাফল্যের ফলে সৃষ্টি হল এক নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা-বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ। এটি বিদ্যুতের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে বার্তা পাঠানোর এক বিস্ময়কর যন্ত্র। যোগাযোগ ব্যবস্থার এরপর দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। 1876 সালে আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল আবিষ্কার করলেন টেলিফোন। এই মাধ্যমের সাহায্যে স্বর ও শব্দ দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে দেওয়া যায়। 1895 সালে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কোনী (Marconi) আবিষ্কার করলেন 'ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ' বা বেতার লিখন। এই যন্ত্র বা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তারের সাহায্য ছাড়াই দূরবর্তী স্থানে বার্তাকে পাঠানো যায়। এরপর যোগাযোগ ব্যবস্থায় এল রেডিও টেলেক্স, তারপর এল টেলিভিশন। আবার পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোতে বার্তা, দৃশ্য বা ছবি সরাসরি পৌঁছে দেবার জন্য ছোটো ছোটো বেতার তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভের সাহায্য নিয়ে চালু হয়েছে স্যাটেলাইট কানেকশন বা উপগ্রহ সংযোগ। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে এই যন্ত্র পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীর এক প্রান্তের দৃশ্য, বার্তা, তথ্য পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষের কাছে সরাসরি ও দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মাইক্রোইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছে। জটিল ও সময়সাপেক্ষ অঙ্ক, সমস্যা, হিসাব এবং তথ্য

সহজেই নির্ভুলভাবে সমাধান করে দিচ্ছে কম্পিউটার।

যোগাযোগ বা সংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো আজ আমাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে এবং প্রতিদিনই বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের গবেষণার প্রতিটি আবিষ্কৃত যন্ত্র বা মাধ্যম আরও নিখুঁত, আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ও আরও কার্যকারী মাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই এককে যোগাযোগের অর্থ প্রকৃতি, প্রকারভেদ ও যোগাযোগের পথে কি কি বাধা রয়েছে সেগুলো আলোচনা করা হবে।

অর্থ (Meaning):

যোগাযোগ বা Communication কথাটি ল্যাটিন শব্দ 'Communicare' থেকে এসেছে যার অর্থ হল 'To share' অর্থাৎ কোনো কিছু অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। প্রত্যেক মানুষের কিছু চিন্তা, ধারণা বা অনুভূতি থাকে যা সে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। এর জন্য সে বিশেষ কতকগুলো অঙ্গভঙ্গি, ভাষা বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে। সাধারণভাবে চিন্তাধারা, ধারণা বা অনুভূতির এই সঞ্চারন বা সঞ্চালনকে যোগাযোগ বা Communication বলে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় চারটি উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেগুলোর আন্তঃক্রিয়ায় যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেগুলো হল প্রেরক বা উৎস (Sender or Souce), বার্তা বা সংকেত (Message or Signal), মাধ্যম (Medium or Channel) এবং প্রাপক বা গ্রাহক (Recipient or Destination)। প্রেরক প্রথমে তার চিন্তাভাবনা, তথ্য বা অনুভূতি সঞ্চালনের জন্য শব্দ, বাক্য, চিত্র বা প্রতীক নির্বাচন করে তা গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করেন। এবার গ্রাহক সেগুলোর অর্থ উপলব্ধি করে প্রেরকের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। তিনিও শব্দ বাক্য বা প্রতীকের সাহায্যে প্রেরককে জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করেছেন। এটিকে পশ্চাৎ উপলব্ধি বা Feedback বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রে এই বার্তা ব্যক্তি মারফৎ না হয়ে রেডিও টেলিভিশন, ফিল্ম, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে পারে। নিম্নে এটি একটি চিত্ররূপের সাহায্যে দেখানো হল—

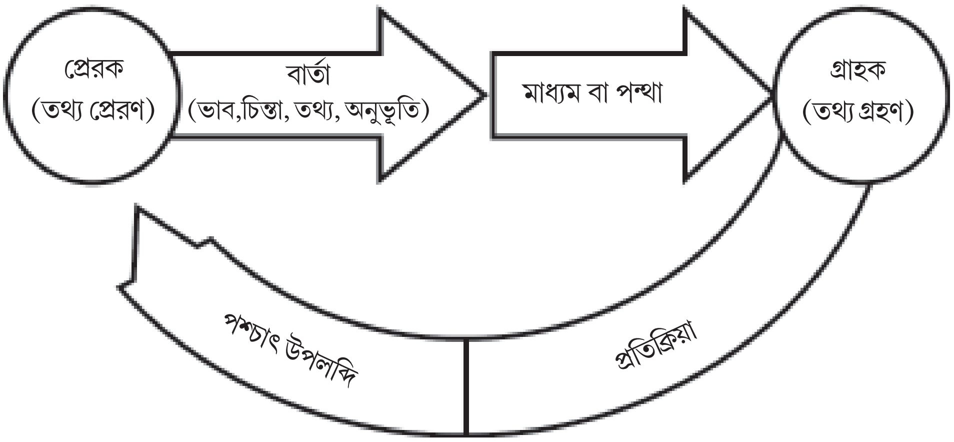

চিত্র : যোগাযোগ প্রক্রিয়া (Communication Process)

যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রেরকের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গ্রাহক বা প্রাপকের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রেরক মৌখিক বা অমৌখিকভাবে সংকেত বা বার্তা প্রেরণ করে। এর উদ্দেশ্য গ্রাহকের মধ্যে একটি সাড়া বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। আর যে নির্দিষ্ট উপায়ে এই বার্তা সঞ্চালিত হয় তাকে বলা হয় মাধ্যম বা চ্যানেল। এই মাধ্যম বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন— শব্দ, সংকেত, ভঙ্গি, ছবি, চাক্ষুষ দর্শন, মুদ্রিত বস্তু, সম্প্রচার, ফিল্ম ইত্যাদি। গ্রাহক যখন প্রেরকের বার্তা গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রেরকের নিকট সাড়া দিয়ে বার্তা পাঠান। এটিকে বলা হয় বার্তার প্রত্যাবর্তন। এর থেকে বলা যায় যোগাযোগ হল ঐক্যমত হওয়া, চিন্তাধারা, ভাব, অনুভূতি, সেন্টিমেন্ট ইত্যাদি সঞ্চালন করা বা বিনিময় করা, তথ্য আদান প্রদান করা।

সংজ্ঞা (Definition):

১) নিউম্যান এবং সামার (Newman And Summer) -এর মতে যোগাযোগ হল এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ধারণা, তথ্য, মতামত বা আবেগের বিনিময়। (Newman and Summer - Communication as an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons.)

২) অধ্যাপক লুইস অ্যালেন (Louis Allen) - এর মতে অন্য ব্যক্তির মনের মধ্যে উপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে একজন ব্যক্তি যা কিছু করেন তাই হল যোগাযোগ। এটি অর্থ প্রকাশের একটি সেতু। এটি কথা বলা, শোনা এবং বোঝার একটি নিয়মতান্ত্রিক ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। (Louis Allen - Communication is the sum total of all the things one person does when he wents to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding.)

৩) কুন্টজ এবং ওয়েইরিচ- যোগাযোগ হল প্রেরকের কাছ থেকে কোনোও তথ্য প্রেরণকারীর কাছে স্থানান্তরিত করা এবং সেই তথ্যটি প্রাপক দ্বারা উপলব্ধ হওয়া। (Koontz and Weihrich- Communication is the transfer of information from a sender to a receiver, with the information being understood by receiver.)

৪) টেরি এবং ফ্র্যাঙ্কলিন- ব্যক্তিসমূহের মধ্যে বোধগম্যতার বিকাশ ও উপলব্ধি অর্জনে একটি শিল্প হল যোগাযোগ। এটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য এবং অনুভূতি আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। (Terry And franklin- Communication is the art of developing and attaining understanding between people. It is the Process of exchanging information and fellings between two or more people and it is essential to effective management.)

প্রকৃতি (Nature):

যোগাযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য, সংবাদ, আদেশ, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সঞ্চালিত করা হয়। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে কথিত কথা বা নীরবতার মাধ্যমে, শারীরিক ভাষা বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা, মুখের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির দ্বারা; লিখিত শব্দসমূহ; গ্রাফিক্স; গান; চিত্রকলা এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে। যোগাযোগ একটি

দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অর্থাৎ প্রেরক ও গ্রহণকারীর মধ্যে বোঝাপড়ার একটি প্রক্রিয়া। প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগ তাদের মেজাজ ও আচরণের উপর নির্ভর করে। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়। যোগাযোগের জন্য কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হয়। এটি ঊর্ধ্বতন কর্মী, অধস্তন কর্মী, বন্ধু, আত্মীয় সবার সঙ্গেই হতে পারে। যোগাযোগের মাধ্যমে তারা তাদের ধারণা ও মতামত বিনিময় করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করলে সমন্বয় সৃষ্টি হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানশিক্ষক থেকে সহশিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী, সকলেই এই সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেন এবং তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত যোগাযোগ। আবার শিক্ষামন্ত্রক বা শিক্ষাদপ্তরের বিভিন্ন নির্দেশ প্রধান শিক্ষকদের মেনে চলতে হয়। এইভাবে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে বিষয়টির পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিকাশ করলে যোগাযোগ কার্যকর হয়। যোগাযোগ লক্ষ্যভিত্তিক। গ্রাহক ও প্রেরকের মধ্যে যদি যোগাযোগ ভাল থাকে তাহলে উদ্দেশ্যটি সহজে অর্জন করা যায়। তবে পারস্পরিক মনোযোগের অভাব, সঠিক অর্থ বুঝতে না পারা, আবেগ অনুভূতিমূলক বাধা থাকলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অকার্যকর হয় এবং তারা উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। যোগাযোগকে কার্যকরী করতে হলে প্রেরক যে বার্তা পাঠাতে চাইছেন, সেটিতে তিনি প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করবেন। গ্রাহক এই সংকেতগুলোর সঠিক অর্থ অনুধাবন করবেন এবং উপযুক্তভাবে সাড়া দিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। পরিশেষে বলা যায় উপযুক্ত ও সুষ্ঠু যোগাযোগের ফলে সকলের মধ্যে কাজের আগ্রহ ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং কাজে সন্তুষ্টি আসে।

প্রকারভেদ (Types):

যোগাযোগ মূলত দুই ধরনের হয়। ১) বাচনিক যোগাযোগ (Verbal Communication); ২) অবাচনিক যোগাযোগ (Non-verbal Communication)। কিন্তু ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে যোগাযোগের আরও কতকগুলো ধরন লক্ষ করা যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল—

১) বাচনিক যোগাযোগ (Verbal Communication):

কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যখন কথা বলা হয় তখন শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার যখন কোনো লিখিত তথ্য পাঠাই তখনও শব্দকে ব্যবহার করা হয়। এই উভয় বিষয়টি বাচনিক যোগাযোগের অন্তর্গত। সাধারণত এই ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কথা বলা এবং লেখার ক্ষেত্রে এমনসব শব্দ ব্যবহৃত হয় যাতে সমাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল জনগণেরই বোধগম্য হয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বাচনিক যোগাযোগের উপর জোর দেওয়া হয়। এই ধরনের যোগাযোগ প্রত্যেকের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য এই যোগাযোগকেই প্রথম এবং প্রধান উপায় বলে বিবেচনা করা হয়। বাচনিক যোগাযোগ দুই ধরনের হয়— ক) মৌখিক যোগাযোগ (Oral Cummunication), খ) লিখিত যোগাযোগ (Written Communication)।

ক) মৌখিক যোগাযোগ (Oral Cummunication): যোগাযোগের সকল মাধ্যমগুলোর মধ্যে মৌখিক যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছে। এই ধরনের যোগাযোগ খুবই কার্যকর। এটি সাক্ষাতে, টেলিফোনে বা সভাসমিতি মারফৎ হতে পারে। এই জাতীয় যোগাযোগ খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় এবং এতে প্রত্যক্ষ

দর্শনের সুবিধা পাওয়া যায়, তাই এর দ্বারা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব বাড়ে।

খ) লিখিত যোগাযোগ (Written Communication): চিঠিপত্র, পুস্তিকা, টেলিগ্রাফ, ফ্যাক্স ও ই-মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরিত হয় তখন তাকে লিখিত যোগাযোগ বলে। যেসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন তথ্যাদির আদান প্রদান করা হয় এবং যার দীর্ঘকালীন তাৎপর্য থাকে সে ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ কার্যকর।

২) অবাচনিক যোগাযোগ (Non-verbal Communication):

অবাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শব্দের পরিবর্তে সংকেত ব্যবহার করা হয়। এখানে গ্রাহক এই বার্তা সংকেত সম্বন্ধে জানে এবং সঠিক সময়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যেমন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শান্ত করার জন্য হাত তুলে ইশারা করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অবাচনিক সংযোগ বাচনিক সংযোগকে সহায়তা করে। এই সংযোগে শিক্ষার্থীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, মুখের অভিব্যক্তি, সঠিক স্থানে দাঁড়ানো, কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণ, ভঙ্গিমা ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রাখতে হয়।

৩) অন্তঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ (Intrapersonal Communication):

অন্তঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ হল যোগাযোগকারীর ভাষা বা চিন্তার অভ্যন্তরীণ ব্যবহার। যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের সঙ্গে অর্থাৎ নিজ সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে আন্তঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ বলে। যেমন– চিন্তা করা, সমস্যা সমাধান করা, ডায়েরি (দিনলিপি) লেখা ইত্যাদি।

৪) আন্তঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ (Interpersonal Communication):

আন্তঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের যোগাযোগ এমন ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পন্ন হয় যাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে। টেলিফোনে কথাবার্তা, সাক্ষাৎকার, চায়ের দোকানে বন্ধুদের মধ্যে কথাবার্তা ইত্যাদি এই যোগাযোগের উদাহরণ।

৫) দলগত যোগাযোগ (Group Communication):

দলগত যোগাযোগ কোনো সংস্থার নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে এবং দল অথবা গোষ্ঠীর কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগকে বোঝায়। এই দলগুলো ছোটোও হতে পারে, বড়োও হতে পারে। এই দলগত যোগাযোগের মাধ্যমগুলো হল সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ডিজিটাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, বক্তৃতা ইত্যাদি।

৬) গণ যোগাযোগ (Mass Communication):

গণ যোগাযোগ হল গণমাধ্যমের দ্বারা জনসংখ্যার একটা বড় অংশে তথ্য সরবরাহ ও আদান প্রদানের প্রক্রিয়া। এই ক্ষেত্রে এক সঙ্গে অনেক ব্যক্তির কাছে বার্তা প্রেরণ করা যায় এবং প্রাপক হয় একটি বৃহৎ জনসংখ্যা— যেমন, জলসা, যেখানে হাজার লোক একসঙ্গে গান শুনছে।

৭) নিম্নমুখী যোগাযোগ (Downward Communication):

যখন প্রশাসক বা উচ্চস্তর থেকে যোগাযোগ নিম্নস্তরে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ আদেশ ও নির্দেশ যখন উর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষ থেকে অধস্তন কর্মীর কাছে উপর থেকে নীচে নামে, তখন তাকে নিম্নমুখী যোগাযোগ বলে।

৮) ঊর্ধ্বমুখী যোগাযোগ (Upward Communication):

যোগাযোগ যখন অধস্তন কর্মীদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট নীচ থেকে উপরে প্রবাহিত হয় তখন তাকে 'ঊর্ধ্বতন যোগাযোগ' বলে। এর সাহায্যে অধস্তন কর্মচারীরা তাদের মতামত, সুপারিশ, অভাব, অভিযোগ, বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গোচরে আনে। এই ধরনের যোগাযোগ খুবই কার্যকর।

৯) আনুভূমিক যোগাযোগ (Horizontal Communication):

যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তখন তাকে আনুভূমিক যোগাযোগ বলে। বিভিন্ন কলকারখানার ম্যানেজার, বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা প্রভৃতির মধ্যে এই নিয়মে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

যোগাযোগের বাধাসমূহ (Barriers in Communication) :

উপরে উল্লিখিত যোগাযোগের বিভিন্ন প্রকারভেদগুলো আলোচনার পর একটা কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যদি প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সব কিছু স্বাভাবিক থাকে তাহলে যোগাযোগ কার্যকর হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রেরক ও গ্রাহকের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা বা বাধা দেখা দেয়। নিম্নে এই বাধাগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হল—

১) শব্দার্থক বাধা (Semantic Barriers): শব্দার্থক বাধা বলতে শব্দের বিভিন্ন অর্থের কারণে এবং যোগাযোগে ব্যবহৃত অন্যান্য প্রতীকগুলোর কারণে উত্থাপিত প্রেরক ও গ্রহণকারীর মধ্যে ভুলবোঝাবুঝিকে বোঝায়। এই বাধা সাধারণত উত্থাপিত হয় যখন তথ্যগুলো সহজ ভাষায় থাকেনা এবং যেই শব্দ বা চিহ্নগুলো থাকে সেগুলোর একাধিক অর্থ থাকে। আবার অনেক সময় বার্তায় ব্যবহৃত ভাষাটি এতই জটিল থাকে যে এটি প্রাপক দ্বারা ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রতিটি বার্তা ব্যক্তি তার জ্ঞান ও বুদ্ধির নিরিখে বিচার করে। কখনও কখনও প্রেরক অনুভব করে যে প্রাপক অবশ্যই এটি সম্পর্কে জানবে এবং কেবলমাত্র এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করবে। তবে এই বার্তার ক্ষেত্রে যদি প্রাপকের অনুমানগুলো অস্পষ্ট এবং অজানা থাকে তাহলে যোগাযোগটি বিরূপ প্রভাবিত হতে পারে। তাই যোগাযোগের বার্তা সহজ, সরল ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

২) শারীরিক বাধা (Physical Barriers): যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রেরক ও গ্রাহকের শারীরিক অবস্থা ও পরিবেশ বাধার সৃষ্টি করে। এখানে প্রেরক অথবা গ্রাহক দুজনের মধ্যে যে-কোনো একজন যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে তাহলে বার্তাটি বিকৃত হতে পারে। আবার অন্যদিকে মৌখিক যোগাযোগের সময় যদি কোনো গোলমাল থাকে এবং লিখিত যোগাযোগের সময় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো না থাকে অথবা যে মাধ্যমের সাহায্যে যোগাযোগ করা হচ্ছে তার মধ্যে যদি কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় সেক্ষেত্রেও বার্তাটি বিকৃত হতে পারে।

৪) অস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি (Ambiguious Expression): যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বার্তাটিতে যদি অস্বচ্ছ গ্রাফিক্স এবং অস্পষ্ট প্রতীক বা সংকেত ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তাই যোগাযোগের বার্তা সহজ, সরল, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া প্রয়োজন।

৫) সাংগঠনিক বাধা (Organization al Barriers): যোগাযোগের সাংগঠনিক বাধা সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন জটিলতার কারণে সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা যায় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই তাদের বার্তা, মাধ্যম এবং যোগাযোগের পদ্ধতি নির্বাচনের ব্যাপারে কঠোর নিয়মনীতি চালু করে। আর এই কঠোর নিয়মের কারণে কর্মীরা কোনোও বার্তা পাঠানো থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মী বিভিন্ন কারণে সব বার্তা খোলাখুলি প্রেরণ করেনা এবং অধস্তন কর্মীও তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করতে পারেনা, তাই বার্তার বিকৃতি ঘটে।

৬) অমনোযোগিতাজনিত বাধা (Barriers related to attention): অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহক যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বার্তা গ্রহণ করেনা। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে প্রেরক যার উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়না অথবা প্রেরক তাদের সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ বোধ করেনা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য কাজে গাফিলতি রয়ে গেছে।

৭) দূরত্বের বাধা (Distance Barriers): যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্ব অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে দূরত্বের কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন চিঠিপত্র যদি সঠিক সময়ে না পৌঁছায় অথবা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছালে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের সমস্যা দেখা দেয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে, যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা সম্ভব নয় তবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপাদানগুলোকে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তাহলে কিছুটা হলেও এই বাধাগুলোকে অপসারণ করা সম্ভব হবে। যেমন যোগাযোগ প্রক্রিয়াতে পারস্পরিক বোধগম্য ও দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। সময় ও চ্যানেল যথোপযুক্ত হতে হবে। যোগাযোগের বার্তা গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণের উপযোগী হবে। যোগাযোগের বিষয়বস্তু অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হবে। সবশেষে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে অবিরত প্রেষণা সঞ্চার ঠিক রাখতে হবে।

উপসংহার (Conclusion):

যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে একটি পৃথক পদ্ধতি হিসাবে ধরা যেতে পারে। এতে একজন অন্যজনের মনকে, চিন্তাধারাকে বা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বার্তাকে এমনভাবে অর্থযুক্ত করতে হবে যাতে প্রাপক তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রেও সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যৌথভাবে কাজ করতে পারে। আজকাল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অল্প সময়ে বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর নিকট বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব। ফলে শিক্ষা আর মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। উন্নততর মাধ্যমের সহায়তায় বার্তা এখন ব্যাপকতর ও অধিকতর কার্যকরীভাবে প্রেরণ করা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ (Summary)

প্রথম একক

প্রযুক্তিবিদ্যা: অর্থ, ধারণা, শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা

প্রযুক্তি কাকে বলে?

শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে প্রযুক্তি বলতে কি বোঝায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নিয়মনীতিগুলো মানুষের জীবনকে সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আরামদায়ক করে তুলে তাকে বলা হয় প্রযুক্তি। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে, স্বল্প প্রচেস্টার মাধ্যমে ফল লাভ করার উপায়কে বলা হয় প্রযুক্তি। 'প্রযুক্তি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Technology'। 'Technology' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হল 'Technic' -যার অর্থ হল শিল্প বা দক্ষতা। আর অপর শব্দটি হল 'Logia' -যার অর্থ হল বিজ্ঞান বা অধ্যয়ন। অর্থাৎ প্রযুক্তি বলতে বোঝায় 'কোনো শিল্প বা দক্ষতার অধ্যয়নের বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের তত্ত্বগত জ্ঞানের প্রয়োগগত বৃহত্তর ক্ষেত্র হল প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল পরিসরে আছে কৃষি, শিল্প, মহাকাশ গবেষণা, এয়ারলাইন্স প্রভৃতি। প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের উপর দেশের অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল।

অর্থ (Meaning):

বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে বাচার লক্ষ্যে, জীবনকে উন্নয়নমুখী করার উদ্দেশ্যে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করতে, শিক্ষাকে লক্ষ্যাভিমুখী করা হয়েছে। আজ শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। তার মধ্যে একটি হল প্রযুক্তিবিদ্যার্জন। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার অন্যতম কারিগর হল প্রযুক্তিবিদ্যা। আবার প্রযুক্তিবিদ্যাই শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে তাকে কর্মক্ষম করে তোলে। প্রযুক্তিবিদ্যাই যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতমানের মানবসম্পদ উপহার দিয়ে থাকে। বর্তমানে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার এত বিস্তৃতি লাভ করেছে যে শিক্ষা প্রযুক্তি পৃথকভাবে অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান হল 5টি 'M' এর সমন্বয়। এগুলো হল Man (মানুষ), Machine (মেশিন), Materials (বস্তুসামগ্রী), Media (মাধ্যম) এবং Methods (পদ্ধতি)। এই পাঁচটি একত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্যপূরণে সহায়তা করে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে পরিচালনা করা যায়। শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী তাই প্রযুক্তিবিদ্যাও উদ্দেশ্যমুখী। শিক্ষা প্রযুক্তি শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, মূল্যায়ন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয় একক

শিক্ষণ প্রদীপন — প্রক্ষেপণমূলক এবং অপ্রক্ষেপণমূলক শিক্ষণ প্রদীপন

শিক্ষণ প্রদীপন (Teaching Aids):

আধুনিককালে শিক্ষণের এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য ভাষামূলক সংকেতের সঙ্গে শ্রেণি শিক্ষণের সময় বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এই কৌশলগুলোকে বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপন (Tesching Aids) বা শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Teaching Appliancc)। অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায়, যে সমস্ত বস্তু বা কৌশলের সাহায্যে পরিপূর্ণ সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলা যায়, তাদের বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপন। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে সাধারণভাবে পাঠদানের জন্য শিক্ষকের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে কিছু সাধারণ উপকরণের প্রয়োজন হয় যেমন, পাঠ্যপুস্তক (Text Book), বোর্ড (Board), চক্ (Chalk), ঝাড়ন (Duster) ইত্যাদি। এই উপকরণগুলো শিক্ষকের ভাষামূলক সীমিত ক্ষমতা অতিক্রম করতে সহায়তা করে এবং শিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নে সহায়তা করে। এখানে শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষণ উপকরণ শব্দ দুটি প্রায় সম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণ প্রদীপন শব্দটি শিক্ষণ উপকরণ থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই বৃহত্তর অর্থে উপকরণ প্রদীপনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রক্ষেপনমূলক প্রদীপন (Projected Teaching Aids):

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের চিত্র এবং প্রকৃত বস্তু বা তার প্রতিরূপ শিক্ষণ প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পাঠ্যবিষয়বস্তুর আলোচনাকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য শিক্ষণকে আরও কার্যকর করার জন্য শিক্ষক এই সব বস্তুর ছবি বা ফটোগ্রাফ প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে দেওয়াল পর্দার উপর ফেলে দেখতে পারেন। এ পদ্ধতিতে প্রদীপন আরও অনেক বেশি নিখুঁত ও জীবন্ত হয়ে উঠে।

অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপণ (Non Projected Teaching Aids):

অপ্রক্ষেপণমূলক প্রদীপণ কোনরকম কৌশল ছাড়াই শ্রেণি শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাই এইগুলোর প্রয়োজনীয়তা সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান। প্রত্যেকটি প্রদীপনের নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাদের ব্যবহার বিধিও ভিন্ন ধরনের।

তৃতীয় একক

শিক্ষায় প্রযুক্তি: এডুস্যাট, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টারনেট

এডুসেট (Edusat):

এডুকেশন স্যাটেলাইট বা EDUSAT হল ভারতের প্রথম শিক্ষা উপগ্রহ। এটি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (Indian Space Research Organisation) অধীনস্থ একটি প্রকল্প। এর মাধ্যমে দেশের কিছু

বিশেষ নির্বাচিত স্থানে বিভিন্ন স্টেশনকে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আর এই স্টেশনগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ থাকে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষণ প্রান্তরূপে কাজ করে। এটি কেবল শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে পরিবেশন করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

শিক্ষাসংক্রান্ত উপগ্রহটি প্রথম বঙ্গোপসাগরের একটি ছোট দ্বীপ শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে 2004 সালের 20 সেপ্টেম্বর মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এটি ভারতের তৈরি রকেট GSLV- এর সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উপগ্রহটির ওজন ছিল 1950 কে.জি. এবং এটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে 180 কিলোমিটার দূরত্বে জিওট্রান্সফার অরবিট - এ স্থাপন করা হয়। এডুসেটটির প্রকল্পিত আয়ুষ্কাল হল 7 থেকে 10 বছর। এটি মূলত শ্রবণ দর্শন মাধ্যম, ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ক্লাস এবং মাল্টিমিডিয়া ও মাল্টিসেন্ট্রিক পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে। এটি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এহং শিক্ষার উচ্চতর স্তরের ক্ষেত্রে প্রথাবর্জিত শিক্ষার জন্য ও বিকাশমূলক সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

স্যাটেলাইট টেলিভিশন (Satellite Telivision):

দূরদর্শন হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক অত্যাশ্চর্য দান। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী, তথ্যবহুল এবং জনপ্রিয় একটি গণমাধ্যম। দূরদর্শন হল এমন একটি মাধ্যম যেখানে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। যার ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসবে এর ব্যবহার ব্যাপকহারে হচ্ছে। এই মাধ্যম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করার কারণ হল যে এটি একটি দর্শন ও শ্রুতিনির্ভর মাধ্যম। এটি একইসঙ্গে মানুষের দুটি ইন্দ্রিয়কে কার্যকরী করে তোলে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই মাধ্যমের গুরুত্ব তাই অনেক বেশি।

দূরদর্শন সম্প্রচার অনুষ্ঠানে তোলা শব্দ ও দৃশ্যগুলো প্রথমে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভসে (Electromagnic Wave) রূপান্তরিত করা হয়। এই চৌম্বকীয় বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলো যা শব্দ ও দৃশ্যকে বহন করে তা টিভি এন্টেনাতে আঘাত করে এবং টিভি সেট তখন এই সংকেতগুলো গ্রহণ করে ও মূল দৃশ্য ও শব্দে রূপান্তরিত করে। তার ফলেই অনুষ্ঠান পর্দায় দেখা যায়।

বর্তমানে টেলিভিশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত নানাহ অনুষ্ঠান বা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের কোনো ঘটনা বা অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা যায় কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থাকে ডাইরেক্ট ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইট বা DBS বলে। এই ব্যবস্থায় উপগ্রহগুলো থেকে আসা সংকেতগুলো টি ভি সেট সরাসরি গ্রহণ করে। এর জন্য এক বিশেষ ধরনের 'স্যাটেলাইট ডিস' প্রয়োজন হয়। এই স্যাটেলাইট ডিস একটি আউটডোর অর্ধবৃত্তাকার রিফ্লেক্টর এন্টেনা এবং একটি লো-নয়েজ ব্লক কনভার্টার (LNB) দ্বারা এই সংকেতগুলো বহন করে। স্যাটেলাইট গ্রাহকযন্ত্র এই সংকেত গুলোর অর্থোদ্ধার করে টেলিভিশন সেটে দর্শনের উপযোগী করে তোলো। স্যাটেলাইট গ্রাহকযন্ত্র বা সেট-টপ-বক্স (Satellite Receiver or Set-Top-Box) সংকেতবার্তাকে কাঙ্ক্ষিত ফর্মে রূপান্তরিত করে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন একটি বিস্তৃত পরিসরে পরিষেবা প্রদান করে বিশেষ করে সেই সকল ভূপ্রাকৃতিক এলাকায় যেখানে ট্যারিস্টরিয়াল টেলিভিশন (Terrestrial Television) কিংবা কেবল টেলিভিশন (Cable TV) অনুপস্থিত।

ইন্টারনেট (Internet) :

সারা বিশ্বের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়, যার সুফল হিসাবে বাড়িতে কম্পিউটারের পর্দায় পাওয়া যায় বিশ্বের বা মহাবিশ্বের নানান খবরাখবর; আর সেই বিস্ময়কর অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনা ইন্টারনেট। ইন্টারনেট এমন একটি উন্নতমানের ব্যবস্থা যার সাহায্যে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প খরচে বিশ্বের যে-কোনো অংশে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের আদান প্রদান সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাড়িতে কম্পিউটারের পর্দায় ইন্টারনেট সংযোগের সাহায্যে ব্যক্তি চোখের সামনে দেখতে পায় কোনো আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত অথবা লক্ষ মাইল দূরের কোনো হাসপাতালের জটিল অপারেশন অথবা খুঁজে পাওয়া যায় নানান তথ্য, ছবি যা একজন ব্যক্তির পক্ষে দেখা বা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়িতে যদি কম্পিউটারের সঙ্গো একটি ছোট্ট যন্ত্র 'মোডেম' (Modem) থাকে, আর একটি টেলিফোন কানেকশানের সঙ্গো ইন্টারনেট কানেকশান থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে বাড়িতে বসেই বিশ্বকে পাওয়া যায়।

ইন্টারনেট হল বিশ্বের সবথেকে বড় নেটওয়ার্ক। ইন্টারনেট কথাটির অর্থ হল Inter Connected Network. এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কের সঙ্গো সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করে থাকে এবং সেক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সংযোগ ব্যবস্থা। ইন্টারনেটের সাহায্যে যে-কোনো তথ্য সম্পর্কে খুব দ্রুত ধারণা পাওয়া যায়। প্রত্যেক তথ্যের জন্য যে চিহ্ন বা তালিকা থাকে তাকে 'সাইট' বলে। বিভিন্ন বিষয়ের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন নাম বা নম্বর থাকে। তবে প্রত্যেকটি সাইট শুরু হয় w.w.w দিয়ে। w.w.w কথার অর্থ হল World Wide Web বা বিশ্বব্যাপী বিস্তার। বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা অর্ধেকের বেশি জনগণ (51%) ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এককথায় ইন্টারনেট ব্যক্তির কাছে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করেছে।

চতুর্থ একক

যোগাযোগ : অর্থ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

অর্থ (Meaning):

যোগাযোগ বা Communication কথাটি ল্যাটিন শব্দ 'Communicare' থেকে এসেছে যার অর্থ হল 'To Share' অর্থাৎ কোন কিছু অন্যের সঙ্গো ভাগ করে নেওয়া। প্রত্যেক মানুষের কিছু চিন্তা, ধারণা বা অনুভূতি থাকে যা সে অন্যের সঙ্গো ভাগ করে নিতে চায়। এর জন্য সে বিশেষ কতকগুলো অঙ্গাভঙ্গি, ভাষা বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে। সাধারণভাবে চিন্তাধারা, ধারণা বা অনুভূতির এই সঞ্চারন বা সঞ্চালনকে যোগাযোগ বা Communication বলে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় চারটি উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেগুলোর আন্তক্রিয়ায় যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেগুলো হল প্রেরক বা উৎস (Sender or Souce), বার্তা বা সংকেত (Message or Signal), মাধ্যম (Medium or Channel) এবং প্রাপক বা গ্রাহক (Recipient or Destination)। প্রেরক প্রথমে

তার চিন্তাভাবনা, তথ্য বা অনুভূতি সঞ্চালনের জন্য শব্দ, বাক্য, চিত্র বা প্রতীক নির্বাচন করে তা গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করেন। এবার গ্রাহক সেগুলোর অর্থ উপলব্ধি করে প্রেরকের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। তিনিও শব্দ বাক্য বা প্রতীকের সাহায্যে প্রেরককে জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করেছেন। এটিকে পশ্চাদ্ উপলব্ধি বা Feedback বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রে এই বার্তা ব্যক্তি মারফৎ না হয়ে রেডিও টেলিভিশন, ফিল্ম, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে পারে।

প্রকৃতি (Nature):

যোগাযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য, সংবাদ, আদেশ, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সঞ্চালিত করা হয়। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে কথিত কথা বা নীরবতার মাধ্যমে, শারীরিক ভাষা বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা, মুখের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা; লিখিত শব্দসমূহ; গ্রাফিক্স; গান; চিত্রকলা এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে। যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অর্থাৎ প্রেরক ও গ্রহণকারীর মধ্যে বোঝাপড়ার একটি প্রক্রিয়া। প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগ তাদের মেজাজ ও আচরণের উপর নির্ভর করে। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়। যোগাযোগের জন্য কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হয়। এটি ঊর্ধ্বতন কর্মী, অধস্তন কর্মী বন্ধু, আত্মীয় সবার সঙ্গেই হতে পারে। যোগাযোগের মাধ্যমে তারা তাদের ধারণা ও মতামত বিনিময় করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করলে সমন্বয় সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

১ মানের প্রশ্ন ঃ একটি বাক্যে

১) Communication- কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
২) একটি শ্রবণভিত্তিক প্রদীপনের উদাহরণ দাও।
৩) w.w.w -কথাটির সম্পূর্ণ নাম কি?

২ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৪০টি শব্দ

১) Technology- শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ।
২) ব্ল্যাকবোর্ডের দুটি উপযোগিতা উল্লেখ কর।
৩) শিক্ষণ প্রদীপন কত প্রকার ও কি কি?

৩ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ৬০টি শব্দ

১) শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যে কোন একটি ধারণা উল্লেখ কর।
২) যোগাযোগের পথে তিনটি অন্তরায় আলোচনা কর।
৩) ছবি ব্যবহারে কয়েকটি রীতি লিখ।

৪ মানের প্রশ্ন ঃ সর্বাধিক ১০০টি শব্দ

১) বিভিন্ন প্রকার চার্ট সম্পর্কে আলোচনা কর।
২) শিক্ষায় এডুস্যাটের ভূমিকা আলোচনা কর।
৩) যোগাযোগের মাধ্যমগুলি আলোচনা কর।

Suggested for Further Readings

প্রথম একক (1st Unit)

Nayak, B. K. (2016). *Text Book of Foundation of Education.* Kitab Mahal: Odisha.

Wingo, G. M. (2014). *Philosophies of Education.* Sterling Publishers: New Delhi.

Rusk, R. R. (2011). *Philosophical Bases of Education.* Oxford University of London Press Ltd : London.

Mrunalini, T. (2018). *Philosophical Foundation of Education.* Neelkamal Publications Pvt. Ltd. : New Delhi.

সেনগুপ্ত, প্র. (১৯৮৫)। *নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন।* ব্যানার্জী পাবলিসার্স: কলকাতা।

দ্বিতীয় একক (2nd Unit)

Mukherjee, K. K. (2009). *Some Great Educators of the World.* Das Gupta Co Pvt. Ltd. : Calcutta.

Purkait, B. K. (2012). *Great Educatios*. New central Book Agency: London.

Chaube, S. P., & Chaube, S. (2018). *Ideals of the Great Western Educators*. Neelkamal Publications Pvt. Ltd. : New Delhi.

ঘোষ, অ. (২০০৯)। *শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব।* এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ : কলকাতা।

তৃতীয় একক (3rd Unit)

Chauhan, S. S. (1998). *Advanced Educational Psychology.* Vikash Publishing House: New Delhi.

Mangal, S. K. (1997). *Advanced Educational Psychology.* Prentice Hall of India: New Delhi.

রায়, স. (১৯৯২)। *শিক্ষা মনোবিদ্যা।* সোমা বুক এজেন্সি: কলকাতা

চতুর্থ একক (4th Unit)

Chauhan, C. P. S. (2004). *Modern Indian Education.* Kaniskka Publishes: New Delhi.

Misra, B. K. C., & Mohanty, *R. (2003). Trends and Issues in Education.* R. Lall Book Depot: Meerut.

ভট্টাচার্য, স. (২০১৫)। মনোবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা।

পঞ্চম একক (5th Unit)

Sharma, R. A., & Sharma, R. K. (2001). *Problems of Education.* H. P. Bhargaba Book House: Agra

Misra, S. (2015). *Essentials of Guidance anal Counselling.* Laxmi Publishers: New Delhi

বিশ্বাস, স. (২০০৬)। *নির্দেশনা ও পরামর্শদান।* জয়ন্তী প্রকাশনা হাউস : কলকাতা।

ষষ্ঠ একক (6th Unit)

Umadevi, M. R. (2017). *Speacial Education.* Neelkamal Publications Pvt. Ltd. : New Delhi.

Rana, N. (2018). *Children With Special Needs.* Neelkamal Publications Pvt. Ltd. : New Delhi.

প্রামাণিক, অ. (২০০৬)। *অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা।* বিবাদী লাইব্রেরি : ঢাকা।

সপ্তম একক (7th Unit)

Garrett, H. E. (1995). *Statistics in Psychology and Education.* Eastern Book House: Guwahati.

Rajamanickam, M. (2001). *Statistical Method in Psychology and Educational Research.* H. P. Bhargava Book House : Agra.

রায়, স. (২০০০)। *ফলিত শিক্ষাবিজ্ঞান*। সোমা বুক এজেন্সি : কলিকাতা।

অষ্টম একক (8th Unit)

Aggarwal, J. C. (2015). *Essentials of Educational Technology.* Vikash Publishing Pvt. Ltd. : New Delhi.

Vanjana, M.; & Varanari L. (2019). *Educational Technology.* Neelkamal Publications Pvt. Ltd. : New Delhi.

সেন, ম. কু. (২০১০)। *প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান*। শোভা: কোলকাতা।

Education : Class XII : Half-Yearly Examination : 80 Marks

Distribution of Marks

Type of Question	Chapter 1 Education & Philosophy	Chapter 2 Great Western Educators	Chapter 3 Psychological Aspects in Education	Chapter 4 Some Issues of Education	Total Weight -age
MCQ : 1 Mark (Multiple Choice Q)	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1	1 × 1 = 1	4
OTQ : 1 Mark (Objective type Q)	1 × 3 = 3	1 × 3 = 3	1 × 3 = 3	1 × 3 = 3	12
2 Mark	2 × 2 = 4	2 × 2 = 4	2 × 2 = 4	2 × 2 = 4	16
3 Mark	3 × 1 = 3	3 × 1 = 3	3 × 1 = 3	3 × 1 = 3	12
4 Mark	4 × 1 = 4	4 × 2 = 8	4 × 1 = 4	4 × 2 = 8	24
6 Mark	6 × 1 = 6	—	6 × 1 = 6	—	12
Total	**21**	**19**	**21**	**19**	**80**

Word Limitation

M.C.Q – Choose the Correct Option
1 Mark – One Sentence
2 Mark – Within 40 words
3 Mark – Within 60 words
4 Mark – Within 100 words
6 Mark – Within 150 words

Education : Class XII : Pre-Board Examination : 80 Marks

Distribution of Marks

Chapter	Title	MCQ 1 Marks	OTQ 1 Marks	2 Marks	3 Marks	4 Marks	6 Marks	Total Marks
Ch. 1	Education and Philosophy	1×1=1	1×1=1	2×1=2	—	—	6×1=6	10
Ch. 2	Great Western Educators	—	1×2=2	2×1=2	3×1=3	4×1=4	—	11
Ch. 3	Psychological Aspects in Education	1×1=1	1×1=1	2×1=2	—	4×1=4	—	08
Ch. 4	Some Issues of Education	—	1×2=2	2×1=2	3×1=3	4×1=4	—	11
Ch. 5	Guidance and Counselling	1×1=1	1×1=1	2×1=2	—	4×1=4	—	08
Ch.6	Inclusive Education	—	1×2=2	2×1=2	3×1=3	4×1=4	—	11
Ch. 7	Statistics in Education	1×1=1	1×1=1	2×1=2	—	—	6×1=6	10
Ch. 8	Educational Technology	—	1×2=2	2×1=2	3×1=3	4×1=4	—	11
							Total	**80**

Word Limitation

M.C.Q – Choose the Correct Option
1 Mark – One Sentence
2 Mark – Within 40 words
3 Mark – Within 60 words
4 Mark – Within 100 words
6 Mark – Within 150 words

Note